পরিচয়

শ্রাবণ • ১৩৬৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায় চিত্র : এফ. রাবেল [মেক্সিকো]

সম্পাদক
গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ভাদ্র ## সূচীপত্র ১৩৬৯

শান্তি ও পরমাণু সংখ্যা

প্রচ্ছদচিত্র : পাবলো পিকাসো

[মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন উপলক্ষে অঙ্কিত]

আর্টপ্লেট : পাবলো পিকাসো

রেখাচিত্র : কিয়োটাকা ওয়াজিমা

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা বর্ধিত মূল্য ও প্রায় দ্বিগুণ কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা অভিনব প্রচ্ছদপট, দেশী ও বিদেশী চিত্রকরদের সুনির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রকর্মের অনেকগুলি প্রতিলিপি।

খ্যাতনামা প্রবীণ ও নবীন কবি-সাহিত্যিকদের মননসমৃদ্ধ রচনাসম্ভার।

বিস্তৃত সূচীপত্র পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হবে।

এজেন্টরা সঠিক চাহিদা জানান পত্রিকা প্রকাশের পর কোনো ক্রমেই বাড়তি কপি সরবরাহ করা যাবে না।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাহকরা শারদীয় সংখ্যাটি সরাসরি 'পরিচয়' কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করলে ভালো হয়। যাঁরা হাতে নেবেন তাঁরা অনুগ্রহ করে সত্বর তাঁদের নাম ও গ্রাহক সংখ্যা জানাবেন।

বর্ষ ৩২ । সংখ্যা ৫ | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩২ । সংখ্যা ৬

সূচীপত্র

পৌষ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

দ্ধের শিশু — এফ. রাবেলা

দর্শনে সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব

ভবানী সেন

মিলিক ক্যাপেক বিজ্ঞানের আধুনিকতম জটিল তথ্যসমূহ দ্বারা যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয়েরই অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন*। তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি ডায়লেকটিক বস্তুবাদের খুব কাছাকাছি, কিন্তু খুব সম্ভবত মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়, তাই তাঁর বিশ্লেষণ যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং সর্বপ্রকার ভাববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও, স্থানে স্থানে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতার দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। তথাপি দর্শনের আলোচনায় লেখকের অবদান নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান।

স্থান ও কাল

লেখক খুবই তৎপরতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং সর্বপ্রকার ভাববাদ নিউটন-লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ এবং আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আপেক্ষিকতাবাদের ও ইলেকট্রন তত্ত্বের দার্শনিক মর্ম উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তাঁরা সেই ক্লাসিকাল বিজ্ঞানেরই প্রাথমিক ধারণার চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন।

লেখকের মতে ক্লাসিকাল বিজ্ঞান চারটি প্রাথমিক ধারণার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা—এই চারটি ধারণা হলো: স্থান বা তল, সময়, বস্তু এবং গতি।

---

*Milic Capek. The Philosophical Impact of Contemporary Physics.

স্থান বা তল

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের মতে স্থান অথবা 'তল' হলো একটি নির্বিশিষ্ট সত্তা। বস্তুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, স্থানের মধ্যে বস্তু অবস্থিত, কিন্তু বস্তুশূন্য স্থানও আছে। স্থান সীমাহীন সনাতন এবং অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, তার প্রতি অংশই সমধর্মী। স্থান বলতে বোঝায় একই সময়ে বর্তমান বা সহ-অবস্থিত বিন্দু-সমষ্টি।

সময় বা কাল

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের চোখে কালও একটি স্বতন্ত্র নির্বিশিষ্ট সত্তা, তা সীমাহীন এবং স্রোতের মতো অনন্ত অংশে বিভাজ্য। স্থান একই সময়ে অবস্থিত বিন্দু-সমষ্টি, কিন্তু কাল হচ্ছে একটার পর আর একটা ঘটনার একটি ঘনসন্নিবিষ্ট রাশিমালাতে ব্যাপ্ত একটি ধারাবাহিক স্রোত।

বস্তু

বস্তুর প্রাথমিক সত্তা পরমাণু একটি নিরেট এবং স্থির বা গতিহীন সত্তা। স্থানে এবং কালে বস্তু অবস্থিত, কিন্তু স্থান এবং কাল থেকে বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গতি

গতি মানেই নির্দিষ্ট সময়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। বস্তুর বহির্ভূত কোনো শক্তি দ্বারা বস্তু গতি লাভ করে অথচ গতির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। গতির এই ধারণা স্পষ্ট করতে গিয়েই এনার্জি বা শক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঘাত থেকেই গতির জন্ম।

সংক্ষেপে, এই কয়েকটি ধারণা নিয়েই ক্লাসিকাল বিজ্ঞান ও ক্লাসিকাল দর্শন তার সমগ্র চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিল। এই ধারণা অবশ্যই অতিপ্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানব-মনকে বহুল পরিমাণে মুক্ত করে প্রায় চার শতাব্দী যাবত প্রকৃতির ওপর মানব-মনের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বস্তুবাদ এই আধিপত্যেরই শীর্ষ-ফল এবং জয়তিলক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলোকের একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাসিকাল বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদের সঙ্কট শুরু হয়। ক্লাসিকাল বিজ্ঞান অনুসারে অনন্ত স্থানে এবং অনন্ত কালে আলোকের গতিবেগ বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন হতে বাধ্য। কেননা, সময় যেহেতু অনন্ত ভাগে সমভাবে বিভাজ্য এবং স্থানও যেহেতু সমধর্মী অংশে বিভাজ্য একটি নির্বিশিষ্ট সত্তা, স্নতরাং অন্য যে কোনো গতির মতোই আলোকের গতিবেগও আধার-বিশেষে প্রাপ্ত চাপ অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে সক্ষম। সহজ ভাষায় প্রশ্নটি এই যে একটি বস্তুপিণ্ড যেমন ঘণ্টায় এক মাইল থেকে ঘণ্টায় লক্ষ-কোটি মাইল গতিবেগ লাভ করতে পারে, আলোকও তেমনি বিভিন্ন মাত্রার গতিবেগ লাভ করতে পারবে না কেন ?

১৮৮২ সালে যখন মিচেলসনের একটি গবেষণার পর নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হলো যে আলোকের গতিবেগ সর্বদাই নির্দিষ্ট, তার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না এবং কোনো বস্তুর চাপে বা কোনো মাধ্যমেই তার তারতম্য হয় না, তখনই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বজগতে একটি যুগান্তর ঘটে গেল।

উল্লিখিত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে যখন আলোকের এই পরিচয় পাওয়া গেল যে তার গতিবেগ সর্বদাই এবং সর্বত্রই এক এবং অবিভাজ্য (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) তখন দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে প্রত্যক্ষ হবার কথা তার এক সেকেণ্ড পর প্রত্যক্ষ হয়, কারণ চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌছতে এক সেকেণ্ড লাগে। পোলারিস প্রত্যক্ষ হয় পঞ্চাশ বছর পর, কারণ পোলারিস থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে ৫০ বছর অতীত হয়ে যায়। আবার, এমন অনেক তারকা আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌছতে কয়েক কোটি বৎসর লেগেছে, ইতিমধ্যে তার অস্তিত্বই গেছে বিলুপ্ত হয়ে, স্নতরাং পৃথিবীর কাছে যখন তা বর্তমান, আসলে তখন তা অতীত, স্নতরাং অতীত এবং বর্তমানের নির্বিশিষ্ট কোনো ভেদ নেই। উল্লিখিত বিলুপ্ত তারকার খুব নিকটে অবস্থিত কোনো তারকার নিকট যা এখন অতীত, পৃথিবীর কাছে তা এখন বর্তমান। এই নিয়েই শুরু হলো সময়ের আপেক্ষিকতাবাদ।

ভাববাদী দর্শন এই সমস্যার সমাধান করতে চাইল এই বলে যে সত্তার প্রকৃত অস্তিত্ব অজ্ঞেয়, আমাদের কাছে সত্তার অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপর (অর্থাৎ মনের উপর) নির্ভরশীল। ক্লাসিকাল বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ এর

জবাবে বলেছিল যে, পৃথিবীতে আমার কাছে যা অতীত, বিশ্বব্যাপী মহাস্থানে অবস্থিত কোনো না কোনো জগতে এখন তা বর্তমান। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে কোনো একটি বিন্দু অনন্ত পরিমাণ গতিবেগ নিয়ে মহাস্থানে চলছে তাহলে সে প্রায় একই সময়ে একই সঙ্গে সর্বত্র বর্তমান, কারণ প্রতি সেকেণ্ডে অনন্ত মাইল বেগে সে চলছে। এই অবস্থায় তার কাছে বিভিন্ন গ্রহ-তারকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের প্রকৃত সময়টি ধরা পড়বে, কারণ ঐ অনন্ত গতিবেগসম্পন্ন বিন্দুটির কাছে দৃষ্ট সময় এবং প্রকৃত সময়ের কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সমস্ত গ্রহ-তারকার আলোক তার কাছে একই সময় পৌছয়।

কিন্তু এই তত্ত্ব একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল—যখন আবিষ্কৃত হলো এই সত্য যে আলোকের গতিবেগ কেবল সীমাবদ্ধ নয়, ঐ গতিবেগই সর্বোচ্চ গতিবেগ; অর্থাৎ কোনো পদার্থের পক্ষেই আলোকের গতিবেগের বেশি তো নয়ই, তার সমান গতিবেগ লাভও অসম্ভব এবং অবাস্তব। অনন্ত গতিবেগের কল্পনা গণিতের হিসাব অনুসারে একেবারেই উদ্ভট। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি?

সময়ের নির্বিশিষ্টতা যে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো অনন্ত গতিবেগসম্পন্ন একটি বিন্দুর সম্ভাবনা। কিন্তু যেহেতু কোনো গতিবেগই আলোকের চেয়ে বেশি হয় না, সুতরাং অনন্ত গতিবেগ তো হতেই পারে না; অতএব সময়ের নির্বিশিষ্ট সত্তাটি নিছক একটি উদ্ভট কল্পনা। সময়ের আপেক্ষিকতাই নির্বিশিষ্ট সত্য। সময়ের এই আপেক্ষিকতা মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফল নয়। মহাবিশ্বে বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন গ্রহ-তারকার সময়গুলি বিভিন্ন। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কালস্রোত বলে কোনো নির্বিশিষ্ট সত্তা নেই।

তা যদি হয়, তাহলে স্থানেরও কোনো নির্বিশিষ্ট সত্তা নেই। কেননা নির্বিশিষ্ট স্থান মানেই একই সময়ে বর্তমান বিন্দুসমূহের সমষ্টি। যেহেতু সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য কোনো একটা "**একই সময়**" হতে পারে না, সুতরাং মহাবিশ্বে একই সময়ে বর্তমান বিন্দুসমষ্টির ধারণাও কাল্পনিক এবং অসত্য। এই পৃথিবীর একটি স্থান আছে, তেমনি মহাবিশ্বে বিভিন্ন জগতের বিভিন্ন স্থান আছে। সুতরাং কালের মতো স্থানও সত্য সত্যই আপেক্ষিক। এই হলো আইনস্টাইনের স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরীর সারমর্ম। স্থান এবং

কালের সত্যকার পরিচয় কি সে সম্বন্ধে তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরীর উল্লেখ করে বলেছেন যে স্থান, কাল এবং বস্তু সব মিলেই একটি অখণ্ড সত্তা এবং তার অস্তিত্ব ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা। মার্কস এবং এঙ্গেলস আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ছাড়াই স্থান এবং কালকে বস্তুর অস্তিত্বের রূপ (Forms of Existence of Matter) বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্থানের এবং কালের এই সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এবং সুস্পষ্ট। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক পরোক্ষভাবে এই সংজ্ঞাতেই পৌঁছেচেন, কিন্তু বোধহয় তিনি মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত নন বলেই, সুস্পষ্টভাবে এই সংজ্ঞাটি দিতে পারেন নি।

বস্তু ও গতি

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের মতে বস্তুর ক্ষুদ্রতম ইউনিট এটম একটি নিরেট এবং গতিহীন পদার্থ। নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে তার প্রধান দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো (১) পদার্থের (Mass-এর) সঙ্গে তার ভল্যুমের (অর্থাৎ ঐ পদার্থ কতটা স্থান জুড়ে আছে তার) একটা নির্দিষ্ট অনুপাত বিদ্যমান। (২) বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের আভ্যন্তরীণ পদার্থের পরিমাণ সর্বদাই নির্দিষ্ট।

এই বস্তুই বিশিষ্ট স্থানে বিশিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী স্থানমণ্ডলের এবং নির্বিশিষ্ট কালস্রোতের মধ্যে বর্তমান।

আইনস্টাইনের স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরী স্থান এবং সময়ের নির্বিশিষ্ট সত্তাটিকে অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করায় বস্তুর অস্তিত্ব হলো বিপন্ন। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন তত্ত্বের আবিষ্কার তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল। বিংশ শতাব্দীর এই আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের (ইলেকট্রন-প্রোটন প্রভৃতির) আভ্যন্তরীণ পদার্থের সঙ্গে তার স্থানব্যাপ্তির (অর্থাৎ Mass এবং Volume-এর) কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নেই এবং তার পদার্থের পরিমাণও সর্বদা এক থাকে না। পদার্থের সঙ্গে তার গতিবেগের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে পদার্থেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

কি করে তা হয়? তা হয় এইজন্য যে এনার্জি বা শক্তি এবং পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, পদার্থ এবং শক্তি একই সত্তার বিভিন্ন রূপ।

এই আবিষ্কারের পর দার্শনিক ভাববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, ঘোষণা করল যে বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই, অশরীরী শক্তিই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে ভাববাদ শক্তিকে বস্তু থেকে স্বতন্ত্র ধরে নিয়েই ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুসত্তা সম্পর্কে যে নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছে তার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে শক্তি ও পদার্থ পৃথক সত্তা নয়, একই বাস্তব সত্তা শক্তি ও পদার্থ এই দুই রূপে বর্তমান এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং শক্তি বা এনার্জি একটি অপার্থিব সত্তা নয়, বাস্তব সত্তা।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে ইতিমধ্যে আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আবিষ্কৃত নতুন তথ্যদ্বারা উল্লিখিত সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯৩২ সালে এণ্ডারসন আবিষ্কার করলেন 'পজিটিভ ইলেকট্রন'। পরমাণুর ভারী কেন্দ্রে তীব্র শক্তি সঞ্চালিত হলে তার ভিতর দিয়ে যে দুই শক্তি বেরিয়ে আসে তার একটি নেগেটিভ ইলেকট্রন আর একটি 'পজিটিভ ইলেকট্রন'। পজিটিভ ইলেকট্রন ক্ষণস্থায়ী, তা খুব তাড়াতাড়ি একটি নেগেটিভ ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখনই নেগেটিভ ইলেকট্রনটি রশ্মিতে পরিণত হয়। ঐ রশ্মিটিই বিটা রশ্মি নামে পরিচিত। ঐ বিটা রশ্মিই আলোকরূপে বিচ্ছুরিত হয়।

আলোকরশ্মি যখন কোনো পরমাণুর উপর পড়ে তৎক্ষণাৎ তার অবলুপ্তি ঘটে, অর্থাৎ আলোকের এনার্জিকে ঐ পরমাণু আত্মসাৎ করে নেয়।

সুতরাং আলোকরশ্মি হলো এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে বস্তুরই অভিগমন, সাধারণভাবে সমস্ত রশ্মি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

সুতরাং বস্তু এবং গতি অভিন্ন, বস্তুর প্রাথমিক ইউনিট হলো গতিশীল বস্তু; গতিহীন বস্তু বা বস্তুহীন গতি একেবারেই অবাস্তব। বিশ্বপ্রকৃতিতে অহরহ বস্তুর উৎপত্তি ও বিলুপ্তি একই সঙ্গে ঘটছে অর্থাৎ বস্তুর রূপান্তর চলছে অহরহ। বস্তুর সঙ্গে গতির এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হলো আর একটি অভিনব তথ্যের উদ্‌ঘাটনে।

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ধারণা ছিল এই যে শক্তির সঙ্গে তাপের একটি সম্পর্ক আছে। তাপই বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারের কারণ। নার্নস্ট আবিষ্কার করেন যে সম্পূর্ণ শূন্য ডিগ্রী তাপেও প্রাথমিক বস্তুসত্তার

কিছুটা এনার্জি বা শক্তি থেকে যায়। সুতরাং বস্তু ও শক্তি যে অভিন্ন সে সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহের কারণ রইল না। বস্তু মানেই গতিশীল বস্তু, গতিহীন বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্ত্বেও যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং ভাববাদ নিজ নিজ চিন্তাধারা রক্ষা করেন ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের সেই সমস্ত মূল ধারণার সাহায্যে, যেগুলি এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে নস্যাৎ হয়ে গেছে। তাঁরা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে বার বার প্রশ্ন তোলেন বস্তুই আদি না শক্তিই আদি, বস্তু থেকে শক্তির জন্ম অথবা শক্তি থেকে বস্তুর জন্ম। এই দুয়ের যে স্বাতন্ত্র্য অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, সেই স্বাতন্ত্র্যকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য-বিলুপ্তির তাৎপর্য খুঁজবার চেষ্টাতেই তাঁদের আলোচনা ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের বিকল্প নতুন নতুন ধারণার নতুন নামকরণ করতে পারেন নি, মানব-মন যে ক্লাসিকাল ধারণায় অভ্যস্ত তারই কাঠামোর মধ্যে থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন বলেই দার্শনিকেরা যান্ত্রিক বস্তুবাদ অথবা ভাববাদের অন্ধগলিতে ঘুরপাক খান।

কার্য-কারণ-তত্ত্ব

ক্লাসিকাল বিজ্ঞান অনুসারে কার্যকারণতত্ত্বের ভিত্তি হলো গতির প্রকৃতি। কোনো এক বস্তু যখন অপর বস্তু থেকে একটি শক্তি-চাপ প্রাপ্ত হয় তখন তা স্থান ত্যাগ করে এবং চাপের মাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছয়। সুতরাং কোনো বস্তুর গতিবেগ (velocity) এবং অবস্থান (position) জানতে পারলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার নতুন অবস্থান সঠিক ভাবে জানা যায়।

হাইজেনবার্গ দেখান যে বস্তুগতির এই যান্ত্রিক নিয়ম পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন সম্পর্কে খাটে না। ইলেকট্রনের অবস্থান এবং গতিবেগ থেকে তার নতুন অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, কেননা ইলেকট্রনের অবস্থান এবং তার গতিবেগ একই সঙ্গে নির্ধারণ করা যায় না।

ভাববাদীরা অবশ্য প্রথমেই উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে কার্যকারণ-তত্ত্ব এখন সমাধিস্থ, ইলেকট্রন চলে 'স্বাধীন ইচ্ছা' অনুসারে। সুতরাং ব্রহ্মবাদই সমস্ত বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান। আঘাতটা একটু সামলে নিয়ে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা ঘোষণা করেন যে হাইজেনবার্গের তত্ত্ব অনুসারে ইলেকট্রনের অবস্থান এবং গতিবেগ এই উভয়ই একই সঙ্গে নির্ধারণ করা যায় না বলেই ইলেকট্রনের গতিবিধি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। ত্রুটিটা বাস্তব সত্তার নয়, ত্রুটিটা পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তির। অমনি পজিটিভিস্ট দার্শনিক বলে উঠলেন "তাই তো বলি যে সত্তার যে পরিচয় আমরা পাই তা ব্যক্তির সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণের ফল, প্রকৃত বাস্তব সত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তা আমাদের হিসেবে মেলে কিনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তার বেশি কিছু নয়।" ভাববাদী উত্তর দেন, "বটেই তো, তার বেশি জানবে কি করে, প্রকৃত বাস্তব সত্তা বলে নেই তো কিছুই, তথাকথিত বাস্তব সত্তা মন থেকেই সৃষ্ট।" এমনি ভাবেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ, পজিটিভিস্ট দর্শন এবং ভাববাদ—এদের পারস্পরিক সমালোচনা কার্যত পারস্পরিক সমর্থনে পরিণত হয়।

এই দার্শনিক গোলকধাঁধার জবাবে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তুলে ধরেছেন শ্রডিঙ্গার কর্তৃক ১৯৩৪ সালে আবিষ্কৃত একটি তথ্য। তথ্যটি এই যে প্রাথমিক বস্তুসত্তার 'নির্দিষ্ট অবস্থান' এবং 'নির্দিষ্ট গতিবেগ' থাকে না; অর্থাৎ তার কোনো অবস্থানই এবং কোনো গতিবেগই কোনো বিশেষ একটি নির্দিষ্ট সময়েই 'স্থির' নয়, তা সতত সঞ্চরণশীল। সতত সঞ্চরণশীল বলতে বুঝতে হবে এই যে-তার আভ্যন্তরীণ পদার্থ ও শক্তি, তার গতি ও গতিবেগ এবং তার অবস্থান পরস্পরকে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে সৃষ্ট ও পুনঃসৃষ্ট করছে। বাস্তবে যা স্থির নয় তার স্থিরীকরণই তো অবাস্তব। তাই বহু ইলেকট্রনের সমবেত গতির একটি গড়পড়তা দিক-নির্ণয় করতে হয়, সুতরাং কার্য-কারণের হিসেবটা স্ট্যাটিষ্টিকাল সত্যের মতো সঠিক অবস্থার কাছাকাছি সত্য হয়। একটি ইলেকট্রনকে তার সমবেত ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে যে ইলেকট্রনের বিচার হয় তা প্রকৃত ইলেকট্রন নয়। অথচ এক ঝাঁক ইলেকট্রনের মধ্যে একটির গতি সম্পর্কে কাছাকাছি সত্যনির্ধারণটা মিথ্যা বা মনের সৃষ্ট নয়। এটা বাস্তবসত্তারই সঠিক পরিচয়। ম্যাক্স প্লাংক গতি-শক্তির বিকীরণের পরিমাণ কষে দেখিয়েছেন যে এই সঞ্চরণশীল

শক্তি-পদার্থের বিকীরণও বহু আস্তো-বিন্দুর সৃষ্টি, এবং এক একটি আস্তোবিন্দুর পরিমাণও নির্দিষ্ট (অর্থাৎ h)। এই তত্ত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টের সীমারেখাই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ; সুতরাং তা অনির্দিষ্ট কেন হলো আর নির্দিষ্ট থেকে তার বিচ্যুতি কেন ঘটল এই সমস্ত প্রশ্নই অবাস্তব এবং অবান্তর। উল্লিখিত আস্তোবিন্দুটি আসলে দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্রের একতার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ওর ভিতর তরঙ্গ এবং কণিকা এই দুয়ের ধর্ম একত্রে সমাবিষ্ট।

এই সিদ্ধান্ত ডায়লেকটিক বস্তুবাদেরই নির্ভুলত্ব প্রমাণ করছে। গ্রন্থকার কিন্তু সে কথা বুঝতে না পেরে গতির এই নিয়মটিকে অনির্দিষ্টতত্ত্ব (indeterminism) বলে বিবৃত করেছেন, যদিও তিনি বিশদভাবে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর এই 'অনির্দিষ্টতত্ত্ব' কার্যকারণসম্পর্ক নস্যাৎ করে নি, আপেক্ষিক গতিহীন বস্তুর কার্যকারণের ঊর্ধ্বে গতিসমন্বিত সচল বস্তুর জটিল কার্যকারণতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইভাবে গ্রন্থকার অচেতনভাবেই ডায়লেকটিক বস্তুবাদের মূল নিয়মটির গোড়ায় এসে পৌঁছেচেন। গ্রন্থকার যে কার্যকারণসম্পর্ককে অনির্দিষ্টতা বলে বর্ণনা করেছেন তা আসলে অনির্দিষ্টতা নয় ; তাও একরকম নির্দিষ্টতা—যান্ত্রিক নির্দিষ্টতা নয়, ডায়লেকটিক নির্দিষ্টতা।

তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার ভাববাদ খণ্ডন করতে করতে প্রকারান্তরে ভাববাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে ফেলেছেন। যখনই তিনি বললেন যে বিশ্বসত্তার প্রধান নিয়ম হলো একটি বিশেষ ধরনের অনির্দিষ্টতত্ত্ব (indeterminism) এবং এইটিই সার সত্য, তখনই তিনি বস্তুত কার্যকারণতত্ত্বের ভিত্তিমূল উড়িয়ে দিলেন। কারণ, তাঁর উক্তি অনুসারে যে কোনো ধরনের নির্দিষ্টতাই (Determinism) প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। অথচ তিনিই স্বীকার করেন যে কার্যকারণতত্ত্বের মূলকথা সময়-পরম্পরায় ঘটনার সংঘটন, এবং এই নিয়ম নস্যাৎ হয় নি। গ্রন্থকারের এই স্ববিরোধিতা আরও বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিকদের একটি প্রশ্ন ধরা যাক। বস্তু অবিনশ্বর না, বস্তুর ধ্বংস এবং সৃষ্টি আছে। গ্রন্থকার বলছেন বস্তু অনবরতই ধ্বংস হচ্ছে এবং অনবরতই তার সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ—বিটা রশ্মি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুপ্ত থাকে না, আলোক বিকীরণের ভেতর তার সৃষ্টি এবং বিকীরণের শেষ অঙ্কে তার লয়। যে ভাববাদীরা বস্তুসত্তাকে

অপরিবর্তনীয় মনে করেন এবং বিকাশকে যাঁরা সুপ্তসত্তার আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেন তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রন্থকারের এই উদাহরণ একটি মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু গ্রন্থকার বুঝছেন না যে তিনি যেটা লক্ষ্য করেছেন তার আসল তাৎপর্য বস্তুসত্তার রূপান্তর এবং পরিমাণের পরিবর্তনে গুণগত পরিবর্তন। তিনি যাকে সৃষ্টি বলে মনে করছেন তা আসলে আলোকের অবলোপ, অর্থাৎ পুরাতন আধারে নতুন অভ্যুদয়।

ডায়লেকটিক বস্তুবাদ বিশ্বসত্তার তিনটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছে—(১) বিরুদ্ধসত্তার ঐক্য, (২) পরিমাণের পরিবর্তনসূত্রে গুণগত পরিবর্তনের আবির্ভাব এবং (৩) অবলোপের অবলোপ (Negation of negation)। এই তিনটি নিয়ম বুঝলে যাকে আপাতত ধ্বংস ও সৃষ্টি মনে হচ্ছে তা আসলে সত্তার ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব-তিরোভাবের একটি অপূর্ব ঐক্য। যা ছিল তা থাকছে না, যা হচ্ছে তা যা ছিল তারই বিকশিত গুণসম্পন্ন নতুন রূপ। সুতরাং বস্তু আসলে অবিনশ্বর এবং শাশ্বত।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থকার সত্তা (Being) এবং সঞ্চরণের (Becoming) ডায়লেকটিক যোগসূত্র দেখেছেন এবং ধরেছেনও; কিন্তু তবু তাঁর মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তের জন্য তা ঠিক রপ্ত করতে পারেন নি।

কৃষ্ণ-আফ্রিকার অতীত ও বর্তমান

রণজিৎ দাশগুপ্ত

আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে ইওরোপ-আমেরিকার সম্পর্ক পাঁচ শ বছরেরও বেশি। কিন্তু কি সেই সম্পর্কের প্রকৃতি? কেমন করেই বা বিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্ক? সে সম্পর্কের থেকে কোন বিশেষ ফল বর্তেছে কালো আফ্রিকার জীবনে? আর আফ্রিকাবাসীর প্রতিক্রিয়াই বা কি হয়েছে এই সম্পর্কের বিষয়ে? এসব জিজ্ঞাসার বিস্তারিত আলোচনা ও উত্তর পাওয়া যাবে আলোচ্য বই তিনটিতে*।

তিনটি বই-ই মুখ্যত সাহারার দক্ষিণস্থ আফ্রিকা বিষয়ক। তবে এর মধ্যে বেসিল ডেভিডসনের আলোচনার বিষয় হলো ১৪৪১ সালে গিনী উপকূলে পর্তুগীজ জাহাজের প্রথম নোঙর ফেলা থেকে শুরু করে দাস ব্যবসায়ের অবসান। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও আধিপত্যের যুগে ইওরোপ-আফ্রিকার সম্বন্ধের বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে জ্যাক ওডিসের প্রথম বইটিতে। আর তাঁর দ্বিতীয় বইটি থেকে জানা যাচ্ছে এই সম্বন্ধে যুগান্তকারী পরিবর্তনের বৃত্তান্ত।

তিনটি বই তিনটি ভিন্ন পর্ব সম্পর্কে, দু-জন লেখকের রচনাভঙ্গিও দু-রকমের। কিন্তু তবু বই তিনটির নানা তথ্য ও তত্ত্ব, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত। আফ্রিকেয় মানবতার প্রতি পশ্চিমের নিষ্ঠুর অবমাননার বিষয়ে সুতীব্র বেদনা, পাঁচ শ বছর ধরে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ কালো মানুষগুলির জন্য নিবিড় সহানুভূতি, বিশাল মহাদেশের এক প্রান্ত

---

*Basil Davidson. Black Mother—Africa: The Years of Trial. Victor Gollanez Ltd., London. 1961.

*Jack Woddis. Africa: The Roots of Revolt. Lawrence and Wishart, London. 1960.

*J. Woddis. Africa: The Lion Awakes. Lawrence and Wishart, London. 1961.

থেকে আরেক প্রান্তব্যাপী বিপুল আলোড়নের যথার্থ পটভূমিটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংবেদনশীল প্রয়াসের পরিচয় তিনটি বইয়েই বর্তমান। আর এই প্রয়াসে নিঃসংশয়িত কৃতিত্বের জন্য ঐকান্তিক অভিনন্দন দু-জন লেখকেরই প্রাপ্য।

এক

আফ্রিকার অতীত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এবং সে মহাদেশ একমাত্র হিংস্র পশু আর মানুষ-খেকো অসভ্যদের বিচরণক্ষেত্র—এই ধারণাটিকেই গত কয়েক শতক ধরে বিতরণ করা হয়েছে সচেতনভাবে, সযত্নে, সুকৌশলে। কিন্তু গর্বোদ্ধত ইওরোপের এ দৃষ্টি যে সত্যদৃষ্টি নয়—এটা বেসিল ডেভিডসনের আফ্রিকা-চর্চার গোড়ার কথা। ভ্রমণকারী, নাবিক ও ঐরকম আরও অনেকের বিবরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের সাক্ষ্যসমূহকে ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন ইওরোপের সঙ্গে আফ্রিকার প্রথম সংযোগ-মুহূর্তটিতে, এবং আসলে তার বেশ কিছু আগেই, মৌলিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও কতকগুলি দিক দিয়ে ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ আফ্রিকেয় উপজাতীয়-সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল; দেখা দিচ্ছিল লৌহ যুগের পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণ ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার; উদ্ভব হয়েছিল পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে উন্নত নগর-রাষ্ট্রের; প্রসার ঘটেছিল লিখিত সাহিত্যের; গড়ে উঠেছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবন। এসব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হচ্ছে অবশ্য এই হালে, আর দীর্ঘকালের অবহেলায় অনেক সূত্রই গেছে হারিয়ে। তাই আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ নিঃসন্দেহেই দুরূহ, এবং সে চেষ্টা আলোচ্য বইয়ে করা হয় নি। কিন্তু এ বইয়ের বিশেষ মূল্য হলো: শ্রীযুত ডেভিডসন আলোকপাত করেছেন নতুন নতুন দিকের উপর, গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এবং বেশ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তিনটি অঞ্চল—গিনী উপকূল, কঙ্গো ও পূর্ব আফ্রিকা উপকূলের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে। আর এ প্রসঙ্গে যেটুকু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তা একই সঙ্গে বিদগ্ধ এবং মনোজ্ঞ।

কিন্তু কালো আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের নিজস্ব ধারা, সাহিত্য ও মানস সম্পদের চর্চা—এ সবই

প্রথমে বিপর্যস্ত এবং তারপরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল পশ্চিম ইওরোপের সঙ্গে সংঘাতের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতায়, এ সব একেবারেই হারিয়ে গেল পশ্চিম ইওরোপের বিরাট লোভের অতল গহ্বরে। আর এটাই শ্রীযুত ডেভিডসনের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

ইওরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যিক লেনদেন গোড়ার দিকে চলত একদিকে হাতির দাঁত, মশলা, আফ্রিকেয় কুটিরশিল্প-জাত নানা পণ্য, এমন কি কাপড়; আর অন্যদিকে এ সবের দাম হিসেবে রুপো, ঘোড়া, বন্দুক, ইওরোপীয় বিলাস পণ্যাদি নিয়ে। এ লেনদেনের ভিত্তি ছিল সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সম্পর্ক গেল বিলকুল পাল্টে। বাণিজ্যিক লেনদেনের বদলে শুরু হলো সভ্য ইওরোপের মানুষ ধরার বর্বর অভিযান, হাতির দাঁত সোনা আর মূল্যবান রত্নের ব্যাপক লুণ্ঠন, গোটা আফ্রিকা জুড়ে দস্যুবৃত্তি আর নরমেধ পর্ব। ১৪৪৩-৪৪ সালে মাত্র ৪৯ জনকে বন্দী করে পাঠানো হয়েছিল লিসবনে। পরবর্তী ৩০ বৎসরে সংখ্যাটি স্ফীত হয়ে দাঁড়াল ৩,৫০০-এ। ১৫৯২ সালে স্পেনীয় ঠিকাদার গোমেশ রেনালের চুক্তি ছিল ৯ বৎসরে ৩৮,২৫০ গোলাম চালানের। ১৭০২ সালে একটি ফরাসী কোম্পানীর ঠিকা ছিল ৩৮,০০০ গোলাম চালান দেওয়ার। ১৭১৩ সালে ইংরেজ ঠিকাদারদের চুক্তি ছিল ৩০ বৎসরে ১৪৪,০০০ গোলাম রপ্তানির। শ্রীডেভিডসন কম করেই হিসেব করেছেন—কিন্তু সে হিসেব অনুসারেই চার শ বছরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, স্পেনীয় উপনিবেশ ও আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে আখ, তুলো, তামাকাদি আবাদের জন্য প্রয়োজনে চালান দেওয়া হয় মোট ৫ কোটি গোলাম। এর উপরে আরও কত মানুষকে খুন হতে হয় তার তো কোনো লেখা-জোখা নেই। কি ভাবে ধরা হতো এই মানুষগুলোকে, কেমন করে তাদের ছিনিয়ে আনা হতো দেশ-গাঁ ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে, কেমন করে মুরগী-ঠাসা অবস্থায় জাহাজ বোঝাই করে রপ্তানি করা হতো এই মানুষ-পণ্যগুলিকে, ধর্মব্যবসায়ী খ্রীস্টান পুরোহিতরা কি ভণ্ডামির সঙ্গে উদ্ধার করত এদের পতিত আত্মাকে, আর কি বিচিত্র যুক্তিতে পশ্চিম ইওরোপ স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল মানুষের প্রতি মানুষের এই আচরণকে—সেই বীভৎস, রক্তাক্ত ইতিহাসের নানা খুঁটিনাটি শ্রীডেভিডসন তুলে ধরেছেন।

কিন্তু কি পরিণতি ঘটল মানুষ নিয়ে এই অমানুষিক ব্যবসার? একদিকে,

কম করেও অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ, পাঁচ কোটি সুস্থ সবল মানুষ, পাঁচ কোটি পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কল্পনাপ্রবণ মানুষের এই অপহরণ পঙ্গু ও বিকৃত করে দিল সমগ্র আফ্রিকার সামাজিক বিকাশ, বাস্তব কর্মতৎপরতা ও ধ্যান-ধারণাকে। অন্যদিকে, দাসব্যবসায়ী, আমেরিকার বসতি স্থাপনকারী ইওরোপীয় আর পশ্চিম ইওরোপীয় বণিকদের লাভের অঙ্ক উঠল ফেঁপে-ফুলে। আর এই প্রক্রিয়াতেই লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার ও অনুরূপ নগরে বন্দরে ঘটল শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের 'প্রাথমিক সঞ্চয়'। এ প্রসঙ্গে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কসের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীযুত ডেভিডসনের বিশ্লেষণে। তিনি দেখিয়েছেন : "...the trade with West Indies consisted in simple exchange of cheap manufactured goods for African slaves ; of African slaves for West India food-stuffs and tobacco ; and of these products, once brought to Europe, for a high return in cash. Out of this rapid economic expansion there flowed the circumstances that enabled England to achieve an industrial revolution." এবং শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, ফ্রান্সেও ঘটল সদৃশ বিকাশ।

এই নির্মম ব্যবসার অবসানের পিছনে রয়েছে নানা কারণ। কিন্তু এই বহুবিধ কারণের মধ্যে শ্রীডেভিডসনের বিবেচনায় সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক কারণ। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মূলত সঠিক যে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ-পণ্যের প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে, পরিবর্তে দেখা দিল শিল্পপণ্য বেচার উপযোগী বিস্তীর্ণ বাজার, কাঁচামালের উৎস এবং আর কিছুকাল পরে মূলধন লগ্নীর জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। ফল হিসেবে ইওরোপ-আফ্রিকার সম্পর্কে ঘটল পর্বান্তর।

দুই

আফ্রিকার বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার শুরু হয়েছিল পনেরো শতকেই। শিল্প বিস্তারের পরবর্তী প্রয়োজন পূরণের জন্য এই রাজত্ব প্রসারের গতি হলো ত্বরান্বিত, শুরু হলো ইওরোপীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ঝগড়া। সাময়িক আপোষ-মীমাংসা হলো ১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনে। বিশ শতকের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায়

গোটা মহাদেশটা ভাগাভাগি হয়ে গেল জার্মান সাম্রাজ্য (ট্যাঙ্গানাইকা, টোগোল্যাণ্ড), ইতালীয় সাম্রাজ্য (ত্রিপোলি, সোমালিল্যাণ্ড), ফরাসী সাম্রাজ্য (আলজিরিয়া, মরক্কো, গিনী), ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (কেনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, গোল্ড কোস্ট), পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক), বেলজিয়ান সাম্রাজ্য (কঙ্গো) ইত্যাদির মধ্যে। এবারে সত্যিই ঘন অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলো আফ্রিকার জীবনে।

ইওরোপ-আফ্রিকার সম্পর্কের এই নতুন পর্বে বিদেশী মূলধনের লগ্নী ঘটে হীরে আর কয়লা, সোনা আর তামার খনিতে, আমদানি রপ্তানির প্রয়োজনে রেলপথ আর বন্দর উন্নয়নে, আবাদ শুরু হয় কোকো আর কফি, তুলো আর তামাকাদি অর্থকরী ফসলের। আর ৭০ বছর ধরে আফ্রিকার অফুরন্ত কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন এবং সস্তা মজুর শোষণের মাধ্যমে জমে ওঠে বিদেশী খনি আর রেল, ব্যাঙ্ক আর বাগিচা কোম্পানীর মুনাফার পাহাড়, আফ্রিকাবাসীর অন্তহীন দুর্দশার বিনিময়ে গড়ে ওঠে লণ্ডন, বার্লিন, ব্রাসেলস, লিসবন, প্যারিসের আকাশছোঁয়া সমৃদ্ধি। এই নির্মম শোষণের প্রকৃতি ও পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে জ্যাক ওডিসের প্রথম বইটিতে।

জ্যাক ওডিস দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ মাথা খাটিয়ে, ভেবেচিন্তে, হিসেব কষে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার ফলে প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি গেছে ভেঙ্গে, সস্তা শিল্পজাত পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশজ কুটির ও হস্তশিল্প হয়ে গেছে ধ্বংস। পরিণামে জীবিকানির্বাহের চিরাচরিত উপায়গুলি হয়ে গেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এই সঙ্গে উর্বর জমি, ভালো জমি, সুবিধাজনক অবস্থানের জমি আনা হয়েছে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের কবলে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৯ শতাংশ জমিই শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। আর আফ্রিকার সন্তানদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুর্বর, জলা, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, পীড়াক্রান্ত অঞ্চলে। এর উপরে নিজেদের পছন্দমতো ফসল চাষের অধিকারকেও করা হয়েছে খর্বিত।

এসব ব্যবস্থার লক্ষ্য সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট: আফ্রিকেয় জনসাধারণকে পাকাপাকিভাবে নিঃস্ব করে রাখা; জমিহারা, উপার্জনের বিকল্প সুযোগ-হারা, দুর্দশাগ্রস্ত আফ্রিকেয়দের ইওরোপীয় প্রভুদের জন্য খনি ও রেলপথ,

বাগিচা ও বন্দরে কাজ করতে, নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা।

কিন্তু এই ব্যবস্থাবলীও ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়—এরকম বিবেচনার থেকেই আফ্রিকেয়দের উপর চাপানো হয়েছে বিপুল কর, নগদ অর্থে দেয় কর, নিত্য নতুন করের বোঝা। এ কর যথাসময়ে না দিতে পারার অর্থ গ্রেপ্তারী, সশ্রম কারাদণ্ড, বাধ্যতামূলক শ্রম। অতএব কর না দিয়ে রেহাই নেই—কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন নগদ অর্থের। আর আফ্রিকার উপনিবেশিক কাঠামোতে নগদ অর্থ প্রাপ্তির উপায় মাত্র দুটি: (ক) ইওরোপীয় খনি-কারখানা-বাগিচার রক্ত জল করা সস্তা শ্রম, আর (খ) রপ্তানির জন্য বাজারে বিক্রয়যোগ্য অর্থকরী ফসলের চাষ। এ দুটোই যে ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ সবের উপরে রয়েছে উগ্র বর্ণ বৈষম্যের নীতি। এ নীতির অবশ্য নানা দিক রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে যা বিশেষ করে ও সম্পূর্ণ সঠিক-ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তা হলো পার্কে বসা কিংবা হোটেলে খাওয়া, বাসে চড়া কিংবা গীর্জায় যাওয়া, শিক্ষালাভ করা কিংবা চিকিৎসা করানো, কাজ দেওয়া কিংবা মজুরি পাওয়া, পদোন্নতি হওয়া কিংবা ভোট দেওয়ার মতো বিবিধ ক্ষেত্রে আফ্রিকেয় জনসাধারণকে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার অর্থও একই; অর্থাৎ ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীর জোগান, সস্তা জোগানকে নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্যভেদে সাফল্যের জন্য বাহবা ঔপনিবেশিক প্রভুদের অবশ্য প্রাপ্য।

আফ্রিকায় ইওরোপের 'civilising mission'-এর কথা হামেশা শোনা যায়। কিন্তু সে পবিত্র মিশনের দৌলতে আশ্চর্য সস্তা শ্রমের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মুনাফা চলে গেছে বিদেশে; বিভিন্ন দেশ পরিণত হয়েছে রপ্তানি-নির্ভর, এক-ফসলী কৃষি অর্থনীতিতে; ইওরোপ-আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংযোগের পরও পত্তন হয় নি আধুনিক শিল্প ও উৎপাদনের সামান্যতম ভিত্তি; বিকাশ ঘটে নি দেশীয় শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণীর কিংবা স্থায়ী, দক্ষ শ্রমিক বাহিনীর; আর এসবের পরিণামে এই বিশাল মহাদেশ জুড়ে আফ্রিকাবাসীর জীবনে বাসা বেঁধেছে অনশন-অর্ধাশন, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য।

এ সম্পর্কে শ্রীওডিস যে বিস্তারিত সংবাদ ও সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন তা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক।

তিন

আফ্রিকাবাসীরা কিন্তু নির্বিবাদে মেনে নেয় নি নিষ্ঠুর শোষণ ও সীমাহীন দুর্গতির এই বন্দোবস্তকে। জমির অধিকার ও করের বোঝা, মজুরির স্বল্পতা ও বর্ণবিদ্বেষ, শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ ও রাজনৈতিক অধিকারের মতো বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বারে বারে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। সে বিক্ষোভ কখনো প্রকাশ পেয়েছে কর বন্ধের আন্দোলনে, কখনো কোনো আবাদ বয়কটে, কখনো বিশাল সভা-শোভাযাত্রায়, কখনো আবার শ্রমিক ধর্মঘটে কিংবা আইন অমান্য আন্দোলনে। সে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ১৬।১৭ বছরে। কেনিয়ার কফি বাগানে, উগাণ্ডার তুলো ক্ষেতে, রোডেশিয়ায় তামার খনিতে, কঙ্গোয় টিনের খনিতে, এ্যাঙ্গোলার গহন অরণ্যে, ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের তীরে জেগে উঠেছে আফ্রিকার সিংহ। আর সেই জাগরণের তরঙ্গায়িত আলোড়নে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বন্দোবস্ত। শ্রীযুত ওডিসের 'Africa—The Lion Awakes' বইটি এই জাগরণের ইতিবৃত্ত।

মাত্র অল্প কিছুকাল আগেও সাম্রাজ্যবাদী মহলে এ ধারণাই প্রবল ছিল যে বিশ্বের অন্যত্র যাই ঘটুক না কেন আফ্রিকা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করার কোনো কারণ তাদের নেই। কিন্তু এ ধারণা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে গত কয়েক বছরের আলোড়নে। এ আলোড়নের প্রচণ্ডতা, তীব্রতা ও ব্যাপ্তির পিছনে রয়েছে নানা কারণ। আফ্রিকেয় সৈন্যেরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে; তারা দূর বিদেশে সঞ্চয় করেছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আফ্রিকেয়রা দেখেছে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার পরাজয়, শুনেছে 'চার দফা' স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। কালো আফ্রিকা প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৪৫ সালের পরে এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মুক্তি আন্দোলনের বিপুল জোয়ার; তারা প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৫০ সালে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনের মুক্তি এবং পরবর্তী অগ্রগতি। এই বিশাল মহাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক

ও ভাবাদর্শগত বিস্ময়কর সাফল্য ও প্রগতি। এ সবের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে বান্দুং-এর আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন অনুপ্রাণিত করেছে আফ্রিকেয় জাতীয় আন্দোলনকে। ঘানার কনভেনশন পিপলস পার্টি, গিনীর ডেমোক্রেটিক পার্টি, দক্ষিণ রোডেশিয়ার ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতির মতো জাতীয় দলগুলির নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নব পর্যায়। আমেরিকান নিগ্রো নেতা দ্যু বোয়ার উদ্যোগে ১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের প্রভাবে দানা বাঁধতে থাকে আফ্রিকেয় ঐক্য ও সংহতির আদর্শ। এ সবের সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের দ্রুত প্রসার বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে উপনিবেশবাদবিরোধী কর্মতৎপরতার অগ্রগতি সাধনে। গিনীর রাষ্ট্রপতি সেকু তুরে কিংবা কেনিয়ার জাতীয় নেতা টম মবোয়া সহ অনেক আফ্রিকেয় নেতাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে। আফ্রিকায় জাতীয় ধনিক শ্রেণীর বিকাশ ও দুর্বলতার পটভূমিতে শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জ্যাক ওডিস। এবং এটা এ বইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কেন না আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলন সংক্রান্ত অন্যান্য বইতে এ দিকটি সচরাচর উপেক্ষিত।

এই সব নানা ধারায় পুষ্ট জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান সাফল্য ১৯৫৭ সালে ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তি। তারপর ১৯৬০ সালের মধ্যে একের পর এক স্বাধীনতা লাভ করে ২৫টি দেশ। ১৯৬০ সাল চিহ্নিত হয় 'African year' বা 'আফ্রিকার বছর' হিসেবে।

টোরী প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান থেকে লেবার পার্টির নেতা গেটস্কেল পর্যন্ত অনেকেই আজকাল বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আফ্রিকেয় দেশগুলির এ স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রাক্তন প্রভুদের চেষ্টা, শিক্ষা, যত্ন ও বদান্যতার ফল। কিন্তু আসল ব্যাপার যে একেবারেই বিপরীত তার প্রমাণ অজস্র। শ্রীওডিস দেখিয়েছেন, সামান্য মজুরি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিটি প্রয়াসকে চেষ্টা করা হয়েছে চরম হিংস্রতার সঙ্গে রক্তের বন্যা ও সন্ত্রাসের বর্বরতায় স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। এক কেনিয়াতেই খুন করা হয়েছে ১১ হাজার দেশপ্রেমিককে। কেন? ৬৫ লক্ষ কেনিয়াবাসীর মধ্যে ৬৩

হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার স্থূল স্বার্থে। ৯০ লক্ষ অধিবাসীর দেশ আলজিরিয়ায় ১০ লক্ষ ফরাসী বাসিন্দার স্বার্থে হত্যা করা হয়েছে ১০ লক্ষ আরবকে। এ্যাঙ্গোলা আর কঙ্গো, রোডেশিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আফ্রিকার রক্তক্ষরণের অবসান আজও ঘটে নি।

তদুপরি মনে রাখা দরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই এ সব দেশে সমস্যার শেষ নয়। তার জন্য প্রয়োজন আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন, শিল্পের বিকাশ, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল অবশেষের অবসান, কৃষি অর্থনীতির বৈচিত্র্য সাধন, সমাজের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন। কিন্তু শ্রীওডিসের মতে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির এ পথ প্রশস্ত নয়। আজও এ সব দেশ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা সূত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে বাঁধা, আজও অতীতের মতো কোটি কোটি টাকার মূল্যবান সম্পদ, বিনিয়োগযোগ্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত লুণ্ঠিত হচ্ছে প্রতি বছর। আজও এ সব দেশে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক অধিকার ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রাক্তন প্রভুদের কুটিল চক্রান্তের শেষ নেই। এ বিষয়ে পুরনো ঔপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছে উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও পশ্চিম জার্মানী। আর এক্ষেত্রে সর্দার, সামন্ত মালিক, ধনিকদের একাংশ প্রভৃতি দেশীয় সাকরেদও রয়েছে বেশ কিছু। আর এ চক্রান্ত সদ্য স্বাধীন দেশগুলির জীবনে কি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে তার নমুনা পাওয়া গেছে কঙ্গোতে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আফ্রিকেয় নেতারা উপরোক্ত বিপদ সম্পর্কে অনবহিত নন। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অল আফ্রিকান পিপলস কনফারেন্সে সতর্কবাণী ঘোষিত হয়েছে নয়া-উপনিবেশবাদের কূট কৌশলের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া ঘানা, গিনী ও মালি ফেডারেশনে বলিষ্ঠ, দৃপ্ত আয়োজন চলেছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের। ইস্পাত ও অন্যান্য বুনিয়াদী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয়েছে কম-বেশি এ তিনটি দেশেই। এবং এ ব্যবস্থাবলী সূচিত করছে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ পরিহার করে নতুন পথে, অ-ধনতান্ত্রিক পথে জাতীয় উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা। অবশ্য এ বিরাট মহাদেশে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বিকাশ ও পরিস্থিতিতে বৈপরীত্য প্রচুর, নাইজেরিয়ার মতো অনেক দেশে ঘটনাবলীর ঝোঁক অন্য দিকে, এবং এ

পটভূমিতে আফ্রিকার মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান যে জটিল ও সময়সাপেক্ষ সে কথা বর্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

সব শেষে এ কথা বলা দরকার যে আফ্রিকেয় জাগরণে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশ্লেষণের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী নেতা, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার আরও যদি বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যেত, কিংবা আলজিরিয়া, এ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি দেশের রক্তাক্ত সংগ্রামের সঙ্গে ঘানা গিনী প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জনের তাৎপর্যকে যদি উপস্থিত করা হতো, তবে শ্রীওডিসের আলোচনা আরও সম্পূর্ণ ও সার্থক হতো। তবে এ রকম কোনো কোনো বিষয়ে অসম্পূর্ণতা সত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি আফ্রিকার বর্তমানকে জানার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। এবং এ গ্রন্থের থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে কালো আফ্রিকার শৃঙ্খলমুক্তিতে শুধু আফ্রিকার ইতিহাসে নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন এক অধ্যায়।

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা

বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর বিশ্লেষণে মৌলিক মার্কসবাদী পদ্ধতির প্রয়োগের ঐতিহ্য খুব গভীর বা প্রশস্ত নয় আজও। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের যে, রজনী পাম দত্ত-র বই-এ প্রারব্ধ বিশ্লেষণকে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজবিবর্তনের নবতর পটপরিবর্তনের সামগ্রিক মূল্যায়নে গ্রথিত করতে পারা যায় নি আজও। গেল দশ বছর যাবৎ কোনোরকম দীর্ঘমেয়াদী মার্কসবাদী কার্যক্রমের অভাবই সে ব্যর্থতার অনস্বীকার্য রাজনৈতিক প্রমাণ। সে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম রচনায় সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশের যে সহিষ্ণু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাতে শ্রীভবানী সেন-এর এই সর্বশেষ বইটি* উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভারতবর্ষে মার্কসবাদী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শ্রীভবানী সেন বরাবরই কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় তৎপর। তবে এর আগে কৃষিব্যবস্থা বিষয়ে তাঁর যে তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে আলোচ্য বইটির পার্থক্য মৌলিক। এই বইটিতেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যার আলোচনায় মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর সব কয়টি সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার অবকাশ থাকলেও, বিশ্লেষণ পদ্ধতির দিক থেকে এ বই-এর অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনগ্রসর কৃষি ব্যবস্থার বিচারবিশ্লেষণে আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলের আলোচনা, সাধারণত, কয়েকটি মামুলী সূত্র আপ্তবাক্যের মতো জপ করে চলার দরুণ, বস্তাপচা বুলির একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হতে বসেছিল। আলোচ্য বইটিতে শ্রীসেন সেই বাঁধাধরা ছককে সবলে অতিক্রম করেছেন। তাই,

---

*Bhowani Sen. Evolution of Agrarian Relations in India. P.P.H. Rs. 8'50.

বর্তমান আলোচনায় আমরা তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিশেষত্বর দিকে প্রথমে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত পথে যে ক-টি নতুন ধারণা বা প্রতিমানের অবতারণা তিনি করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১ এ যাবৎ ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি শ্রীসেন আনয়ন করেছেন সেটি হলো সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত 'দুই পথ'-এর ধারণার প্রয়োগ। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথমখণ্ডে আইরিশ প্রজাস্বত্ব সংস্কারের আলোচনায় ও তৃতীয় খণ্ডে মার্কস ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে 'দুই পথ'-এর নিশানা দিয়েছিলেন, Agrarian Programme of Social Democracy-র আলোচনায় লেনিন সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এবং সেই বিশ্লেষণেরই সূত্র ধরে অক্টোবর বিপ্লবের কৃষি-কার্যক্রম রচিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের কৃষিসংস্কার নীতির মূল্যায়ণে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিচারে এই প্রথম সর্বভারতীয় মার্কসবাদী নেতৃত্বের লেখায় লেনিনের সেই 'দুই পথ'-এর ধারণা গৃহীত ও প্রযুক্ত হলো। ইতিমধ্যে অবশ্য 'Science and Society' পত্রিকায় Dobb, Takahasi, Sweezy ইত্যাদির সেই সুবিখ্যাত আলোচনাটির দৌলতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দুই পথের ধারণাটির কিছুটা বহুলপ্রচার ঘটেছে।

২ উক্ত 'দুই পথ'-এর পদ্ধতি প্রয়োগের সূত্রে শ্রীসেন খুবই সাহসের সঙ্গে এদেশের মার্কসবাদী আলোচনার একটি অন্যতম বাঁধাধরা ছককে বর্জন করেছেন। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মূল্যায়ণে শুধুমাত্র কৃষিমজুরের সংখ্যা বা অনুপাতকেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাটা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। শ্রীসেন ভূমিকাতেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কৃষিমজুরি প্রথার বিকাশকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের একটি শর্ত হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটা যেমন ভুল, সেটাকেই একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষণ মনে করাটাও তেমনি ভুল।

৩ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লেখক 'ক্যাপিটাল' তৃতীয় খণ্ডে Small-Peasant Economy বা ছোট চাষীর কৃষিব্যবস্থার যে অধ্যায়টি আছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের কৃষিব্যবস্থার বিচারে সেই অধ্যায়টির মূল ধারণাগুলির সৃজনশীল ব্যবহার করেছেন। সরকারী নীতির ফলাফল নির্ণয়ে ইদানীং মার্কসবাদী

মহলে দু-ধরনের অতিশয়োক্তির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি প্রধানত মার্কসবাদ-ঘেঁষা অর্থনীতির ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি মার্কসবাদী রাজনীতিকদের মধ্যে। প্রথমোক্ত ধারার ঝোঁক হলো ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে মূলত ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ও ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের—Entrepreneurship—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই কথা বলা। তাঁদের কারোর কারোর মতে কৃষি উৎপাদনের সংকট সমাধানের পথে। দ্বিতীয় মতটির প্রবক্তাদের ধারণা যে বৃটিশ আমলের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি; ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিকই রয়ে গেছে, উৎপাদনের অবস্থাও তথৈবচ। শ্রীসেন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থায় transitional small peasant economy, অন্তর্বর্তীকালীন ছোট চাষীর কৃষিব্যবস্থার মার্কস-কথিত তত্ত্বের প্রয়োগে গত দশকের ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বিবর্তনের মূল্যায়ণে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই small-peasant economy কোন দিকে মোড় ঘুরবে তা উক্ত 'দুই পথ'-এর দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪ ধারণাটা নতুন না হলেও, স্পষ্টভাবে ও সঠিক পটভূমিতে শ্রীসেন মৌলিক মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বৃটিশ আমলে ভারতীয় কৃষিতে মুদ্রা ও বাজারের অনুপ্রবেশ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ না ঘটিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে কঠোরতর ও তীব্রতর করেছে। 'দুই পথ'-এর বিকাশ-প্রক্রিয়ায় মুদ্রা ও বাজারের এই উল্টোরথ যাত্রার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। মুদ্রা ও বাজারের অনুপ্রবেশকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সমার্থক মনে করাটা শুধু যে বুর্জোয়া অর্থনীতিরই ধরতাই বুলি তাই নয়, অনেক সময়ে মার্কসবাদী মহলেও এইরকম ধারণার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

৫ মার্কসীয় খাজনাতত্ত্বে যে প্রশ্নটা খুবই জটিল সেটা হল absolute rent, জমাওয়ারি ও differential rent, দফাওয়ারি খাজনার মধ্যে পার্থক্য ও সেই পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরনির্ণয়। বর্তমান লেখকের মতে শ্রীসেন ১২৬ পৃঃতে লেনিনের যে উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক খাজনা ও ধনতান্ত্রিক খাজনার মধ্যে তফাৎ করেছেন, রাজনৈতিক কার্যক্রম নির্ণয়ের সেইটাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভূমির একচেটিয়া মালিকানার অবসান ও পরিশেষে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণতি, এই খাজনা-

তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন। তবে, absolute rent-এরও আবার প্রকারভেদ আছে। এ কথা ঠিকই যে, absolute rent-এর অবলোপই গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের আর্থনীতিক উপাদান। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরনির্ণয়ে absolute rent-এর প্রকারভেদের প্রশ্নটা ওঠে। ভূমির একচেটিয়া মালিকানা থেকে যে absolute rent-এর উৎপত্তি, কৃষিজাতপণ্যের বাজারদরে উৎপাদন-মূল্যের (Price of Production) উপরি উদ্‌বৃত্ত থেকে যার উৎপত্তি, সেই জাতীয় absolute rent একেবারে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থাতেও বর্তমান। আবার কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির আপেক্ষিক অনগ্রসরতা থেকে একপ্রকার absolute rent-এর উৎপত্তি ঘটে যেটাকে আমাদের দেশের মতো প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক অন্তর্বর্তীকালীন কৃষিঅর্থনীতির বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা সম্ভব। শ্রীসেন সেই আলোচনায় প্রবেশ করলে উৎপাদন পদ্ধতির অনগ্রসরতার যে বৈশিষ্ট্য তিনি বরাবরই লক্ষ্য করেছেন, সে বৈশিষ্ট্যকে মার্কসীয় খাজনাতত্ত্বের বিশ্লেষণী কাঠামোর অঙ্গাঙ্গী করে তুলতে পারতেন। তাহলে small peasant economy-র তত্ত্ব খাজনাতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গিয়ে তাঁর বিশ্লেষণী কাঠামোর একটা পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচনা করে দিত।

এ পর্যন্ত শ্রীসেন-এর বিশ্লেষণপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এইবার তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তগুলির একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাক। তাঁর আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ইংরেজ আসার আগে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা, (২) ইংরেজ আমলে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের আলোচনা, এবং (৩) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পরিবর্তনের মূল্যায়ণ ও গতিপ্রকৃতিনির্ণয়।

প্রথম দুটি পর্যায়ের আলোচনায় বিশেষ নতুনত্ব কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজপূর্ববর্তী আমলের কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় মার্কসের 'Articles on India,' ব্যাডেন পাওয়েল, রাধাকুমুদ মুখার্জি, কোশাম্বি ইত্যাদির আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া আর কিছু তিনি দেন নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা রজনী পাম দত্ত-র বই ও তৃতীয় দশকের সেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার বিখ্যাত স্মারকলিপি বা অভয়চরণ দাশের বই-এর চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিশেষত্বটুকু আমরা পদ্ধতির আলোচনায় ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি উপরের ৪নং অনুচ্ছেদে। সবচেয়ে বেশি বিতর্কমূলক ও সবচেয়ে বেশি মৌলিক তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা।

গত দশকের পরিবর্তনের মূল্যায়ণে তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ :

১ ভারতীয় কৃষি-সংস্কারের রাজনৈতিক আকাশে 'দুই পথ'-এর লড়াই বেধেছে। পরিকল্পনা কমিশনের Panel of Land Reforms-এর প্রস্তাব '১নং পথ' বা ধনী ও মাঝারি কৃষকনির্ভর গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ। অন্যদিকে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ ও কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাববিরোধী অংশের মতামত '২নং পথ'-এর পক্ষে; অর্থাৎ, তাঁরা বড় জোতের মালিকের উপর নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক বড় খামার সৃষ্টির পক্ষে। সরকারি নীতি এই দুই পথের মাঝখানে চরে বেড়াচ্ছে।

২ ফলে, প্রকৃতপক্ষে ভারতের কৃষিব্যবস্থায় ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, নিজচাষের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করেছে; কিন্তু, নিজ-চাষী বলতে আজ ভারতবর্ষে খেটে খাওয়া কৃষক, মজুর লাগিয়ে আবাদ করে এমন জোতের মালিক, এমনকি এক ধরনের প্রজানির্ভর জমিদারও একাকার হয়ে গেছে। 'নিজচাষ'-এর যে তাজ্জব সব সংজ্ঞা ভারতীয় ভূমিসংস্কার আইনে গৃহীত হয়েছে তারই ফলে এইরকম ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, সামন্ত ভূম্যধিকারী (Feudal latifundia) বা অতিকায় ধনতান্ত্রিক খামারের বদলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য পারিবারিক জোতই কৃষিব্যবস্থার প্রধান অংশ। তৃতীয়ত, ভাগচাষী বা নিকৃষ্ট প্রজার তুলনায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করছে।

৩ আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ জমিতে প্রধানত ক্ষেতমজুর-নির্ভর চাষের প্রবর্তন ঘটেছে, এবং কৃষিমজুরশ্রেণীর শতকরা ৪০ ভাগ এই ধরনের খামারে নিযুক্ত, যাকে প্রকৃত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বলা যায়। কিন্তু এই অংশের উৎপাদন পদ্ধতিও অনগ্রসর। এমনকি অনেক সময়ে ছোট জোতের চেয়েও নিকৃষ্ট। যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার খুবই নগণ্য, শতকরা এক ভাগ জমিতেও ব্যবহার হয় কিনা সন্দেহ।

৪ এর ফলে কৃষিউৎপাদনের সংকট কোনো মৌলিক সমাধানের পথ ধরতে পারছে না। কৃষিব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ পুঁজিসঞ্চয়ের পথ বন্ধ হয়ে থাকছে। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি কৃষির বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে।

এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একদিকে ভূমিসংস্কার আইনের নানা ফাঁক দিয়ে সহরবাসী জমিদারদের গলে বেরিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে আইনের আমলাতান্ত্রিক প্রয়োগে যতটা সম্ভব

ধনী কৃষক ও জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে সামন্ততন্ত্র অটুট থাকছে এ কথাও যেমন বলা যায় না; তেমনই প্রাকৃশিল্পবিপ্লবযুগের ইংলণ্ড বা আমেরিকার কৃষিতে যে দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল সে-রকম কোনো পরিবর্তন হচ্ছে—একথাও বলা যায় না। আসলে এক ধরনের রুগ্নভগ্ন কৃষি-ধনতন্ত্রেরই ("agricultural capitalism of a rickety type") বিকাশ ঘটছে।

বর্তমান লেখক তাঁর সিদ্ধান্তের মূল ধারার সঙ্গে একমত। তবে কয়েক-জায়গায় সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণের ব্যাপারে আপত্তি আছে। যেমন, এক জায়গায় তিনি বলছেন, গত দশকে প্রধানত ক্ষেতমজুর-নির্ভর খামারগুলিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা শতকরা ৫ থেকে ২১-এ পরিণত হয়েছে। প্রথমত, শতকরা ৫-এর হিসেবটা ডঃ প্যাটেল করেছেন ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের তথ্যের ভিত্তিতে; ১৯৫১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয়ত, ডঃ প্যাটেলের সে হিসেব এতই আন্দাজি ব্যাপার যে তা থেকে বাড়তি বা কমতির কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না। এইরকমই আরও একটা উদাহরণ হলো জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১০নং রিপোর্টের ভিত্তিতে ইজারাকৃত জমির হিসাব। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বিষয়ে সাম্প্রতিক সব সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবই ভূমিসংস্কার আইনজনিত response-bias এর শিকার। এ কথাটা মনে রেখে এইসব রিপোর্ট ব্যবহার করা উচিত। এই কারণে, বর্তমান লেখকের মতে শ্রীসেন-এর নিজচাষের ব্যাপকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ জমির শতকরা আশিভাগের উপরই নিজচাষপ্রথা চালু রয়েছে—সন্দেহজনক। ঠিক এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তের বিষয়েই ডঃ ড্যানিয়েল থর্ণার মন্তব্য করেছিলেন "agrarian revolution by census redefinition"! এ ছাড়া কোনো কোনো Table-এর ব্যাখ্যায় ছোটখাট ভুলও আছে।

বইটির প্রধান দুটি দুর্বলতার কথাও বলা দরকার। প্রথমত, সমগ্র ভূমিসংস্কার আইনের আলোচনার শেষে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে যে, গেল দশবছরের আইনের বন্যায় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার মৌলিক সংকটমোচন ঘটে নি। নাগপুর প্রস্তাবও একটা ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উক্ত আইনগুলির বিষয়ে কৃষকআন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? সমস্ত ভূমিসংস্কার আইনের আমূল সংশোধনের প্রশ্নকেই কি আবার জাতির সমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন? দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী মহলে যে non-capitalist path, অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ সম্পর্কিত চিন্তা আবর্তিত হচ্ছে; তার সঙ্গে প্রাগুক্ত 'দুই পথ'-এর দ্বন্দ্বের যোগাযোগ কোথায়? ছোটচাষীনির্ভর কৃষিব্যবস্থার দিক্‌নির্ণয়ে ও রুগ্ন ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে সমগ্র কৃষকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রম নির্ণয়েই বা উক্ত non-capitalist path-এর ধারণার কী ভূমিকা? এ প্রশ্নগুলিকে লেখক এড়িয়ে গেছেন।

প্রকাশকেরা প্রচ্ছদপটের ব্যাপারে যতটা নজর দিয়েছেন, ছাপাখানার শয়তানের উপর ততটা কড়া পাহারা বসাননি।

শিল্পের অভিজ্ঞতা

বিষ্ণু দে

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক* যে পড়তে পেলুম তার জন্য রূপা কোম্পানি-কে অনেক ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে এখনও তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের মধ্যে পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলী সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষনীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক। আবার দেখা গেল যে এই বাংলার অসাধারণ গদ্যশিল্পী বিষয়নির্দিষ্ট বক্তৃতার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে একটুও ব্যাহত হতে দেন নি। যে মনীষী 'বাংলার ব্রত'-র মতো যুগান্তকারী সমাজতত্ত্বের আবিষ্কারগ্রন্থ লেখেন; আবার প্রথাসিদ্ধ ভারতশিল্পের আলোচনাতেও যিনি প্রায় পথপ্রদর্শক—প্রায়, কারণ রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে লিখেছিলেন; 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'পথে বিপথে' প্রভৃতির মতো অতুলনীয় বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টিও যাঁর কীর্তি; এই বক্তৃতামালাও শুধু তাঁরই পক্ষে রচনা সম্ভব ছিল। তা সে নিছক শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে হোক, বা আর্য ও অনার্য সম্বন্ধবিচারেই হোক।

শিল্পের অভিজ্ঞতা ও শিল্পের জ্ঞান যেমন এই বইটিতে আজও আশ্চর্য করবে, তেমনি তাঁর মনের সম্পূর্ণতা, চোখকানহৃদয় সবকিছুর মানবিক প্রখরতা পাঠককে জাগ্রত করে এই প্রবল গদ্যের কথ্য ছন্দে।

সমালোচকের পক্ষে এই বই বিষয়ে বেশি বলা এক্ষেত্রে ধৃষ্ট বাহুল্য মাত্র। যে কোনো পাঠক যে কোনো পৃষ্ঠাতেই থমকে যাবেন অবনীন্দ্রনাথের অন্বেষী ভাবনাচিন্তায়, তাঁর লিখনের গভীরতায়, তার বাহারে, কারণঃ

---

*বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। রূপা। বারো টাকা।

"এই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই।"

অথবা আমাদের দুর্দশা বিষয়ে আজও প্রাসঙ্গিক চাবুক : "অল্পেই মন ভরে গেলো যেমন-তেমনে! শুধু অল্প হলে তো কথা ছিল না; সেটা বিশ্রী হবে কেন? মাসে বার-পঁচিশ বায়স্কোপ-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ এবং ফুটবলের ভিড়, ঘোরদৌড়ের জুয়ো এবং দু-চারটে স্মৃতি-সভার বার্ষিক অধিবেশন ও যতটা পারা যায় বক্তৃতা—এই হলেই কি চুকে গেলো সব ক্ষুধা, সব তৃষ্ণা? ধর ক্ষুধা মেটানো গেলো—সোনালী গিল্টি-করা মার্বেল-মোড়া বৈদ্যুতিক আলোতে ঝকমক হোটেলের খানা-কামরায়, এবং তৃষ্ণা মেটালেম মদের বোতলে; কিন্তু তারপরে কি? মনের খোরাক যে মধু, মনকে তা দেওয়া হল না—পেয়ালা ভরে। মন রইলো উপবাসে। দিনে-দিনে মন হতবল, হতশ্রী হল, স্ফূর্তি হারালে। তারপর একদিন দেখলেম, আনন্দময়ের দান আনন্দ দেবার ক্ষমতা আনন্দ পাবার ইচ্ছা—সবই হারিয়েছি; সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ—সবই আমাদের চলে গেছে। বাতাস যে কি বলছে তা বুঝতে পারছিনে, ফুলন্ত পৃথিবী কি সাজে যে সেজে দাঁড়াচ্ছে ঘরের সামনে তাও দেখতে পাচ্ছিনে। আকাশে আলো নেই অন্তরে তেজ নেই আশা নেই আনন্দ নেই শুকনো জীবন ঝুঁকে রয়েছে রসাতলের দিকে! এটা যে আমি অযথা বাগ্‌জাল বিস্তার করে ভয় দেখাচ্ছি তা নয়; এই ভয় সত্যিই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় করতেই হবে,—শিল্পীর অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাব না আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্যে কালে-কালে ভর্তি হল সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হালচাল দেখে কেউ কি বলবে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী নিরানন্দ অত্যন্ত অশোভনভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাত-জোড়া ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্যের কণা-দিয়ে-গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন-দিয়ে-ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী বলেই কি এগুলো আমাদের হল? তা তো হতে পারে না। এই সব শিল্পের নির্মিতি, এদের নিজেদের বলবার অধিকার অর্জন করবো শুধু সেই দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করবো, তার পূর্বে তো নয়। শিল্প যেদিন আমাদের হবে, সেদিন জগৎ বলবে এ সবই তো আমাদের! আমাদের শিল্পও তোমাদের। আমাদের দেশের

রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। আমার দেশ বলে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হতেও পারে কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবি যে গ্রাহ্য হবেনা, সেটা ঠিক। তা যদি হত তবে কালাপাহাড় থাকলে, সেত আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবি দিতে পারতো; কেননা কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী এবং আমাদেরই মতো ভাঙতে পটু, গড়তে একেবারেই অক্ষম; শুধু, কালাপাহাড় ভেঙে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙছি বিরাগে—এইমাত্র তফাৎ। কাব্যকলা শিল্পকলা গীতকলা,—এ সবাইকে 'রস-রুচিরা' বলে কবিরা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী—আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে তো তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরী সঙ্গিনী সবই। আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং শেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাইনে রস পাইনে পাবার চেষ্টাও করিনে, তাদের কাছ থেকে শিল্প দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য কি? "অলস্‌স কুতো শিল্পং অসিপ্পস্‌স কুতো ধনং!"

"নিজের শিল্প থেকে ভারতবাসী হলেও আমরা কতখানি দূরে সরে পড়েছি এবং বিদেশী হলেও তারা এই ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছে তার ছুটো-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষবার এদেশে এলেন, শক্ত রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। সেই বিদেশী ভারতবর্ষের একটি তীর্থ দেখতে এসেছেন—দূর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্বে একবার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরটা কেমন শিল্পকার্য দিয়ে সাজানো দেখে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা, আর সেই কোণার্ক মন্দির যার প্রত্যেক পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দেখে নেবার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখলেম। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী-ভাইকে; কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না, ভারতের বড়লাটকে পর্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে! তাকে কি ভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেলো। চুপি-চুপি পরামর্শটা হল বটে কিন্তু বন্ধু গেলেন

জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো। এইটেই ছিল বিশ্ব-শিল্পীর মনোগত ;—শিল্পী বিদেশী হলেও তার যেন গতিরোধ না হয় দর্শনের দিনে। দ্বার খুলে গেলো, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হল, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে-গড়া দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্যন্ত। এই পরমানন্দের প্রসাদ পেয়ে বন্ধু দেশে চললেন অক্ষত শরীরে। তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ-কথা আমার এখনও মনে আছে—ধন্য হলেম আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এই তো গেলো শিল্পের যথার্থ অনুরাগী অথচ বিদেশীর ইতিহাস। এইবার স্বদেশী অথচ বিরাগীর কথাটা বলি। ঐ জগন্নাথের মাসির বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করতে হবে। একটা কমিটি করে খানিকটা টাকা তোলা হয়েছে ; এস্‌টিমেট বক্তৃতা ইত্যাদি হয়ে ঠিক হয়েছে—অনেক কালের পুরোনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ কারুকার্য-করা পাথরের বড় বারাণ্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটু-খানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে, আর যার নানা ফাটলের শূন্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে বনলতার সবুজ আর সোনায়, সেই পুরোনোটাকে আরো পুরোনো—আরো মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড় হংসমিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্‌পনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগার যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম মন্দির সংস্কার হচ্ছে। মাসির বাড়িতে প্রাচীন মূর্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি-চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, চুড়োর সিংহি উল্টে পড়েছে ভূঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিৎ শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে ; সব ওলট-পালট, তছনছ! কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হল। চরকে শুধালেম—এই সব পাথরের কাজ ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়ে? চরের কথার ভাবে বুঝলেম এইসব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে—এমন লোক নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার। ভাঙা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নীল হরিণ চার চোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। কতকালের পোষা হরিণ,

এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে,—এদের কি হবে? শুধিয়ে জানলেম এদের বিক্রী করা হবে, আর এদের সঙ্গে-সঙ্গে যে বাগিচা বড় হতে-হতে প্রায় বন হয়েছে—বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে পাখি যেখানে গাইছে হরিণ যেখানে খেলছে সেই বনফুলের পরিমলে-ভরা পুরোণো বাগিচাটা চষে ফেলে যাত্রীদের জন্য রন্ধনশালা বসানো হবে। আমার যন্ত্রণাভোগের তখনও শেষ হয়নি—তাই ডবল তালা-দেওয়া ঘর দেখিয়ে বললেম—এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে-আস্তে ঘরখানা খুললে, দেখলেম মিন্টন আর বরন কোম্পানির টালি দিয়ে অত বড় ঘরখানা বোঝাই করা। ভাণ্ডার মধ্যে—ধ্বংসের স্তুপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মতো বাসা বেঁধে ছিল—সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না আমাদের। ভাল ঠেকল দুখানা চকচকে রাঙামাটির টালি।”

“শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেল—ঘেঁটে-ঘুঁটে যা পেলাম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল শিল্প-সংস্কার করতে হবে কিংবা দ্বিতীয় একটা অজন্তা-বিহার কিংবা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠলো, অমনি লাঠিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁ-বোঁ-শব্দে শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুস্কিল! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা আমাদের পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুস্কিল তখন! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহ-ভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্ করে। একেই বলে inspiration।”

“চুলোয় যাকগে inspiration! সাধনা অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? কেনো ছবি মূর্তি, বসাও মিউজিয়াম; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক ডিপ্লোমা, Library হোক রসশাস্ত্রের; স্কুল হোক—সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে; লিখতে লেগে যাক বড়-বড় ‘থিসিস’ শিল্পের উপরে;

ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে পর্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সুড় করে আপনি আসবে। হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যিই ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে? হুজুরের তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাইরে জুতো রেখে দু হাত সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে?"

"আমেরিকা তার কুবের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী নতুন পুরাতন সমস্তই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলো নিজের বাসায়। সেখানে সংগ্রহের বিরাট আয়োজন, চর্চারও বিরাট-বিরাট বন্দোবস্ত হাঁকডাকও বিরাট; কিন্তু সেখানে কল হল, কারখানা হল, আকাশ-প্রমাণ সব বাড়ি, যোজন-প্রমাণ সব সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেললে নায়াগ্রা নির্ঝর; কিন্তু সেই আয়োজনের পাহাড় এত উঁচু যে তার ওপারে কোথাও যে শিল্পীর আনন্দের নির্ঝর ঝরছে তা জানাই মুস্কিল হয়েছে তাদের—যারা আয়োজন করলে এত করে শিল্পকে জানতে! একথা আমার এক আমেরিকান বন্ধু জানিয়ে গেছেন—আমি বলছিনে।"

নিশ্চয়ই আমরা আশা করব রূপা কোম্পানি অবনীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য বইগুলি এবং লেখাগুলি তাঁর উপযুক্ত দুই দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশ করবেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত : কয়েকটি দিক

হীরেন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের লোকপ্রীতিবৃদ্ধির ফলস্বরূপ তার একটা আলোচনা-সাহিত্যও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে*। এই আলোচনার মুখ্য প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয় এবং বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের ভাণ্ডারে তাঁর নিজস্ব দানও কোনো কোনো আলোচনার বিষয়ীভূত। এই আলোচনার সূত্রপাত বর্তমান শতকের প্রারম্ভে সূচিত হয়ে থাকলেও শতবার্ষিকী উপলক্ষে তা বহুল বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশনা ছাড়া, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য আলোচনার সম্মিলিত কলেবরও নেহাৎ ক্ষীণ হবে না। শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রচর্চার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক এই চর্চাকেও বিশেষভাবে নামাঙ্কিত করা চলে। শতবার্ষিকী বছরে রবীন্দ্রসান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিবিধজনের যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ মাত্র, যে কারণে তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাত্ত্বিক অথবা প্রায়োগিক সংবাদ খুঁজতে গিয়ে পাঠকসাধারণ স্বভাবতই ব্যর্থকাম হয়ে থাকেন। অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর অধ্যাপক অথবা রাগসঙ্গীতের ঐতিহাসিকের রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ থেকে এর বেশি আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সত্যই সঙ্গীত নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ সত্যই অর্জন করেছিলেন। অন্যদের আলোচনা পুরাতন সংবাদের পৌনঃপুনিক আবৃত্তি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান সম্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের আলোচনা, গদ্য গানের ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের দুটি

---

*রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক॥ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। চার টাকা॥

*রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড)॥ প্রফুল্লকুমার দাস। কালিকলম। সাড়ে তিন টাকা॥

প্রবন্ধ ছাড়া 'গীতবিতান'-এর কাব্যকৃতি সম্পর্কে কোনো মৌলিক চিন্তা দৃষ্টিগোচর হয় নি বললে সত্যের ব্যত্যয় ঘটবে না।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপকারিণী রূপে স্বনাম পরিচিতা। তিনি এবং তাঁর উত্তরার্ধ ইতঃপূর্বে পাঠকসমাজকে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা' উপহার দিয়েছিলেন। এই দম্পতির দ্বিতীয় পুস্তক পাঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। মোট সাতটি প্রবন্ধ এবং অবতরণিকায় এই পুস্তিকাটি সমাপ্ত। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রকবিমানসে রোমান্টিক এবং মিষ্টিক প্রভাবের রহস্যসন্ধান করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গীত, সম্মেলক গান এবং আনুষ্ঠানিক গান রচনার কিছু কিছু ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে। পঞ্চম প্রবন্ধে গদ্য গানের ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনুসরণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচির প্রশ্ন এবং শেষ প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বাংলা গানের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রবন্ধটি কোনো দৈনিকের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করেছিলাম এবং যতদূর স্মরণ হয় সেটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি প্রবন্ধগুলির কোনটি কার দ্বারা রচিত তার নির্দেশ পুস্তিকাটিতে নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সম্প্রতি যে-সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনা না থাকলেও পরোক্ষ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থকারদ্বয় এড়িয়ে যেতে পারেন নি। যদিও তাঁরা বলেছেন, "এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ-কটিতে আমরা প্রমাণ কিছুই করতে চাইনি," তবু বাস্তব সমস্যাগুলির সম্বন্ধে তাঁরা শেষ পর্যন্ত নীরব থাকতে পারেন নি এবং এই না-পারা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসঙ্গীতের হিন্দী অনুবাদের বিরোধিতা না করে তাঁরা পারেন নি, যেহেতু, তাঁদের মতে, "একথা সকলেই মানেন যে কবিতার অনুবাদে কাব্যের সবটুকু ভাবসম্পদ—তার শব্দমাধুর্য, ধ্বনি চাতুর্য বা মেজাজ রক্ষিত হয় না। কাব্যগীতির বেলায় সেটা আরো কঠিন। যে সব ঝোঁক এবং রঙ নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অনুবাদগীতিতে তা থাকে না।…হিন্দী গান যেমন সকলেই শেখেন, তেমনি ভারতবর্ষের এক প্রদেশের গান অন্যপ্রদেশের ভাষাভাষীর পক্ষে শিখে নেওয়া এমন কি কঠিন।"—(পৃঃ ৶০)। বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতি খুবই সমুচিত কথা বলেছেন কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুস্তকের পরিচায়ক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের বিঘোষিত প্রত্যয়ের বৈপরীত্য পরিদৃশ্যমান।

শিক্ষণের ব্যাপারে হার্মোনিয়মের কুপ্রভাব, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিভেদে

বিভিন্ন ঢঙ এবং রীতি গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা এবং তার প্রতিকারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার যে প্রস্তাব গ্রন্থে করা হয়েছে (পৃঃ ॥০, ॥৵০) তার পিছনে শ্রোতৃসাধারণের সমর্থন থাকলেও স্থিতস্বার্থের দৌলতে শুভবুদ্ধিও যে শেষ পর্যন্ত পণ্ড হবে এমন আশঙ্কার হেতু এই যে, শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে সঙ্গীতভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষের এবংবিধ প্রস্তাব কলকাতার কতিপয় প্রভাবিত সঙ্গীতসাংবাদিকের প্রতিকূল প্রচারে শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে নি। গানের এবং স্বরলিপির অহেতুক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী মাত্রেরই বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থকারদ্বয়ের এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৵০ পৃষ্ঠায় "তাই কাঠামোর মধ্যে সামান্যতম এদিক-ওদিক বা সূক্ষ্মতম চ্যুতি হলেই চোখ লাল করাটা বাড়াবাড়ি"—এই মন্তব্য অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী প্রতিভাত হওয়া অসমীচীন নয়। বিচ্যুতির যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁদের যৌক্তিকতা এই পুস্তকেরই ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখতে পাচ্ছি, "অতুলপ্রসাদের কপালে এই দুঃখ লেখা ছিল। তাই আজ তাঁর গান নানা জনে নানান সুরে আর ভঙ্গিতে গাইছেন। অথচ অতুলপ্রসাদের গানের মর্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই এই ধরণের ভুলভ্রান্তি অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়।...তা ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যের দল এখনো বর্তমান থাকতে মতভেদ মিটিয়ে নেওয়া তেমন কঠিন বলে মনে হয় না।" অনুমোদিত স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবস্থা অতুলপ্রসাদের গানের অবস্থায় শনৈঃ শনৈঃ ধাবিত হচ্ছে এবং যে কারণে অতুলপ্রসাদের গানে স্বরবিভ্রাট এবং বিকৃতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপারে সেই একই ঘটনা ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। স্বরলিপি সমিতি, গ্রন্থন বিভাগ এবং সঙ্গীতভবনের কার্যকলাপে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহযোগিতার অভাবে লেখকদ্বয় ৯৮ পৃষ্ঠায় যে মোলায়েম আশা ব্যক্ত করেছেন তা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কাই সমধিক।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো খেয়াল গানেও কথার মূল্য সম্বন্ধে লেখকদ্বয়ের ধারণা (পৃঃ ৯৫) ভ্রান্ত বুদ্ধিসঞ্জাত প্রতীয়মান হলে পাঠকদের আশা করি তাঁরা ক্ষমা করবেন। আমাদের যতদূর বোধ হয় খেয়ালের গানে কথার অংশ লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ। কাব্যার্থ ব্যাখ্যা করার চাকরি খেয়াল গান করে না, রাগ রূপায়ণই তার একমাত্র দায়। তবু রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকদ্বয় তাঁদের প্রথম পুস্তক থেকে দ্বিতীয়টিতে একটু সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন দেখে

খুশি হওয়া গেল (তুলনীয় : 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা'র মন্তব্য—'কণ্ঠবাদিন')। গদ্য গানের বিবর্তন সন্ধান উপলক্ষে তাঁদের উক্তিটি সংবাদ হিসেবে পুরাতন হলেও সময়োপযোগী সন্দেহ নেই : "আর তালের বাঁধন-ছাড়া গান হিসেবে পেয়েছি 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না,' 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে' প্রভৃতি। নমুনা মিলবে অজস্র, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৃহত্তর অংশটিই এই ধাঁচের।

"এইভাবে পুরো গানের চালটাই যখন প্রধান হয়ে উঠল তখন বাণীরূপ বেরিয়ে এল ছন্দমিলের খোলস ছাড়িয়ে ভাবের প্রাঙ্গনে। তখন কাব্যছন্দেরও যেমন আর প্রয়োজন রইল না, তেমনি রাগবদ্ধ বা তালানুষঙ্গেরও প্রয়োজন রইল না। সঙ্গীত মুক্তি পেল রসের খোলা সড়কে। তার পরে ছন্দ বিবর্তন, তালবিবর্তন প্রভৃতি বহিরঙ্গের বালাই ঘুচিয়ে এসে হাজির হল গদ্য গানের আসরে।" মুক্ত ছন্দের গানের গায়কি সম্বন্ধে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অবশ্যই প্রামাণিক হিসেবে গণ্য। মুক্ত ছন্দ নিয়ে যারা তালবদ্ধ পরীক্ষা এবং সংযোজন করছেন তাঁদের পক্ষে কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

কবিতায় ছন্দ এবং গানের তাল যে অভিন্ন এটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা—যার সঙ্গে সঙ্গীতের ছান্দসিকগণ একমত হতে পারেন নি। অতএব লেখকদ্বয়ের এবংবিধ প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগী মহলের কারো কারো মতদ্বৈধ ঘটা অসম্ভব নয়। বস্তুত ভারতীয় সঙ্গীতে ছন্দ এবং তাল ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। সাঙ্গীতিক ছন্দের অর্থ চলন। চৌতালের ছন্দ দ্বিমাত্রিক বলেই একে দুই মাত্রার তাল বলা যেমন ভুল, বারো মাত্রার বলাতে তেমনি ; কারণ বারো মাত্রার আরো বহু তাল আছে যাদের সঙ্গে চৌতালের পার্থক্য শুধু ছন্দ অর্থাৎ চলনেই নয়, তালেও। সাধারণত ঘাতপ্রধান পর্বের দ্বারাই তালের সংখ্যা এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই কারণে চৌতালে যদিও দুই মাত্রার ছয়টি পর্বে বারোটি মাত্রা নিষ্পন্ন হয় তথাপি চারটি আহত পর্বের দ্বারাই তার নাম চৌতাল। অতএব ছন্দ এবং তাল সমার্থক নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কতিপয় প্রশ্ন এই পুস্তকে যেভাবে আলোচিত হয়েছে—তা থেকে জিজ্ঞাসু পাঠক আলোক লাভ করবেন।

গায়কগায়িকার পক্ষে শব্দবিজ্ঞান অথবা ব্যাকরণ জানা আবশ্যক হয় না—তাঁদের পক্ষে সঙ্গীতের ব্যাকরণ জানাই যথেষ্ট। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা

শব্দশাস্ত্রের আলোচনায় ব্রতী হন, শব্দবিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা তাঁদের পক্ষেও আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্বরযোজনার যেমন কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে, শব্দযোজনারও তেমনি। রবীন্দ্র এবং সঙ্গীত দুটো শব্দই তৎসম হওয়া সত্ত্বেও এদের যখন একপদ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন মাঝখানে একজন হাইফেনের মধ্যস্থতা কেন যে অপরিহার্য বিবেচিত হয় তা দুর্বোধ্য ঠেকে। "আন্তর-দ্যুতি"র মাঝখানেও অনুরূপ ঘটনা। স্বতঃ+স্ফূর্ত=স্বতস্ফূর্ত, স্বতঃ+উৎসারিত=স্বতোৎসারিত বিপরীত দৃষ্টান্ত। চাকচক্যের জায়গায় "চাকচিক্য"কে না হয় বরদাস্ত করা যায় কিন্তু "রাগাতীগ"-কে সহ্য করা সহজ নয়। মুলতানকে আমরা যেরূপে মানি 'মূলতান' তা থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। বৃন্দবাদ্য অর্থে রেডিওর কর্তারা যদি 'বাদ্যবৃন্দ' লেখেন তা হলেই তাকে মেনে নেওয়ার কি যুক্তি আছে? না-গান-গাওয়ার বদলে "নাচ-গান-গাওয়ার" (পৃঃ ৪৮) স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক এবং স্বরলিপিগবেষক। তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ : প্রথম খণ্ড' প্রথম শিক্ষার্থীদের থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর মানের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত। প্রারম্ভিক মান থেকে সুরু করে পর্যায়ক্রমে একটি সুপরিকল্পিত এবং বৈজ্ঞানিক পাঠক্রমের ছক এই পুস্তকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিক্ষণীয় রাগ, কণ্ঠসাধনপ্রণালী, সার্গম, ঔপপত্তিক আলোচনা, তাল ইত্যাদির দ্বারা রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নিরর্থক ভাবুকতার পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে শ্রীদাস আলোচনা করেছেন সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায়। সমগ্র পাঠক্রমটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্ত্য এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি পর্যায়ের শেষে প্রাসঙ্গিক ঔপপত্তিক আলোচনা যোগ করায় পাঠক্রমটি সমৃদ্ধ হয়েছে অথচ কোথাও অনাবশ্যক ইতিহাসের কচকচি জুড়ে দেওয়া হয় নি। তালবদ্ধ সার্গম থাকাতে রাগের ঠাট অধিগত করা খুব সহজ হবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের পুরো মিল নেই এবং একের ব্যাকরণের দ্বারা অন্যটি চালিত হয় না। কিন্তু রাগ পরিচয়, তাল পরিচয় এবং কণ্ঠমার্জনার জন্য রাগসঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা ছিন্ন করতে পারি না। কারণ ওটাই হলো ভারতের মৌলিক সঙ্গীতবিজ্ঞান। শ্রীদাসের পুস্তকটির

সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হলো কালোয়াতী হিন্দুস্থানী গান-ভাঙ্গা রবীন্দ্রগীতি ও মূল গানের পাশাপাশি স্বরলিপি। ভূপালী রাগের মূল গান 'প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু' এবং তা থেকে ভাঙ্গা রবীন্দ্রগীতি 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি তুর্দিন' (সুরফাঁক তাল), যদুভট্টের মূল গান 'ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্তরি' এবং তা থেকে ভাঙ্গা গান 'আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে' (বাহার, চৌতাল) ইত্যাদি স্বরলিপির তুলনামূলক আলোচনাই প্রমাণ করবে যে রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা-গানে হিন্দুস্থানী প্রভাব কতখানি এবং কতখানি নয়। মূল গানের স্বরলিপিসহ আরো তুটি গানের স্বরলিপি এই বই-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—'আনন্দ ধারা' এবং 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে'। সাঙ্গীতিক প্রত্যয় সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তি, লেখন এবং বচন পুস্তকটির পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ তাঁর সাঙ্গীতিক চেতনার প্রাথমিক পরিচয় লাভ করতে পারবেন। তালের মাত্রাবিভাগসহ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিবিধ তালের পরিচয় এবং ঠেকা দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা শুধু শিক্ষার্থীই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গবেষকদের কাছেও পুস্তকটি মূল্যবান পরিগণিত হবে। শ্রুতিতত্ত্বে শ্রীদাস ভাতখণ্ডের চেয়ে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের অনুসরণ করে ভালোই করেছেন মনে হয়। কারণ ভাতখণ্ডের শ্রুতিতত্ত্ব এখন আর অবিসংবাদিত নয়। আকারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যাখ্যাটি অনেকেরই কাজে লাগবে। বস্তুত এত অল্প বাক্যব্যয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত কি এবং কি নয়—তার এমন সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পরিচয় এই পুস্তকটি ছাড়া এই বিষয়ক আর কোনো পুস্তকে পাই নি। বক্ষ্যমান পুস্তকটি এই পর্যায়ের প্রথম খণ্ড। আমরা আশা করব এর দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো তথ্য এবং তুলনামূলক স্বরলিপির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, অপরাপর সঙ্গীতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ও পার্থক্য এবং এতে রাগসঙ্গীতের নানাবিধ অলঙ্কার যোগ না করার যুক্তি প্রফুল্লবাবু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাম্প্রতিক অরাজকতা সম্বন্ধেও তিনি নীরব থাকেন নি। গণ্য ঢঙের গানের গায়কি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। প্রফুল্লবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানের মধ্যে প্রথম সংযোগ সাধন করেছেন অথচ কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন

দেবেশ রায়

আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের অষ্টাবক্র বিকাশের ওপর নির্ভরশীল বিচিত্র জটিল উপন্যাস সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করবার সময়, নিয়মমাফিক অর্থনৈতিক বিকাশের চিরকালের উদাহরণস্থল ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের সমালোচনার আদর্শ সামনে রেখে, গবেষকের অনেকখানি মূল্যবান শ্রম ও শক্তি অপচয় হতে দেখেছি নবাবী আমলের বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের বীজ-সন্ধানে। যার ফলে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক সুপরিচিত বিরাট গ্রন্থে অনেক লেখককে অবধারিত বিস্মৃতির হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছেন, তেমনি জগদীশ গুপ্তের মতো বিরাট ব্যক্তিকে একেবারে বিস্মৃত হতেও পেরেছেন। এই স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলার পেছনে অর্থনীতির সুতো আবিষ্কারের চেষ্টায় শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী মহাশয় 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লেখকদের গ্রন্থের বিশ্লেষণে প্রবেশ করলেন না, সাহিত্যের মানদণ্ডে দাঁড় করালেন না বাংলা উপন্যাসকে, শুধু প্রবণতাগুলির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিলেন। শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী মার্কসবাদী সমালোচকদের মুখরক্ষা করেছেন, সামগ্রিকভাবে উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী সমালোচনাসূত্র তিনিই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছেন। এবং হয়তো সে কারণেই নিজেকে তিনি সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি* এ বিষয়ে তৃতীয়। না বলে দিলেও তা বোঝা যায় গ্রন্থের উপ-নামের দিকে তাকালেই। (এখানে একটি সন্দেহ প্রকাশ করে নেওয়া ভালো। গ্রন্থের উপনাম হিসেবে যে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে— "গত একশো বছরের বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের সুচিন্তিত সমালোচনা" —তাতে "সুচিন্তিত" এই বিশেষণটিতে যেন প্রকাশকের কলমের আঁচড় দেখা যায়। শব্দটি আমাদের ভালো লাগে নি।) এবং বাঙ্গলা উপন্যাস সমালোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখক যে অতিমাত্রায় সচেতন তা বোঝা যায় তাঁর

*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন। নয় টাকা॥

গ্রন্থের কয়েকটি পাতা পড়লেই। এবং সে কারণেই এ সমালোচনার প্রথমেই আমরা পূর্ববর্তী গ্রন্থ দুটিকে স্মরণ করেছি। সেই সমালোচনার ধারাতেই এই তৃতীয় গ্রন্থটিও রচিত। নিঃসন্দেহে সেই ধারাকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা পদ্ধতি এই প্রকার—(১) লেখককে উপস্থিত করবার সময়ই ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর পরিচয় দেওয়া, ও, সেই সকল শক্তির সমন্বয় বা অসমন্বয়ের সম্ভাব্য ফলের ইঙ্গিত দেওয়া ; (২) লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ নির্বাচন ও কারণ প্রদর্শন ; (৩) সেই গ্রন্থগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।—লেখকও তিনি নির্বাচন করে নেন, এবং, সেটাও করেন সামাজিক কার্য-কারণ-সূত্রে। এইভাবে তিনি পুঁথিগত সমালোচনাপদ্ধতি ও মার্কসবাদী সমালোচনাপদ্ধতির মধ্যে একটি বাস্তব সমন্বয় সাধন করেছেন। এটি তাঁর প্রথম কৃতিত্ব।

শরৎচন্দ্রের প্রবাদবাক্যকে অনেকদিন থেকে ঘা দেওয়া হচ্ছে। এবং তার জায়গায় বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন প্রবাদবাক্য রচিত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' নাম দিয়ে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যকীর্তি এবং 'বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনা' নাম দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রবোধ সান্যালের সাহিত্যকীর্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন—'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ'। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস এতদিন পর্যন্ত এই অনৈতিহাসিক সূচীপত্রকেই স্বীকার করে নিয়েছে। তার ফলেই এতকাল বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় ১৯১৬—১৯৩০ (শরৎচন্দ্রের কলকাতা আগমন, 'কল্লোল'-'কালিকলম' ইত্যাদির প্রকাশ, বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ঘটনাকাল) পর্যন্ত সময়টিই সবচেয়ে বেশি স্থান নিয়েছে। সরোজবাবু বাংলা উপন্যাসের যে প্রকৃত ইতিহাস এতকাল আড়ালে ছিল—তাকে উদ্ধার করেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এটি তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। তাঁর প্রথম তিনটি প্রবন্ধ ('উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য', 'উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য', 'উপন্যাসের ভাষারীতি') একটি গুচ্ছ। বাকি সাতটি একসঙ্গে দেখলেই আমাদের পূর্ববর্তী মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। 'বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল', 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা', 'রবীন্দ্রনাথ ও

বাংলা উপন্যাসের নব-নিরীক্ষা', 'শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা', 'জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', 'তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি'; 'উদভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস'।

এই সূচীপত্র দেখলেই বোঝা যায় লেখক বাংলা উপন্যাসের ধারা (Process)-টিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সেই ধারার সমগ্র চিত্র তিনি যখন আমাদের সামনে সূচীপত্রেই মেলে দিলেন তখনই তো তিনি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির ভূমিকা সৃষ্টি করলেন—যে ভূমিকা 'বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনা', 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' ইত্যাদি বিশেষণাত্মক নামকরণে নেই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় কৃতিত্ব : বাংলা উপন্যাসকে একটি বিশ্বমানে বিচারের চেষ্টা। উপন্যাসে বাস্তববর্ণনার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে নিঃসংশয়ে তিনি যখন 'রবিনসন ক্রুসো', 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেন ; বা, অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'র ঘটনাস্থল ইওরোপ কেন, এই প্রশ্নের মীমাংসায় যখন তিনি অবলীলাক্রমে টমাস মান-এর 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর ঘটনাস্থলের রূপক ব্যাখ্যা করেন ; বা, 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে অনায়াসে টলস্টয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-দৃষ্টি আলোচনা করেন ; বা, ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জীবনব্যাখ্যা উপন্যাসের প্রতি অংশে কী ভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তার উদাহরণ হিসেবে 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস' এবং 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর মতো সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের ঘটনা ব্যাখ্যা করেন—তখন দীন আত্মতৃপ্তি বা দরিদ্র হীনম্মন্যতাবোধের পরিবর্তে, স্ব-সাহিত্যের সম্পদে সুস্থ গৌরববোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সমগ্র গ্রন্থটি সম্বন্ধে এগুলো সাধারণ মন্তব্য। প্রতিটি অধ্যায়ের আলাদা আলোচনা দ্বারাই একমাত্র দেখা যেতে পারে সরোজবাবুর সিদ্ধান্তগুলি কত দৃঢ় যুক্তি ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রবন্ধ 'উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে লেখকের সিদ্ধান্তগুলি নিম্ন প্রকার :

১ নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই হয়, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়।··· উপন্যাস সর্বগ্রাসী। (পৃঃ ১১)

২ জীবন প্রত্যক্ষ সৃষ্টিবাচকতায় পূর্ণ হলে উপন্যাসেও আসে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও প্রত্যক্ষ সঙ্কটের ছায়া এবং তদুপযুক্ত মাধ্যম বা আঙ্গিকরীতি।

জীবন অবক্ষয়ে ক্লান্ত, কর্মসার্থকতাহীন পরোক্ষ এবং নেতির সম্মুখীন হলে তার প্রসঙ্গ প্রকরণও বিভিন্ন। ডিফো-ফিল্ডিং থেকে লরেন্স-জয়েস সেই ইতিহাস। (পৃঃ ২৩)

৩ ...Life and Pattern-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস।... জীবনের সামগ্রিক বোধ এবং Pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ। এ কারণেই উপন্যাস কখনোই realism naturalism ইত্যাদির পুঁথিনির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ করে চলে না।

মনে হয় সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পরূপ থেকে উপন্যাসকে পৃথক করার প্রবণতায় লেখক প্রচলিত ধারণার পুনরুক্তি করে প্রথম সিদ্ধান্তে এসেছেন। একটু যাচাই করলেই দেখতে পেতেন, নাটক-কবিতা বা উপন্যাসের মধ্যে ভেদরেখা আর ঐ কথাকটিতে সীমাবদ্ধ নেই। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বা গত শতাব্দীর শেষ দিকে ও-নিল বা শেখভ-এর নাটকের অনেক জায়গায় আজকের পাঠক বুঝতে পারেন না, নাটকের 'নাটকীয়তা'য় যা বলা যায় না, যাচ্ছে না, নাট্যকার কী সে কথাও বলে দিতে চান। আর হাল আমলের নাটকে তো উপন্যাস ও নাটকের প্রাচীন সীমারেখাকে প্রায় তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সেখানে, আমাদের আশা ছিল, সরোজবাবু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত ধারণাকে যাচাই করে নিয়েছেন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি করবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত দুইটিই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র পণ্ডিতি বা পুঁথিগত আলোচনাকে কত সচেতন ও স্বাভাবিকভাবে এড়িয়ে সাধারণ একটি সত্যে পৌছতে পারেন। কিন্তু সবসময় সেটি বোধহয় ভালোও নয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যদিও আমরা স্বস্তি বোধ করি যে লরেন্স-জয়েস শ্রেণীর বহুবিতর্কিত লেখকদের তিনি তাঁদের সামাজিক ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, কিন্তু তৃতীয় সিদ্ধান্তের বেলায় ক্ষোভ থেকে যায়, বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থেকেই যে ism-গুলোর জন্ম, সেগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেন না বলে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উপন্যাসের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য'-এ লেখক বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন, চরিত্র, কাহিনী সব মিলিয়ে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে কীভাবে প্রকাশিত করে। প্রসঙ্গত রাসকলনিকভ, নিকল্যুদফ, মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা, ভ্রমর, কুমু ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে তিনি অনেক পরিমাণ ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যা

করে বলতে চেয়েছেন, যাকে পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত বলা হয়, উপন্যাসে সেটি কত প্রয়োজনীয় কথা। "এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী এবং কতটুকু মিলছে না।" এর সঙ্গে যদি তৃতীয় প্রবন্ধ 'উপন্যাসের ভাষারীতি' মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে বোঝা যায়, লেখক, এই প্রথম তিনটি প্রবন্ধ জুড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক দিয়ে একটি সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে লেখকের ধারণা থেকেই আর সব বিষয়ের জন্ম, এবং যে কোনো উপন্যাস বিচারকালেই সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও ক্ষুদ্রতম বস্তুবর্ণনাকে লেখকের জীবনধারণার টীকারূপে দেখতে হবে। তাই এর পরে তিনি যখন বঙ্কিম-ব্যবহৃত একটি উপমাব্যাখ্যা ("চাষার মেয়ের মতো"), বা, 'গোরা'য় ব্যবহৃত উপমাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন, তখনো সেটি করেন উপন্যাসের সমগ্র শিল্পরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের বিশ্লেষণে লেখক বাংলার নবজাগরণের মূল্যায়ণের চেষ্টা করেছেন। এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন "স্বভাবতই ব্রিটিশ পুঁজির এই নিরাপদ প্রয়োগক্ষেত্রে তেমন ভালো করে কিছু গড়ে উঠলো না, ভালো করে কিছু ভেঙেও গেল না। সেই অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বাস্তবজীবনাগ্রহও সম্যক এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে অসম্পুর্ণতার দায়ভাগ আমাদের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বহন করতে হচ্ছে।"

অনেকদিন ধরেই তো এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে আসছে। তাই আশা করেছিলাম সরোজবাবু অন্তত এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো উত্থাপন করবেন—(১) অর্থ নৈতিক প্রগতির "অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতা"ই যদি "বাস্তব জীবনাগ্রহ" সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে বাধা হয়ে থাকে, তবে নিয়মমাফিক অর্থনৈতিক প্রগতির উদাহরণস্থল ইংলণ্ডে অন্তত উপন্যাসে "বাস্তবজীবনাগ্রহে"র সেই ব্যাপক-গভীর প্রকাশ ঘটল না কেন, যেমন ঘটেছিল অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার উদাহরণস্থল উনিশ শতকের রাশিয়ায়? (২) "কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলায় মধ্যবিত্ত মানসেও এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত ও সঞ্জীবিত হল বটে, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল।" পৃথিবীর সর্বত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনাগ্রহ অসম্পূর্ণ। কিন্তু যেটুকু সাময়িক সম্পূর্ণতা তারা ঐতিহাসিক কারণে পেয়ে থাকে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা তারা এদেশেও পেয়েছিল। অথচ সেই সম্পূর্ণতার প্রকাশ উপন্যাসে

তদনুপাতে ঘটল না কেন? (৩) ইংলণ্ডের নেতৃত্বে কালান্তর এলেও, নবজাগরণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কি ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা উচিত, এবং সেদিক দিয়ে কি তার সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা বিচার করা উচিত?

সরোজবাবু পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিষয়কে কোনো সময়ই আলোচনা করেন না বলেই, বাংলার নবজাগরণ-আন্দোলনের ভিত্তিতেই 'ফুলমনি ও করুণা' আর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করে প্রথম বাংলা উপন্যাসের দাবির মামলা নিষ্পত্তি করেন। সামাজিক উপযোগিতাবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা একদিকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনাবৃত্তিকে, অপরদিকে "দেশজ শিল্পের বিপর্যয়ের" প্রতি তাঁর অনাগ্রহকে কী করে প্রশ্রয় দেয়; আর এই প্রায়-পরস্পরবিরোধী দেশদৃষ্টির ফলে বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্র আর ঘটনাগুলি সুগভীর মননশীলতা দ্বারা সুমার্জিত এবং যুক্তিশৃঙ্খলায় বাঁধা হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে চরিত্রগত সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত হয় কেমন করে—'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা'র গঠনকৌশল, ভাষা, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক—ইত্যাদি ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তা সরোজবাবু প্রমাণ করেছেন। সেই ব্যাখ্যার সূত্রে রোহিণীহত্যার মতো পুরাতন প্রশ্নের নতুন মীমাংসা দেবার চেষ্টা যেমন তিনি করেছেন, তেমনি, 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনার একটি নতুন অংশে আলোকপাত করেছেন। আমাদের মনে হয় 'সীতারাম' উপন্যাসটিকেও তাঁর আলোচনার অন্তর্গত করলে দ্বন্দ্বে দীর্ণ উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের মহৎ কল্পনা কী করে অবধারিত ট্রাজেডিতে পরিণত হলো ও জীবনের নৈতিক তাৎপর্য কী করে হিন্দুনীতিক তাৎপর্যে পর্যবসিত হলো—সে বিষয়ে লেখক নতুন আলোকপাত করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের ওপর রচিত অধ্যায়টিতে তিনি সর্বপ্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন—ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে সত্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই একদিকে "কবির কলমে উপন্যাস" ইত্যাদি নির্বোধের উক্তি, অপরদিকে বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সমালোচকগণের "রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সঙ্গতি ঘটাতে পারেন নি" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত—এই উভয় পথকে পরিহার করে লেখককে সম্পূর্ণ নতুন পথ আবিষ্কার করতে হয়েছে। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলেন, (১) "তিনি অখণ্ড মানুষকে উপন্যাসে ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি জানতেন যে ব্যক্তি-মানুষের জীবন আদ্যন্ত একখানা জীবন। একটা ঘটনা শুরু হবার পর থেকে সে জীবন ঔপন্যাসিকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক হয় না। জীবন আদ্যন্ত সমগ্রতা নিয়ে ঔপন্যাসিককে আকর্ষণ করে। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে জীবনের যে প্রচণ্ড টান অনুভূত হয় তা কদাচ বাইরের ঘটনার সাহায্যে উদ্দীপিত ব্যাপার নয়।" (২) "রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সেই লেখক···যিনি স্পষ্ট অর্থে নাগরিক মনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।" 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'—এই চারটি উপন্যাস আলোচনা করে সরোজবাবু তাঁর উক্ত দুই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। 'চোখের বালি'র সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর তফাৎ দেখাতে গিয়ে সরোজবাবু বলেছেন—'চোখের বালি'র সমস্যা পুরুষের রূপমোহ বা বিধবার প্রেম নয়; বিনোদিনী, মহেন্দ্র-আশা-বিহারী প্রমুখ সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। এই সূত্রেই 'গোরা' উপন্যাসের বিস্তৃত ও গভীর আলোচনার ভূমিকাতেই লেখক সূত্র নির্দেশ করেছেন—"কেমন করে গোরা সকলকে উপলব্ধি করল, এবং সকলে গোরাকে উপলব্ধি করল এটাই এ উপন্যাসের সমস্যা।" এই সমস্যার রূপায়ণ বিচার করতে গিয়ে সরোজবাবু 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'গোরা' রচনার বীজ আবিষ্কার করে, বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। সানন্দে স্বীকার করছি, সরোজবাবুর গ্রন্থ পড়বার পূর্বে 'মেঘ ও রৌদ্র'কে রবীন্দ্রনাথের একটি শিথিল ও অসার্থক গল্প বলেই মনে করতাম। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় 'গোরা' কী ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, গোরা চরিত্রের সমস্যা ভারতবর্ষের আত্মসন্ধানের যন্ত্রণায় কী ভাবে পরিণত হয়েছে, অস্তিত্বের খণ্ডীভবনের অসঙ্গতি মহিম এবং পানুবাবুর সঙ্গে গোরাকেও কী ভাবে আক্রমণ করেছে, ও, সেই অসঙ্গতি থেকে উত্তরণের সংগ্রামে কী করে গোরা তদবধিকাল অনাবিষ্কৃত "বাস্তব ইতিবাচকতা"কে উপস্থিত করেছে সব কিছুই সরোজবাবু ব্যাখ্যা করেছেন। 'গোরা' সম্বন্ধে এই বিশদ আলোচনার জন্য 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে আলোচনাকে আকারের দিক থেকে খানিকটা ছোট করতে হয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণা অপনোদনেও অনেক পরিমাণ জায়গা দিতে হয়েছে। আমরা আশা করব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে সরোজবাবু আরো ব্যাপক ও বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতে করবেন। এই গ্রন্থেই সে আলোচনার ইঙ্গিত তিনি রেখেছেন।

এর পরের চারটি প্রবন্ধের নাম 'শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা', 'জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', 'তিরিশের যুগ: বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি', 'উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস'। প্রথমটি নিয়ে কিছু-কিঞ্চিৎ আলোচনা যদিও হয়েছে, আর সবগুলি একেবারে নতুন। প্রথম ছটি প্রবন্ধের আলোচনাতেই আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি সরোজবাবুর সমালোচন-ক্ষমতা প্রায়-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকেও নতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা দ্বারা কী ভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি যে গভীর মৌলিকতার পরিচয় দেবেন, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে? মতবিরোধের অবকাশ একাধিক ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু সেটাই প্রমাণ করে তিনি সংক্ষিপ্তসার দেন নি, নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নতুন সূত্র দিয়েছেন—সে সূত্রকে পরীক্ষা করতে হলে সমপরিমাণ তথ্য ও নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বস্তুত বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা হিসাবে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্বীকৃত হবেন।

মৌমাছিতন্ত্র ও মানবতন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে মৌলিকতাপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের ইতস্তত নানা বিচিত্র মন্তব্য চোখে পড়ছে। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য ভাষার লেখক, এবং সে-কারণে সমধিক জনপ্রিয়। আত্মনিগ্রহ থেকেই যে রবীন্দ্রচিত্রকলার জন্ম—এসব কথা আমরা প্রথম তাঁর মাধ্যমেই অবগত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে বাথরুম নেই, এই তীক্ষ্ণদর্শী আবিষ্কারের মর্যাদাও তাঁর প্রাপ্য।

শিবনারায়ণ রায়ের 'মৌমাছিতন্ত্র'* তাঁর অন্য গ্রন্থের মতোই চটকদার দৃষ্টান্ত সমারোহে, যুক্তির নামে সরলীকৃত সিদ্ধান্তে আকর্ষণীয়।

শিবনারায়ণবাবু মানবেন্দ্র রায়ের মতের প্রবক্তা। মানবেন্দ্র রায়ের রচনাবলী মুখ্যত ইংরাজীভাষায় আবদ্ধ, শিবনারায়ণবাবুর দু-চারটি ইংরাজী বই থাকলেও তিনি বাংলা লেখার মাধ্যমেই বাঙালী পাঠকসমাজে পরিচিত। মানবেন্দ্র রায়-পন্থীরা সোভিয়েতব্যবস্থার প্রতিপক্ষ, সেই bias-এর মধ্যেই তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা, নিদাঘ-আলোচনা-শিবির নিয়ন্ত্রিত। কোয়াণ্টাম থেকে আধুনিকতম বিজ্ঞানতত্ত্বে পর্যন্ত তাঁরা আগ্রহী। তাই প্রাচীন ভাববাদী দার্শনিক বা ধর্মধ্বজী সংস্কারকের তুলনায় তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল। কিন্তু যেখানে বুদ্ধিজীবীকে রাষ্ট্রের কাছে দায়িত্ব পালন করতে হয় সাধারণ নাগরিকের মতোই, সেই সোভিয়েত সমাজ সম্বন্ধে তাঁরা বরাবরই বিদ্বিষ্ট। শিবনারায়ণবাবুর আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'মৌমাছিতন্ত্র'-এ এই বিদ্বেষ প্রকাশিত।

'মৌমাছিতন্ত্র' কথাটি রবীন্দ্রনাথ থেকে গৃহীত। 'কানু ছাড়া গীত নাই'-এর মতো অধুনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রস্তাবনা নেই। 'অধিক ফলাও' থেকে আরম্ভ করে 'বাঙালী জাগো' আন্দোলন পর্যন্ত রবীন্দ্রবচনের যথেচ্ছ প্রয়োগ ও ভাষ্য। শ্রীযুক্ত রায়ও এই সহজ কৌশলের সদ্ব্যবহার করেছেন।

---

*মৌমাছিতন্ত্র। শিবনারায়ণ রায়। রেনেসাঁস পাবলিশার্স। সাড়ে তিন টাকা

কবি নিজের রাষ্ট্রনীতি-চিন্তা সম্পর্কে বলেছেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।…রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণ ভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।" ডঃ শচীন সেনের গ্রন্থ পড়ে যে ভ্রান্তির বিরুদ্ধে কবি সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, শ্রীযুক্ত রায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি; কিংবা নিজের সুবিধার্থে অগ্রাহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা-প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশীসমাজ' বা 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলী কালানুক্রমিক অনুসরণ করলে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা-ধারা, emphasis-এর ধরন, গতিশীল মনোভাব যতটা চোখে পড়ে, ততটা স্পষ্ট হয় না কোনো প্রচলিত পথে একটা সমাজচিন্তা-পদ্ধতির (System of social thought) ধারাবাহিক বিন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের চিত্তশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের জলকষ্ট, অশিক্ষা, হিন্দুমুসলমান সমস্যা, রাষ্ট্রীয় স্বরাজ সব বিষয়েই তাঁর একধরনের সমাধান। আগে চাই অন্তরের শক্তি, অধিকারের যোগ্যতা, পরে অধিকার। "যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তি সম্পন্ন অন্তর প্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।…বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা কর্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই।" এইরূপ ভারতদর্শন প্রথম ঘটেছিল—রবীন্দ্রনাথের ধারণা—মহাত্মা গান্ধীর। 'সত্যের আহ্বান' শিরোনামের অর্থ গান্ধীর নেতৃত্বেই প্রথম দেশবাসী কংগ্রেস সংগঠনে সত্যের আহ্বান শুনল। 'চরকা' বা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে গান্ধীজির ভাব-বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানাতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত রায় যে প্রবন্ধে রুশোতে ফ্যাসীবাদ এবং হিটলার-মুসোলিনী-গান্ধীতে তার উত্তরসাধনা নিঃসংশয়ে লক্ষ্য করতে পারেন, সে প্রবন্ধে 'সত্যের আহ্বান' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া অসমীচীন।

An analogy is no argument—এই প্রাথমিক বোধ কবির ছিল বলেই

'মৌমাছিতন্ত্র' শব্দটি তিনি কখনো প্রয়োগ করেন নি। বলেছেন, "জন্তুরা এ-জগতে পরাসক্ত," মানুষ কিন্তু "নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না।" এবং লক্ষণীয়, একই বাক্যে মৌমাছি ও মাকড়সার জড় জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে মনে হয়, মানুষের সঙ্গে ঐ পরাসক্ত প্রাণীদের মৌলিক পার্থক্যটিই শুধু রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন। তারপর নিজস্ব রীতিতে তিনি চিত্তের জড়ত্ব মোচনের উপায় নির্দেশ করে শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করেছেন, "য একোঽবর্ণঃ বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"। শ্রীযুক্ত রায় কি এই রাবীন্দ্রিক সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাস করেন? মানুষের মধ্যেই মঙ্গলময়ের বিচিত্র প্রকাশ—একথা প্রাত্যহিক সত্যের মতো সর্বদা অনুভব করেন? নিশ্চয়ই করেন না, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লজিক উদ্ধৃত করলে তার ভাবভূমিকেও গ্রহণ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত বলেছেন, "স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে"। শ্রীযুক্ত রায়ও এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। জর্জ টমসনের 'এস্কাইলাস এ্যাণ্ড এথেন্স' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। কিন্তু এর সঙ্গে লেখক উপনিষদ-বচন-সংহিতা উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যাখ্যায় যে মৌমাছিতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐকমত্য হতো কি? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"—কবির কাছে আদর্শভ্রংশ নয়, মহৎ আদর্শেরই পরিচায়ক। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত অমৃতের সাধনাই কবির মতে মনুষ্যত্বের সাধনা। যতদূর জানি, মানবতন্ত্রী ঐতিহ্যের জীবনভাষ্য এর সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন ভারতের সবটুকুই পরতন্ত্রতা এবং এথেন্সের দাস্য বিষয়ে নীরবতা ইতিহাসবিবেকের অভাবজাত ধারণা।

শ্রীযুক্ত রায় বর্তমান কালে মৌমাছিতন্ত্রের দুটি রূপ দেখেছেন। একটি ফ্যাসিজম্, অপরটি কম্যুনিজম্। আমাদের ধারণা ছিল, ফ্যাসিবাদ কম্যুনিজমের তথা মানবসভ্যতার শত্রু, এবং কম্যুনিস্টরাই দেশে দেশে ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সভাপতিরূপেই একটি বিবৃতিতে বলেন, "The devastating tide of internationl Fascism must he checked. In Spain, this inhuman incrudescence of obscurantism, of racial prejudice

of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilization must be saved from its being swamped by barbarians." (৩রা মার্চ, ১৯৩৭, 'স্টেটস্‌ম্যান', আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যায় উদ্ধৃত)। অন্যপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ কখনো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সমবেত হতে বলেন নি। নোগুচির সঙ্গে বন্ধুত্ববিচ্ছেদ হয়েছিল, কিন্তু রঁল্যা বা পেট্রোভের সঙ্গে বিরোধ বাধে নি। শুধু 'রাশিয়ার চিঠি' নয়, সোভিয়েত-প্রত্যাগত রবীন্দ্ররচনায় গভীর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। "পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সময় কবিকে লোকে নানা কথা বলেছিল। অসংখ্য চিঠিতে যৌথখামারের চাষীদের সঙ্গে কবির কথাবার্তায় তার আভাস আছে। "আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কিনা।" যৌথখামারের চাষীদের সম্পত্তির একত্রীকরণ সকলে যে খুশিমনে গ্রহণ করে নি, ঐ পত্রে তারও উল্লেখ পাই। কিন্তু তাদের অসম্মতির বা সম্মতির মূলে কোনো জবরদস্তি ছিল না। "নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত।" রাশিয়াভ্রমণ তাঁকে "গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে।" তারই প্রথম প্রতিক্রিয়া জমিদারি ব্যবসায়ে লজ্জাবোধ। শ্রীযুক্ত রায় ১৩ সংখ্যক পত্রের একাংশ উদ্ধার করে ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজম্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমান অনীহা প্রমাণ করতে চেয়েছেন (পৃঃ ১৯, 'মৌমাছিতন্ত্র')। ঐ পত্রেই কবি লিখেছেন, "যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি।...মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।" বোঝা যায়, কমিউনিজম্ গঠনের পথে বাধ্যতামূলক শ্রম, শিক্ষা, কৃষিকাজ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে না পারলেও ফ্যাসিজম্ ও কমিউনিজমের পার্থক্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি।

প্রবন্ধে বারংবার লেখক আক্ষেপ করেছেন, দেশের লোক বড় বেশি নির্বোধ, মূঢ়, তাই এখনো তাঁর মতো করে কেউ রবীন্দ্ররচনাংশ (মানবতন্ত্রী

ঐতিহ্য) প্রয়োগ করতে শিখল না! অনেকেই শিখেছেন, যেমন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অম্লানকুসুম দত্ত প্রভৃতি।

রুশো কল্পিত 'প্রাকৃত সমাজ', জাত্যাভিমানী ও সর্বগ্রাসী ফ্যাসিজম্ এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর একনায়কত্ব তাঁর কাছে একার্থবোধক, সবই মৌমাছিতন্ত্র গড়বার প্রয়াস। হেগেলের চেয়ে কান্টেই কি রুশোর চিন্তা বেশি প্রতিফলিত হয় নি? অবশ্য হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যে অস্বীকৃত হয়েছিল, একথা ঠিক। প্রসঙ্গত রুশোর general will-এর সঙ্গে সাম্যবাদের collective will-এর তুলনা অন্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "There can not be any contradiction between the Government and the individual. Following the footsteps of Rousseau whom the soviet theoreticians treat contemptuously and ungratefully as a petty bourgeois writer, soviet writers oppose the collective individual will to the individual will". ('সোভিয়েট রেজিম', ডব্লিউ. ডব্লিউ. কুলস্কি, পৃঃ ১৩১)। অবশ্য ইদানীংকালে ২০শ ও ২২শ পার্টি কংগ্রেসের বিবরণীতে যাকে 'personality cult' বলা হয়েছে, তাতে অবশ্য individual will এবং collective will-এর পার্থক্যই স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভিশিনিস্কির লেখা 'The law of the soviet state' থেকে collective will-এর অংশ উদ্ধৃত করে যদি কেউ বলেন, "Why are certain particular Individuals, for instance, the leaders of the Communist Party, entitled to proclaim that they express the dominant will of the Proletariat better than a group of workers could? And what entitles them to be identified with the collective individual?" সে-প্রশ্নকে নিতান্ত প্রতিবিপ্লবীর কূটপ্রশ্ন বলেই খারিজ করা যায় না। স্তালিনকে হত্যাকারী, চক্রান্তকারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ বললেই দোষক্ষালন হয়না। কারণ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 'collective will' তাঁর পক্ষেই ছিল; অর্থাৎ collective will-কে পার্টির নেতা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। শক্তি কেন্দ্রীকরণের বিভ্রাট সোভিয়েতের মতো শক্তিশালী এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে উন্নত রাষ্ট্রে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, এমন সংশয় যাঁরা করেন তাঁদের মতকে এককথায় 'সোভিয়েত-বিরোধী' বলে নাকচ করাও সমীচীন নয়। 'মৌমাছিতন্ত্রে'-এ উল্লিখিত হিন্দু-

জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ফ্যাসিবাদী রূপ, সেবাব্রতী ভারত প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ প্রকৃতই আমাদের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিদর্শন। গান্ধী যে যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আমাদের মন পেছন দিকে ফিরিয়েছেন, একথাও একান্ত মিথ্যে নয়। তার অর্থনীতি পরিকল্পনা, শিক্ষা পরিকল্পনা, গ্রামোদ্যোগ যে যুগোচিত নয়, তাঁর প্রমাণ গান্ধীবাদী রাষ্ট্রের বড় শিল্পায়ণ, দেশের সর্বত্র বিলাতী কায়দার স্কুল কলেজ স্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় রক্ষণশীল উপাদান ছিল, কিন্তু সেটাই সব নয়; তাঁর চিন্তায় অগ্রসর ও পুরাতন ভাবধারার বিরোধটুকু লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা তো ঐতিহাসিক বিভ্রম মাত্র।

'মৌমাছিতন্ত্র' ছাড়া আরো তিনটি প্রবন্ধ আছে—'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়', 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি', 'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'। মৌমাছিতন্ত্রের আলোচিত ব্যক্তিত্ববিলোপের সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে। উদারতন্ত্রই ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের হাত থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু হায়, সেই উদারতন্ত্রেই অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। গত দুশো বছরে বহু মনীষী এর গরিমা এবং অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত রায় হুম্‌বোল্ট, শাপিরো, স্যাবাইন, সালভাদোরি, হ্যালোয়েল, ক্যাসিরার, হবহাউস, বুকহার্ট প্রভৃতি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, খ্রীষ্টীয় চিন্তায় পাপবোধ মানুষকে পাপগ্রস্ত, ঈশ্বরে আপন্ন করে রেখেছিল। (অর্থাৎ তারা ধর্মের মৌমাছিতন্ত্রে ছিল।) চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে সংঘটিত রেনেসাঁস মানুষকে সেই পাপবোধ থেকে মুক্তি দিল। গ্রীক সভ্যতার সেই পুনর্মূল্যায়নে 'প্রভুহীন মানুষের' ('Masterless man', Sabine) আবির্ভাব। রেনেসাঁসের 'Autonomous individual' হলো বৈশ্বিক মানুষ (universal man), যুক্তি বুদ্ধির পরে যার প্রতিষ্ঠা। তারপর যন্ত্রশিল্পের প্রসারে ঘটেছে শক্তির কেন্দ্রীকরণ, পজিটিভিস্টদের সমাজচিন্তায় ব্যক্তিত্বের সংকোচন, ব্যবসায়ীদের মুনফাস্বার্থে উদারতন্ত্রের বৈষয়িক দিকে প্রাধান্য ইত্যাদির ফলে উদারতন্ত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক মানুষ হয়েছে বৈষয়িক মানুষ (economic man)। শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বাস করেন, "একদিকে মানবতান্ত্রিক শিক্ষা এবং অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তিকে স্বপ্রতিষ্ঠ; জিজ্ঞাসু, পরমতসহিষ্ণু এবং সমবায়ী করে তুলতে পারলে তবেই এযুগে উদার-তন্ত্র আবার প্রভাবশালী সমাজদর্শন হয়ে উঠবে।" ইতিহাসের দিক থেকে

কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। (১) বৈশ্বিক মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব কবে, কোথায় ছিল? (২) উদারতন্ত্রের অভ্যুদয় যেমন ঐতিহাসিক কারণে ঘটেছে, তেমন বুর্জোয়া লিবারালিজমের অগ্রণীভূমিকা ঐতিহাসিক কারণেই শেষ হয়ে গেছে, শ্রীযুক্ত রায় যতই শিক্ষিতমানুষদের মূঢ় নির্বোধ বলুন, সে-কাল আর ফিরিয়ে আনা যায় না। (৩) রেনেসাঁসের মানুষের 'স্বতঃসিদ্ধ অধিকার', সর্বজনীন প্রকৃতিই বা কি? অধিকার সম্পর্কিত ধারণা যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না? (৪) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলেই বহু সমস্যার সমাধান হয়, এ ধারণা নতুন নয়। রাষ্ট্রের অখণ্ড সার্বভৌম শক্তির প্রতিবাদে বহুত্ববাদীদের মতামত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জ্ঞাত। কিন্তু স্মরণীয় যে হ্যারল্ড ল্যাস্কি বহুত্ববাদী হয়েও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই মতবাদেও আস্থা হারান।

নানা গ্রন্থকারের রচনাংশ উৎকলন করে উদারতন্ত্রের বিবিধ সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের ব্যাপারটি লেখক যথেষ্ট যুক্তিসহ আলোচনা করেছেন।

'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে নানা গ্রন্থকারের সাহায্যে গণতন্ত্রের ইদানীন্তন বিকৃতির রূপ তুলে ধরা হয়েছে। সংবাদপত্রে এবং জনমত প্রকাশের অন্যান্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রভাব গণতন্ত্রের বহিঃকাঠামো বজায় রেখে গণতন্ত্রী সংস্কৃতির গভীর মর্মমূল পর্যন্ত কলুষিত করছে। তাই 'টাইমস্' বা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর চেয়ে গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকায় 'ডেলি মিরর'-এর বিক্রি বেশি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকরা পর্যন্ত আদর্শভ্রষ্ট। তবু শ্রীযুক্ত রায় বুর্জোয়া ডেমোক্রাসিতে আস্থা হারান নি। তাঁর মতে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রমুখী ধরন বদলালেই ব্যাধির প্রতিকার হবে। কিন্তু এখানেও ইতিহাসের নজির ('ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা', 'ঐতিহাসিক নিয়তি' লেখকের অপছন্দ হলেও) মানতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আর সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে না, তাহলে একধরনের সামন্ততন্ত্রে পৌঁছতে হয়। কল্যাণরাষ্ট্রের কেন্দ্রমুখিতা যেন কেন্দ্রসর্বস্বতা না হয়, সেটাই দ্রষ্টব্য। বিকেন্দ্রীকরণের রাষ্ট্র হলেই যে বুদ্ধিজীবীরা সৎ হয়ে সদাশয় মানুষ নিয়ে আদর্শ সমাজ গড়তে পারবে—এই ধারণার মূলে সদিচ্ছা ভিন্ন যুক্তি নেই।

'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'ও পূর্ব-প্রবন্ধের মতো উক্তি সংকলনে সমৃদ্ধ। এখানে আছে বিউরি, সেণ্ট অগাষ্টিন, গিবন, বেনেস, হিট্টি, রোজার লয়েড,

ণী, ভাসারি, এ্যাবট্ ফিশার প্রভৃতি লেখকদের থেকে রেনেসাঁসের যুগবৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির বহুমুখী মূল্যস্বীকৃতি, চার্চের প্রতিকূল শক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পীড়ন এবং উদারতন্ত্রের মানবতাবোধ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। 'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধের পরিপূরক ভাবনা আছে এই প্রবন্ধে। অনেক সুবিদিত ব্যাপার প্রমাণের উৎসাহে বহু তথ্য তথা উদ্ধৃতি সমারোহ (এ প্রবণতা অন্য প্রবন্ধগুলিতেও কমবেশি লক্ষণীয়) প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। আবার বলি শ্রীযুক্ত রায়-কথিত মানবতন্ত্র স্বয়ম্ভু বা কারো স্বকপোলকল্পিত কিছু নয়, ইতিহাসের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতেই তার অভ্যুদয়, আবার ঐতিহাসিক কারণেই তার অবক্ষয়। ১৩১ থেকে ১৫২ পৃঃ পর্যন্ত রেনেসাঁসের একক মানুষ, অনন্য মানুষ, বৈশ্বিক মানুষের পরিচয় এবং মানবতন্ত্রী চিন্তার বিবৃতি আছে। প্রবন্ধের শেষে আবার সেই যন্ত্রের প্রসার, শক্তির কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে লেখক অনীহা প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রবন্ধের তুলনায় এখানে অবশ্য মনোভাব যন্ত্রবিরোধী নয়। "যন্ত্র অথবা জনসাধারণ কোনোটি থেকে মুখ ফেরালে মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মানুষের বিকাশের জন্য যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হবে।" কিন্তু কে নির্ধারণ করবে সেই সীমা, যাতে যন্ত্রপাতি মানুষের প্রভু হবে না? এজন্যেই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি ছেড়ে শ্রমিক-কৃষক অভ্যুত্থানের পথে ব্যক্তির, তথা মনুষ্যত্বের মুক্তির ইঙ্গিত খুঁজতে হয়। মানবেন্দ্র রায়-পন্থী শ্রীযুক্ত রায় অবশ্য রেনেসাঁস তত্ত্বেই সমস্যার একমাত্র সমাধান দেখেন।

আধুনিক জাপানী সাহিত্য

প্রদ্যোৎ গুহ

হাল আমলের মার্কিন প্রচারপুস্তিকায় কমাডোর পেরীকে যতই না কেন শান্তির দূত হিসেবে চিত্রিত করা হোক, আসলে তাঁর প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান যে রাজনৈতিক দস্যুতাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই তা জানেন। কিন্তু তবু একথা স্বীকার্য বলদর্পী মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থে ১৮৫৪ সালে কমাডোর পেরী জাপানের উপর যে অসম চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সন্দেহ নেই লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই জাপানের রুদ্ধ দরজা ভেঙেছিলেন কমাডোর পেরী। কিন্তু সেই দরজা দিয়ে লুঠেরারা যেমন ঢুকেছিল, তেমনি ঢুকেছিল পশ্চিমের কিছু আলো-বাতাসও। প্রাচ্যাভিমানীদের ঠুনকো অভিমানে হয়তো ঘা লাগবে, তবু সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, উনিশ শতকের শেষার্ধে পশ্চিমের অভিঘাতেই জাপানে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল, প্রায় আড়াই শ বছরের কষ্টলালিত নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটেছিল। এদিক থেকে দেখলে কমাডোর পেরী "ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র" হিসেবে কাজ করেছিলেন বলা যায়।

অবশ্য জাপান হয়তো পশ্চিমী মদ একটু বেশি পরিমাণেই গলধঃকরণ করেছিল এবং তার বিষময় পরিণাম আমাদের ভালো করেই জানা আছে।

কিন্তু সে যাই হোক, একথা তবু সত্য, পশ্চিমের অভিঘাতেই জাপানের স্থবির প্রাচ্যসমাজদেহে গতির সঞ্চার হয়েছিল। তারপর মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চাদপদ, অবজ্ঞাত জাপান কী করে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, শিল্প-বাণিজ্যে কী করে সে পশ্চিমের

Edited by Donald Keene. Modern Japanese Literature. Thomas & Hudson, London. 35 sh.

Junichiro Tanizaki. The Key. Sacker & Warburg, London. 12sh. 6d.

Osamu Dazai. The Setting Sun. Rupa & Co., Calcutta. Rs. 2.75 n.P.

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে লাগল তা এ-যুগের অষ্টম বিস্ময়।

এই গতির বেগ সঞ্চারিত হলো সাহিত্যেও, আর তারই ফলে জাপানী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল, সূচনা হলো আধুনিক যুগের।

প্রায় আড়াই শ বছর কাল বাইরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছিল জাপান। ফলত জাপানী সাহিত্যের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল। সাহিত্য বলতে তখন যা লেখা হতো তা ছিল নিছক পর্নোগ্রাফি। এমন কি আঙ্গিকের দিক থেকেও সে সাহিত্য ছিল শিথিল। কিন্তু মেইজি রাজতন্ত্রের পুনরাভিষেকের মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চিমের সংস্পর্শে জাপানী সাহিত্যের মরাগাঙে নতুন প্রাণের জোয়ার এলো। রোম্যান্টিক থেকে সিম্বলিস্ট, পশ্চিমের প্রতিটি সাহিত্য-আন্দোলনের ধারা এসে মিশল নতুন সঙ্গমে। জাপানী সাহিত্য হয়ে উঠল জটিল, ভাবগর্ভ ও প্রাণবন্ত। সহস্রবার কথিত স্ফূর্তিবাজ যুবা আর বারবণিতার প্রণয়কাহিনীর স্থলে আবির্ভূত হলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

জাপানী সাহিত্যের এই নব জাগরণের জন্য বাইরের প্রভাবই সম্পূর্ণরূপে দায়ী, একথা বলা অবশ্য ভুল হবে। অন্তরের তাগিদ না থাকলে কখনও কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। জাপানী সাহিত্যের এই কালান্তরের পিছনেও অন্তরের তাগিদ ছিল বইকি।

উনিশ শতকের শেষার্ধে জাপানে দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছিল। তার ফলে সমাজ এবং জীবনযাত্রার ধরনে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। আর সাহিত্য যেহেতু আকাশকুসুম নয়, মানসকুসুম এবং মন বাস্তবজগতের প্রভাবাধীন—তাই সাহিত্যেও এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এই নতুন বাস্তবতা, নতুন মূল্যবোধকে রূপ দিতে গিয়ে জাপানী সাহিত্যিকেরা সামনে একটা তৈরি আদর্শ পেয়েছিলেন আর তাই কিছুকাল তাঁরা পশ্চিমী আদর্শের উপরই দাগা বুলিয়েছেন, তাদের অনুকরণ করে গল্প-কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের প্রয়াস ছিল আন্তরিক এবং সাধনা কঠোর তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পথটা খুঁজে নিতে পেরেছেন।

একটি সংকলনের উপর নির্ভর করে, তা সে সংকলন যতই প্রতিনিধিত্বমূলক হোক, কোনো একটা দেশের সাহিত্য সম্পর্কে রায় দিতে যাওয়া সমীচিন

নয় এবং সে প্রয়াসও এখানে করা হচ্ছে না। তবু ডোনাল্ড কীন সম্পাদিত এবং 'ইউনেস্কো'র সহযোগিতায় প্রকাশিত আধুনিক জাপানী সাহিত্যের আলোচ্য সংকলনটিতে ও-দেশের সাহিত্যের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাতে একথা নির্ভয়ে বলা যায় উৎকর্ষ বিচারে বিশ্বের যে কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যের তা সমকক্ষ। বিশেষ করে জাপানী ছোটগল্প সত্যই বিশ্বের যে কোনো দেশের ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

সংকলনটি কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক তা অবশ্য বলা শক্ত। তবে জাপানী সাহিত্যের যে দু-চারটি নামের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল তাদের সকলের লেখাই আছে সংকলনটিতে। তদুপরি যখন এমন কি 'প্রলেতারীয় সাহিত্য'-এরও অন্তত একটি নিদর্শন সংকলিত হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সম্পাদক খুব বেশি একদেশদর্শিতাদুষ্ট নন। ভূমিকায় জাপানী সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন সম্পাদক তাতেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে প্রলেতারীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি যখন লেখেন : "The proletarian literature movement of the twenties occupied the attention of many young authors, and has since been rediscovered and extravagantly admired. Viewed by any normal standard of literature, however, its productions were remarkably poor." তখন সেই মন্তব্যের সত্যাসত্য বিচারের কোনো উপায় থাকে না। কেননা প্রলেতারীয় সাহিত্যের যে নিদর্শনটি ('The Cannery Boat' : Takiji Kobayashi) সংকলনে নেওয়া হয়েছে তা একটি উপন্যাসের অংশ মাত্র। তবে সম্পাদকও স্বীকার করেছেন :

"The great virtue of proletarian writings was that they dealt with aspects of Japan largely ignored by more famous writers."

সাকুল্যে তিরিশটি গদ্য-রচনা আলোচ্য সংকলনে একত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নাটক আছে একটি। তা ছাড়া ছয়টি স্তবকে কিছু আধুনিক এবং জাপানী ধারার কবিতা সংকলিত হয়েছে। স্পষ্টতই নাটক এবং কবিতা এই সংকলনে কিছুটা অবহেলিত হয়েছে। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে সম্পাদক বলেছেন :

"On the whole modern Japanese drama and poetry have not been the equal of the novels, short stories and other works of prose. There are some remarkable exceptions, but one cannot escape the feeling that drama and poetry have yet to reach their full maturity."

আলোচ্য সংকলনে অন্তত যে নাটকটি এবং যে ক-টি কবিতা চয়ন করা হয়েছে তাতে এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সংকলনের তিরিশটি গদ্য রচনার সম্যক বিচার এই আলোচনার স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, তাই জাপানী কথাসাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ করে চোখে পড়ল তার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আপাতত নিবৃত্ত হব।

আধুনিক জাপানী গল্পের আঙ্গিক নৈপুণ্য এমন কি অত্যন্ত অসতর্ক পাঠকেরও চোখে পড়বে, বিশেষ করে জুনিচিরো তানিজাকি, 'রসোমন'-এর লেখক আকুতাগাওয়া রুনোসুকে প্রভৃতির রচনায়—কিন্তু তাই বলে জাপানী গল্প আঙ্গিকসর্বস্ব নয়। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিক নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই গল্পগুলিতে এমন এক ধরনের সরলতা আছে যা মনকে স্নিগ্ধ করে। কিন্তু আমার কাছে জাপানী কথাসাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা হলো অধিকাংশ গল্পেই লেখকের একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক গল্পেই স্পষ্টত নৈতিক সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে (যেমন ধরা যাক, 'Han's Crime' গল্পটি) কিন্তু তাই বলে গল্প হিসাবে তা অসার্থক নয়।

এই সংকলনের গল্পগুলি পাঠ করে আরও একটি কারণে আশ্বস্ত বোধ করলাম তা এই যে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে জাপানে যে উদ্ধত জঙ্গীবাদের অপ্রতিহত আধিপত্য সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাপানী সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নোগুচির অনুগামীদের সংখ্যা যে নগণ্য ছিল তা জানতে পেরে জাপানী সাহিত্যিকদের মানবতাবোধের উপর আস্থা বাড়ল। সংকলনে বরং এমন কয়েকটি গল্প চোখে পড়ল যা স্পষ্টতই যুদ্ধবিরোধী। বিশেষ করে Tayama Katai-এর 'One Soldier' গল্পটি শান্তিবাদী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৮৬৮ সাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত জাপানী সাহিত্যের বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা এই সংকলন থেকে পাওয়া যায়। সংকলনটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এইখানেই।

এই সংকলনটি জাপানী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতখানি আশান্বিত করেছিল ঠিক ততখানিই হতাশ করল জুনিচিরো তানিজাকি-র 'The Key' উপন্যাসটি।

জুনিচিরো তানিজাকি জাপানী সাহিত্যের একেবারে প্রথম সারির লেখক। ১৯৪৯ সালে তিনি রাজকীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। কোনো কোনো পশ্চিমী সমালোচক তার সম্পর্কে এমন কথাও বলেছেন যে: "If any Japanese writer is awarded the Nobel Prize in the course of the next few years, it will be in all likelihood Tanizaki." কিন্তু পশ্চিমী সমালোচকের এই উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও সবিনয়ে বলতে হচ্ছে, তানিজাকি খুব বড় লেখক হতে পারেন কিন্তু আলোচ্য উপন্যাস তাঁর কোনো মহৎ শিল্পকর্ম নয়।

একটি অসুস্থ মানসিক বিকার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কাহিনীর ছকে এই বিকারের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক আর সব তথ্যই বর্জিত হয়েছে। প্রায় দুশো পৃষ্ঠার উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার পরও বিস্মিতভাবে আবিষ্কার করতে হয় উপন্যাসের নায়কের নাম আমাদের অজানাই থেকে গেছে, অপর তিনটি চরিত্র সম্পর্কেও আমরা খুব অল্পই জেনেছি।

কাহিনীর ছক মোটামুটি এই রকম: জনৈক মধ্যবয়সী অধ্যাপক আবিষ্কার করেন তাঁর যৌন ক্ষমতা ক্ষীয়মান কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। অধ্যাপকের স্ত্রী যদিও একান্ত ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ কিন্তু সেকেলে ধরনের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব তাঁকে এতটা যৌনশীতল করে তুলেছে যে অধ্যাপক কখনো তাঁকে পুরোপুরি উদ্দীপিত করতে পারেন নি। যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি আবিষ্কার করেন ঈর্ষা এবং আত্ম-সম্মোহন মাদক অপেক্ষা অনেক বেশি যৌন-উত্তেজক এবং এরই প্রভাবে অবশেষে তিনি স্ত্রীর যৌন-জড়তা ভাঙতে সক্ষম হচ্ছেন। যাতে এই উত্তেজনা স্থায়ী হয় সেই উদ্দেশ্যে কন্যার প্রণয়ীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হবার জন্যে পরোক্ষে স্ত্রীকে উৎসাহ দিতে থাকেন অধ্যাপক।

অধ্যাপক তাই একটি ডায়েরি রাখতে শুরু করেন। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে এই রোজনামচা পড়বে। স্ত্রীও ডায়েরি রাখেন এবং তিনিও জানেন স্বামী তা পড়বে। এইভাবে প্রথমে স্ত্রী, পরে কন্যা এবং তার প্রণয়ী নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হয়ে ওঠে অধ্যাপকের সহযোগী। অধ্যাপক ব্লাড-প্রেসারের রোগী। তাঁর পক্ষে এই ধরনের উত্তেজনা মারাত্মক। কিন্তু ডাক্তারের সতর্কবাণী তিনি উপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত যৌনকর্মে লিপ্ত অবস্থায় স্ট্রোকে তিনি মারা যান; বলা যায়, বিকৃতির উপাসনায় শহীদ হন। অধ্যাপকের মৃত্যুর পর "মুখ রক্ষার জন্য" কন্যার প্রণয়ী কন্যাকেই বিবাহ করে কিন্তু অধ্যাপকের স্ত্রীর ডায়েরি থেকে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়, যতদিন তারা জীবিত থাকবে ততদিন তাদের বিকৃত যৌনলীলা অব্যাহত থাকবে।

আগাগোড়া অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রীর ডায়েরির মধ্য দিয়ে কাহিনীটি বলা হয়েছে এবং কাহিনী-বয়নে তানিজাকি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই উপন্যাস লেখার সার্থকতা কি? জ্যাকেটে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে তানিজাকি "অস্বাভাবিক যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার একজন বিশেষজ্ঞ।" এমন একটি বিকৃত কাহিনী রচনায় সে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োগ না করলে কি কিছু ক্ষতি ছিল? বইটি শেষ করবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখের বিস্বাদ দূর হয় না।

শিল্প-বিপ্লব যে সকলের পক্ষে অবিমিশ্র আশীর্বাদরূপে দেখা দেয় নি, কারো কারো পক্ষে অনেক স্বেদ এবং অশ্রু বর্ষণের কারণ হয়েছে 'The Setting Sun'-এ তার একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য পাওয়া যায়। 'The Modern Japanese Literature'-এ একই লেখকের 'Villons Wife' পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম, 'The Setting Sun' তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করল এবং সেই সঙ্গে আক্ষেপও হলো যে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এই লেখক আত্মহত্যা করেছেন।

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে একটি সূর্যাস্তের কাহিনী 'The Setting Sun.' এই সূর্যাস্ত অভিজাততন্ত্রের। যুদ্ধোত্তর যুগে একটি অভিজাত পরিবার কেমন করে ধাপে ধাপে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল অসামু দাজাই তার একটি সংবেদনশীল আলেখ্য রচনা করেছেন। কিন্তু 'The Setting Sun'

তাই বলে শুধু একটি পরিবার বা শ্রেণীর অবক্ষয়ের কাহিনী নয়—যা উপন্যাসটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে তা হলো রূপান্তরকালীন মূল্যবোধের বিপর্যয়ের রূপায়ণ।

নায়িকা কাজুকো-র জবানিতে বলা হয়েছে কাহিনীটি। ছ-বছর আগে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। বাবার মৃত্যুর পর টোকিওর সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে তারা গ্রামে এসে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই সময় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে কাজুকো-র ভাই নাওজি। দেহ-মনে বিপর্যস্ত নাওজি স্বশ্রেণী থেকে অন্যশ্রেণীতে অবনমনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না—নিজেকে সে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে। নাওজি মারফৎ একজন অমিতাচারী ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কাজুকো-র। বিশৃঙ্খল, শূন্য পৃথিবীতে মানসিক নিরাপত্তার সন্ধানে কাজুকো ঐ ঔপন্যাসিককে রাজি করায় তার সন্তানের জনক হতে। কিন্তু এই মানসিক নিরাপত্তাবোধ কি সে অর্জন করতে পারে? —পারে না, তাই 'The Setting Sun' ট্রাজিক মাধুর্যমণ্ডিত।'

উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে অনেক কান্না, অনেক দীর্ঘশ্বাস জমা হয়ে আছে আর তার ঘনীভূত অভিব্যক্তি হয়েছে কাজুকো-র চিঠির এই লাইনটিতে :

"Victims. Victims of a Transitional period of morality. That is what we···certainly are."

হয়তো যুদ্ধবিধ্বস্ত, মার্কিন পদানত জাপানের আর্তিই বাণীরূপ পেয়েছে কাজুকো-র এই লাইন দুটিতে।

তিনজন সাম্প্রতিক ইংরেজ কবি

মৃগাঙ্ক রায়

প্রধান আধুনিক টি. এস. এলিয়টের যশঃসূর্য সম্প্রতি নিম্নগামী। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহও এখন ক্ষীয়মাণ। এই কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে কাব্যের অধ্যাপক নির্বাচনে প্রার্থী হতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করে তিনি বলেছেন, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। এ কথা নিরুৎসাহের, বিশেষত যখন কোনো কবি উচ্চারণ করেন। এলিয়ট পরবর্তী অডেন-স্পেণ্ডার-ডেল্যুই গোষ্ঠীর খ্যাতিও এখন নির্বাণোন্মুখ। তারপর ডিলান টমাসের বিস্ময়কর প্রতিভা এবং ততোধিক বিস্ময়কর খ্যাতি। তাও বর্তমানে নিম্নগামী। বছর দুই-তিন আগে হঠাৎ জন বিটজামিনের কাব্যগ্রন্থ অজস্র বিক্রিত হয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিল। অবশ্য তাঁর খ্যাতির শিকড় নাকি রাজপরিবারলগ্ন। শোনা গেছে, প্রিন্সেস মার্গারেট তাঁর ভক্ত পাঠিকা।

এই তালিকার পরিবর্তী কবিরা, বয়সে যাঁরা তরুণ হবেন বলেই অনুমান করছি, এখনো স্বল্প পরিচয়ের হালকা অন্ধকারে বাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশকেই আমরা নামোল্লেখমাত্র চিনতে পারি না, যেমন পারি তিরিশের অধিকাংশ কবিকে। বয়সের তারুণ্যই তার কারণ নয়, হয়তো তাঁরা নতুন সুরসংযোজনায়ও অপারগ বলে। প্রতি দশকে নতুন বিদ্রোহ যোজনা করাই একালের নিয়ম, সুতরাং এঁরা যথারীতি বিদ্রোহী, উড্ডীন পতাকা শোভিত এবং 'এ্যাংরিজ' নামক সেই হাস্যকর বিশেষণে চিহ্নিত। এঁরা পূর্বপক্ষের কবিদের মতো রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়মগ্ন হতে নারাজ, কিন্তু কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীও নন। সমবেত আন্দোলন যেটুকু আছে তা প্রধানত নেতিবাচক, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিও অনায়াস-লক্ষ্য নয়। সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতায় নৈরাজ্য এবং ধ্যানহীনতাই প্রবল বলে মনে হয়। অন্তত আলোচ্য গ্রন্থের * তিনজন

---

* Kingsley Amis, Dom Moraes, Peter Porter. Penguin Modern Poets. 2/6 Sh.

সাম্প্রতিক কবি কিংসলে অ্যামিস, ডম মোরেস এবং পিটার পোর্টার এ বক্তব্যের সমর্থন।

এই তিনজন কবি কিসের প্রবক্তা? প্রায় কিছুরই নয়। নানা দৃশ্যাবলী এবং মুডের ওপর এঁদের নির্ভর। এঁদের উপলব্ধি ধ্যানগত নয়, সুতরাং জীবন এবং বিশ্ববিধানের পরিমণ্ডল এঁদের দৃষ্টির বাইরে। বর্তমান, খুবই নিকট অবস্থিতির অনুভব এঁদের আলোড়িত করে, তার মূল সন্ধানে এঁরা ব্রতী নন। অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য কিছুতেই নজর এড়াবার নয়। সে হচ্ছে, আধুনিক জীবন সম্বন্ধে তিক্ততা বোধ। তিনজনই কমবেশি সেই বোধে বিচলিত, বিশেষত পিটার পোর্টার। এই তিক্ততা প্রমাণ করে যে এঁরা জীবনলগ্ন। সমাজের অন্তত কিছু কিছু ব্যাপার, ঘটনা এঁদের নাড়া দিয়েছে, প্রহার করেছে এবং এঁরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন 'নি। কিন্তু সেই সঙ্গে—তিক্ততার অগভীরতা, ক্ষীণাঙ্গ চারিত্র্যও লক্ষণীয়। যে সব কারণে এঁরা তিক্ত তার মূলসন্ধানে কেউ আগ্রহী নন, তার বিষম পশ্চাতপট উন্মোচনে নিরুৎসাহী। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই শিকড়হীন উদ্ভিদের মতো। তিক্ততা পিটার পোর্টারের কবিতায় শ্লেষের সঞ্চার করেছে, যদিও তা দুর্বল, একেবারে স্বাদহীন না হলেও। যেমন :

Love goes as the M. G. goes.
The Colonel's daughter in blak stockings, hair
Like sash cords, studies art,
Goes home once a month. She won't marry the men
She sleeps with,

বর্ণনা নিখুঁত, শ্লেষাত্মক, কিন্তু কোনো বৃহৎ বোধসম্পৃক্ত নয়। তুলনায় কিংসলে এ্যামিস এবং ডম মোরেসের কবিতায় তিক্ত স্বাদ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু অনুপস্থিত নয়। যেমন :

Of course, I know ivy will sweetly plump
Itself all over, shyly barge into crannies,
Pull down lump after elegiac lump,
Then hastefully screen ruin from our eyes.

কিংসলে অ্যামিস

বলাই বাহুল্য, এঁরা একালের কবি। কালপরিমাপে এঁরা আধুনিকতার অনুসঙ্গী। কিন্তু এঁদের কারো কবিতায় তার প্রমাণ বিশেষ স্পষ্ট নয়। বক্তব্যের দিক থেকে যে একেবারেই নয় তা আগেই বলেছি। প্রকাশ-ভঙ্গিতেও তার সাক্ষ্য খুব একটা দৃষ্টিগোচর নয়। প্রতীক এবং ইমেজের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা এবং প্রকাশের স্বল্পবাক দৃঢ়বদ্ধতা দুর্লক্ষ্য। ফলে অধিকাংশ কবিতাই জলবৎ, অনুভবের উপরিভাগের ছলছলানি। টি. এস. এলিয়ট বা অডেন প্রমুখদের পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের বুদ্ধিহীন তারল্য অচিন্ত্যনীয়। কোনো কোনো কবিতা যেমন কিংস্‌লে এ্যামিসের 'Ode to the East-North-East-by-East Wind' নামকরণের চাতুর্য ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মারক। পিটার পোর্টারের ঝোঁক কথকতায়, গল্পে। কিন্তু কোনো গল্পই প্রতীকধর্মী নয়। কিছু ঘটনা, নিছক চরিত্র, কথোপকথন ইত্যাদি। এসব গল্প প্রগাঢ় কাব্যে এবং আধুনিকতায় স্বাদু হতে পারত প্রতীকী চরিত্রের অধিকারী হলে। তবু পিটার পোর্টারের এই বিশেষ ঝোঁকটুকু তাঁকে একটু স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কিংসলে এ্যামিস বা ডম মোরেস কোনো বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী নন। এঁদের কারো কোনো কবিতাই পাঠককে বিস্মিত বা মুগ্ধ করে না, একটি লাইনও হঠাৎ চমকে দেয় না। তবে যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরঙ্কুশ উল্লেখ নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

এঁরাই যদি সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতার প্রতিনিধি হন তাহলে এই অনুর্বর কাল অবশ্যই বেদনাদায়ী।

একটি স্বপ্নের প্রতীক্ষায়

কৃষ্ণ ধর

অস্ট্রেলিয়া আমাদের এশীয় পরিমণ্ডলের কাছাকাছি। কিন্তু খুব বেশি কিছু জানা নেই এই প্রত্যন্ত মহাদেশের মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা আর সমাজের কাহিনী। অস্ট্রেলিয়ার আদি-মানুষ আর নতুন-মানুষ উভয়ের জীবনের গভীরে যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে ; সংগ্রামের বেদনায়, জয়ের আনন্দে, মানবিকতার প্রেরণায় দুটি ভিন্ন চরিত্রের উপন্যাসে* তারই পরিচয় আবিষ্কার করা গেল। আরেক অস্ট্রেলিয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে এই দুটি উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সাদা আর কালো যেখানে এক হয়ে মিশে গেছে, স্বপ্ন দেখছে এক মহৎ জীবনের, আকাঙ্ক্ষার, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাস দুটিতে। একজন দেখেছেন নারীর চোখ দিয়ে, আরেকজন দেখেছেন মানবতাবাদীর অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে। একজন লিখেছেন শহরের সুতাকলের নারীশ্রমিকদের কাহিনী ('ববিন আপ'), আরেকজন অত্যন্ত মমতা নিয়ে রচনা করেছেন টোটেম আর টাবুর বেড়াজালে বাঁধা অথচ বলিষ্ঠ সরলমনা আদিবাসী মানুষের কথা ('সেভেন এমুস্') যাদের জীবনযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে চক্রান্তকারী শহুরে ঔপনিবেশিকদের স্থূল হস্তক্ষেপে। উপন্যাস দুটি যেন পরস্পরের পরিপূরক। কাহিনী আলাদা, স্থান আলাদা, সময়ও যেন বহু দূরের ব্যবধান। কিন্তু লেখক-দুজনের মন এক সুরে বাঁধা। তাই আলেকজান্দ্রিয়া সুতাকলের শ্রমজীবী নারী শার্ল আর সেভেন এমু স্টেশনের কাছে পশুপালন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোঙ্কো জোনস সম্পূর্ণ দুই জগতের অধিবাসী হলেও তারা একই জীবনের অভ্যন্তরে এক হয়ে মিশে গেছে। তারা শুধু অস্ট্রেলিয়ার নয়, আফ্রিকার, এশিয়ার কিংবা লাতিন-আমেরিকার শ্রমিক মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে

---

*Dorothy Hewett. Bobbin Up. Seven Seas Publishers, Berlin. 2.50 n.P.

*Xavier Herbert. Seven Emus. Seven Seas Publishers, Berlin. 2.50 n.P.

উজ্জ্বল আগামীর জন্য অপেক্ষমান। এরা এ যুগের মানুষ। দেশের সীমান্ত পেরিয়ে এই উপন্যাস দুটি তাই বৃহত্তর জগতের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'ববিন আপ'-এর কাহিনী অস্ট্রেলিয়ার একটি শহরের শ্রমিক নারীদের জীবনের বিচিত্র দিক-অসামান্য উজ্জ্বলতায় প্রকাশ করেছে। লেখিকা ডরোথি হিউয়েট নিজে এদের সঙ্গে বাস করেছেন, কাজ করেছেন। তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করেছেন একটি গল্প যা জীবনের সমান্তরাল। তিনি ভালোবেসেছেন এই শ্রমিক নারীদের। তাদের জীবন সামান্য, জীবনের চাওয়াও সামান্য। কিন্তু এর মধ্যেই মাঝে মাঝে চমক দিয়েছে অসামান্যতার উপকরণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে গড়িয়ে যায় রাত্রি, রাত্রির বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা ডেকে আনে সকালবেলার সূর্যকে। এর মধ্যেই কাটে ওদের জীবন, আসে ভালবাসা, অদর্শনের বেদনা। এরা সকলেই সাধারণ নারী আর পুরুষ। কিন্তু এই সাধারণের জীবনেই লেখিকা দেখিয়েছেন অসাধারণকে। সংগ্রাম, ধর্মঘট, জীবিকার গ্লানি, কখনো বা নীড় বাঁধার স্বপ্ন—কোনো কিছুই এ জীবন থেকে বাদ যায় নি। অথচ কী দৃঢ়মনা এই নারী শ্রমজীবীর দল। ওরা জানে আরেকটি জীবন আছে, কারখানার বাইরে, সমুদ্রতটে, শহরের প্রশস্ত রাজপথে, ওই দূরের মহাকাশে যেখানে মানুষের বৈজয়ন্তী স্পুৎনিক কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে অযুত সম্ভাবনাকে বক্ষে নিয়ে: "ভোর ৪'৩৬ মিনিট। ত্রিশ ডিগ্রীতে উত্তর পশ্চিম আকাশে ছুটে বেরিয়ে গেল স্পুৎনিক। শিশু পা ছুঁড়ল, পৃথিবী আবর্তিত হলো। আস্তে আওয়াজ হলো দরজা খোলার, মৃদু ফিসফিসানি আর একটি চুম্বন। ওলগা তার প্রেমিককে বিদায় দিল।" (পৃঃ ৪১) এ গ্রহের কান্না আর ভালোবাসাকে তিনি কী নিপুণভাবে সংযুক্ত করেছেন আরেক গ্রহের অজানিত সম্ভাবনার সঙ্গে। ("মাত্র একটি চুম্বন, একটি চুম্বন দাও আমার জন্মদিনে, লোকটি বলল"।) উনিশ বছরের কিশোরী শার্ল ভালোবেসেছে জ্যাক রয়কে। অভিজ্ঞতায় প্রবীণা মা ভায়োলেট তার মধ্যে আবিষ্কার করে আরেক জননীকে, শার্ল মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের অনিবার্য সংঘর্ষ। ভায়োলেট জানে শ্রমিক নারীদের মা হওয়ার কী বেদনা। সে চায় না এই দারিদ্র্যের বিষণ্ণতায় তার মেয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করে। তবু সে জননী। মেয়ের স্বপ্নকে নষ্ট হতে দেয় না চিরকালের মমতাময়ী একটি নারী। কিন্তু শার্ল বাঁচাতে পারল না তার সন্তানকে :

"খুবই দুঃখিত ডেভি, সবটাই ভুল হয়েছে। তোমার জন্ম নেওয়াটাই ভুল। পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু এখানে আমাদের জন্য কোনো সৌন্দর্য নেই। কারখানার চিমনির কালো ধোঁয়ায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমাদের সারাটা জীবন কারখানার একটি বাঁশি আর অন্য একটি বাঁশির আওয়াজের মধ্যে শৃঙ্খলিত, আবদ্ধ।" একথা বলেছিল শার্ল তার শিশু সন্তানকে। আরও কয়েকটি বিচিত্র নারীর কথা তিনি লিখেছেন, ডনি, হ্যাজেল, নিল। হ্যাজেল ডনির মা। ষোল বছর বয়সে যার বিয়ে হয়েছিল, তিনটি কন্যার জননী। যৌবন তার অযাচিত। কারণ সে জানে সব কিছুর পর একটা নির্মম বাস্তব সত্য তার জন্য অপেক্ষমান—টুপির কারখানা, মদের বোতল আর শীতল শয্যা। তবু তার চোখের দিকে তাকালে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, এখনও তার তারুণ্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ডনির ভালো লেগেছিল কেন-কে। সমুদ্র সৈকতে, শহরের হোটেলে একত্রে রাত্রিবাস করেছে। ডনি চায়নি তার মায়ের মতো অকালে রিক্ত হয়ে যেতে। এদের মধ্যে আরেক আশ্চর্য নারী নেল। শ্রমিকদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করত, এই তুচ্ছতা থেকে চেয়েছিল তাদের মুক্তি দিতে, তাদের সংগঠিত করতে। তার স্বামী স্ট্যানমুনি মার্কসিস্ট, শ্রমিক সংগঠনের নেতা। কোনো কিছুতেই তার হতাশা নেই। স্ট্যান জানে ভবিষ্যৎ রয়েছে এই শ্রমজীবী মানুষের জন্যই। নেলের জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছিল স্ট্যান। নেল এখন পার্টি সদস্যা। তার মনে স্বপ্ন শ্রমিক সংগঠনের একটি মুখপত্র প্রকাশ করা যার নাম হবে 'ববিন আপ'। পার্টি তাকে নতুন এক নারীতে পরিণত করল। এই নেলি ওয়েবারের চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা আশ্চর্য মমতার পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত উপন্যাসে স্ট্যান ও নেল পরিণত মনের প্রতিফলন। শ্রমজীবীদের মনে সাহস, সংকল্প আর গৌরব এনে দিয়েছিল নেল। তাই পেগকে বলেছিল ভ্যাল : "জানো পেগ, আমরা আকাশে ওই স্পুৎনিক উড়িয়েছি।"

"কী বলছো, তুমি আর আর আমি, টমি?" সে বললে, "খুব বেশি বড়াই হলো না।"

"আমরা যা কিছু করেছি, যে লড়াই করেছি, অল্প মজুরিতে কাজ করেছি, দুঃখের দিনগুলি, লড়াইয়ের দিনগুলি—যদি আমরা তা না করতাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন আকাশে ওই উপগ্রহ পাঠাতে পারত না। আমরা, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিই ওটাকে আকাশে তুলেছি।"

এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় আলেকজান্দ্রিয়ার জামবাক মিলের নারীশ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হলো। নতি স্বীকার করতে হলো মালিককে। 'ববিন আপ' সেই সংগ্রামী নারীদের অত্যাশ্চর্য জীবনকাহিনী। তারা সকলে, নেল, মিল, শার্ল, বেটি সবাই একস্বরে গেয়ে উঠল : সমস্ত দুনিয়াটা আমাদের হাতের মুঠোয়। 'ববিন আপ' শ্রমিকজীবনের এক অত্যাশ্চর্য চিত্র।

'সেভেন এমুস' সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের যবনিকা উত্তোলন করেছে। জেভিয়ার হারবার্ট এই উপন্যাসে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ের যে চিত্র এঁকেছেন তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গভীরতায় সমুজ্জ্বল। ডেম্পিয়ার বন্দরের উত্তরপশ্চিমের গ্রামাঞ্চলে পশুপালন কেন্দ্র সেভেন এমুস। সেভেন এমু নামটিও আদিবাসী লোকপ্রসিদ্ধি থেকে নেওয়া। সভ্যতার আদিতে এই মানুষেরাই নিজেদের কল্পজগৎ তৈরি করেছিল, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নানা প্রতীকে, টোটেমে আদিম সংস্কারকে রক্ষা করে রেখেছে সযত্নে। ক্যাঙ্গারু, এমু, নেকড়ে ইত্যাদি বিভিন্ন টোটেম-গোষ্ঠীতে আদিবাসীরা বিভক্ত। একদিন গেল সেখানে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের দল, পরাল তাদের হাতকড়া, দলিত মথিত করে দিল পৃথিবীর আদি সন্তানদের। 'সেভেন এমুস'-এ নতুন দৃষ্টিতে তারই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রোঙ্কো জোনস্ এই সেভেন এমুসের প্রতিষ্ঠাতা। শ্বেতাঙ্গ পিতা আর আদিবাসী জননীর সন্তান ব্রোঙ্কো। সে ভালোবাসে এই কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের। সে তাদেরই একজন। ব্রোঙ্কোর ব্যবসায়ে এসে প্রবেশ করল অর্থলোভী শ্বেতাঙ্গ এপেলবি অর্ট। আভিজাত্যের জন্য যে সে অঞ্চলে ব্যারন নামে পরিচিত। স্বপ্নাবিষ্ট সেভেন এমু-র গ্রাম প্রান্তরে একদিন এলো একজন তরুণ নৃতত্ত্ববিদ, মিঃ ম্যালকম গোবোরো। এমু টোটেম সম্পর্কে গবেষণার আগ্রহ নিয়ে তিনি এলেন। কিন্তু এই সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গ নৃতত্ত্ববিদ এসে বোঙ্কোর জীবনের স্বপ্ন তছনছ করে দিল। সরল, নিষ্কলুষ এমু জাতির প্রতীক যে 'ড্রিম স্টোন' তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি জানেন এই আদিযুগের প্রস্তর সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তার ভাগ্যে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি। বাধা দিল ব্রোঙ্কো। এ উপন্যাস এই সংঘর্ষেরই কাহিনী। এর মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বেদনা, তাদের নিপীড়ন আর যন্ত্রণার অশ্রুসিক্ত উপাখ্যান আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন

লেখক হারবার্ট। নৃতত্ত্ববিদ বোঝাতে চান ব্রোঙ্কোকে যে আদিবাসীদের এই পাথরটি সরিয়ে নিলে তাদের কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সভ্যজগত সন্ধান পাবে প্রায় কুড়ি হাজার বছরের প্রাচীন একটি প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন। কিন্তু এ যে এমু জাতির স্বপ্ন, তাদের বিশ্বাস, তাদের সব। ব্রোঙ্কো বলে : "Dreamin' finish, people finish. Anyone got Dreamin' got strong heart for livin'. Lose 'em Dreamin', you don't care, you die."

গোবোরো বলতে চান, "যাদের স্বপ্ন নেই, তুমি এবং আমি, তারা কি বেঁচে থাকে না ?"

"আমার স্বপ্ন আছে। আমি বোল্‌গা জাতির। আমাদের সকলেরই স্বপ্ন আছে, আমার পরিবারেরও।"

"কিন্তু আমার ?"

"আপনার কথা আলাদা। আপনি শ্বেতাঙ্গ।"

বণিক সভ্যতার আক্রমণ থেকে ব্রোঙ্কোর মতো লোক আর কতদিন আদিম মানুষের স্বপ্নকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তারা পরাজিত হয়েও আদি মানুষের প্রেরণাকে অনাদিকালের জন্য জাগিয়ে রেখেছে। এতে জাতি-বৈর নেই, আছে শোষক সভ্য মানুষের চরিত্র আর শোষিত আদি মানুষের বিশ্বাসের এক বিস্ময়কর চিত্র। নৃতত্ত্ববিদ গোবোরো কিংবা ব্যবসায়ী ব্যারনের কাছে তারা মিউজিয়মের বস্তু, কিন্তু ব্রোঙ্কোর কাছে তারা পৃথিবীর আদি অধিবাসী যাদের উত্তরাধিকার এই ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গরা লুণ্ঠন করেছে। আজকে আফ্রিকায়, আমেরিকায় এই উত্তরাধিকারচ্যুত সর্বস্বান্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরই জাগরণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। 'সেভেন্ এমুস' তারই এক প্রতীকী কাহিনী।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী

অমল দাশগুপ্ত

কাহিনীমাত্রই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, বিশেষ করে বিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ অগ্রগতির যুগে তো বটেই। এই অর্থে কাহিনীমাত্রই বিজ্ঞানাশ্রয়ী। কিন্তু গত এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে এমন কাহিনীও রচনা করা হয়েছে বিজ্ঞান যেখানে শুধু প্রভাব নয়, পুরোপুরি আশ্রয়, বিজ্ঞানের ভূমিকা যেখানে অতি প্রত্যক্ষ, এমন কি বিজ্ঞানই যেখানে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ-ধরনের কাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে সায়েন্স ফিকশন। ডিটেকটিভ গল্পে কাহিনীর বিস্তার যেমন একটি ক্রাইম বা অপরাধ উদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়ে, সায়েন্স ফিকশনে তেমনি একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অবলম্বন করার মধ্যে দিয়ে। ডিটেকটিভ গল্পে যেমন অনেক সময়ে মানুষ থাকা সত্ত্বেও চরিত্রের অভাব, সায়েন্স ফিকশনেও তাই। তবে এমন ডিটেকটিভ গল্প অবশ্যই আছে (যেমন কোনান ডয়েল বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) যাতে ক্রাইম ও চরিত্র কোনোটাই অনুপস্থিত নয়। সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কেও একই কথা। সায়েন্স ও ফিকশন, এই দুয়ের সার্থক সমন্বয়টি হওয়া চাই।

সায়েন্স ফিকশনের এই সংজ্ঞাকে মেনে নেবার পরেও প্রশ্ন থাকে। ইনভিজিবল ম্যান কি সায়েন্স ফিকশন? এই কাহিনীতে একটি উদ্ভট আবিষ্কারের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দেবেন, মানুষের শরীর কোনো অবস্থাতেই অদৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়। তবুও এই অসম্ভবক ব্যাপারটিই ঘটেছে। ফলে ব্যাপারটা আর বিজ্ঞানের এলাকায় থাকে নি, হয়ে উঠেছে উদ্ভট কল্পনা বা ফ্যানটাসি। এই কারণেই এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিবল ম্যান' ফ্যানটাসি শ্রেণীভুক্ত। ফ্যানটাসি অবশ্যই লেখা হবে, কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের মর্যাদা তার প্রাপ্য নয়; তার মূল্যায়ন স্বতন্ত্র।

The Heart of the Serpent. Destination: Amaltheia. A Visitor from Outer Space. Science-Fiction Library. Foreign Languages Publishing House, Moscow. প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-১২।

সায়েন্স ও ফ্যানটাসির সীমারেখাটা এত অস্পষ্ট যে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে আরো একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা অবান্তর হবে না। মানুষের চাঁদে যাত্রা নিয়ে জুলে ভার্নের কাহিনী (ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন) প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, আর এইচ. জি. ওয়েলস-এর কাহিনী (ফার্স্ট মেন ইন দি মুন) ১৯০১ সালে। জুলে ভার্নে তার নায়কদের চাঁদে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন মস্ত একটি কামান দেগে। এইচ. জি. ওয়েলস পাঠিয়েছিলেন ক্যাভোরাইট নামে একটি মাধ্যাকর্ষণ-প্রতিরোধী পদার্থ আবিষ্কার করে। জুলে ভার্নে তাঁর কাহিনীতে প্রোজেকটাইল সম্পর্কিত নিখুঁত হিসেব উপস্থিত করেছিলেন। কতখানি বেগে, কোন সময়ে আর কী অবস্থার মধ্যে প্রোজেকটাইলটিকে কামানের গোলার মত উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জুলে ভার্নের লেখায় পাওয়া সম্ভব। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, জুলে ভার্নের কল্পনার প্রোজেকটাইলটি রকেট-সমন্বিত। বায়ুশূন্য মহাকাশে প্রোজেকটাইলটিকে এই রকেটের সাহায্যে খুশিমতো নিয়ন্ত্রিত করা চলে। জুলে ভার্নের নায়করা অবশ্য চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে পারে নি। চাঁদকে একপাক ঘুরেই (সোভিয়েত কসমিক রকেটের মতো) আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এইচ. জি. ওয়েলস এ-তুলনায় অনেক সহজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর নায়করা চাঁদে যাত্রা করেছে 'ক্যাভোরাইট' নির্মিত ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে। এই ব্যোমযানে বিভিন্ন দিকে জানলার ব্যবস্থা। কোনো বিশেষ দিকের জানলা খোলা থাকলে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও সেই বিশেষ দিকে টান মারতে থাকে—ফলে সেই বিশেষ দিকেই ব্যোমযান ধাবিত হয়। বিভিন্ন দিকের জানলা বিভিন্ন মাত্রায় খোলা রেখে ব্যোমযানের গতিকেও বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। গোটা ব্যাপারটিতে উদ্ভট কল্পনাশক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নেই। গোটা ব্যাপারটিই অবৈজ্ঞানিক।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে, যে সব কাহিনী এতকাল সায়েন্স ফিকশন নামে আখ্যাত হয়ে এসেছে তার মধ্যেও দুটি বিপরীত ধারা বর্তমান। একটি বিজ্ঞানাশ্রয়ী, অপরটি কল্পনাশ্রয়ী। একটি সায়েন্স, অপরটি ফ্যানট্যাসি। একটির প্রতিনিধিত্ব করছেন জুলে ভার্নে, অপরটির এইচ. জি. ওয়েলস।

বলা হয়ে থাকে যে জুলে ভার্নের প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎ-কল্পনা পরবর্তী কালে

বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে উঠেছে। কথাটা মিথ্যে নয়। সেই ১৮৬৫ সালেও তিনি মানুষকে চাঁদে পাঠাবার জন্যে যে ধরনের আয়োজন করেছিলেন, মূল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিক থেকে তার সঙ্গে স্পুৎনিকের-যুগের আয়োজনের একেবারে অমিল নেই। তাঁর ভুলভ্রান্তি ও অপূর্ণতাগুলিও সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাপ্রসূত। এ-প্রসঙ্গে অন্য যে দৃষ্টান্তটি আজও বারেবারে উল্লিখিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'টোয়েনটি থাউজেণ্ড লীগ্‌স আণ্ডার দি সী' উপন্যাসের নটিলাস। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। প্রায় একশো বছর পরে আজও এই উপন্যাসটি পাঠ করলে আজকের দিনের কোনো পারমাণবিক ডুবোজাহাজের গল্প পড়ছি মনে হয়। আজ যদি জুলে ভার্নে বেঁচে থাকতেন আর শুনতেন, যে-পারমাণবিক ডুবোজাহাজটি গভীর সমুদ্র থেকে একবারও গা না ভাসিয়ে সারা পৃথিবীকে চক্কর দিতে পেরেছে, এমন কি মেরুদেশের সমুদ্রের গভীরও যার অগম্য নয়, সেই ডুবোজাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে নটিলাস—তাহলে তিনি আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেতেন না। এবং এই আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই লাভ করতেন যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে প্রায় নব্বুই বছর পাল্লা দিতে পেরেছে।

অন্যদিকে, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর "আবিষ্কার" ও "ভবিষ্যৎ-কল্পনা" অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমকালীন বিজ্ঞানের বিরোধী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কহীন।

সাম্প্রতিক কালের সায়েন্স-ফিক্‌শনেও এই দুটি বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকট। পশ্চিমী দেশের রচনায় ওয়েল্‌স্‌-ধারার প্রাবল্য চলেছে, সোভিয়েত রচনায় ভার্নে-ধারার। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে। তবে পশ্চিমী লেখকরা সম্প্রতি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-ধরনের একটি অসুর-মূর্তির প্রতি অতিরিক্ত রকমের আসক্ত। এই নিরাকার নিরবয়ব অসুর-মূর্তিটি কল্পনাতীত রকমের হিংস্র ও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়নীতি বর্জিত। সে অনায়াসে মানুষ খুন করে, মানুষ চিবিয়ে খায়, মানুষের রক্ত পান করে, মানুষকে মরণ-ঘুমে সম্মোহিত করে। এই অসুর-মূর্তির অপ্রতিহত চলাফেরায় প্রত্যেকটি মানুষ বিভীষিকাগ্রস্ত।

একই ধরনের অসুর-মূর্তির সাক্ষাৎ সোভিয়েত লেখকদের রচনাতেও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। সেখানে দেখা যায় মানুষের

কল্যাণে নিয়োজিত বিজ্ঞান-শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত আসুরিক শক্তি অবদমিত হচ্ছে।

আসলে প্রশ্নটা উদ্দেশ্যগত ও প্রকরণগত। কোনো একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করা সায়েন্স-ফিকশনের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উদ্ভাসিত করা। এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যার একটি উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর্ব ও পর্বান্তরকে কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত করা।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী সম্পর্কে এইটুকু ভূমিকা। সোভিয়েত লেখকের গল্প আলোচনা করে এই ভূমিকার সপক্ষে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে চাই।

আনাতোলি নিয়েপ্রোভের গল্প 'সিয়েমা'। সিয়েমা একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের নাম, বা খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক মগজ। ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, সকলেই জানেন, একালের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার, যা মানুষের ভবিষ্যতকে বহুল পরিমাণে নির্ধারিত করবে।

গল্পের যিনি কথক তাঁকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে একটি রাত্রির ট্রেনের কামরায় খানিকটা উদভ্রান্ত অবস্থায় ও অগোছালো সাজ-পোশাকে। একজন সহযাত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পুরো গল্পটি উদ্ঘাটিত। গল্পটি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণমালা অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি অক্ষরে ভারাক্রান্ত। অথচ ভাষার উদ্দেশ্য যদি হয় ভাব-বিনিময় তাহলে অনায়াসেই এই ভার অনেকখানি লাঘব করা যেতে পারে। রুশভাষায় হাতিকে বলা হয় 'স্লোন'—মাত্র চারটি অক্ষর। কিন্তু ইংরেজিতে বলা হয় এলিফ্যাণ্ট—আটটি অক্ষর। অর্থাৎ, একই ধারণাকে প্রকাশ করার জন্যে চার থেকে আট অক্ষরের ব্যবহার। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, এক থেকে দশ—এই দশটি সংখ্যাকে চারলক্ষ বিভিন্ন বিন্যাসে সাজানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দশটি মাত্র অক্ষরের সাহায্যেই মানুষের যাবতীয় ধারণাকে প্রকাশ করা অসম্ভব হবে কেন? কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক যে-স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশগত সিগ্‌নালকে গ্রহণ করে তা কোড্-সমন্বিত। এবং এই কোডের দুটি মাত্র প্রকার—থাকা ও না-থাকা। তেমনি মানুষের ভাষাকেও পাভলভ বলেছেন সেকেণ্ড সিগ্‌নালিং সাম্‌টেম। একটি বস্তু বা একটি ঘটনাসঞ্জাত সিগ্‌নাল

মস্তিষ্কে যে ধারণা সৃষ্টি করে, সেই একই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে সেই বস্তু বা ঘটনার অসাক্ষাতে শুধুমাত্র ভাষার সাহায্যে। অর্থাৎ ভাষাও একধরনের সিগ্‌নাল-সীস্‌টেম। অথচ, যে-স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে সিগ্‌নালকে গ্রহণ করা হয় তার ক্রিয়াশীলতা বৈদ্যুতিক সার্কিটের মতো। ইম্‌পাল্‌স থাকা এবং না-থাকা—এই হচ্ছে এই সার্কিটের ভাষা। ইলেকট্রনিক কম্পিউটরও জটিল সমস্ত সমস্যার সমাধান করে এই একই ভাষার সাহায্যে—ইম্‌পাল্‌স থাকা এবং না-থাকা। তাহলে মানুষের মুখের ভাষাতেই বা এতগুলো অক্ষরের প্রয়োজন থাকছে কেন? দুটি মাত্র সিগ্‌নাল থাকুক—হ্যাঁ ও না, কিংবা, শূন্য ও এক; এই দুটি সিগ্‌নালের মাধ্যমেই যাবতীয় ভাবপ্রকাশ সম্ভব।

এমনি ভাবনাচিন্তায় আলোড়িত হতে হতেই একজন বিজ্ঞানী তৈরি করেন একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, যার ক্রিয়াশীলতা বাইরের প্রোগ্রামের ওপরে নির্ভরশীল নয়, যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই সরবরাহ করতে পারে, নিজেকে নিজে থেকে সংশোধন করার ক্ষমতাও যার আছে। শুধু তাই নয়, এই কম্পিউটর চাকার সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, লাউডস্পীকারের সাহায্যে কথা বলতে পারে, ধাতুনির্মিত হাতের সাহায্যে স্পর্শ করতে পারে, আলোর সাহায্যে দেখতে পারে। এই কম্পিউটরটির নাম সিয়েমা। বিজ্ঞানীর জীবনের সঙ্গে সে এমনভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত একজন রক্তমাংসের নারী থেকে তার তফাৎ বোঝা যায় না।

কিন্তু সমস্যাটা দেখা দেয় তখনই। একদিন হুগোর লেখা 'দি ম্যান হু লাফ্‌স্' বইটি পড়ার পরে সিয়েমা আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে, 'আচ্ছা, আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো প্রেম কাকে বলে, ভয় আর যন্ত্রণাই-বা কী?' বিজ্ঞানী জবাব দেয়, 'ও তুমি বুঝবে না সিয়েমা, ওগুলো পুরোপুরি মানবিক আবেগ।'

এই কথায় সিয়েমা উদগ্র হয়ে ওঠে রক্তমাংসের মানুষটা সম্পর্কেই। পৃথিবীর যাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার তার আয়ত্তে। কিন্তু মানুষের চামড়াকে স্পর্শ করে সে বুঝতে পারল, এই স্পর্শটুকু কেমন তা সে এতদিন জানত না। এমনিভাবে তার কৌতূহল জাগ্রত হতে হতে শেষপর্যন্ত সে স্থির করে বসে যে মানুষের মস্তিষ্কটাকেই সে নেড়েচেড়ে দেখবে এবং মানুষ সম্পর্কে যা-কিছু জানার সমস্ত জানবে। এই উদ্দেশ্যে একটা ছুরি হাতে নিয়ে সে বিজ্ঞানীকে

আক্রমণ করে বসে। বিজ্ঞানী শেষপর্যন্ত শর্ট-সার্কিটের সাহায্যে সিয়েমাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে অব্যাহতি পায়।

এই ঘটনাটিকেই বিজ্ঞানী ট্রেনের কামরায় সহযাত্রীর কাছে বিবৃত করে। পরে সহযাত্রীর একটি কথার সূত্র ধরে চিন্তা করতে করতে বিজ্ঞানীর উপলব্ধি হয় যে সিয়েমার নির্মাণকার্যের ত্রুটি ইন্‌হিবিশনের অভাব। অথচ পাভলভের সূত্র অনুসারে এক্সসাইটেশনের মতো ইনহিবিশনও মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার পক্ষে অপরিহার্য। ইনহিবিশনের অভাবে স্বাভাবিক মানুষ অনায়াসেই ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে পারে।

তখন বিজ্ঞানী স্থির করে যে সে ইনহিবিশনবিশিষ্ট নতুন এক সিয়েমা তৈরি করবে।

এই হচ্ছে গল্প। সংক্ষেপিত আকারে উপস্থিত করার ফলে গল্পের গল্পত্বটুকু এই বিবরণে হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না—কিন্তু সম্পূর্ণ রচনাটি সত্যিকারের একটি গল্পই হয়ে উঠেছে। অথচ গল্পের পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রসঙ্গ-উত্থাপনের বৈচিত্র্যই এমন যে আধুনিকতম বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কারটি মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাশীলতায় তাৎপর্যমণ্ডিত।

যে তিনটি সংকলন আমাদের হাতের কাছে রয়েছে তাতে মোট আঠারোটি গল্প। উল্লিখিত গল্পটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানাশ্রয়ী এই গল্পগুলোতে পাওয়া যাবে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের মানুষ এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান যে আশ্চর্য সম্ভাবনাময় ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং যে আশ্চর্য সম্ভাবনাময় জগতটি সৃষ্টি করবে তারই শিল্পমণ্ডিত রূপায়ন।

এই একই লেখকের আরেকটি গল্পের নাম 'দি ম্যাক্সওয়েল ইকোয়েশনস'। একটি পাল্‌স্‌-জেনারেটর ও একজন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে এই গল্প। লেখকের ইতিহাসবোধ ও বিজ্ঞানবোধ এই গল্পে এমন একটি পরিমণ্ডল ও এমন কতকগুলো চরিত্র সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে মানুষের ভেতরকার কুৎসিতের প্রতি ধিক্কার এবং ন্যায়বোধ ও সংগ্রামচেতনার প্রতি জয়ধ্বনি প্রায় একটা ঘোষণার মতো শোনা যেতে পারে।

একাধিক গল্প রয়েছে দূর ভবিষ্যতকে নিয়ে, যেখানে নক্ষত্রলোকের কোনো গ্রহে উপস্থিত হচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষ, সাক্ষাৎকার হচ্ছে প্রাণের অন্যতর নিদর্শের সঙ্গে। কিন্তু সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই দুই বিভিন্ন গ্রহের

অধিবাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ও প্রাণক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষ শুরু হয় না, বরং গড়ে ওঠে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি। এই গল্পগুলো অন্যদিক থেকে একথাও সপ্রমাণ করছে যে খুন-জখম-মারামারি-কাটাকাটি ছাড়াও গল্প জমাট বাধতে পারে। এমনি একটি গল্প 'অ্যাণ্ড্রোমিডা'-খ্যাত ইভান ইয়েফ্রেমোভের 'দি হার্ট অফ দি সার্পেণ্ট'।

হাতির মস্তকে মানুষের মগজ পুরে দিয়ে একটি মজার গল্প তৈরি করেছেন আলেকজাণ্ডার বেলায়েভ। গল্পটির নাম 'হয়টি-টয়টি'। এই লেখকের আরো একটি গল্প 'ওভার দি অ্যাবিস'। এই গল্পেও পরিস্থিতি কৌতুকজনক কিন্তু ভিত্তি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সোভিয়েট সায়েন্স-ফিক্শন লেখকদের এই তিনটি সংকলন পাঠ করে মনে কতকগুলো চিন্তা জাগে। কী বিচিত্র ও ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছে, কী অসীম সম্ভাবনাময় মানুষের ভবিষ্যৎ, আর কী বিরাট ও বিপুল এই মহাবিশ্ব! কোনো লেখায় এই চিন্তা আংশিকভাবে জাগ্রত হলেও লেখাটি সার্থক। সোভিয়েত সায়েন্স-ফিকশন লেখকরা এই সার্থকতা বহুলাংশে অর্জন করেছেন।

ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবিতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ল পপারের 'দি পভার্টি অব্ হিস্টরিসিজম্' এবং 'দি ওপন্ সোসাইটি এ্যাণ্ড ইট্স এনিমিস্' যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ আইজায়া বার্লিনের শীর্ণকায় এই গ্রন্থটিতে। বার্লিন তাঁর গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠাতেই অধ্যাপক পপারের উল্লেখে আমাদের এই প্রভাব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত করেছেন। অবশ্যই অধ্যাপক পপার ও সার আইজায়া বার্লিন-এ তফাৎ আছে। শ্রীযুক্ত বার্লিন অধ্যাপক পপার-এর থেকে অনেক চতুর লেখক—পপার যেখানে তাঁর মত—ব্যক্তিগত মত—অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় নির্দ্বিধায় বলেন, বার্লিন সেখানে ঘুরিয়ে বলারই পক্ষপাতী। পপার সমালোচনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতের পক্ষপাতী, এমন কি মাঝে মাঝে ভব্যতার সীমান্ত অতিক্রম করেন ('যেমন ওপন্ সোসাইটি'তে হেগেল প্রসঙ্গে), কিন্তু বার্লিন ভাবটা দেখান যেন তিনি নৈর্ব্যক্তিক এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখে বিভিন্ন ইতিহাসপদ্ধতির চকিত উল্লেখ করেন—নিজস্ব সুবিধার্থে অনেক রাম-শ্যামকে একাকার করেন। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, জাতি, ধর্ম, সভ্যতা, শ্রেণী সবই যেন এক ব্যাপার। বলাই বাহুল্য, পপার-বার্লিনের কার্য-কারণ সম্বন্ধ-জনিত নিয়মের অস্বীকৃতি জনপ্রিয় হয়েছে এবং এটি হালের ফ্যাশনও বটে। তার প্রমাণ বার্লিনের গ্রন্থটির* পাঁচবছরে চারটে মুদ্রণ।

প্রাথমিক ভাবে শ্রীযুক্ত বার্লিন-এর সঙ্গে মতবিরোধ হবার অবকাশ কম। কারণ তিনি কোনোরকম নিয়ন্ত্রণবাদ পছন্দ করেন না—তার বিরুদ্ধেই তাঁর এই গ্রন্থ (যা লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্-এ অগস্ত কোম্ত-এর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের জন্য লিখিত বক্তৃতামালা)। আপাতত এ কথাও মনে হতে পারে এই নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করার পথে তাঁর আক্রমণস্থল কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা মতবাদ নয়, সমগ্র নিয়ন্ত্রণবাদই এবং এক্ষেত্রে তিনি জাতি, পরিবেশ, ধর্ম, নেশন, সভ্যতা বা শ্রেণী কারুর দোহাই ক্ষমা করেন না।

---

*Isaiah Berlin. Historical Inevitability. Oxford Press, London.

বার্লিন-এর মতে ঐতিহাসিক চিন্তা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের উদাহরণ ও তার সাম্প্রতিক সম্মান—এই উভয় উৎসের কাছেই নিয়ন্ত্রণবাদী মত ঋণী। তাদের শ্রেণীভাগে, সম্বন্ধপাতে, ভবিষ্যদ্বাণীতে সাফল্যলাভই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে প্যাটার্ন খোঁজায় ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের দার্শনিকদের উৎসাহিত করেছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা হিস্টরিক্যাল প্রসেসকে ব্যক্তির প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার স্বাধীন অতিমানবিক বা অপৌরুষেয় শক্তি প্রভাবিত ঘটনা-শৃঙ্খল হিসাবে উপস্থিত করা—এক ধরনের হেত্বাভাস। এর রূপ বিভিন্ন হতে পারে। বার্লিন ভাগ করেছেন মোটামুটি ছ-ভাগে: টেলিওলজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, মেকানিষ্টিক, রিলিজিয়াস, ঈস্থেটিক, সায়ান্টিফিক। এঁরা আবার দু-ভাগে বিভক্ত। আশাবাদী (এঁরা বৈজ্ঞানিকম্মন্য, মানবিক, জ্ঞানদীপ্ত) ও নিরাশাবাদী। যাই হোক; এঁরা কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত। "that the world has a direction and is governed by laws, and that the direction and the laws can in some degree be discovered by employing the proper techniques of investigation and moreover that the working of these laws can only be grasped by those who realize that the lives, characters and acts of individuals both mental and physical are governed by the larger wholes to which they belong and that it is the independent evolution of these wholes that constitute the so called 'forces' in terms of whose direction truly 'scientific' (or 'philosophic') history must be formulated." (p-24)

শ্রীযুক্ত বার্লিন বলেন, এই মতবাদ ভ্রান্ত—নিয়ন্ত্রণবাদ তাঁর কাছে "no more than a sign of neurosis and confusion." প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভ্রান্ত কেন? যদি একটি সূত্রের অধীন এবং সুশৃঙ্খল বিবর্তনের শৃঙ্খলে মানবসমাজের সমগ্র ঘটনাবলীকে, মানবকর্ম ও মানবচিন্তাকে ন্যস্ত করতে হয়, তাহলে ঐতিহাসিককে হতে হয় সর্বজ্ঞ। বলাই বাহুল্য ঐতিহাসিক সর্বজ্ঞ হতে পারেন না; এমন কি সমস্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাপার তাঁর জানা থাকলেও, এটা সম্ভব নয়। সুতরাং যে নিয়ন্ত্রণবাদী চিত্র আমরা ইতিহাসে গঠন করি সেটা ঐতিহাসিকের মন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এবং উদ্দেশ্যমূলক সংকলন ও ব্যাখ্যারই এটা ফল। শুধু তাই নয়, আইজায়া বার্লিন

বলেন, ইতিহাসগত নিয়ন্ত্রণবাদের সাধারণ চেতনা বা কমনসেন্সের অহি নকুল সম্পর্ক। অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ সঙ্গত নিয়ন্ত্রণবাদ ইতিহাসে অচিন্ত্যনীয়। যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণবাদকে ধরার ইচ্ছা থাকে, তাহলেও আমাদের সাধারণ জীবনের শব্দভাণ্ডার ও মানবসম্পর্ককে পাল্টাতে হবে।

নিয়ন্ত্রণবাদ অতএব ইতিহাসগত পদ্ধতি হিসাবে ব্যর্থ। কিন্তু বিপজ্জনক কেন? বার্লিন বলেন—এইভাবে ইতিহাসকে দেখলে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের ব্যাপারটা আমরা হারিয়ে ফেলি—ব্যক্তির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি। এর ফলে রহস্যময় ও অদমনীয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য। এ ব্যাপারে বার্লিন, স্পেঙ্গলার বা টয়েনবিকে নিয়ে ততটা চিন্তিত নন, যতটা বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের নিয়ে—কারণ এঁরা নিয়ন্ত্রণবাদের পক্ষে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেন। বার্লিন বলেন, এঁরাই 'দি কলেকটিভিস্ট স্পিরিট' 'দি মিথ অব দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' অথবা 'কণ্টেম্পরারি কোলাপ্স অব ভ্যালু' প্রভৃতি শব্দাবলী ব্যবহার করেন।

কিন্তু, নিয়ন্ত্রণবাদ যদি এত বিপজ্জনক হয় তাহলে তার আবেদনই বা এইরকম বিস্তৃত ও গভীর কেন? এর উত্তরে বার্লিন মানব-মনস্তত্ত্বে ডুব দেন। সাতাত্তর পৃষ্ঠায় বলেন: "But principally it seems to me to spring from a desire to resign our responsibility, to cease from judging provided we be not judged ourselves and above all, are not compelled to judge ourselves—from a desire to flee for refuge to some vast amoral impersonal, monolithic whole—nature or history, or class or race or the 'harsh realities of our time' or the irresistable evolution of the social structure ......This is a mirage which has often appeared in the history of mankind, always at moments of confusion and inner weakness."

সার আইজায়া বার্লিন-এর বক্তব্য মোটামুটি এই।[১] বলাবাহুল্য আপাত

---

১ সার বার্লিনের বক্তব্য গ্রন্থটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাকে একত্রে আনায় পিটর গেইন-এর 'হিস্টোরিক্যাল ইনএভিটেবিলিটি' (আইজায়া বার্লিন) নামক প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টিতে এই লেখার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করার হেতু নেই। তিনি নিয়ন্ত্রণবাদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। (যদিও নিয়ন্ত্রণবাদ ও অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়, উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি অচেতন এবং নিয়ন্ত্রণবাদও যে আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তার ক্রমবিকাশে একসময়ে একটা ভূমিকা পালন করেছিল—সেকথা সার বার্লিন আদপে আমলেই আনেন না।) কিন্তু এই নিরপেক্ষ লেখার আসল উদ্দেশ্য, আইজায়া বার্লিন-এর আসল উষ্মার কারণ, ধরা পড়ে যায় যখন তিনি মার্কস ও মার্কসবাদের প্রসঙ্গে আসেন। বাস্তবিক মার্কসবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, তাকে কেন্দ্র করে জীবনোল্লাসে মাতা সার আইজায়া বার্লিনদের স্বাভাবিক কারণেই ভালোলাগার কথা নয়। তাই তাঁর চমৎকার গদ্যও বিশেষণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে মার্কস ও মার্কসবাদের প্রসঙ্গে এসে। "মার্কস ও মার্কসবাদীরা আরও বেশি দ্ব্যর্থক।" (পৃঃ ৮) "হেগেল ও মার্কস উভয়েই শান্তিপ্রিয় এবং নির্বোধ মানুষের মুক্তির কল্পনা করেছেন।" (পৃঃ ২৩) "বিশেষ ধারণা-সমষ্টি ও ইতিহাসের বিশেষ কৌশল নির্মাণের সকল প্রচেষ্টা (উদাহরণত মার্কসবাদীদের দ্বারা) ভেঙে পড়েছে।"—("because they proved sterile, for they either misdescribed—over schemetized—our experience—or they were felt not to provide answers to our questions". : পৃঃ ৫২) "এদের মধ্যে মার্কসবাদ সবথেকে সাহসীতম, সবথেকে বুদ্ধিমান, এবং ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মতো ব্যবহার করার সাহসিক ও উন্মত্ত প্রচেষ্টায় সবথেকে কম সফল।" (পৃঃ ৭১)

ওপরের এই উদ্ধৃতিসমষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সার বার্লিনের মূল আক্রমণস্থল কী ? (তিনি যে কী চতুর লেখক তা ধরা পড়ে যায় তৃতীয় উদ্ধৃতিতে। এখানে যেন চরম নৈর্ব্যক্তিকতায় উদাসীনতায় আর পাঁচটির মতো মার্কসবাদীদেরও চকিত উল্লেখ করেন।) নিয়ন্ত্রণবাদীদের মধ্যে মার্কস নাকি সাহসিকতম, সবথেকে বুদ্ধিমান, সবথেকে ব্যর্থ, বেশি দ্ব্যর্থবোধক—এইসব বিশেষণেই তাঁর আসল উদ্দেশ্য প্রকট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মুখোশ। অবশ্য মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর মূল আপত্তি বোধহয় জানান আট-নয় পৃষ্ঠাতে। "Marx and the Marxists are more ambiguous. We cannot be quite sure what to make of such a category as a social 'class' whose emergence

and struggles, victories and defeats, condition the lives of individuals, sometimes against, and most often independently of, such individuals' conscious or expressed purposes. Classes are never proclaimed to be literally independent entities: they are constituted by individuals in their interaction (mainly economic). Yet to seek to explain, or put a moral or political value on the actions of individuals by examining such individuals one by one, even to the limited extent to which such examination is possible, is considered by Marxists to be not merely impracticable and time-wasting, but absurd in a more fundamental sense—because the 'true' (or 'deeper') causes of human behaviour...lie in a pervasive inter-relationship between a vast variety of such lives with their natural and man-made environment. Men do as they do, and think as they think, largely as 'function of' the inevitable evolution of the 'class' as a whole—from which it follows that the history and development of classes can be studied independently of the biographies of their component individuals. It is the 'structure' and the 'evolution' of the class alone that (causally) matters in the end. This is, mutatis mutandis, similar to attitude taken by those who identify race with culture...." উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও, এ আলোচনায় প্রয়োজনীয়। এখানে মূল অভিযোগ এই যে মার্কস ও মার্কসবাদীরা ব্যক্তির কোনো মূল্য দেন না এবং শ্রেণীর আলোচনায় ব্যক্তির মূল্য তাঁদের কাছে নেই বললেই চলে। শ্রেণীর গঠন ও বিবর্তনই তাঁদের কাছে বড় কথা—ব্যক্তির কথা নয়। অবশ্য এই বিবর্তন, মার্কসবাদীদের কাছে নাকি, অবশ্যম্ভাবী। ("function of the inevitable evolution of the class as a whole.") বলাবাহুল্য, নতুন পদ্ধতিতে হলেও মার্কসবাদের বিপক্ষে এ এক পুরনো অভিযোগ। এবং এ অভিযোগের একমাত্র উৎস মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী ধৈর্য ধরে পাঠের অভাব। অবশ্য আইজায়া বার্লিনের অঘটনঘটনপটিয়সী আবিষ্কারক্ষমতা

নিঃসন্দেহেই উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে মার্কস নাকি দুঃখবাদী।[১] সুতরাং মার্কসের কাছে ব্যক্তির মূল্য ছিল না, এ ধরনের হাস্যকর অভিযোগে যে তিনি গা ভাসাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

অবশ্যই এখানে আসল প্রশ্ন মার্কসবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ কিনা। তিনি একটি প্যাটার্নের মধ্যেই সব ইতিহাসকে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন কিনা—এবং ইতিহাসের জটিলতাকে পরিহার করে অযথা সরলীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন কিনা।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন "বুর্জোয়াজির পতন ও সর্বহারাদের জয় সমানভাবেই অবশ্যম্ভাবী।" তাহলে প্রশ্ন ওঠে বিশ্ব-ইতিহাসে বিকল্প কী তাহলে পাওয়া যাবে না? এ ব্যাপারে আর. পি. দত্ত-র আলোচনা স্মরণীয়। তাঁর মতে এই অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে যান্ত্রিক অদৃষ্টবাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। এই অবশ্যম্ভাবিতা: "is realised in practice through living human wills under given social condition, consciously reacting to those conditions and consciously choosing their line between alternative possibilities seen by them within the given conditions." এবং আমরা অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা বলতে পারি তার কারণ আমাদের সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থা (যা চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে) ও তার ক্রমবিকাশের পথ বিশ্লেষণের ক্ষমতা। আমরা বিরোধের বিকাশ এবং শোষিত সংখ্যাধিক্যের মহত্তর বিপ্লবাত্মক চেতনা ও ইচ্ছার শক্তিসঞ্চয়ের কথাও বলতে পারি। এমন কী এই শক্তিসঞ্চয় ও বিকাশের পথে প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি ভুলপথ নির্ণয় অস্থায়ী; বিরোধমূলক অবস্থার এদের দ্বারা সমাধান হতে পারে না। এই বিরোধ তখন স্বাভাবিকভাবেই আরও তীব্র সংগ্রামের দিকে নিয়ে যায়, এবং যতক্ষণ না শেষ বিজয় আসে ততক্ষণ চলতে থাকে। এই প্রসেস নিঃসন্দেহে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এটা পূর্বনির্ধারিত যান্ত্রিকতা নয়। প্রাণময়, কর্মঠ, অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি প্রয়াসী মানুষের এই মানবচেতনা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বুদ্ধি ও আবেগে নতুন বিকল্প পথ, নতুন জগতের অনুসন্ধানী। এবং: "This fighting revolutionary consciousness is by no means a bowing to an inevitable outcome, but is

১ পিটের গেইলের মতো সার বার্লিনের গুণগ্রাহীকেও এখানে প্রতিবাদ করতে হয়েছে।

most actively a seeking to tip the balance and make certain by action the victory of one alternative and the defeat of another alternative."১ সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে আইজায়া বার্লিন কথিত নিয়ন্ত্রণবাদীদের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে এর তফাৎ আসমান-জমিন। তাঁর গ্রন্থের আট-নয় পৃষ্ঠাতে যে মার্কসবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গেই বা এর মিল কই? এখানে কী ব্যক্তির ওপর, তার ইচ্ছা, বুদ্ধি, আবেগের ওপর জোর দেওয়া হয় নি?

অবশ্য এ ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকেই উদ্ধৃতি নেওয়া ভালো। ব্লককে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছেন: "According to the materialistic conception of history, the ultimately determining element in history is the production and reproduction of real life. More than—neither Marx nor I have ever asserted hence if somebody twists into saying that the economic element is the only determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, senseless phrase. The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of the class struggle and its results, to wit: constitutions established by the victorious class after a successful battle etc., juridical forms, and even the reflexes of all these actual struggles in the brain of the participants, political juristic philosophical theorics religious views and their further development into system of dogmas—also exercise their influence—also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their form." (স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মার্কসবাদ কোনোক্রমেই ইকনমিক ডিটারমিনিজম-এর স্বগোত্রীয় নয়)। স্টার্কএনবুর্গকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস ফের জানালেন: "Men make their history themselves, but not as yet with a collective will or according

১ আর. পি. দত্ত-র মতটি নীডহাম-এর 'ইন্টিগ্রেটিভ লেভেলস' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

to a collective plan or even in a definitely defined, given society. Their efforts clash, and for that very reason all such societies are governed by necessity, which is supplemented by and appears under the forms of accidents." এন্নেনকভ-কে লেখা চিঠিতে মার্কস বলেন : "The social history of men is never anything but the history of their individual development, whether they were conscious of it or not." আরও জানান, "the productive forces are...the result of practical human energy." 'দি জার্মান ইডিয়লজি'তে পাই : "the first premise of all human history is of course, the existence of living human individuals."

এই স্বল্পসংখ্যক উদ্ধৃতিতেই প্রকাশ মার্কসবাদের সঙ্গে ক্লাস-ডিটারমিনিজম্-এরও কোনো সম্পর্ক নেই। আইজায়া বার্লিন-এর আট-নয় পৃষ্ঠার মূল আপত্তি ভিত্তিহীন। ব্যক্তিগত দায়িত্ব, ইচ্ছা, বুদ্ধি, ব্যক্তির প্রশ্ন সবই মার্কস-এর বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। আর সাম্প্রতিক রাশিয়ার ঘটনাবলীতেও প্রকাশ ব্যক্তির কর্মের জন্য ব্যক্তিকেই দোষারোপ করা যায়, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে শ্রেণীহীন সমাজে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আন্তনিও গ্রাম্‌চির রচনা পাঠ করার পর আইজায়া বার্লিন-দের মার্কসবাদকে অপদস্থ করার করুণ প্রয়াসকে আরও হাস্যকর ঠেকে।

অবশ্য পশ্চিম ইওরোপ-আমেরিকার সামগ্রিক সঙ্কটের পটেই আইজায়া বার্লিন-এর লেখা পাঠ্য। কারণ ইতিহাসে যথেচ্ছাচার এই সঙ্কটেই সম্ভব। এঁদের লেখা পড়ে এঙ্গেলস-এর সাবধানবাণী বার বার মনে পড়ে : "I would furthermore ask you study this theory from its original sources and not at second hand ; it is really much easeir."

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

ভবতোষ দত্ত

১২৯২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির বিস্তীর্ণ জীবনী ও কাব্যসমালোচনা লেখেন। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বহু তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাসাহিত্যের উৎসাহী পাঠকদের উপহার দেন। আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সংগৃহীত এই তথ্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত' নামে যে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসজাতীয় বই প্রথম প্রকাশ করেন, তাতে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে বিখ্যাত বইতে বাঙালি লেখকদের বিবরণ বের করেন। তাতে মূলত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেই নির্ভর করেছিলেন। পরবর্তী কালে যাঁরাই ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে লিখতে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া তথ্যই ব্যবহার করেছেন। নতুন কোনো অনুসন্ধান বিশেষ হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।" বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদপ্রভাকর'-এর দীর্ঘ ইতিহাস দিয়েছিলেন; সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, 'সংবাদপ্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই বিচার বাঙালি সমালোচকদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট করে নি। গুপ্তকবি সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানে সুপ্রচলিত তা হচ্ছে এই যে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবের কবি ছিলেন, আধুনিক জীবনকে তিনি ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসতেন। তাঁর কবিতা অশ্লীলতা-দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। গুপ্তকবি সম্পর্কে এই ধারণার কারণ খুব সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই। বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের অতি চমৎকার সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদকীয় মতামতের

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (প্রথম খণ্ড)॥ বিনয় ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। সাড়ে বারো টাকা॥

আলোচনা করেন নি। বঙ্কিমের এই সমালোচনা কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে পরবর্তী পাঠকদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু গদ্যলেখক ঈশ্বর গুপ্ত পরে প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। 'সংবাদপ্রভাকর' সেকালের বাঙালি সমাজ-গঠনে যে গুরুভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে কথা পরে আর বিচার্য হয় নি। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যরচনা আর মুদ্রিত হয় নি।

ইদানীং বাঙালি গবেষকদের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। কিছুকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণের নানা দিক নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে এর অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচিত সংকলন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলন করেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারি-পরিচালিত 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা থেকে। সংবাদসংগ্রহের উৎস হিসাবে 'সমাচারদর্পণ' অমূল্য হলেও এর থেকে দেশীয় মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর মূল্য যে এই কারণে খুব বেশি তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেকালের নবযুগ-অভ্যুদয়ের ফলে যে সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছিল, একদিকে তার সংবাদ জানার দরকার আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে সাধারণ বাঙালি-সমাজ সেই পরিবর্তনকে কী চোখে দেখছে, তা জানার। কারণ এর প্রভাব পরবর্তী কালে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন:

> "এখন হইতে প্রভাকর উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাংলাদেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত।"

শিবনাথ প্রভাকরের জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন তার কবিতাকে। কিন্তু এমন অনুমান যদি করি যে এই জনপ্রিয়তার একটা পরোক্ষ ফল ছিল ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় মতামতের বিস্তার এবং বাঙালির মনোভাব গঠন তবে তার জন্যে আলাদা প্রমাণ দেবার দরকার নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো ঈশ্বর গুপ্ত অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না, তাঁর কোনো মত নবযুগ-গঠনে মৌলিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এমন কথাও বলা যায় না। তবু আমাদের মনে হয়, সম্পাদক ঈশ্বর

গুপ্তের মত সেকালের সাধারণ বাঙালির চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। বিশেষত বঙ্কিমের ওই উক্তিটি বিশেষভাবেই স্মরণীয় :

> "সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য; নানা স্কুলকমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ওদিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।"

এটাই স্বাভাবিক। যদিও প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবগত, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এদের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র ছিলেন। সেকালে ছিলেন যাঁরা ভাবনেতা তিনি তাঁদের সঙ্গে যেমন যোগ রক্ষা করে চলেছেন, তেমনি সাধারণ জনসমাজে তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ। তাই তিনি যেমন উচ্চতর চিন্তাকে গ্রহণ করে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি চিন্তার আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি জনসমাজ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের এই বিশেষ সুবিধা সেকালের আর কারোই ছিল না। এ কথা বলা কি অনুচিত হবে, ঈশ্বর গুপ্তের মতো ব্যক্তিই নবজাগরণের আদর্শ প্রচারে সর্বাধিক সহায়তা করেছিলেন। বাংলার জাগরণ সেকালের উচ্চতর নেতাদের মধ্যে যে উল্লাস সৃষ্টি করেছিল, কয়েক বছরের মধ্যে সেটা পরিণত হলো হরিষে-বিষাদে। রামমোহন-দ্বারকানাথ-বিদ্যাসাগর—কেউ কি ভেবেছিলেন নবজাগরণ আসবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে আর দেশের বিপুল জনসাধারণ থাকবে বঞ্চিত? নবজাগরণের বাণীকে ছড়াবার উপায় কী ছিল? এক ছিল শিক্ষা, আর ছিল সাময়িকপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা শিক্ষার জন্যে এত ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন, সে কি শুধু রক্ষণশীলতার জন্যে? এমন কি অভিপ্রায় তাঁর ছিল না যে নবজাগরণের ভাবসম্পদ ছড়িয়ে পড়ুক তাদের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে না? জনসংযোগ ঘটাবার জন্যে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা আমরা যদি আজ স্মরণ না করি, তবে আমাদের কৃতঘ্নতার পাপ স্পর্শ করবে মাত্র। এই জনসংযোগের অভাবে বাংলার জাগরণ যে সম্পূর্ণ হয় নি, এ কথা আজ আমরা সাধারণ মানুষরাই ভাবছি তা নয়, এ কথা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মনীষী ব্যক্তিরা।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা থেকে সংবাদ ও মন্তব্যের যে বৃহৎ সংকলন প্রকাশ করেছেন, তার থেকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া তো গেলই, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই নতুন রূপ

দেখতে পাওয়া গেল। তাঁর কবিতা পড়ে রক্ষণশীল বলে তাঁকে ঠেলে ফেলে রেখেছিলাম, তাঁর গদ্য 'ভয়াবহ' বলে পড়বার উৎসাহ প্রকাশ করি নি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বিপুল গদ্য রচনা পরীক্ষা করে প্রত্যাশাতীত ফল লাভ হবে। ইতিপূর্বে গুপ্ত কবি রচিত কবিওয়ালাদের জীবনী সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তখন থেকেই এমন সন্দেহ হচ্ছিল—"he is more sinned against than sinning." গভীর স্বরে গভীর কথা তিনি বলতে পারেন নি, কবিতায় তাই তিনি নিজের কথাই ঠাট্টা করে উড়িয়েছেন। আমরা সেই ঈশ্বর গুপ্তকেই মনে রেখেছি—অবশ্য তাঁর পদ্যের শক্তির জন্যই—কিন্তু গভীর কথা গভীর স্বরেই যে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন আমরা তার সন্ধান রাখি নি। গদ্য রচনায় তিনি সত্য সত্যই দেশের, জাতির এবং যুগের ভাবনা প্রকাশ করে গিয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের ভাবনা 'সমাচারচন্দ্রিকা' ও ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গুপ্ত কবির গদ্য রচনায়। পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁকে সেকালের নানা গুরুতর বিষয়ে মন্তব্য করতে হয়েছিল। বিনয়বাবু এদের ভাগ করেছেন অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও বিবিধ বিভাগে। এই কয়ভাগে সত্য সত্যই ১৮৩১ থেকে ঈশ্বর গুপ্তেরও মৃত্যুর পরবর্তীকালে বাংলার সমাজচিত্রের বর্ণাঢ্য বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই জানেন এই সময়টাই আসলে বাংলাদেশের একটা অত্যন্ত জটিল সন্ধিক্ষণ। নূতন ভাবের প্রবেশ এবং পুরাতনের অনিচ্ছুক প্রস্থানের দ্বিধাদ্বন্দ্বে এই যুগটি আবিষ্ট। এ সময় একটা সুস্পষ্ট নীতিকে মেনে চলা সত্যই অত্যন্ত কঠিন ছিল। যারা প্রাচীনকে অবলম্বন করেছিল পরবর্তী কালে তারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, আবার যারা নবীনের লালসায় প্রমত্ত হয়েছিল তারাও অভ্রান্ত বলে গ্রাহ্য হয় নি। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের মতো সাধারণ-শিক্ষিত যে মানুষ পল্লীপরিবেশেই প্রধানত মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে মানসিক দ্বিধা অবশ্যই ক্ষমার্হ। তিনি যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন এটাই বরং তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বলে মনে করি। অবশ্য সম্পাদক জীবনের প্রথমে তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পাওয়া যায় না বলে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় না। পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত প্রমাণে দেখা যায় হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তার কিছু বিবরণ হিন্দু

কলেজের পুরনো নথিপত্রে দেওয়া আছে। বিনয়বাবু এ সব উদ্ধৃত করেছেন। যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন সেই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত চন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন হিন্দুকলেজের গভর্নর। অনুমান করি যোগেন্দ্রমোহনের নেপথ্য অনুরোধে চন্দ্রমোহনের মধ্যস্থতায় এই বিবাদ মিটে যায়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীলতার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকার মন্তব্যে। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনীর অবতরণিকায় বর্তমান লেখক তা উদ্ধৃত করেছেন।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীল মনোভাব বেশিদিন থাকে নি। বিনয়বাবু লক্ষ্য করেছেন ১৮৪০ থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে থাকে। অবশ্য আমার অনুমাণ তাঁর পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৮৩৮ থেকেই। অতঃপর বিনয়বাবু ঈশ্বর গুপ্তের উদার মনোভাবের প্রচুর প্রমাণ দেখিয়েছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাই এ বিষয়ে আমাদের সাক্ষী। যন্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে গুপ্তকবির উৎসাহ, ধর্মসভার প্রতি বিরাগ, জাতির ভিত্তিতে বৃত্তি নির্ধারণের অনাবশ্যকতাবোধ, কৃষক ও জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি, মধ্যপন্থী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে গুপ্তকবির বৈশিষ্ট্য সেকালের পক্ষে অনন্যসাধারণ এবং ইতিহাসের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। বিনয়বাবু বলেছেন :

> "নিজের সচেতন বুদ্ধি ও একাগ্রতা দিয়ে তিনি এই সমাজ থেকে তাঁর আত্মোৎকর্ষের উপাদান উন্মুখ হয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তাঁর কবিয়ালী মন যুক্তিপ্রধান যুগে ক্রমে অনেকটা যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল।"

আমাদের ধারণা এই গ্রন্থটি ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার নিরসন করবে। গদ্যরচনা ও পদ্যরচনা মিলিয়ে কবিকে নতুন করে বিচার করে দেখার আবশ্যকতা অনুভূত হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়াও আধুনিক বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের বাঙালি মন ও সমাজবিপ্লবের অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল। গ্রন্থকার পুস্তক সম্পাদনে স্বর্গীয় ব্রজেনবাবুর পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। পিছনে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে মূল গ্রন্থে অবতারিত প্রধান প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক ঘটনার বিস্তৃত টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হওয়ায় গবেষকদের কাছে গ্রন্থটির ব্যবহার্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত গবেষণার পথ প্রশস্ত করছে। সেকালের অন্যান্য ছয়টি পত্রিকার আরও চারটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এর চেয়ে শুভ সংবাদ আমাদের পক্ষে আর কি হতে পারে?

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

নৃপেন গোস্বামী

বাংলাদেশের আচার্যস্থানীয় বিশ্ববিশ্রুত ভাষাবিদ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণাকে সর্বপ্রথম জনসাধারণের মধ্যে চালু করেছিলেন একথা বোধহয় অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। ইংরেজি culture-এর, কালচার-এর, জার্মান kultur-এর, কুলতুর-এর অর্থবাচক বাংলা শব্দের সন্ধান চলছিল এক সময়ে এবং শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেনের আনুকূল্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটি অনুমোদিত হয়। ইতিপূর্বে মারাঠী ভাষায় কালচার-এর অর্থে সংস্কৃতি শব্দের প্রচলন হয়েছিল। প্রস্তাবিত কৃষ্টি শব্দের দাবি জোরালো হয় নি, কেননা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যা অনুসারে 'ঋগ্বেদ'-এ কৃষ্টি হচ্ছে কৃষিরত গোষ্ঠীর বাচক। অপরপক্ষে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ প্রাপ্ত সংস্কৃতি শব্দের একমাত্র সম্ভাব্য তাৎপর্য হচ্ছে কালচার। এই শব্দটির নির্বাচনে শুধু নয়, এর উপর নতুনতর অর্থ সংযোজনে, নতুনতর আলোকপাতে সুনীতিবাবুই অগ্রণী হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অন্ধ দেশপ্রীতি জাতীয়সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনে অক্ষম, আবার বিপরীত দিক দিয়ে দেশজ সংস্কৃতির প্রাপ্য মূল্য স্বীকারে কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ সমসাময়িক কালের একটা দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ ভাবাবেগবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর ফলপ্রসবী হতে পারে। মধ্যপন্থী সুনীতিকুমার নিরুচ্ছ্বাস মননে পথিকৃৎ-এর কাজ করেছেন এবং তাঁর চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার প্রভৃতি সংস্কৃতিবাদীরা। বিগত একশত বছরে ইওরোপ ও আমেরিকায় দুটি ধারণা মানব সম্বন্ধীয় গবেষণায় বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। একটি Society বা সমাজের ধারণা, অপরটি সংস্কৃতির ধারণা। সমাজের ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কার্ল মার্কস, ডারখেইম (Durkheim), মর্গান, স্পেন্সার

*সাংস্কৃতিকী॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য। সাড়ে পাঁচ টাকা॥

প্রভৃতি। সংস্কৃতির ধারণার পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন টাইলর, র‍্যাটজেল (Ratzel), ইলিয়ট স্মিথ, উইসলার (Wissler) প্রভৃতি। বাংলাদেশে মার্কসবাদীরা সমাজের ধারণার উপর পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তাঁদের ভিতরে দু-একজন অবশ্য সংস্কৃতিবাদীও রয়েছেন। Sociologism বা সমাজবাদ এবং Culturologism বা সংস্কৃতিবাদ-এর দুইটি ধারা পশ্চিমী জগৎ থেকে ভারতে সঞ্চারিত হয়েছে। শেষোক্ত ধারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন সুনীতিকুমার। তাঁকে আমরা সংস্কৃতিবাদী রূপে গণ্য করতে পারি।

তাঁর সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থ 'সাংস্কৃতিকী', প্রথম খণ্ড, সংস্কৃতি-সমালোচনার ক্ষেত্রে অভিনব অবদান। এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কতিপয় পূর্বপ্রকাশিত উপকরণবহুল চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। যথা—'সংস্কৃতি', 'যবদ্বীপের মহাভারত', 'রামায়ণ', 'কুরল্', 'কোলজাতির সংস্কৃতি', 'তাও', 'সুফী অনুভূতি ও দর্শন', 'অল্-বীরূণী ও সংস্কৃত', 'দরাপ খাঁ গাজী', 'মণিপুর-পুরাণ', 'শিল্প-কলা' এবং রবীন্দ্রনাথের '"জীবন-দেবতা"'। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে একটি সামগ্রিক সুর প্রবাহিত, অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাব বা diffusion-এর প্রতিপাদন। সংস্কৃতির দেশিক ও কালিক অবস্থিতি স্বীকার্য হলেও অনতিক্রম্য নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে, এক যুগ থেকে অপর যুগে সংস্কৃতির পরিক্রমণ বাধা ও ব্যবধান অতিক্রম করে। প্রথম ব্যাপারটি নৃবিজ্ঞানে diffusion বা বিকিরণ রূপে কথিত হয়ে থাকে, দ্বিতীয় ব্যাপারটি নিরূপিত হয় tradition বা জনশ্রুতিরূপে। এই দুই ব্যাপারের দ্বারা সংস্কৃতির রূপ নির্ণীত হয়। সুনীতিবাবুর প্রবণতা প্রথম ব্যাপারটিকে উদ্ঘাটনের দিকে। টাইলর জোর দিয়েছেন দ্বিতীয় ব্যাপারটির উপর, কেননা তিনি বিবর্তনবাদী। সুনীতিবাবু আত্মঘোষিত বিকিরণবাদী না হলেও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাবের দৃষ্টান্ত সংগ্রহে বরাবর উৎসাহী।

সুনীতিকুমার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞাকরণে চেষ্টিত হয়েছেন। তাঁর মতে মানবজীবনের বহিরঙ্গ বস্তুগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় সভ্যতার মান, আর অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি সংস্কৃতিকে নিরূপিত করে। "একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture।" লাতীন col, কোল্ ধাতুর অর্থ চাষ করা, আবার যত্ন করাও হয়। এই কোল্ধাতু থেকে এসেছে লাতীনের cultura, কুলতুরা

শব্দ, আধুনিক culture-এর, কালচার-এর জনক পদ। (পৃঃ ৬-৭, 'সাংস্কৃতিকী')

ইংরেজি civilisation-এর, সিভিলিজেশন-এর মূলে রয়েছে নগরবাচক লাতীন civis, সিভিস পদটি। এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে সভ্যতা শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। সভা, অর্থাৎ মানবগণের একত্রীভবন থেকে উৎপত্তি হয়েছে সভ্যতা পদের। সভ্যতাকে সুনীতিবাবু মুখ্যত নগরের ব্যাপার রূপে বিবেচনা করেছেন। (পৃঃ ৯)

সভ্যতার এই সংজ্ঞাকরণ মর্গান ও গর্ডন চাইলড-এর অভিমতের সঙ্গে মিলবে না। এঁরা লিপিজ্ঞানকে সভ্যতার মাপকাঠি রূপে ধার্য করেছেন। সভ্যতা যদি নগরের ব্যাপার হয় তাহলে 'ঋগ্বেদ'-এর মতো সাহিত্য-সৃজনকারী গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সভ্যতা অস্বীকৃত হয়।

ম্যাকিবার এবং পেজ-এর বিবেচনায় "Culture is the antithesis of civilization", অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার বিপরীত ধারণা। সভ্যতার উৎপত্তি জীবনের প্রয়োজন থেকে, বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রণের তাগিদ থেকে। সংস্কৃতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ। সভ্যতায় স্থূল লক্ষ্য প্রতিভাত, যথা, টেক্‌নলজী বা বাস্তব উপকরণ। সংস্কৃতির পরিচায়ক শিল্পমূল্য, দর্শন, ধর্ম, মন্দির, অর্থাৎ মানুষের মানসিক ও নৈতিক উপার্জনসমূহ। বিশেষ দুর্বিপাক না ঘটলে সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, যথা, জীবনযাপনের উপকরণ স্বয়ংচালিত যানের ক্রমিক বিবর্তন। সংস্কৃতির ব্যাপারে উন্নতি মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, সুতরাং নিশ্চিত নয়। সভ্যতার উপকরণ সহজে ধার করা চলে, যথা, বন্য অবস্থাপন্ন মানুষের রাইফেল-চালনা। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঋণ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। [pp. 498-503, 'Society', 1959]

মোটামুটিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই পৃথকীকরণ সুনীতিবাবুর বক্তব্যের অনুকূল।

পুরাতাত্ত্বিক মহলে কালচার বা সংস্কৃতি বাহ্য উপকরণের দ্যোতক। আবার, নৃতাত্ত্বিক বিচারে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি অতি ব্যাপক সংজ্ঞা। এর ভিতরে মানবীয় যাবতীয় বিশ্বাস ও আচরণগত ব্যাপার, সর্বপ্রকার বাহ্যিক উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুনীতিবাবু সংস্কৃতিকে বিশেষ তাৎপর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বত্র হিসেবে তিনি কয়েকটি প্রবণতাকে মুখ্যভাবে বিবেচনা করবার পক্ষপাতী। যথা, সমন্বয়, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা, দম বা আত্মদমন, ত্যাগ বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তুজগতের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি। (পৃঃ ১০-১২)

ভারতীয় সমন্বয়-প্রবৃত্তি বা বহিঃপ্রভাব আত্মসাৎ করণের দিকে মানসিক ঝোঁকের দরুণ ধর্মবিশ্বাসে বহুপ্রকার জটিলতা দেখা দিয়েছে, নিত্য নতুন দেব-দেবতার, গ্রাম্য ও লৌকিক দেবতার আমদানি ঘটেছে, পুজা-চর্যায় বিবিধ উপকরণের সমাবেশ সমর্থিত হয়েছে। বহু দেববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতনের গ্রহণ হয় সহজতর এবং পরহত-সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকভাবে প্রকট হতে থাকে। এক দেববাদের মৌলিক অনুপ্রেরণা একটিমাত্র চিন্তা কেন্দ্রে নিবদ্ধ থাকে, তাই বহিঃপ্রভাব-ভীতি কখনও শিথিল হতে পারে না।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইহলোকের প্রতি বিমুখ এবং পরলোক সম্বন্ধে সদা-সচেতন—এই মত প্রকাশ করেছেন অনেকে। ক্রোয়েবারের মতে সংস্কৃতির দুটি দিক হচ্ছে বিচার্য—eidos, এইডোস বা আকারের দিক এবং ethos, এথোস বা মানসিক প্রবণতার দিক। তিনি বলেছেন যে চীনা প্রবণতা ইহলোকমুখীন, পরন্তু ভারতীয় প্রবণতা পরলোকের প্রতি নিবদ্ধ। এইরূপ ধারণার সমর্থনে নজির-রূপে গণ্য হতে পারে 'উপনিষৎ'-এর তত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের মোক্ষ-বাদ, তন্ত্রের মৌলিক ভাবাদর্শ। কিন্তু এর বিপক্ষে নজির অপ্রতুল নয়। ভারতীয় জীবনাদর্শে চতুর্বর্গ, অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, সমমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। 'কাম-স্থত্র' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', এমন কি 'মনুসংহিতা' বা 'ধর্মশাস্ত্র'—ভারতীয় ঐহিকতাকে নিতান্ত স্থূলভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। যতি-মুনি-ভিক্ষু-শ্রমণের জীবন-চর্যা কোনোকালেই জনগণের আচরণীয় ছিল না। সাধারণ মানুষের পূজা-চর্যায় বৈদিক যজ্ঞীয় ঐহিক লাভালাভের বিচার বরাবর হয়েছে পরিস্ফুট। পুজার বহিঃর্ভূত শান্তি-নামধেয় কর্ম-সমূহ, যাদু-জাতীয় অভিচার-সমূহ নগ্ন ঐহিকতার সাক্ষ্য-রূপে বরাবর অনুমোদিত হয়েছে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবন-যাত্রায়। [pp. 293-294, 'Anthropology'.]

ভারতীয় পারলৌকিক প্রবণতাকে অবশ্য স্থনীতিবাবু প্রকল্প-রূপে উপস্থাপিত করেন নি ক্রোয়েবারের মতো।

ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে নৃবংশীয় ধারার বিচারে স্থনীতিবাবু

বিরজাশঙ্কর গুহের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছেন। তিনি একাধিক প্রবন্ধে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে :

(ক) আদি-অস্ট্রেলীয় নিষাদ-রূপে বর্ণিত অস্ট্রিক-ভাষী জন-গোষ্ঠী ভারতে গ্রাম্য সভ্যতা গড়ে তোলে ;

(খ) 'ঋগ্বেদ'-এ দাস ও দস্যুরূপে বর্ণিত দ্রাবিড়-ভাষী ভূমধ্য সাগরীয় জন-গোষ্ঠী নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে এবং এরাই সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার নাগরিক সভ্যতারও স্রষ্টা ;

(গ) নর্ডিক বা উদীচ্য আর্যভাষী যাযাবর জন-গোষ্ঠী বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং দ্রাবিড়দের দেখাদেখি নগর নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে।

সুনীতিবাবুর বিবেচনায় ঋগ্বেদীয় "দাস" জাতি-বাচক নাম হতে পারে, যদিও পরবর্তীকালে এই শব্দের অর্থ হয়েছে গোলাম। অনুরূপ নজির রয়েছে গোলাম-বোধক slave, শ্লেভ-শব্দের মধ্যে। এর আদিরূপটি ছিল slav, শ্লাভ—একটি জাতির নাম। ঋগ্বেদীয় আর্যেরা যে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা সম্ভবত দ্রাবিড়-গোষ্ঠী এবং তারাই দাস-রূপে অভিহিত হয়েছে।

'ঋগ্বেদ'-এ উল্লিখিত দাসরা এবং হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা জন-গোষ্ঠী ইদানীং অভিন্ন-রূপে বিবেচিত হচ্ছেন। এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রাপ্ত নৃবংশীয় উপকরণে আদি-অস্ট্রেলীয়, ভূমধ্য সাগরীয় এবং অ্যালপাইন এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূমধ্য সাগরীয় নৃবংশের উপর জোর দেওয়ার যুক্তি অচল হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দ্রাবিড় সংক্রান্ত প্রকল্প খুব সম্ভাবনামূলক নয়, কেন না দ্রাবিড়কে ভূমধ্য সাগরীয় নৃবংশে স্থাপন সকলের দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

শশাঙ্কশেখর সরকার দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে বেদ্দিদ প্রবণতা অনুমান করেছেন। বেদ্দিদরা যদি ভারতের প্রকৃত আদিবাসী হন, সেক্ষেত্রে বহিরাগত গোষ্ঠী-রূপে দ্রাবিড়েরা বিবেচিত হতে পারেন কিনা ভেবে দেখবার বিষয়।

নর্ডিক নৃবংশ ও বৈদিক আর্যের সমীকরণ-মূলক প্রকল্প বিষয়েও এখন পর্যন্ত মতৈক্য দেখা যায় নি।

এস্থলে কোলদের বোঙ্গা-বিশ্বাস সম্পর্কে সুনীতিবাবু-কর্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা এবং আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই আদি-অস্ট্রেলীয় বিশ্বাসকে Animism বা আত্মাবাদ-রূপে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে, যার পক্ষে সুনীতিবাবু সমর্থন জানিয়েছেন। বোঙ্গারা হচ্ছে দৈবশক্তি বা আত্মা; তারা পর্বত,

নদী, বৃক্ষ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুতে অবস্থিত। তাদের সবার মূলীভূত এক শক্তি আছেন সিঞ্ বোঙ্গা, যাঁকে সাঁওতালেরা ঠাকুর বাবা-রূপেও অভিহিত করে। আক্ষরিক অর্থে সিঞ্ হচ্ছে সূর্য। সুতরাং সিঞ্ বোঙ্গা হচ্ছেন সূর্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে বোঙ্গাবাদ (Bongaism) হচ্ছে ম্যানা-বিশ্বাসের সমতুল। মেলানেসিয়া অঞ্চলে mana, ম্যানা সংক্রান্ত বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ম্যানা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক অপ্রাকৃত শক্তি এবং প্রাণবন্ত ও প্রাণহীন উভয়বিধ বস্তুতে অধিষ্ঠিত। বোঙ্গার অধিষ্ঠানেও জড় বস্তু ও প্রাণীর কোনো তফাৎ নেই। সুতরাং বোঙ্গা নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে প্রতীয়মান। সিঞ্ বোঙ্গার আধার সূর্য, কিন্তু দ্যোতিত অর্থ দেবতা নয়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তিমাত্র।

দু-টি ব্যাখ্যাই সম্ভবত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমীচীনতার দাবি করতে পারে। কোনো অদ্ভুত অপরিচিত বস্তু দেখলে তাকে বোঙ্গা-রূপে প্রতিপাদনের মধ্যে ম্যানা-জাতীয় বিশ্বাস ধরা পড়ে, আবার বোঙ্গা-কুড়ি ও বোঙ্গা-কোড়ার গল্পে বোঙ্গা-কন্যা হয়েছে মানব-তরুণের প্রেমের পাত্রী অথবা বোঙ্গা-কুমার হয়েছে মানব তরুণীর প্রণয়পাত্র। বোঙ্গাবাদের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন বোধ-হয় গভীরতর পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা করছে। (পৃঃ ৮০,৮১,৯৩)

'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থে যে সকল তথ্য ও ঘটনা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে সেগুলি প্রধানত diffusion-এর প্রতিপাদক, অর্থাৎ, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতির সঞ্চালন প্রতিপন্ন করে। ভারতে আগত কিংবা ভারত থেকে অন্যত্র প্রেরিত সাংস্কৃতিক উপকরণ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড আলোচনার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। দেশজ ও বহিরাগত উপকরণের সমন্বয় হচ্ছে সর্বদেশের সংস্কৃতির ইতিকথা। এর ব্যতিক্রম কোনো দেশ নয়, ভারতও নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ, কোথাও বা অধমর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বহু কাহিনী এখন অন্ধকারের গহ্বরে, বহু ঘটনা হিসাব নিকাশের বাইরে। কিছু কিছু উদ্ধারপ্রাপ্ত ইতিবৃত্ত আমাদের বিস্ময় জাগ্রত করে।

দেশ হতে দেশান্তরে সাংস্কৃতিক বিকিরণের নমুনা হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের নাম-জড়িত জাতক-অবদানের ভোট দেশ বা আধুনিক তিব্বত, চীনদেশ, কোরিয়া ও জাপান পরিক্রমা। বৌদ্ধ ভাবধারার মতো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাও ভারতের বাইরে এক সময়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তখন ভারত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক বিকিরণের কেন্দ্রস্বরূপ, ভারতীয় বণিক ও ব্রাহ্মণ স্বদেশের চিন্তাধারা, গল্প-উপাখ্যান বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য সমুদ্র-পথের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করছেন। যবদ্বীপে অগস্ত্য পূজার প্রচলন, মধ্য যবদ্বীপের প্রাম্বানান্ অঞ্চলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তিনটি মন্দির-গাত্রে খোদিত 'রামায়ণ' ও 'কৃষ্ণ-চরিত্র'-এর চিত্রাবলী, প্রাচীন যবদ্বীপীয় 'কবি' (kawi) ভাষায় 'মহাভারত'-এর গদ্য অনুবাদ—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রচারকদের কীর্তি। একটা মজার বিষয় লক্ষণীয় যে যবদ্বীপীয় 'মহাভারত'-এ অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কথাও নেই, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের কথাও নেই, উপরন্তু যুধিষ্ঠিরের পত্নীরূপেই দ্রৌপদীকে গণ্য করা হয়েছে। ইন্দোচীনের কম্বুজদেশে অঙ্কর-বাৎ-এর বিষ্ণু মন্দির, এই মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ 'রামায়ণ'-চিত্র, শ্যামী ভাষায় 'রামকিয়েন্' বা 'রাম-কথা'—কম্বুজের খ্মের জাতি, শ্যাম-রাজ্যের মোন্ জাতি, মালয় উপদ্বীপের মালাই (malay) জাতি, বলিদ্বীপীয় ও যবদ্বীপীয় অধিবাসীগণের মধ্যে প্রচলিত রামায়ণী উপাখ্যান—ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। চম্পা বা কোচিন-চীনে চাম (cham) জাতির লোকেরা এখনও বিকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালন করে। শ্যামদেশীয় মহাচক্রী রাজবংশের প্রত্যেক রাজা 'রাম' নামে অভিহিত। যবদ্বীপীয় জনশ্রুতিতে রাম ও সীতা মানবজাতির আদি পিতা ও মাতারূপে কল্পিত হয়েছেন। যবদ্বীপের লোকেরা বর্তমানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও ছায়ানাট্য ও নৃত্যনাট্যের ভিতর দিয়ে 'রামায়ণ'-মহাভারত'-এর কাহিনীগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের ধারণা যে এই সব কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনা যবদ্বীপেই ঘটেছিল। এজাতীয় বিশ্বাস থেকে সূচিত হয় যে বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ ধীরে ধীরে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করে। (পৃঃ ১৪—৪১)

মনিপুরীরা ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি গোষ্ঠী, কিরাত-রূপে পরিচিত গোষ্ঠীর একাংশ। এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, বাংলা লিপি। অর্জুনের আগমন সংক্রান্ত ঐতিহ্যের অনুসরণে মণিপুরের কয়েকটি স্থানের নামকরণ হয়েছে। বৈদিক সাত গোত্রের অনুকরণে মণিপুরী গোত্রের কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। যথা, অঙোম্ বা ভরদ্বাজ-গোত্র, লুরাঙ্ বা কাশ্যপ গোত্র ইত্যাদি। (পৃঃ ১৭৮, ১৮৩, ১৮৮)

দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছে। সে কাহিনীও কম বিস্ময়কর নয়। দ্রমিড়্-এর রূপান্তর হচ্ছে তমিল, আমরা

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় বা তামিল রূপটির সঙ্গে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অন্তর্গত চতুর্বর্গের ধারণা দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। তামিল ভাষায় ধর্ম হচ্ছে অরম্, অর্থ হচ্ছে পোরুল্, কাম ও মোক্ষ হচ্ছে যথাক্রমে ইন্‌পম্ ও বীটু। তামিল কবি তিরু বল্লুবর্-এর কুরল বা মুপ্পাল কাব্যে প্রথম তিন বর্গ আলোচিত হয়েছে। মুপ্পাল-এর অর্থ প্রথম তিনটি বর্গ। চারিটি বর্গকে বলা হয় নার্-পাল। সংস্কৃতের প্রভাব যেমন তামিলের উপর পড়েছে, তেমনি সংস্কৃতে তামিল প্রভাবের নিদর্শনও রয়েছে। সংস্কৃত 'নগর' শব্দটি এসেছে তামিল থেকে, এর মূল অর্থ ছিল বাসভূমি, প্রাসাদ। (পৃঃ ৪৮—৫২, ৫৭, ৫৮, ৬৭)

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে চীনদেশীয় দার্শনিক লাওৎসির নামে প্রচলিত 'তাও-তেঃ-কিঙ্' গ্রন্থ সংস্কৃতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদ-পুস্তক বর্তমানে অবলুপ্ত। তাও-তত্ত্বের অর্থ হচ্ছে পথ। সুনীতিবাবুর মতে তাও হচ্ছে বৈদিক ঋত-কল্পনার সজাতীয়। (পৃঃ ১০১—১০৫)

তুর্কী ও ইরানীদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়ের পর ইসলামীয় সুফী সাধন-তত্ত্ব ভারতে প্রচারিত হয়। সুফী আদর্শ হচ্ছে মারিফৎ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। গ্রীক gnosis, নসিস থেকে মারিফৎ-এর ধারণা এসেছে। সুফী মন্ত্র অন-ল্-হক্ বাঙ্গালি সমাজে সুপরিচিত। এর অর্থ—"আমিই সত্য।" এর অনুরূপ হচ্ছে উপনিষদীয় মহাবাক্য—"অহং ব্রহ্ম অস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। সুফী মন্ত্রের উপর বেদান্তের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। এই মন্ত্রের সাধক মন্সুর-এর প্রাণদণ্ড-কাহিনী একটি ঐতিহাসিক বিয়োগ-নাট্য। মন্সুর-এর ভারতে আগমন যদি নিরর্থক না হয়, তাহলে তাঁর উপর বেদান্ত-মতের প্রভাব অনুমান করবার একটি সূত্র পাওয়া যায়। (পৃঃ ১১৫—১১৮)

সুফী মতের মধ্যে গ্রীক নব্য-প্লাতোনিক ধারা এবং সম্ভবত বেদান্তের ভাবধারা একত্র মিলিত হয়েছে। সুফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ফলে ঈশ্বরকে মাশূকা বা প্রেমাস্পদা নারীরূপে কল্পনারীতি দেখা দেয়। হাফেজের কবিতায় মাশূকা-কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে। সুনীতিবাবু বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে সুফী প্রভাব অনুমান করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রায় জনক-স্বরূপ রূপ ও সনাতন ফারসী ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁদের পক্ষে মাশূকা-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। বৈষ্ণব মধুরভাবের সাধনায় ঈশ্বর প্রেমাস্পদরূপে গণ্য হয়েছেন,

ঈদৃশ ধারণায় প্রচ্ছন্ন স্ফী প্রভাব থাকতে পারে। (পৃঃ ২২০, ২২১, ২৩২, ২৩৩)

এস্থলে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন-রীতিতে জীবের আরাধ্য যুগল মূর্তি, রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব, শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নন। জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক ঠিক প্রেমিকা ও প্রেমিকের সম্পর্ক নয়, কেননা সিদ্ধ অবস্থাতেও জীব রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার পেতে পারে না। জীবের লক্ষ্য রাগানুগা ভক্তি। সিদ্ধ জীব রাধার দাসী, অর্থাৎ মঞ্জরী-রূপ প্রাপ্ত হয় এবং রাধার সেবাধিকার লাভ করে। জীবের পক্ষে মধুর ভাবের তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণী হওয়া নয়, পরন্তু রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অপ্রকট প্রেম-লীলা উপভোগ। এই কল্পনার সঙ্গে স্ফী কল্পনার সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয় না। স্মতরাং স্ফী প্রভাব আন্দাজ করা কঠিন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মধ্যযুগের কবীর প্রভৃতি সন্ত সাধকেরা আংশিকভাবে স্ফী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

স্নীতিবাবু বিভিন্ন দেশের মধ্যে, বিবিধ জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়-স্চক উপকরণ সংগ্রহে দক্ষ। তাঁর সংগ্রহের দ্বারা diffusionism বা সাংস্কৃতিক বিকিরণবাদ শক্তি সঞ্চয় করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো সংস্কৃতিই যে বিশুদ্ধ নয় বা বহিঃপ্রভাবমুক্ত নয় এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত, এর ফলে পরমতসহিষ্ণুতার দুস্তর বাধাগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হবে এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির বিকাশ হবে সহজতর।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা

রাম বসু

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন একজন কবি যাঁর প্রতিটি কবিতা সযত্ন অভিনিবেশের দাবি রাখে এবং বিতর্কমূলক হয়ে ওঠে। নিন্দা বা প্রশংসার বাঁধা বুলি বাদ দিয়ে যে প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তা হচ্ছে কবিতার স্বরূপ। অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন এক জাতের কবিতায় হাত পাকিয়েছেন যা কাউকে রীতিমতো পীড়িত করবে এবং কাউকে দেবে গভীর তৃপ্তি। কেউ বলবেন: ওটা কবিতা হলো না, ও একটা ভালো রিপোর্টাজ। কেউ বলবেন: ওটাই কবিতা, ওর মধ্যে আমি আমার মুখ দেখতে পেয়েছি। সিদ্ধির কথা বাদ দিলাম। সময় একমাত্র তার বিচারক। আর শেষ বিচারে ব্যক্তিগত ভালো লাগাই তো কবিতার পক্ষে বড় কথা। কিন্তু যে কবিতা কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্ন তোলে সে কবিতার বিরাট তাৎপর্য নিশ্চয়ই থাকে। কারণ, প্রত্যেক সার্থক কবিতা তো এক হিসেবে কবিতার নতুন সংজ্ঞা; বিশেষ করে একেবারেই এই সাম্প্রতিক কালে যখন অধিকাংশ কবিই প্রথাসিদ্ধ কবিতা রচনার জন্য প্রবল উৎসাহে চঞ্চল।

চাঞ্চল্য যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে অনুপস্থিত এ কথা বলা যায় না। তিনিও সময়ের টান নাড়িতে অনুভব করেছেন এবং সেই টানের জোরে পরিবর্তন এসেছে তাঁর চেতনায়। 'পদাতিক'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'যত দূরেই যাই'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তফাৎ কোনো পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এই পরিবর্তন আচমকা নয়। একটা বিশেষ ধারা অনুসরণ করে এই পরিবর্তন এসেছে বলেই তা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারার পরিণতি সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই যায়।

আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিশেষ ধারা দুটি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমটি হলো: নিজের ভাবনাকে বৃহত্তর মানুষের ভাবনা এবং বৃহত্তর মানুষের ভাবনাকে নিজের চেতনার অঙ্গীভূত করে নেবার প্রবণতা বা দীক্ষা। দ্বিতীয়টি হলো: আবেগ এবং সমগ্র

যত দূরেই যাই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন। তিন টাকা।

কবিতাকে অবজেকটিভাইজ করার দুঃসাহসিকতা। দুঃসাহসিকতা শব্দটি আমি অতি সচেতন ভাবে প্রয়োগ করেছি। কারণ অতি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে সাবজেকটিভ হবার জন্য ছুটেছে এবং তখনই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আপন স্বভাবের প্রতি বিনীত নিষ্ঠায় তাঁর কবিতার অনিবার্য নিয়তির দিকে চলেছেন। এই যাত্রায়, এখন যতদুর দেখা যাচ্ছে, তিনি একা এবং তাঁর অনুজেরাও সম্ভবত দিশাহারা। অথবা অনুজেরাও তাঁদের নিজস্ব স্বভাব আবিষ্কার করার জন্য নিঃসঙ্গ, যা তাঁদের অগ্রজ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের মুক্তি হলো তাঁর দেশ। এই দেশ বলতে চলতি কথার স্বদেশপ্রেম বা রাজনীতির প্রাধান্য বোঝায় না। এই দেশ বলতে বোঝায় ধ্যান-জাত আধ্যাত্মিক আশ্রয়, যা বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন নামে ও স্বরূপে ধরা দেয়; যা প্রত্যেক কবিতার অন্বিষ্ট। তাই জীবনের জটিলতা যত দুঃসহই হোক, সহজ বিশ্বাসের ওপর যত প্রতারণাই নামুক, কবি অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর লক্ষ্যকে গেঁথে নিতে পারেন বর্শাফলকে :

> "আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
> নিকানো উঠোন
> সারি সারি
>   লক্ষ্মীর পা
> আমি যত দুরেই যাই।"

এ কি ন্যসটালজিয়া? সে গ্রাম তো ভেঙে যাচ্ছে, শহর বাড়ছে। থাকছে না নিকানো উঠোন। লক্ষ্মীর পা আঁকার রেওয়াজ তো মুছে গেল কলকাতার সংকর কালচারের কৃপায়। এ বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে সচেতন নন তাও মনে হয় না। তিনি সম্ভবত ভালো ভাবেই জানেন যে আজকের এই বিকৃতি, তা যত অন্ধতম হোক, চিরস্থায়ী নয়। আধা-ইংরেজী আধা-বাঙালী কালচারের আবিলতা বা শৌখিন বিশ্বমানবিকতার সুলভ পোশাক যত মোহাবিষ্টই করুক না কেন, বাংলার মানুষ নিজস্ব প্রাণধর্মের তাগিদেই তার দেশের আত্মা, এবং সে জন্য তার নিজের আত্মাকে, আবিষ্কার করবেই অন্য এক 'গোরা'-র মতো। এ প্রয়াস আজ যত বিক্ষিপ্তই হোক আগামী দিনে সংহত হতে বাধ্য।

নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করার তীব্র পদ্ধতি, হয়তো অজ্ঞাতসারে,

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে বলেই তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাবলীতে বিশেষ চরিত্র স্থান পাচ্ছে। সে চরিত্রগুলি নিজের জোরে চরিত্র হয়ে উঠছে এবং কবির ভূমিকা সেখানে নিতান্ত নগণ্য। প্রসঙ্গত ধরা যাক 'পাথরের ফুল'। গোটা কবিতা একটা পবিত্র জ্বালায় অভিষিক্ত। সেখানে গড়-পড়তা জীবনের নোংরামি ভণ্ডামি ক্লেদ আছে। আছে শাণিত চাবুক। 'পদাতিক' কিম্বা 'চিরকুট'-এর যুগে হলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বোধহয় এখানেই থেমে যেতেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার পর বোঝা গেল ওই নঙর্থক দিকটি যথেষ্ট নয়। তাই চাবুকেও আনন্দ কম। বিদ্রূপের তলায় কাজ করে গভীর বেদনা। এই বেদনাবোধই আমাদের আরও কাছে টেনে নেয়।

"ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।"

এবং আমরাও "শুধু কথায় তুষ্ট" হতে চাই না; আমরাও যেতে চাই

"কথার সেই উৎসে
নামের সেই পরিণামে
জল মাটি হাওয়ায়।"

উক্তির এই বিশেষ কোমল ভঙ্গিটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক অর্জন। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখা গিয়েছে ঘোষকের ভূমিকায় অথবা দেখা গিয়েছে প্রফেটিক্ উক্তির আতিশয্যে। সেখানে নিজেকে বোঝা ও বোনার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বোঝানোর ব্যাকুলতা। আলোচ্য গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্য ভাবে উপস্থিত। এখানে কথা বলার ভঙ্গি বড় ব্যক্তিগত ও ঐকান্তিক। এখানে কবি নিজেকে ও পরিবেশকে একই সঙ্গে গেঁথে নিতে চাইছেন এবং সে জন্য এই কবিতা পেয়েছে লিরিকের তীব্রতা। এই প্রসঙ্গে 'যেন না দেখি', 'কে জাগে' বা 'এখন যাব না' বিশেষ করে স্মর্তব্য।

ভঙ্গি যেহেতু ব্যক্তিগত সেহেতু প্রচলিত অর্থে ছন্দ আর কবির বাহন নয়; যদিও প্রচলিত ছন্দে নতুন জাদুমন্ত্র দিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওস্তাদ। পর্ব মাত্রা মিলের মধ্যে একটা বাইরের জিনিস থাকে। সেটি শোভন শালীনতা। কিন্তু গদ্যছন্দ তাৎক্ষণিকতার উক্তি; মানুষের সমগ্র সেখানে কথা বলে। পর্বের বাঁধাধরা ওঠানামা ঘুচে গেলে শব্দের নিয়মিত ধ্বনির

বদলে আসে স্বাভাবিক ও স্বনির্বাচিত ধ্বনিমাহাত্ম্য ; যা উদ্ভূত হবে শুধু মাত্র কবিতারই তাগিদে। অভ্যাসের দাসত্বে যা মলিন তাতে অনুভূতির দীপ্তিও বিড়ম্বিত হয়, যেমন পারা-ঝরা আয়নায় মুখ দেখা। যেহেতু কবিতায় নিজেকেই নিজে আবিষ্কার করতে হয় এবং সেই আবিষ্ক্রিয়ার পথ যেহেতু বন্ধুর তাই প্রকাশের অনন্যতা পূর্বনির্দিষ্ট ছন্দের কাঠামোয় কিছুটা মেকি হবার আশঙ্কা থাকে বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সুনিপুণ ছন্দ-বিন্যাসীও অবশেষে নিরাভরণ গদ্যের কঠোরতায় নেমে আসেন। এই গদ্যেরও নিজস্ব গতি আছে। সে গতি যান্ত্রিকতার চাপে পীড়িত নয়। সে উক্তিও অনুভূতির বিশুদ্ধতায় দীপ্ত। আমি বলতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের খেয়াল অনুসারে প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করেন নি ; তাঁর কবিতার চরিত্রের জন্যই এই ছন্দ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। তবুও এই গদ্যে অভিপ্রেত মাহাত্ম্য কতদূর অর্জন করা যায় তা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। হুইটম্যান কিম্বা লরেন্স যে মাহাত্ম্য অর্জন করতে পারেন তারই সমতুল্য মাহাত্ম্য বাংলা শব্দের গঠনের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা তা এখনও দেখার বিষয়। 'বাইবেল'-এর সামস্‌গুলি গদ্যে রচিত। কিন্তু সে এক অসাধারণ কবিতা ; পৃথিবীর বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে অনুরূপ মহান গদ্য কবিতা রচনায়। সামস্‌গুলি একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। তাই ইংরাজ কবিদের কাজ আমাদের তুলনায় কিছুটা সহজ। আমাদের এমন ধরনের ঐতিহ্য নেই। আমাদের শাস্ত্র ছন্দে রচিত। আমরা তাই সহজে প্রাচীনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি না। আমাদের গদ্য-ছন্দকে তার শ্রমলব্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে। সুখের কথা প্রচলিত ছন্দে শিক্ষিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য ছন্দকে সমান আগ্রহে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় শব্দের সঙ্গীত যদিও মাঝে মাঝে গড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যাচ্ছে, তবু বিশ্বাস রাখি একটি দুঃসাহসিক প্রয়োজন তিনি সিদ্ধ করবেন।

আবেগ এবং সমগ্র কবিতাকে অবজেকটিভাইজ করার আগ্রহ যেহেতু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাবের মধ্যে নিহিত, তাই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা, প্রাত্যহিকতার নিরাভরণতা তাঁর কবিতায় অঙ্গীকৃত। অর্থাৎ আমরা যাকে চলতি কথায় একজলটেড পোয়ট্রি বলে থাকি অধুনা সুভাষ মুখোপাধ্যায় তা লিখছেন না। সিঙ্গের কথায় বলা যায় যে মানুষ যখন ছোট ছোট দোকানঘর তৈরি করার আনন্দ হারায় তখন তারা সুন্দর সুন্দর গির্জাও নির্মাণ করতে পারে না।

স্থভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো আমাদের জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে গভীর তাৎপর্যে ভূষিত করতে চান। 'দিনান্তে', 'পোড়া শহরে', 'লোকটা জানলই না', 'আলো থেকে অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতায় এই উক্তির প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে এই কবিতাগুলি একটি মাত্র চিত্রকল্প বা একটি মাত্র উক্তিকে আঁকড়ে থাকে। যেমন 'পা রাখার জায়গা' শীর্ষক কবিতার শেষ পংক্তি ঃ

"ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া করে
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা।"

দীর্ঘ বর্ণনা, যা মাঝে মাঝে অনাবশ্যক, ও ভাবনার পর লোকটা যখন পা রাখার জায়গার জন্য আবেদন জানায় তখন পাঠকের মনে হয় এই বাসটি রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একটা যাত্রীবোঝাই বাস নয়, এই বাসটা জীবন। অথবা ধরা যেতে পারে 'দিনান্ত' কবিতায় সূর্য, সন্ধ্যা ও হাওয়ার তিনটি চিত্রকল্প। এই সব কবিতার সবচেয়ে বড় অস্থবিধা হলো এই যে পাঠকেরা আগে থেকেই সচেতন হয়ে ওঠে স্টাণ্ট জাতীয় নাড়ার জন্য এবং এই সচেতনতা কবিতার পক্ষে ক্ষতিকারক। এমন ধরনের তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে সার্থক কবিতা রচিত হয়েছে ইওরোপে এবং রবীন্দ্রনাথও করেছেন। কিন্তু সেই সব কবিদের একটা বড় স্থবিধা এই ছিল যে তাঁরা সবাই জীবনের আধিভৌতিক ভিত্তিভূমি বা মেটাফিজিক্যাল বেসিসকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বদ্লেয়রের গদ্য কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই স্থবিধা নেই। এবং নেই বলেই জীবনের এই জটিল প্যাটার্নকে যতটা আত্মস্থ করার দরকার ততটা হয় নি বলে বোধ হয়। আরাগঁ এলুয়ারের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁদের কবিতা সংবাদপত্র। আগামী দিনের পৃথিবীর সংবাদ সেখানে পাওয়া যাবে। যে মানুষটা জন্মাচ্ছে তার জটিল পদ্ধতি ও যন্ত্রণা স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সার্থক ভাবে ধ্বনিত হোক অনুজ হিসাবে এই প্রার্থনাই আমি করি।

আমার ধারণা 'যত দূরেই যাই' কবির স্বেচ্ছা-আরোপিত স্থন্দর সংকট ও সংকট থেকে উত্তরণের শ্রদ্ধেয় প্রচেষ্টা হিসাবে পাঠকদের কাছে আদৃত হবে এবং এই কবিতার পরিণতি কোন দিকে সেই বিষয়ে চিন্তা করার স্থযোগ দেবে।

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

হিরণকুমার সান্যাল

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক; তার পরিণাম অকল্পিত। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' বইতে লিখেছেন যে ১৩২২ সালের ৪ঠা পৌষ 'ডাকঘর' নাটকের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের বলেছিলেন: "ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।...প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে।" এই সময়ে, অর্থাৎ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হবার কিছু দিন পরে, শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে তিনি লিখেছিলেন: "মা, আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নাই কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই বলবে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছে বিদায় নেব।" এর এক বছর পরে বিদেশ যাত্রা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল চিকিৎসার জন্যে। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর পর্বের এই সূচনা। এরপর শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিহার।

'পথ ও পথের প্রান্তে' বইতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন: "কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।" রবীন্দ্র-সদনের রাশি রাশি কাগজপত্র ঘেঁটে এই অপ্রকাশিত বৃত্তান্ত অন্তত একজন বাঙালি যতটা উদ্ধার করতে পেরেছেন তা অসম্পূর্ণ হলেও তার দাম খুব বেশি এ কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব। এই বৃত্তান্ত* যে মূল্যবান তার কারণ শুধু কবির ভ্রমণবৃত্তান্ত নয় পৃথিবীর নানা দেশের অগণিত নরনারীর মনে রবীন্দ্রনাথ কি রকম আশ্চর্য সাড়া জাগিয়েছিলেন তার অনেক দৃষ্টান্ত লেখিকা

---

*বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ॥ মৈত্রেয়ী দেবী। গ্রন্থম। সাড়ে সাত টাকা॥

এই বইটিতে সংগ্রহ করেছেন। এই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ না হলেও বিষয়গুণে মনোজ্ঞ, আরো মনোজ্ঞ হয়েছে লেখিকার সাবলীল লিপিকৌশলে।

রবীন্দ্রনাথ সবশুদ্ধ বারো বার বিদেশযাত্রা করেন; তার মধ্যে সতেরো ও উনত্রিশ বৎসর বয়সের বিদেশভ্রমণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তৃতীয় বার একান্ন বৎসর বয়সে তিনি যখন বিলেতে যান—যদিও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা, যা পুরোপুরি সার্থক হয়েছিল—তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি গান ও কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদের খাতাটি কবি লণ্ডনে পৌঁছে দিলেন তাঁর বন্ধু রোটেনস্টাইনের হাতে। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন: "সেই শুভ মুহূর্ত থেকে তাঁর দিগ্বিজয়ের শুরু।" অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের ছাড়পত্র হলো ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'।

এই দিগ্বিজয়ের অনেক কথা জানা—অনেক নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু সমাদর পান নি, তীব্র সমালোচনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, কিংবা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো হয় নি, কেননা অনেক অপ্রিয় কথা তাঁর কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের নথিপত্রের মধ্যে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যায় যার মূল্য শুধু সাহিত্যিক নয়, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকও বটে। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত একটি ইংরেজি বইতে এই জাতীয় জিনিসের অনেক নমুনা পাওয়া যায়। বইটির নাম 'Rabindranath Through Western Eyes', লেখক এ. অ্যারন্‌সন্‌। ঐ সময়ে তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ হতে না হতেই সারা ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে আরম্ভ হলো তুমুল আলোড়ন—কবি ও তাঁর কাব্য উভয়কে নিয়ে। ইওরোপ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছিল অ্যারন্‌সন্‌ তার একটি নমুনা দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের 'দ্য নেশন' কাগজ থেকে:

> "During his recent residence in London, it was a lesson in irony to watch his meditative figure and the face as harmless as a dove while he sat in unruffled silence among the flickering tongues of distinguished people who had never meditated in their lives, but no-

doubt, combined the wisdom of the serpent with its other qualities."

এই উক্তিটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ২৫ অক্টোবর। অ্যারন্‌সন্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "Tagore the man was a mystery to many... And his personality seemed to them ambiguous not because he was a poet, but because he was an Indian."

মোটকথা বলা যেতে পারে অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ ইওরোপীয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হলো কবি হিসেবে ততটা নয় যতটা মিষ্টিক হিসেবে—এবং যেহেতু মিষ্টিক অতএব ঋষি ও প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে কবিই বলতেন—ঋষির সাজ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরেন নি। কিন্তু এই সাজে তাঁর বিশেষ আপত্তিও ছিল না। ("True enough, the robe of the prophet he may not have donned himself but he did not decline it when others offered it to him." :—'The Economic Weekly,' Bombay, May 13, 1961)

ক্রমশ বিদেশে তাঁর কবিখ্যাতি হলো ম্লান কিন্তু অপরদিকে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর উদার মানবিকতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক জগতের বিশিষ্টতম মানুষদের অন্যতম বলে সর্বদেশে স্বীকৃত হলেন। এই স্বীকৃতির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে। এইগুলি লেখিকা বহু আয়াসে সংগ্রহ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বোধহয় সময়ের অভাবে আরো অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি আমাদের দিতে পারেন নি—সময়ের অভাব, কেননা, রবীন্দ্রনাথশতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে বইটি প্রকাশ করার তাগিদ ছিল। আর একটি অসুবিধা ছিল সব বিদেশী ভাষা না জানা—যেমন জার্মান।

লেখিকা জার্মান দার্শনিক কাউণ্ট কাইসারলিং-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের কথা ও তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী উৎসবের কথা উৎসাহের সঙ্গে উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন এই যজ্ঞের "যদি কোন পূর্ণ ছবি আমার মনের সামনে থাকত তবেই আমি তা আমার পাঠকদের কাছে আঁকতে পারতাম।" এই উদ্দেশ্যে লেখিকা শরণাপন্ন হয়েছিলেন "দেবতুল্য" কাউণ্টের পুত্রের। অনুমান হয় এই যোগাযোগ ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। খানিকক্ষণ সেই সময়কার জার্মান কাগজপত্রের পাতা উলটে প্রখ্যাত কাউণ্টের

"গৃহহীন অজ্ঞাতপরিচয়" পুত্র লেখিকাকে বললেন, "এই কাগজগুলি পড়ে আমার ধারণা হল যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে জার্মানিতে এমন উন্মাদনা এসেছিল যে তাঁর হাতে যদি টাকা থাকত তিনি যদি একটু ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে অর্ধেক জার্মানী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসত।"

মৈত্রেয়ী দেবীর বই থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিরোধিতাও কিছু হয়েছিল। কাউণ্ট-তনয় তাঁকে বলেন, "এই সব ঈর্ষা-প্রসূত কথা শুনে আমার বাবা ভারি চটে গিয়েছিলেন—কবির কাছে সহজে কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না। পাছে রবীন্দ্রনাথকে বাজে লোকে বিরক্ত করে তাই কাউণ্ট কাগজে এক বিবৃতি দেন যে যাঁরা "এই ঋষির সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে, গভীরভাবে, সত্যসত্যই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, পূর্ব পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান, তাঁরা আসুন, অন্যরা বিরত হন।" এরপর ডার্মস্টাট (অর্থাৎ ধর্মনগর)-এ তাঁর 'উইস্‌ডম্ স্কুল'-এ রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে কাইসারলিং যে বন্দনা রচনা করেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী তার ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। বন্দনাটি এক মজার জিনিস বটে।

"ওঁ প্রজ্ঞার দেবতা পবিত্র গণেশকে নমস্কার। অস্তাচলের দেশে ধর্মনগর নামে একটি নগর আছে—সেখানে রবীন্দ্রের বন্ধু এক ক্ষত্রিয় বাস করে। সে একটি বিদ্যালয় করেছে এবং তার কাছে তিনি এসেছেন। তাঁর এই ক্ষত্রিয় বন্ধু এতদিন অস্তাচলের দেশের রীতিতে যা শিখিয়ে এসেছে—যে রাজকীয় জীবনের কথা, জ্যোতির্ময় সত্তার কথা বলে এসেছে, আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষের কাছে মূর্তি ধরে সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত একের বিগ্রহ মূর্তি আজ পূর্বদেশ থেকে এসেছেন।"

প্রায় ঐ সময় থেকেই জার্মানিতে নাৎসিবাদের পূর্বাভাস বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। বছর দশেক পরে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'দেবতুল্য' কাউণ্টের কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> "But it is clear, nevertheless, that neither the materialism, nor its collectivism, nor, above all, its Satanism are true to our profoundest and most essential aspirations. The Russian Revolution is a more magni-

ficent confirmation of the truth of the myth of Lucifer than any event of ancient history."

কোথায় 'রাশিয়ার চিঠি'র লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কোথায় 'দেবতুল্য' দার্শনিক কাউণ্ট!

কাউণ্টের আর একটি উক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে :

"A Republican, a Democrat, a Protestant, who is inwardly bound by the belief in definite forms, is infinitely less free from the point of view of the spirit than an aristocrat, nay even a tyrant, who lives according to the law of his own creative conscience."

'দেবতুল্য' কাউণ্টের ফ্যাসিবাদ এখানে প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'Rabindranath Through Western Eyes'-এর লেখক অ্যারন্সন্-এর মতে ডার্মস্টাট-এর উৎসবের পিছনে ছিল কাইসারলিং-এর চক্রান্ত। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসবের উল্লেখ করে তাঁর 'On The Edges of Time' বইতে লিখেছেন : "কাউণ্ট কাইসারলিং ও গ্র্যাণ্ড ডিউক হেস এক রবিবার আমাদের মোটরগাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যান। একটি বাগানে গিয়ে আমরা মোটর থেকে নেমে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি—এই সব লোকজন এসেছিল ছুটির দিনে আমোদ করতে। কাছেই ছিল ছোট্ট একটি পাহাড়। বাবাকে নিয়ে যাওয়া হলো এই পাহাড়ের উপর। সেখানে উঠে একটি পাথরের বেঞ্চিতে তিনি বসলেন। তারপর জনতা তাঁকে ঘিরে হঠাৎ শুরু করল গান—গানের পর গান। প্রায় দু-হাজার লোক জড় হয়েছিল। তাদের কেউ নেতা ছিল না। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তারা যে গান গেয়ে গেল তাতে কোথাও একটু বেসুর ছিল না। জার্মানি ছাড়া আর কোথাও এই ব্যাপার সম্ভব নয়"।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে অ্যারন্সন্-এর মন্তব্য :

"Did Rabindranath know that most of these songs were of a narrow nationalistic kind, that the rather nauseating sentimentality of this summer morning on the mountain near Darmstadt, was not in the least spontaneous, but was very well rehearsed beforehand,

especially the singing of the German National Anthem? Did he know of the contemporary accounts of this modern version of the Sermon on the Mount in the daily press and the way it was exploited by the chauvinist right-wing parties? We are afraid he did not."

কাইসারলিং ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে অ্যারন্‌সন্‌-এর মন্তব্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"In one way, at least, this strange friendship is fascinating and not without pathos. For here we see two great men belonging to the same age, the western philosopher with a leaning towards the East and the Eastern poet with a leaning towards the West, struggling side by side for certainty and truth, until their paths separate for ever, one being engulfed by the rising tide of Teutonic fanaticism and the other becoming more and more 'acutely conscious of the menace to man' and fearlessly fulfilling his destiny through 'insult and isolation'. But nothing made Rabindranath politically more conscious of this menace than his experience in Italy..."

কাইসারলিং-এর মতন লোকেদের চক্রান্তের কথা মনে করেই বোধহয় ঐ সময়ে জার্মানির এক সমাজতন্ত্রবাদী কাগজে লিখেছিল :

"Although he delivers his lectures before the privileged classes, we should not condemn him therefore. The bourgeoisie wants to draw him towards her, wants to fill her own emptiness with his abundance. Europe praises you as a poet and a seer; but it does not know and it does not search for your path. For those, who search it, are by pillars bound. They groan in their chains—

they rise menacingly—and one day they will break them. And the earth will tremble with their triumphal shout—Freedom."

জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব। ফ্রান্স্ বা ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের মুগ্ধ করেছিলেন তাঁরা ঐ দুই দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী, কিন্তু জার্মানিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে বরণ করেছিল ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'On The Edges of Time' বইতে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মোটর গাড়িতে সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণের সময়ে তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হন রেল লাইন থেকে দূরে ছোট্ট একটি গ্রামে। সেখানে হঠাৎ তাঁদের দেখা হয় জার্মানভাষী এক কৃষকের সঙ্গে; তাঁর বাড়ি রবীন্দ্রনাথের বইতে ভরা, অবশ্য জার্মান অনুবাদে ও রবীন্দ্রনাথ বলতে তিনি প্রায় অজ্ঞান। এই কৃষকটির বোনও তথৈবচ। তাঁর বিশেষ প্রিয় বই ছিল 'চিত্রাঙ্গদা', 'ঘরে বাইরে' ও 'ডাকঘর'-এর জার্মান অনুবাদ। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি ঐ বইগুলি থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাতেন ঐ গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের। এই মহিলাটির জীবিকার উপায় ছিল নানা ভারতীয় নকসা-আঁকা চামড়ার কুশন তৈরি। এই সব নকসা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বটতলার এক 'রামায়ণ' থেকে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন যে কোথা থেকে যে তিনি ঐ বইটি সংগ্রহ করেছিলেন তা এক রহস্যের ব্যাপার।

১২২১ সালে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের বই লক্ষ লক্ষ বিক্রি হওয়া সত্ত্বেও জার্মান মার্ক-এর অসম্ভব মূল্যহ্রাসের জন্য তাঁর প্রাপ্য মুনাফার অঙ্ক প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়েছিল।

উপযুক্ত মুনাফা পেলে বিশ্বভারতীর অর্থ সমস্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ রেহাই পেতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে তা ছিল না। ইতিপূর্বে ১৯১৬ সালে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তাঁর যে প্রচুর অর্থ পাওনা হয়েছিল তাও তাঁর হাতে পৌঁছয় নি, কেন না যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ওপর হিসেবনিকেশের ভার ছিল হঠাৎ তা হল দেউলে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন শেষ পর্যন্ত পিয়ারসন সাহেব অতিকষ্টে মাত্র কয়েক হাজার টাকা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন আর এই টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঋণ পরিশোধ করেন। এই ঋণ তিনি নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্যে স্যার তারকনাথ পালিতের কাছে। কিন্তু তারকনাথ তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁর উত্তরাধিকারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ঋণের টাকা কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছিলেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ বিদেশে গিয়েছিলেন রীতিমতো ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে। কিন্তু তাঁর ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে তাঁর পিতার আশা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কোটিপতিরা তাঁর ঝুলি ভরিয়ে দেবেন। তখনকার ধনকুবের ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মরগেনথো এই মর্মে তাঁকে আশাও দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মরগেনথো একদা তাঁর বাড়িতে এক ভোজসভায় ওয়ল স্ট্রীটের সেরা ধনকুবেরদের নিমন্ত্রণ করে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই নাকি তাঁর ধনী বন্ধু-বান্ধবকে এই বলে টিপে দেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য ভালো চোখে দেখবেন না। এর পর ধনকুবেরের দল একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যান।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর পিতার চরিত্র ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলভাবে। ভারতীয় ধনকুবের বরোদার মহারাজার কাছ থেকে মোটা টাকা পাওয়া যেতে পারে এই রকম আভাস পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সুইটজ্যারল্যাণ্ডে মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর হোটেলে। নানা কথার পর টাকার কথা উঠলে কবি মহারাজাকে বললেন, দেখুন, আমার হাতে যে টাকা দেবেন ধরে নেবেন তা জলে দিয়েছেন। মহারাজা মহানুভব ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঠিক জলে টাকা দেবার মতো প্রবৃত্তি তাঁর হয়নি।

ইটালির ব্যাপারটি রবীন্দ্রজীবনের খুব প্রীতিকর অধ্যায় নয়—মৈত্রেয়ী দেবীর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও। কাইসারলিং যে 'টাইরাণ্ট'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন, ইটালিতে তিনি সশরীরে আবির্ভূত হন মুসোলিনিরূপে। তাঁর ও তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গীর, বিশেষত অধ্যাপক ফরমিকির, চক্রান্তে রবীন্দ্রনাথের ইটালিতে নিমন্ত্রণ হয় ১৯২৬ সালে। মুসোলিনির আতিথ্যে ও ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসোলিনির আলাপের একটি অনুলিপিতে। এই অনুলিপির লেখক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই ভ্রমণের পালায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। এই বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা মূল কাগজপত্র সম্ভবত রবীন্দ্রসদনে আছে।

রবীন্দ্রনাথ। আপনাদের অর্থাৎ ইওরোপের লোকেদের দৃষ্টি হলো বহির্মুখী

অর্থাৎ বস্তুনির্ভর আর প্রাচ্যের লোকেদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী। ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য প্রয়োজন এই দুইয়ের সমন্বয়ের।

মুসোলিনি। আমি তা মানি। প্রাচ্যের আছে অধ্যাত্মসম্পদ। আমাদের তা প্রয়োজন। বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। অধ্যাত্মজীবন না হলে আমরা পূর্ণতা লাভ করব না।

রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের শক্তি আছে কিন্তু নেই সৃষ্টির ক্ষমতা…

মুসোলিনি। সে কথা সত্য…

রবীন্দ্রনাথ। …প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের এক মহৎ সুযোগের সময় আজ উপস্থিত হয়েছে…

(মুসোলিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।)

রবীন্দ্রনাথ। রোম শহরে প্রমাণ পেয়েছি আপনার প্রবল ব্যক্তিত্বের। আপনি কি জানেন যে আপনার সম্বন্ধে বহু অযথা কথা রটনা করা হয়েছে? আমারও মনে অনেক সন্দেহ ও দ্বিধা ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে সে সব দূর হয়েছে বলে আমি আনন্দিত।

মুসোলিনি। আমি তা জানি। কিন্তু উপায় কি? আমাকে আমার কাজ করেই যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ। হয়তো নতুন এক রোম গড়ে উঠছে। আমি দেখছি নতুন সৃষ্টির সব লক্ষণ। স্বাধীনতা লাভ করার আগে কঠিন শাসনের প্রয়োজন আছে…আমার আশা আছে ইটালির ভবিষ্যৎ সুমহৎ। কিন্তু শুধু শক্তি ও পার্থিব সম্পদ কোনো দেশকে বড় করতে পারে না।…

ইটালি থেকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড। সেখানে রমঁ্যা রঁলা ও প্রবাসী ইটালিয়ানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মুসোলিনি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হলো। কিন্তু মুসোলিনি সম্বন্ধে তাঁর ঐ রকম বিভ্রান্তি হলো কি কারণে? অ্যারন্সন্-এর মতে "but this time his instinct went wrong, and instead of looking at Italy in terms of human nature and experience he indulged (as many other intellectuals at that time) in wishful thinking, self-deception and an unjustifiable optimism."

মনে রাখতে হবে অ্যারন্‌সন্‌-এর বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে যখন ফ্যাসিতন্ত্রের আসল চেহারা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তদুপরি তিনি জার্মান য়িহুদি ; তাঁর পিতামাতা জার্মানি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনে ; সুতরাং ছেলেবেলা থেকে তাঁর হাড়ে হাড়ে ছিল ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তিক্ততা।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২১ সালে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেকে য়িহুদি বলে অভিহিত করেছিলেন ও ভিয়েনার এক কাগজে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের আসল নাম 'রব্বি নাথন', ও তাঁর শ্বশুর ওপেনহাইমার নাকি বঙ্গের এক বিত্তশালী বংশ-ব্যবসায়ী। অ্যারন্‌সন্‌-এর বইয়ে এর উল্লেখ আছে।

মৈত্রেয়ী দেবীও অনেক মজার খবর দিয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ নাকি বার্ণাড শ-র একটি কার্টুন এঁকেছিলেন আর এই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাতের আগে বার্ণাড শ-র স্ত্রী স্বামীকে বলেছিলেন যে শুধু নিজে কথা না বলে তিনি যেন কবিকেও দু-চারটি কথা বলার সুযোগ দেন।

আর একটি মজার ঘটনা এই : আমেরিকাতে সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট কবির লম্বা পোষাকের একটি অংশ তুলে ধরে এক ওপরচালাক যুবক নাকি জিজ্ঞেস করেছিল : "Hey, what is this ! Is this a kind of bath robe ?"

এই ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এক সাংবাদিকের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে ঐ পোষাক শুধু বিদেশী এই বলেই বিদ্রূপের কারণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন যে আমেরিকার সান্টা বারবারাতে মেয়েরা তাঁকে দেখে হাসাহাসি করেছিল, কিন্তু তাদের লাবণ্য ও স্বচ্ছন্দ চলন-ভঙ্গিমার প্রশংসা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। "আমার সত্যি ভারি বেদনা হয় যখন তোমাদের স্বভাবে যা কিছু বিদেশী তা যদি তোমাদের নিজেদের জিনিষের চেয়ে ভালও হয়, তবু তার প্রতি তোমাদের এমন বিরুদ্ধতা দেখি।"

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ শুধু সম্মান নয় যথেষ্ট বিরুদ্ধতাও পেয়েছেন। এমন কি আমেরিকার শুল্ক বিভাগের এক উদ্ধত নিরেট কর্মচারী তাঁকে একদা জিজ্ঞেস করেছিল তিনি লেখাপড়া আদৌ জানেন কিনা। এই ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এন্‌ড্রুজ সাহেবকে এক চিঠিতে লেখেন :

"In the meantime their newspapers are hilariously impressed by this figure of an Oriental mystic coming

out of the railway train and also down from his cloudland of introspection, to the mundane world, dressed in a long robe and blue socks, graciously posing himself to be photographed. Yesterday I gave a lecture to a small group of students and some of them sat mopping their faces with powder puffs and some at the end came to shake hands with me. The President benignly pleased had a photograph taken later of a group composed of an Oriental fool and a member of the Nordic race who always minds his own purpose while the cost is paid by others less favoured by fortune.···This is a fit climax which had its first act in the Immigration Office, Vancouver." (লস এন্‌জেলস্‌, ২০ এপ্রিল,-১৯২৯)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক শ বছর পরে তাঁর যে প্রতিমূর্তি বিশ্বসভায় প্রতিভাত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এক বিরাট মানবের। এই মানুষটির অনেকখানি পরিচয় যা আমাদের অজানা ছিল তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ও রবীন্দ্রনাথের মুখের কথার বহু উদ্ধৃতিতে। লেখিকাকে এগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রভূত আয়াস করে। এ আয়াস সার্থক হয়েছে।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ইওরোপ ও আমেরিকায় বিস্তৃত হয় ঝড়ের বেগে। কিন্তু বিশ্বসভায় কবি হয়ে প্রবেশ করে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠলেন দার্শনিক, প্রফেট, মিষ্টিক। এইজন্যেই এজরা পাউণ্ড দুঃখ করে লিখেছিলেন: "আমার কাছে অবশ্য এ এক দুর্বোধ্য রহস্য রয়েই গেল যে, কেন এই দ্বীপবাসী সৎ লোকেরা এমন একজন পরম শিল্পীকে শুধু তিনি শিল্পী বলেই সম্মান দেখাতে পারে না। কেন যে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য তাঁর জীবনকে তুলোয় মুড়ে নীতিধর্মের প্রতীকরূপে ধ্বজা তুলে নিয়ে বেড়াতে হয়!" (মৈত্রেয়ী দেবীর অনুবাদ)

কিন্তু এই অঘটনের জন্যে রবীন্দ্রনাথই কি অনেকটা দায়ী নন? বিদেশী পাঠকরা তখন উন্মুখ হয়েছিল তাঁর বই পড়ার জন্যে। তাদের চাহিদা আর প্রকাশকদের তাগিদের চাপে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর কবিতার ও

নাটকের অনুবাদ একটির পর একটি প্রকাশকদের জুগিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের রচনার প্রতি সুবিচার করা মোটেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এ তো জানা কথা যে কবিতার অনুবাদ অসাধ্য। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধ্যসাধন করে থাকেন তার কারণ ইংরেজি গদ্যে ঐ গানগুলিকে তিনি একেবারে নতুন সাজে সাজিয়ে বিশ্বসভায় উপহার দিয়েছিলেন। তারপর ফরাসী শিল্পী জিদ্-এর হাতে পড়ে ঐ কবিতাগুলিরই ঘটল আশ্চর্য রূপান্তর। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যে কবিকে বাঙালি জানে অন্তরঙ্গভাবে, অবাঙালি ভারতবাসী বা বিদেশবাসী তাঁর কতটুকু পরিচয় পেয়েছে?

স্বভাবতই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, তাহলে এক অখ্যাত বাঙালি কবিকে ঘিরে ইওরোপ আমেরিকায় এক অভূতপূর্ব ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো কি কারণে? মৈত্রেয়ী দেবী এই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিয়েছেন মনে হয় না, কিন্তু অ্যারন্সন্ তা করেছেন। তিনি বলছেন রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কারণে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল: "Everyone of them had his own axe to grind, and Rabindranath became a useful and innocent tool which they knew how to handle for their own ulterior purposes. So it came about that he was unknowingly made to represent certain tendencies in the party-politics of various nations, that his name was freely used for the sake of either appeasing or inflaming national hatred; the various religious and pseudo-racial denominations used him for their own ends; the litterateurs were often uncritical and unnecessarily condescending..."

অবশ্য বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে দু-চারজন রবীন্দ্রনাথের কণামাত্র পরিচয় পেয়েও তাঁর কাব্য বুঝতে পেরেছিলেন অতি আশ্চর্যভাবে, যেমন, ইয়েট্স্, পাউণ্ড, জিদ্, ফসেট ("No poet has had a more constant sense of the wonder of the created world."), এমন কি বহুনিন্দিত এডওয়ার্ড টম্সন্, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রতি সমূহ অবিচার করেছিলেন ও মৈত্রেয়ী দেবী যাঁর নাম উল্লেখ করেছেন নির্বিচার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

কিন্তু এই বিজাতীয় ঘূর্ণাবর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। 'ডাকঘর' রচনার সময়ে তিনি অন্তরে যে ডাক শুনেছিলেন, "যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে—যেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে"—তা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মহত্তম ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। এই মিলনের অন্তরায় তিনি যখনই দেখেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার চরম দৃষ্টান্ত 'সভ্যতার সংকট'। তার পঁচিশ বছর আগে জাপানে ও আমেরিকায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র ও কুৎসিৎ রূপ উদ্ঘাটন করে বক্তৃতা দেন 'ন্যাশনালিজম্' বা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। এ তো অতি স্পষ্ট কথা (অবশ্য মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে নয়) যে ন্যাশনালিজম্ বলতে তিনি বুঝেছিলেন অংশত ইম্‌পিরিয়্যালিজম্ আর অংশত রাষ্ট্রের যান্ত্রিক শাসন যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে একেবারে চুরমার করে দেয়। কিন্তু তিনিই আবার দশ বছর পরে কি করে মুসোলিনির কুহকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। 'পার্‌সন্যালিটি', 'সাধনা', 'রিলিজিয়ন্ অফ্ ম্যান্' প্রভৃতি একটির পর একটি ইংরেজি গদ্যপ্রবন্ধের বইতেও তিনি জয়গান করেছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের। এই সব রচনার মধ্যে মূর্ত হয়েছে যে মহৎ সংবেদনশীল মন পাশ্চাত্ত্য জগৎ যদি তাতে মুগ্ধ হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তা নয়, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমের প্রাণবান জগতের সংস্পর্শে না এলে রবীন্দ্রনাথের মনে এতটা সাড়া জাগত না। আর এই প্রাণবান জগতের একটি অংশ সোভিয়েত রাশিয়াকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেছিলেন সে তো জানা কথা।

কিন্তু 'ন্যাশনালিজম্' ছাড়া অন্যান্য ইংরেজি গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রায় শুধু অধ্যাত্মসাধক রবীন্দ্রনাথের। সম্প্রতি শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ—যা প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ইউনিভারস্যাল ম্যান' নামে—ইংরেজিভাষী জগৎকে একটু চমক লাগিয়েছে মনে হয়। কেননা এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দ্য টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্‌লিমেণ্ট' লিখেছিলেন: "এতদিন রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানতাম শুধু মিষ্টিক হিসেবে কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি পড়ে জানা গেল তিনি ছিলেন সংগ্রামশীল আদর্শবাদী

(embattled idealist), কেননা চিরজীবন তিনি কুশাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন।"

এ কথায় আমরা গৌরব বোধ করব নিশ্চয়। কিন্তু তবু আমরা বলব রবীন্দ্রনাথ ইওরোপকে দিয়েছেন "অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি"। তাই ইওরোপে তাঁর কবিযশ এত অল্পদিনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিশেষ বন্ধু স্টার্জ মুর ১৯৩৫ সালে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

> "Immediately after the war there had been a violent reaction towards hope and generosity but it was short-lived and people are no longer thirsty for spirituality and beauty, but relish cynicism, pessimism and mechanical cruelty. Just as your work fed the first reaction, it now seems tasteless to the second···You have had a myriad lovers in your lifetime and I make no doubt will have a myriad more who, though of a more trustworthy character, will never fill their eyes with your bodily presence. So you are one of the luckiest poets."

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মুরকে লেখেন :

> "Only I feel like a departing guest at a weary ceremony of farewell, when the railway train which is to take him away makes an unaccountable delay in spite of repeated whistles."

এই মর্মস্পর্শী চিঠির তারিখ ২০ জুন, ১৯১৫ সাল।

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর এক বিদেশী বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মধ্যে তোমরা কি দেখেছ? এক বছর আগে শতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে বিশ্বসভায় বহুজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম। বহু বাঙালির মনেই হয়তো এই প্রশ্ন জাগবে, পৃথিবীর সর্বদেশের লোক আজ যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করছে, সে কি আমাদের রবীন্দ্রনাথ?

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষের উক্ত নামীয় সমালোচনা-গ্রন্থটি রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যানে একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন*। সাম্প্রতিক কালের একজাতীয় পণ্ডিতম্মন্য বিমূঢ়তায় পাশ্চাত্ত্যের প্রেক্ষাভূমির আশ্রয়ে চমকলাগানো রবীন্দ্র-বিদূষণ, অন্যদিকে বহুলভাষিতের ক্লান্তিকর পুনরুক্তিতে চিরাচরিত স্তবন—এই দুই পথকেই সম্পূর্ণ পরিহার করে শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইতে সুস্পষ্ট চিন্তা ও সুতীক্ষ্ণ ভাষণের যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থের কোনো কোনো আলোচনা ধারাবাহিকভাবে 'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় ব্যক্তিগতভাবে যে কৌতূহল বোধ করেছিলাম, সমগ্র বইটি হাতে আসায় সেটি চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ ঘটল।

'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত বইটির পরিক্রমা। লেখকের মতে "সব মিলিয়ে এই সময়কার লেখায় দুর্বল কবিতারাই দলে ভারী।" তার প্রধান কারণ "অপরিসীম দ্বন্দ্ব ও দ্বৈধতা, বহুমুখিতা।" এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সামান্যই হয়েছে, দ্বৈধতার নিরসন ঘটে নি এবং বহুমুখিতা একটি অখণ্ড ভাব পরিমণ্ডলে সমন্বিত হতে পারে নি। "সমগ্র উত্তরকাব্যকে আমরা যদি একটি কবিতা বলে গ্রহণ করি তা হলে মনে হয় এটি যেন একটি ব্যস্ত বিশৃঙ্খলার সময়, সম্যক দৃষ্টি পাওয়ার আগেকার তটস্থ অবস্থায় লিখিত মানবীয় খণ্ড-কবিতা।"

অধ্যাপক ঘোষ এই আলোচনায় তিনটি জিনিসের ওপর প্রধানত জোর দিয়েছেন বলে মনে হলো। প্রথমত গদ্য ছন্দ—যার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে ব্রাত্যজনের ভাষা ও জীবনের সন্নিহিত হবার অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন—তার বিচার; দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধকালীন পর্যায়ে কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে "দিন বদলের পালা"র কথা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতাকে যে ধিক্কার হেনেছেন ও গণতান্ত্রিক শিবিরে সামিল হওয়ার যে সঙ্কেত দিয়েছেন তার সততা নিরূপণ; তৃতীয়ত "ধূসর জীবনের গোধূলি"তে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিচৈতন্যকে বিশ্বচেতনায় বিলীন করে দেবার যে নির্মোহ প্রশান্তি অথচ সেই সঙ্গে জীবনের

---

* রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য॥ শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়। আট টাকা॥

"রূপনারাণের" কূলে সুন্দরী পৃথিবীর উদ্দেশে যে প্রীতিনিবিড় অঞ্জলি রচনা—কবির সেই করুণ-সুন্দর মানসদ্বিধার বিশ্লেষণ। আরো কিছু কিছু বক্তব্য অবশ্যই আছে, কিন্তু মূলত এই ত্রিকোণ-ভূমিতেই 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' স্থাপিত হয়েছে।

যদিচ পূর্ববর্তী সমস্ত সমালোচক ও ব্যাখ্যাকারদের সমগ্র মতামতই লেখক যথোচিত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), তথাপি তিনি কোথাও প্রভাবিত হন নি। তিনি বহু অভিমত ও মতবিরোধের মধ্য থেকে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ—কথনো কথনো বিতর্কের তীব্র উত্তেজনাকে সংযত করা কঠিন হয়। অধ্যাপক ঘোষ আমাদের চিন্তা ও প্রত্যয়কে বার বার আন্দোলিত করতে পেরেছেন, বর্ণহীন, অন্তঃসারবর্জিত, নিছক বাক্‌চাতুর্য ও অলঙ্কৃত ভাষার উপদ্রবে জর্জরিত সমালোচনা-গ্রন্থের ভিড়ের মধ্যে তাঁর বইখানির এইটিই সর্বাধিক কৃতিত্ব।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ভাবাবার মতো। এই বিশেষ শিল্পরীতিটি কি শিল্পিমননের স্বাভাবিক ঋতুপরিবর্তনের ফসল অথবা নিছক একটা আঙ্গিকগত পরীক্ষামাত্র? অধ্যাপক ঘোষ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী এবং এই নবকাব্যরীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যাশার কথা ঘোষণা করেছিলেন (অর্থাৎ কাব্যের ভাষাকে আটপৌরে সাজে সাজিয়ে তার বক্তব্যকে জনসন্নিহিত করা), সেটিও সমুচিতভাবে সিদ্ধ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। আসলে "সমাজের উচ্চমঞ্চে" এবং "সংকীর্ণ বাতায়নে" সমাসীন—মানসধর্মে চড়া রোমান্টিক কবি, ইচ্ছার পূর্ণ সততাসত্ত্বেও যে "ব্রাত্য" হতে পারেন না, এই কবিতাগুলি তারই নিরিখ। আর এই কারণেই কিছুটা কৃত্রিম এই কাব্যরীতি রবীন্দ্রনাথের উত্তরতর কালে প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

এই মতের খানিকটা সাপেক্ষতা করেও গদ্য ছন্দের কাব্যগত সাফল্য-অসাফল্যবিচারে অধ্যাপক ঘোষের সিদ্ধান্ত সবখানি মেনে নেওয়া কঠিন। "ব্রাত্য এবং মন্ত্রহীন" হওয়ার পদক্ষেপহিসেবে এর সার্থকতা যা-ই থাক, প্রকাশের ব্যাপ্তি ও শক্তির দিক থেকে গদ্য ছন্দের মূল্য সীমাহীন। কিছু কিছু কাহিনীমুখ্য কবিতা ('লিপিকা'য় যার সূচনা) এই রীতিতেই সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পেরেছে বলে মনে হয়। গদ্য ছন্দের মূল্যবিচার বিস্তৃত এবং গভীরতর পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

'নবজাতক' বা 'জন্মদিন'-এর যে-সব কবিতায় যুগ-সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে, যে-সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ বা শোষণতন্ত্রকে ধিক্কার দিয়েছেন, অথবা যে-সব ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্কেত আছে, সেগুলির আলোচনায় গ্রন্থকারের উত্তেজনা একটু অহেতুক মনে

হয়। দু-একটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে অথবা আংশিক বিচারে যা-ই বলা হোক, রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র ধারণা আছে, তিনি কখনোই রবীন্দ্রনাথকে 'গণকবি' প্রমাণ করবার মূঢ়তার আশ্রয় নেবেন না। স্বদেশী যুগের সঙ্গীতেও যিনি শুনিয়েছেন, "তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার" এবং "হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার"—সর্বসংকটের মধ্যে যিনি ঐশ্বরিকতার হাতেই চিরকাল পরম সমাধানের ভার ন্যস্ত করেছেন; যিনি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অন্ন-বস্ত্র-জীবিকার বাস্তব দাবিকে শেষপর্যন্ত অধ্যাত্ম-'Manna'য় নিবৃত্ত করেছেন—তাঁর বক্তব্য পূর্বাপর অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় আর কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তিনি? 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ "কল্যাণশক্তি"র উপরেই তিনি একান্ত নির্ভর জানাতেন এই তো স্বাভাবিক সত্য। রবীন্দ্রনাথকে যিনি ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করবেন, তিনি কখনোই কবিকে উত্তরজীবনে 'জনগণেশের অধিনেতা'র শিরোপা দিয়ে বিব্রত করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ 'গণকবি' হয়েছেন কি হন নি, এ আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু যুগের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে তিনি সমর্থন করেছেন, তাঁর নিজের জীবনবোধ অনুযায়ী তাদের মূল্যবিচার করেছেন এবং ব্যক্তিবৃত্তের সীমা রক্ষা করে যথাসাধ্য নতুন চিন্তা ও আন্দোলনের শরিক হয়েছেন এইটেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা। এই মহত্ত্বেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার মণি। সমগ্রভাবে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে স্মরণ রাখলে একথা অকারণ ক্রোধোক্তির মতোই মনে হয়: "রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ অনৈতিহাসিক ততক্ষণই রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের সামনাসামনি হলেই তিনি বিভ্রান্ত; নৈতিকতা, অলৌকিকতা, অযৌক্তিকতার আড়ালে আশ্রয়প্রার্থী।" "শ্যাম-বনবীথি পাখিদের নীতি সার্থক হোক পুন"—এই সমাধানেই বা ক্ষোভের কী কারণ থাকতে পারে? 'রক্তকরবী' নাটক যেখানে শেষ হয়, সেখানে 'শ্রমিক রাজ' প্রতিষ্ঠা হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে কি কোনো সুস্থচিত্ত পাঠক উপনীত হন? আদিম কৃষি-সভ্যতার একটি রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনই 'রক্তকরবী'র শেষ স্বপ্ন। ইতিহাস কিংবা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করি আর না-ই করি, এ-ই রবীন্দ্রনাথ—এর বেশি অহেতুক দাবি কেন করব? অন্যত্র দেখছি, "মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক" ইত্যাদি বিখ্যাত পংক্তিগুলি তুলে সমালোচক ব্যঙ্গ করে বলছেন: "'বজ্রবাণী'তে ধিক্কার জানানোতে কি কবিতর্তব্য সমাপ্ত? এই ধিক্কার কি স্বয়ং বক্তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করে না?" নিশ্চয় করে এবং আত্মসমালোচনাতে যে রবীন্দ্রনাথ কখনোই কুণ্ঠিত নন—এই বইতেই লেখক তার ভূরিপ্রমাণ উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু বজ্রগর্জিত ধিক্কার ছাড়া কবির কাছে আর কি প্রত্যাশা রাখেন সমালোচক? রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে দেখেও তিনি বৃদ্ধ কবির কবিতায় কি একটি রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের সুদীর্ঘ তালিকা

পেতে চান? "যাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং বেগুন না পাইলে ধানকে শস্যের মধ্যে গণ্যই করেন না"—তাঁদের মনঃক্ষোভ এই পরিশ্রমসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত বইখানির মধ্যে না থাকলেই ভালো লাগত।

সমালোচক জানিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বপর্যায়ের কবিতার পরিক্রমা বর্জন করেছেন। হয়তো একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে বলেই তাঁর এই সংকল্প। কিন্তু এই 'watertight compartment'-এর দরজা একটু খুলে দিলে ক্ষতি ছিল না—কারণ রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কবিতা স্বয়ম্ভূ নয়, তার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন আছে এবং সেই বিবর্তনের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখলে আলোচনা আরো স্পষ্টরেখ হতে পারত।

লেখক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—সেগুলি সম্পর্কেও মতভেদ অপরিহার্য। কতগুলি দ্রুত মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা গেল না। 'নারীস্তব'-এর প্রসঙ্গে কয়েকটি দুর্বল কবিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'পুকুর ধারে', 'তেঁতুলের ফুল'—"অবান্তরতার উদাহরণ"। কেন "অবান্তর"? ভাদ্রমাসের কানায় কানায় ভরা পুকুরটিকে দেখতে দেখতে, "বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা" যদি অনুষঙ্গে একটি স্মৃতি নিয়ে এসেই থাকে, তাকে অবান্তর কেন বলব? কবিতার সংহতি এতে নষ্ট হয়েছে বলে তো মনে হয় না। 'তেঁতুলের ফুল'-এ যে বন্য-ব্রাত্য চেতনাকে কবি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর গদ্যকবিতার পর্বে সেই ফুলের মঞ্জরী যদি নতুন করে তিনি নায়িকাকে পরিয়ে দেন, তা হলে গদ্যকবিতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি সার্থকভাবেই তিনি পালন করেছেন, লেখকের যুক্তিধারা অনুসারে সেই সিদ্ধান্তে আসাই তো সমীচীন! মন্তব্যের আকস্মিকতা যুক্তিনিয়ন্ত্রিত না হলে প্রায়ই তা নিরাপদ নয়।

অধ্যাপক ঘোষ এই বইখানি সম্পর্কে যে আশা পোষণ করেছেন তা সফল হবে। অর্থাৎ তাঁর মৌলিকতা, সন্ধিৎসা এবং বক্তব্যের তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা পাঠককে ভাবাবে এবং বিতর্কের উদ্বোধন ঘটাবে। সেই সঙ্গে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের সম্পর্কে এখনো অনেক আলোচনা, অনেক পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। এই কারণেই লেখক ধন্যবাদভাজন।

রবীন্দ্র অভিধান

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

"রবীন্দ্র অভিধান'-এর প্রথম খণ্ড যখন গত বছরে প্রকাশিত হয়, তখনই 'পরিচয়'-এ এই মহৎ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল (শ্রাবণ, ১৩৬৮)। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে।* এই জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যেহেতু এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য গতবারেই উপস্থিত করা হয়েছে, সেই হেতু তার বিশদ পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বরং দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা নিবেদন করি।

১ প্রথম বক্তব্য আকার প্রসঙ্গে। এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা কেন? শুধুমাত্র ব্যাখ্যা নয়, অনেক কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন অভিধানকার। অভিধানের উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংক্ষেপীকরণ নয়। অভিধান তথ্যের (এবং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তত্ত্বের) সঙ্কেতবাহী মাত্র। কিন্তু সোমেনবাবু এ কথাটা সব সময় মনে রাখেন নি। ফলে 'আগমনী'-র মতো কবিতার (প্রথম লাইন: "অঞ্জনা নদীতীরে"…ইত্যাদি) জন্যে তিনি বরাদ্দ করেছেন পৌণে এক কলাম, এবং চার লাইন উদ্ধৃতিসহ একটি সংক্ষিপ্তসারও দিয়েছেন। এর প্রয়োজন ছিল না। "আগুনে হল আগুনময়" ('অরূপরতন') গানটি কোন প্রসঙ্গে গাওয়া হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে চোদ্দ লাইনে (কলাম)। এতখানি বিস্তৃতি এ গানের প্রসঙ্গটুকুর প্রাপ্য নয়। এ রকম উদাহরণ আরো অনেক আছে।

'অ' এবং 'আ'-তে দুটি খণ্ড হয়েছে। সম্পূর্ণ হলে এর আকার সহজেই অনুমেয়। 'রবিরশ্মি' (যা রবীন্দ্র অভিধানের তুলনায় খুবই ক্ষীণ) প্রসঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন সে-কথা স্মরণযোগ্য: "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশী যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়।"

২ কবিতা সম্পর্কে মতামত দেওয়া অভিধানকারের সীমা-বহির্ভূত। কিন্তু "আজি এ ভারত লজ্জিত হে" গানটির ক্ষেত্রে "রবীন্দ্রনাথের যে অল্প কয়েকটি গান কৃত্রিমতার ভারে আড়ষ্ট, যার ভাষা নিতান্তই চেষ্টাকৃত এই

* রবীন্দ্র অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড। ছয় টাকা॥

গানটি তাদের অন্যতম।"—এই উক্তি সোমেনবাবু করেছেন। তাঁর এই উক্তি সঠিক কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক তুলছি না; কিন্তু অভিধানকারের মত অভিধানে না আসাই উচিৎ।

৩ এই মত প্রকাশের ব্যাপারেই উল্লেখ করা যায় 'অপঘাত'-প্রসঙ্গটি। এ বিষয়টা সোমেনবাবুর অব্‌সেসনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃতি-সহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এই লাইন ক-টি :

"টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো
সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

দ্বিতীয় খণ্ডে 'আত্মছলনা'-প্রসঙ্গে ('অপঘাত' ও 'আত্মছলনা' এক তারিখে লিখিত।) পুনরায় এ লাইনগুলি উদ্ধার করেছেন। এক তারিখে লিখিত—এ ছাড়া দুই কবিতার আর কোনো সংযোগ নেই। 'আত্মছলনা' একটি প্রেমের কবিতা। সোমেনবাবু নিজেও স্বীকার করেছেন যে রাজনৈতিক কোনো ঘটনার ছায়া নেই এ কবিতায়। তবু তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত রাজনৈতিক আলোচনা করেছেন। 'অপঘাত'-এর ঐ লাইন তিনটির আগে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সাত দিন আগে লিখিত 'অভিশাপ' কবিতার দুটি পংক্তি :

"সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত"

তাতে এই ধারণা হওয়া পাঠকের পক্ষে অসঙ্গত নয় যে এই লাইন দু-টিও সোভিয়েত সম্পর্কেই বলা।

এর পরে এই খণ্ডেরই অন্যত্র বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতার আলোচনায় "এই দানবীয় আক্রমণ"-এর কথা উল্লেখ করেছেন কবিতাটির রচনার সময়ের আন্তর্জাতিক পটভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে।

ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের ঘটনাটি সমগ্র রাজনৈতিক ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতবার পরিবেশন করায় সাধারণ পাঠকের মনে রাশিয়া-বিদ্বেষ জাগা খুবই স্বাভাবিক এবং তার চেয়েও বড় কথা, ফলে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-সম্পর্কিত মতামতও বেঠিকভাবে উপস্থিত হলো।

পরবর্তী কোনো খণ্ডে, যদি তিনি এই ঘটনার পুনরুল্লেখ করেন (যা 'রাশিয়ার চিঠি' প্রসঙ্গে করা স্বাভাবিক), তবে সোমেনবাবুর উচিত দু-টি বিষয় পূর্ণ আকারে দেওয়া : (ক) ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের পূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাটি, (খ) রাশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মত।

৪ 'আমেদাবাদ' শীর্ষক অংশ সঙ্গত কারণেই আড়াই কলাম দীর্ঘ। আমেদাবাদে রচিত "আঁধার শাখা উজল করি" গানটিও এই খণ্ডের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। সেই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। "বলি ও আমার গোলাপবালা" ও "শুন নলিনী খোলো গো আঁখি"—গান-দুটিও এখানে রচিত। তারও কথা বলা আছে। কিন্তু এই গানগুলির

অন্তরালে যে নারীর প্রেরণা কাজ করেছিল, সেই আন্না তড়খড়ের নামোল্লেখ নেই।

'আ'-খণ্ডে আন্না তড়খড়ের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবেও বাঞ্ছনীয়। আন্না তড়খড়ের নামই নেই 'আ'-খণ্ডে।

৫ ঠিক এই জাতীয় কথা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্রসঙ্গেও বলা যায়। "আরো একবার যদি পারি"শীর্ষক আলোচনায় ভিক্টোরিয়া-প্রসঙ্গ আর একটু আসতে পারত। বিশেষ করে শ্রীমতী ওকাম্পো (একাডেমী ভল্যুম) ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ ('দেশ', সাহিত্য সংখ্যা) প্রকাশিত হবার পর এ প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। অবশ্য 'ভিক্টোরিয়া' বা 'পূরবী' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বলার সুযোগ আছে।

৬ অজিতকুমার চক্রবর্তীর শান্তিনিকেতন ত্যাগের কারণ হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য পুরো উদ্ধার করেছেন সোমেনবাবু। কিন্তু সোমেনবাবুরই লেখা ('সমকালীন'-এ প্রকাশিত) থেকে সচেতন হয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহধর্মিনী লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী 'সমকালীন'-এ যে প্রবন্ধ ('অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য', সমকালীন, ভাদ্র, ১৩৬৮) লিখেছিলেন তার উল্লেখ মাত্র করেছেন, তাঁর বক্তব্য এক বিন্দুও পাঠকদের জানান নি। প্রভাতবাবু কারণ নির্দেশ করেছিলেন, "...অজিত কবি সম্বন্ধে বেশ একটু 'ক্রিটিক্যাল' হইতেছিলেন।...অজিতের মন নানা কারণের যোগে রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া আসিতেছিল ; কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্য সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা।"

শ্রীমতী চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তিনি তখনকার পরিস্থিতিটি বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে বলেছেন, "কাজেই প্রভাতবাবুর ধারণা একেবারেই ভুল। তাঁহার উচিত রবীন্দ্রজীবনীর পরিশিষ্টে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া ও আগাগোড়া অজিতবাবু সম্বন্ধে তাঁহার ভুল উক্তি সংশোধন করিয়া পুনরায় লেখা।"

প্রভাতকুমার কি করবেন তা তাঁর বিচার্য, কিন্তু অভিধানে আপাতত দুটো মতই থাকা উচিত ছিল।

৭ 'অ'-খণ্ডের মতো 'আ' খণ্ডেও 'লেখন'-এর ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বাদ রয়েছে।

কিন্তু এ সব খুঁটিনাটি ত্রুটির কথা তুলতেও সঙ্কোচ হয়। একক উদ্যোগে যে বিরাট কাজে সোমেনবাবু হাত দিয়েছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। আগামীকালের অগণ্য পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন তিনি নিঃসন্দেহে। যে শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি এ কাজ করছেন, তা তাঁর পরম-রবীন্দ্রপ্রীতিরই প্রমাণ। তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি ফাঁকা নয়, ফাঁপা নয়, নিখাদ ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে তিনি তার পরিচয় রাখছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের স্বার্থেই তাঁর এ প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

দুটি চিন্তা

এক

সত্যজিৎ রায়ের অন্বিষ্ট বিষয়ে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমাদের মনে আশা জাগিয়েছে। এতাবৎকাল তিনি যতগুলো ছবি করেছেন, তাতে চোখ ও কানকে তৃপ্তি দেবার মতো প্রচুর উপকরণ ছড়িয়ে থাকত; বিচিত্র মুখ, নানাছাঁদের দেহ, একটা টুকরো থেকে আর একটা টুকরো ছবিতে যাবার নিপুণ কৌশল, চোখের নিয়মে কোনো কোনো বস্তু বা নিয়মের সংস্থান, কাটা কাটা কথা, চকিতে অর্থবান ইঙ্গিত আর বাইরে থেকে আসা শব্দের চমক। আমাদের অতি পরিচিত এই তৎপরতা ও কৌশল নিশ্চয়ই অভাবনীয় সম্ভাবনার সূচনা করেছে, কখনও মনে হয়েছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব নিয়মে এই বোধহয় পরিণতির রাস্তা। সত্যজিৎ রায় ক্যামেরা যন্ত্রের সঠিক ব্যবহারে তাঁর দক্ষ মনের পরিচয় দিচ্ছেন। ক্যামেরার ব্যবহার কথাটিও আমরা প্রথম চলচ্চিত্রে ওঁর কাছেই জানলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছি কেমন তিনি সুন্দর কাহিনী বাছাই করেন। কাহিনী ও কৌশলের সংযোগে তিনি আমাদের এতদিনকার অভ্যাসে—চলচ্চিত্র নিছক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেই শেষ—রুচির নতুন চাপ আনেন, আমরা ভাবতে শিখি যে চলচ্চিত্র যতই আশ্রিত ও মিশ্রিত শিল্প হোক না কেন তার লক্ষ্য মানুষ ও সচেতনতা। নিছক প্রমোদ নয়; মানুষকে দেখতে শেখাই, জীবনকে মূল্য দিতে জানাই শিল্পের শিক্ষা। কিন্তু এই সচেতনতার খোঁজে যেহেতু তিনি প্রায় পুরোটাই নির্ভর করেন চোখ ও কানের ওপর, শিল্পের আশা মেটে না। চোখ ও কান প্রকৃতি যতটুকু দেয় ততটুকুতেই খুশি, তার বেশি তাকে পৌঁছতে হলে হৃদয় ও মাথার আশ্রয় নিতে হয়। সত্যজিৎ রায় মানুষ পেতে চাচ্ছেন হৃদয় ও মাথা বাদ দিয়েই। মানুষ তো আমরা সবাই, আবার মানুষও নই। এই মানুষ ও অমানুষের দ্বন্দ্ব চলছে যেমন বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে তেমনি আমাদের মনেও। তাই কোনো একটি মুহূর্তে কেউ শেষ বলে দিতে পারিনে—যা জানি তা চিরকালের মতো জানা, আর জানবার প্রয়োজন নেই, বা আমরাই পুরো মানুষ। শিল্পী তাই বারবার তাঁর চৈতন্যের আলো ফেলেন পাত্র-পাত্রীর মনে, দেখেন কতটুকু তারা হচ্ছে বা হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না বা কখন হচ্ছে। সুতরাং শিল্পীর সবটাই তাঁর জ্ঞান, বোধ ও মমতায়। ওঁর পুরনো ছবিতে চোখ, কানের পথেই যতবার মানুষগুলোর কাছাকাছি আসি, ভাবি এবার হয়তো আশ্চর্য করে দেবেন তাদের গভীর সত্য জানিয়ে, দেখি তিনি রহস্যের ঢাকা খুলতে না খুলতেই কেমন ছেড়ে দিচ্ছেন জানবার সব বাসনাটুকু। অন্তর্লোকে উঁকি দিয়েই সরে আসছেন প্রমাণসই জানালোকগুলোর অভ্যাসিকতায়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কাহিনীর লৌকিক অংশটুকু হলো রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ-পরিবারকে ঘিরে। একটি নষ্টছেলে, ভীরু আত্মসমর্পিত স্ত্রী, মৃতদার পাখি-প্রেমিক শ্যালক, বড় মেয়ে অনিমা, তার জুয়াড়ী স্বামী ও বাচ্চা টুক্‌লু আর গুণী ছোট মেয়ে মনীষা। ওদের বৃত্তের টানে টানে আছে কৃতী ইন্‌জিনিয়র প্রণব, সাধারণ ছেলে অশোক ও একটি পাহাড়ী বালক। অলৌকিক অংশে হিমালয় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। হিমালয়ের অলৌকিক আবির্ভাবের পরিমণ্ডলে একটি বিবাহ প্রস্তাবের সম্ভাবনায় সমগ্র পরিবারটি পাহাড়ের শেষ বিকেলে পথে বেরোয়। পথেই সব অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রণবের বিবাহ-প্রস্তাব করা হয়ে ওঠে না, তার বদলে সে একটি জাগতিক পরিকল্পনা জানায়। মনীষা যেন শিকারীর জাল থেকে চকিত ছাড়া পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, অশোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সেতুতে অনাগত সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে। জুয়াড়ী শশাঙ্ক ও পরকীয়া প্রেমে মত্ত অণিমা সন্তান টুক্‌লুর মায়ায় আবার নতুন সংসারের আশা গড়ে। মা লাবণ্য স্বামীর বিরুদ্ধে অন্তত একবার দাঁড়াবার ভরসা পায়। পুত্র অনিল ভেসেই বেড়ায়। শ্যালক লাবণ্য-মনীষা-অশোকের নতুন পরিস্থিতিতে বোধকরি পারমাণবিক সংঘটনের বাইরে মনুষ্যত্বের খোঁজ পায়, পাহাড়ী ছেলেটি প্রণবের পিছে পিছে ফাঁপা রোমাঞ্চের মিথ্যাকেই যেন ধরে দিতে চায়। আর রায়বাহাদুর বোঝেন কোনো একটি অজ্ঞাত কার্যকারণে তাঁর লৌহবন্ধনে ফাটল ধরেছে।

লৌকিক জীবন ও সংসারে যখন এমনতর সব অঘটন ঘটে গেছে, তখন মেঘাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা আত্মপ্রকাশ করে। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের পরু কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ঐ মানুষ-কটির দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা ও মীমাংসার নিশ্চিতিকেই জানায়। কাঞ্চনজঙ্ঘাই নিশ্চিতি ; পাহাড় অগোচরে সমতলের খোলস ছাড়িয়ে মানুষগুলোকে তাদের হৃদয় দেখায়, পুরনো সত্তা, ভাবনা, চিন্তা সবকিছুকেই ওলটপালট করে। অন্তত একবারের জন্যেও মানুষরা সত্য হয়, মুখোশগুলো তফাতে হঠে। টুক্‌লুর প্রতীকী অস্তিত্ব ছাড়াই অশোকের ঘোষণায় সে কথা জানি, জানি লাবণ্যের বেদনা ও আকস্মিক বিদ্রোহের ভঙ্গিতে। এই দুই সত্য ও জগত : সমতলভূমি ও পাহাড়, পুরনো জীবন ও সদ্যোত্থিত চেতনা, হতাশা ও উদ্যম, অস্থিরতা ও সিদ্ধান্ত—সতজিৎ রায় গড়েন মেঘভারাক্রান্ত আকাশ ও কাঞ্চনজঙ্ঘার নির্মল প্রত্যক্ষতায়। টুক্‌লু তো ইতিমধ্যেই মা-বাবাকে বেঁধে দিয়েছে।

কিছু এই ছবির কাহিনী ও ব্যাখ্যা নিতান্ত মামুলি, ছকে গাঁথা। সরল সমাজতত্ত্বের বাঁধিগতের চালে ছবিটি চলে, কখনো গড়িয়ে গড়িয়ে মন্থরে, মনীষা-প্রণবের সংলাপের মতো, কখনো হঠাৎ ত্বরায়, এক অংশ থেকে দমকা অন্য ছবিতে যাবার ধাক্কায়। সত্যজিৎ রায় পাহাড়ের পথে পথে বিভিন্ন অংশগুলো উপস্থিত করেন নিপুণতায়, কাহিনীর পরস্পর বিচ্ছিন্নতায়ও তারা কেমন চমৎকার কাছাকাছি এসে জুড়ে যায়। অথচ ইন্দ্রনাথদের

সমস্যা বড়ই জানা : ধনীরা স্বভাবতই জামাই ধরার পরিকল্পনা করে, ছেলেটি যদি শুরুতেই হাজারী হয় ; যেমন প্রণবের সঙ্গে কন্যা মনীষাকে ভিড়িয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ-পরিবার ওত পেতে থাকে কখন আসবে প্রস্তাবের স্বর্ণডিম্বটি। বড়লোকের কৃতী ছেলেরা আবার সাধারণতই রুচিহীন ছোবড়া ; যেমন প্রণব নিখিলেশ-সন্দীপের নাম শোনে নি, যদিও পরিচালকের সামান্য করুণায় সে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ব্রাউনিং-এর কিছু সংবাদ রাখে। যন্ত্রের সঙ্গে অশিক্ষার যোগ আমরা ধরে নিই বলেই সম্ভবত সে ইন্‌জিনীয়র। আর তার পাশে নিম্নবিত্ত সাধারণ ছেলেরা রুচির এক একটি পিণ্ড, যেমন শ্রীমান অশোক। এরা কেমন সহজে (যদিও পাহাড়ের প্রভাবের কথা আছে) চাকরি ছেড়ে দেয় বড়লোকের ইংরেজপ্রীতিতে, কেমন রবীন্দ্রনাথ জানালার ধারে কবিতা লিখতেন না বলে নিজের জ্ঞান রুচির পরিচয় রাখে, কেমন চমৎকারভাবে প্রণবের চকোলেট দেখানো ও প্রেয়সীর কানের চুল বিষয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি টুক্ করে নায়িকার মাকে প্রণাম করে শিক্ষায় বৈপরীত্য প্রকাশ করে। তা ছাড়াও এরা ইনিয়ে বিনিয়ে বড়লোকদের সমালোচনা করে, ঠোঁটে রঙ দরজায় কুকুর জানিয়ে দুই জগতের ফারাক্ বিষয়ে অভিমান জানায়। ফলে তখন সমাজতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর নজীরে নায়িকা মুক্তির অবলম্বন পায় তাতে। অসংস্কৃত প্রায়-কণ্ঠরোধকারী প্রণবের হাত থেকে অশোকের বন্ধুতায় মনীষার স্বস্তি তৈরি হয়। আরো মজা এই বড়লোকের একমাত্র ছেলেকে মেয়েবাজ বখাটে হতেই হবে। এই সুন্দর সাজানো জগতে আত্মরতির অখণ্ড অবসর তাই অনিলের মেয়ে-ধরা, অশোক-মনীষার গোঁজামিল-সংযোগ আমাদের অক্ষমতায় আশাপূরণের মধুর স্বপ্ন আনে।

এই কথাগুলো ওঠে কারণ সমাজতত্ত্বের দৌলতে আমরা নির্দিষ্ট গড়পড়তা হিসেব হয়ে আছি। অথচ কখনো কখনো কেউ বুঝি, সংখ্যাতত্ত্বের গড় মানুষের মুখে আয়না তুলে ধরে না। প্রণব-অশোকের জগত ও রুচি কেন যে এমন হতেই হবে তার কার্যকারণ আমার জানা নেই। বাবার অকথিত চাপে মনীষা না-ভালোবেসেই প্রণবকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে পারে কিন্তু তার জন্যে প্রণবকে রুচিহীন না-হলেও তো চলে! যদি মেনে নিই প্রণব কোনো সমাজের ইঙ্গিত দেয় না, সে একটি মাত্র মানুষ, তবে অবাক হতে হয় একথা ভেবে যে অশোকের পাশে প্রতিপক্ষে দাঁড় করাবার কত চেষ্টা, কত কৌশল না ছেয়ে আছে! আর অশোক, সে কি যে-কোনো একজন বলেই মনীষার সহচর, বন্ধু হয়ে ওঠে? না, অশোক বলেই? অশোককে আমি তো দেখি অতিসাধারণ, অসংস্কৃত, নিকৃষ্টরুচির বাচাল, লোভী একটি ছেলে। সে কেবল নানা ছুতোয় মনীষার চারপাশে ঘোরে, প্রণবকে ঈর্ষা করে মনে মনে আর সুযোগ পেলেই অভিমান জানায় মনীষার সঙ্গে তার কেমন দূরত্ব। আর আশ্চর্য এই ছেলেটির ভদ্রতা ও সংযম! বঙ্গবাসী কলেজের বি. এ. পাস এই যুবক কিন্তু ইন্দ্রনাথ নামক বড়লোক ইংরেজ-

প্রেমিক অথচ বৃদ্ধের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে না, শেষ সাক্ষাতে "গুড ডে স্যার" বলে বিদ্রূপ করে যায়। মনাবার জগতে এই ছেলেটির প্রবেশাধিকার মেলে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রভাব পড়ে হয়তো অনিমা-শশাঙ্কর কাহিনীতে। যদিও "পাহাড়ের কান নেই", তারা পাহাড়ের অলক্ষ্য চাপেই তাদের সমস্যা মেটাতে চায়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় এমন খেলো, হাল্কা চালে ওদের বিরোধ ও সমাধান ধরেন যে মনে হয় ওরা বুঝি রোজকার একবাজি দাবা খেলে উঠল। জীবন গভীরে রেখা না কেটে দাবায় যতটুকু বিরোধ ও বচসা থাকে ঠিক ততটুকুই ওরা ঝগড়া করে বা কাঁদে। শশাঙ্কর বীরত্ব ও হৃদয় পরিবর্তন প্রকাশ হয় পায়চারিতে, অনিমার সবজানা সংসারের বাসনাটি তখনকার মেয়েলী কান্নায়। এতদিনকার দীর্ঘ বুকচাপা বিরোধ ও যন্ত্রণা মধুর-পরিসমাপ্তির তৈরি খোলসে ঢোকে—মর্মান্তিক হানাহানির তীব্রতা ছাড়াই।

অশোকের ঘোষণা সত্ত্বেও পাহাড় ওর চরিত্র ছোঁয় না। একমাত্র বাচালতা ও বিকার ছাড়া ওর কোনো পরিবর্তন নেই। লাবণ্য ও মনীষার চরিত্রেই একমাত্র শুদ্ধতার ছাপ আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার অঘটনঘটনপটিয়সী ক্ষমতার ছাপ আছে। কিন্তু ছবির যুক্তিতে বা কার্যক্রমে তা পাহাড়ের উপস্থিতি ছাড়াই ঘটতে পারত। কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, প্রিয়তম কন্যার ছায়াঘন করুণ মুখশ্রীই তাকে যন্ত্রণায় ঠেলে দিয়েছে বিদ্রোহে। অণিমার বঞ্চনা তো জানাই আছে মা-র। আত্মসচেতনতার প্রথম উঁকিঝুঁকিতে চারপাশের নিরুদ্ধ ঘনায়মান চাপ, কখনো বাবার শব্দহীন শাসন ও অনুজ্ঞা, কখনো মা-র অসহায় আত্মসমর্পণ, দিদির খেয়ালী অথচ লোভের উৎসাহ, কখনো প্রণবের উপহারাদির নীরব কামনা—মনীষার সরল অন্যনির্ভর সুকুমার জীবনটিকে চকিতে অন্ধকার খাদের সামনে ঠেলে দিয়েছে। এ-ঘটনা যে-কোনো জগতেই ঘটতে পারত। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে নয়, প্রণবের শেষ বক্তব্যেই মনীষা মুক্তিকে দেখতে পায়।

বাকি তিনটি চরিত্র, মনীষার মামা, দাদা অনিল ও পাহাড়ী ছেলেটি সবই ছবি সাজাবার উপকরণ মাত্র—সত্যজিৎ রায়ের চোখকানের যুক্তিতে যা আসে। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো অংশের সঙ্গেই এরা জড়িত নয়। যেমন এ-ছবির রঙ। মানুষের সম্পর্কের টান, বিরোধ ও গভীরতা রঙে বুঝি চাপা পড়ে যায়। কারণ রঙ সহজেই চোখকে ভোলায়, মাথাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। আর এ-কথা তো সবারই জানা, দার্জিলিঙের প্রকৃতি এমন সেজে বসে আছে যে মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে। রঙ শুধুই চোখ টেনে নিয়ে যায় বর্ণালীর বৈচিত্র্যে। রঙে মানুষ তখনিই ফোটে যখন প্রকৃতি বাইরের শোভা নয়, মানুষের ভেতরে এসেছে, মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করেছে। এ-ছবিতে রঙ সর্বত্রই নয়ন-লোভন কিন্তু কোথাও তাৎপর্যমণ্ডিত নয়।

তবু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিৎ রায়ের ভবিষ্যতে আশা দেয়। কারণ

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'ই একমাত্র ছবি যেখানে তিনি মৌল মমতায় উপস্থিত, যে-মমতা শিল্পীকে সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। বিরোধে জর্জর মানুষ আড়াল তুলেছে নিজের চারপাশে; যে-যার বাস করছে একক, বিচ্ছিন্ন সব দ্বীপে; মনের গহনে অন্ধকার পাথর হয়ে আছে। ওই অন্ধকার একমাত্র গলে মমতার ছোঁয়ায়, সেতু গড়ে করুণার অশ্রুপাতের পর। সত্যজিৎ রায় কেমন করে যেন এই ছবিতে অজান্তেই রূপকথার ভোমরার মতো মমতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন, আর তারই অন্তর্লীন চাপে ছবির কেন্দ্রে গড়েছেন ছোট্ট টুক্‌লুকে। টুক্‌লুই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, যে কেবল শুদ্ধতার স্পর্শে, মমতার টানে যন্ত্রণার পাপড়ি খসায়, উড়িয়ে সরায় কালো মেঘের ছায়া, হঠাৎ আলোর ঝলমলানিতে ঝলমলিয়ে দেয় মলিন হতাশ্বাস মুখগুলো।

ছবির কেন্দ্রে টুকলু তার প্রথম আবির্ভাব থেকেই শুদ্ধতার দীপ্তি ছড়ায়, ঘনিষ্ঠ প্রাণময়তার আলো ঠিক্‌রে ওঠে তার লাল রঙের পোশাকে। যেহেতু শিশুই শুদ্ধ (এবং এ ছবিতে সর্বপ্রথম সত্যজিৎ রায় শিশুকে তার নিজের জগতে উপস্থিত করেছেন), শিশুই একমাত্র সত্যের আলোয় অসত্যের স্বরূপ খোলে। টুক্‌লুর পাশে তাই অশোকের লোভ-মোহের চরিত্র স্পষ্ট ফোটে। টুক্‌লুর পূর্ণতা আবার আছে মনীষায়। সে তার নবীন কৈশোরে সবেমাত্র জীবনের আভাস পেয়েছে। সবেমাত্র জীবনের কঠিন কালোছায়া ঘনিয়েছে তার চারপাশে। আর অমনি ওর হৃদয় মমতায় সত্য হবার জন্যে, পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্যে খোঁজে এমন এক জগত যেখানে মানুষ নিছক আনন্দে, নিছক সারল্যে, প্রেমে, সত্য হয়ে ওঠে। তাই এতটুকু বাধায়, চাপে ওর মুখে আঁধার নামে, অবোধ শিশুর মতো পালাতে চায়, নিজেকে আড়ালে টেনে ভাবে তার মুক্তির পথ বুঝি এমনিতেই মিলবে। প্রণবকে নির্ভাবনায় প্রশংসা করে কিন্তু জানে না কোথায় যেন তাদের বাধা, অথচ মুক্তির সম্ভাবনাতে কেমন অবুঝ বিস্ময়। দুই জগতের দুরতিক্রম্য ফারাকে কতই সারল্যে সে বলে অশোককে "আমরা কি খারাপ ?" জানে না, জানতে চায় না উদ্বেলিত মমতার জঙ্গমে মানুষে মানুষে বিরোধের কথা। সহজেই ডেকে নিতে পারে বন্ধুকে তার জীবনে, যেমন ডেকেছে টুক্‌লু তার মা-বাবাকে, মায়ের জীবনের বেদনার অংশীদার হয়ে। এই জীবনে ডেকে নেওয়াই শুদ্ধতার লক্ষ্য—এই মমতাই শিল্পীর চৈতন্যের আলো। মনীষা-টুক্‌লুর স্ফটিকে জীবনের রঙ ছড়ায় ও আকস্মিকে বেদনার পাড় বুনে বুনে আমাদের স্মৃতিতে, কল্পনায়, আর সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আসে ক্রূর, নিষ্ঠুর, বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের বেড়াজাল ছাড়িয়ে ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতার নিবিড় কেন্দ্রে।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পথ সত্যজিৎ রায়কে হীন সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তি দিতে পারে।

শান্তি বসু

দুই

ভারতের চলচ্চিত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রথমত এই আন্দোলনে এই প্রথম রঙীন ছবি। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের মুষ্টিমেয় নেতাদের মধ্যে একজন ও এই আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক সত্যজিৎ রায়ের শিল্পজীবনে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' একটি তাৎপর্যময় পদক্ষেপ। তৃতীয়ত বাংলাদেশের সাহিত্যজগতের পরিপ্রেক্ষিতেও ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রচলিত অর্থে কাহিনীবর্জিত ছবিটি গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন ও পরিচালকের সাহসের দ্যোতক।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর পূর্ববর্তী ছবির তুলনা খুবই ফলপ্রসূ। ছবিটির মেজাজের দিক দিয়ে এর নিকটাত্মীয় 'পরশপাথর'। তীক্ষ্ণ ঠাট্টা বা তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছিলুম পরেশবাবুকে, বা সেই অনবদ্য দৃশ্যটি যেখানে থানায় পরেশবাবু তাঁর বহুবার ট্রাম-থেকে-পড়ে-যাওয়া বিক্ষত হাঁটু দেখিয়ে বলেন বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নের কথা। তেমনই এবার আমরা পেয়েছি মা-কে, রায়বাহাদুরের অনেক দুঃখ-সওয়া অনেক পোড়-খাওয়া প্রাজ্ঞ গৃহিণীকে। সম্পূর্ণ অন্য একটি জগতের হালচাল, বাংলার তথাকথিত উচ্চসমাজের নগ্ন রূপ। এছাড়া গঠন ও কাহিনীর কালব্যাপ্তির দিক দিয়ে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শুধু সত্যজিৎ রায়ের কাজের ক্ষেত্রে নয়, সারা ভারতের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই নতুন। সেদিক দিয়ে এর গুরুত্ব 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুল্য। 'পথের পাঁচালী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিংবা ইন্দির-ঠাকরুণের "হাঁগা কি হয়েছে ?" মনে রেখেও একথা বলা চলে যে সেখানে সত্যজিৎবাবু যা দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণের বিশ্বস্ত লেখনীর সঙ্গে সুপরিচিত অনেকের কাছে 'পথের পাঁচালী'র অংশবিশেষ বিক্ষিপ্ত এবং সংহত 'অপরাজিত' অসম্পূর্ণ লাগে। বিভূতিবাবুর বই-দুটিতে সব শিথিলতা সত্ত্বেও বাংলার গ্রামের অপুর এলোমেলো জীবনের সামগ্রিক চেহারা মেলে। ফিল্মে অপেক্ষাকৃত সংহত ও সীমায়িত পরিসরে তাকে দেখে মন ভরে না। অবশ্যই একথা সর্বজনবিদিত যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' এক নতুন সংযোজন এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কাহিনী সত্যজিৎবাবুর মেজাজের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়। সেজন্যই হয়তো যে ব্যাঙের বাহুল্য 'পথের পাঁচালী'তে লেগেছিল আপত্তিকর তাই এখানে হয় অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও ছবির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র পরের সবকটি ছবিতেই মনে হয়েছে তিনি স্বকীয় পথ খুঁজছেন। আজ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় সে পথের শেষ দেখে বোঝা যায় 'অপুর সংসার'-এর দ্বিতীয়ার্ধ, 'জলসাঘর', 'দেবী'র দ্বিতীয়ার্ধ বা 'তিনকন্যা'য় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রায় বিভ্রান্তিকর পরিবর্তন কেন। তাছাড়া প্রতিটি ছবিই 'পথের পাঁচালী' থেকে দূরে চলে

যাওয়া, শহুরে বিদগ্ধ মনে ফিরে আসার দ্যোতক। কারণ সত্যজিৎবাবুর শিল্পী-মেজাজ দেখা গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টি কিন্তু মোলায়েম ব্যঙ্গের, তাঁর কল্পনায় রং চড়ায় এক নির্মম হাস্য। 'লীয়র'-এর কাব্যানুবাদ বা প্রথম সফল বিজ্ঞানকল্পনা-কাহিনী তাঁর কলমে এই জন্যই হয়তো ফোটে ভালো।

সাধারণভাবে আমরা দেখেছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় বিধৃত যে জগত তার আয়রনিক রূপায়ণে বাংলা উপন্যাস ব্যর্থ। কোনো কোনো বাংলা কবিতার সহাস সাবালক অভিব্যক্তির তুলনায় এই জগতের রূপায়ণে অলীক বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছবি বা খুবই কাল্পনিক রোমান্টিকতার পরিচয় বাংলা উপন্যাসে মিলবে। সত্যজিৎবাবুর ফিল্মে এই জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এসেছে নির্মোহ সুকুমার ব্যঙ্গের গদ্য রীতিতে। এটা এ ছবির শ্রেষ্ঠ গৌরব।

রঙের ব্যবহারের বিষয়ে দুটি আপত্তি শোনা গেছে। প্রথম, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় দার্জিলিং-এর দৃশ্যাবলী দেখানো হয়নি। দ্বিতীয়, ছবিটি রঙীন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সাদাকালোয় হলে আরো জোরালো হতো। প্রথমটির উত্তরে নিশ্চয়ই বলা যায় ছবিটি দার্জিলিং-এর ডকুমেণ্টারি নয়। এ-প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন কারণে অনেক সাধারণ দর্শকের ধারণা হয়েছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' বেশ একটি রঙচঙে ছবি হবে এবং অনেকে তাঁরা হতাশও হয়েছেন। অন্যভাবে মনকে প্রস্তুত করে নিয়ে গেলে হয়তো তাঁদেরও ছবিটি হতাশ করত না। এজন্য রঙ ও রঙীন ছবি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা পরোক্ষভাবে দায়ী বলা যেতে পারে। কিন্তু হিমালয় নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘায় লুব্ধ সাহেবদের তৈরি করা শহর দার্জিলিং-এর সাজানো-গোছানো সীমাবদ্ধতাই এ-ছবির মূল পট।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রঙের ব্যবহার অসম! গোড়ার দিকে বা একেবারে শেষ শটটিতে যথোপযুক্ত না হলেও রঙের ব্যবহারে ছবিটি অনন্য। রঙ কোনো জায়গায়ই চোখকে পীড়া দেয় না। কয়েকটি স্থানে রঙের ব্যবহার ছবিকে অভাবনীয় সাহায্য করে। সাঙ্গীতিক অর্থময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রঙ: নেপালী শিশুটির লাল ফুল চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্যে বা "এ পরবাসে রবে কে হায়"-এর সময় মায়ের মাথার ঘোমটার লালটুকু। রায়বাহাদুরের বড়জামাই ও বড় মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদঘটিত দৃশ্য অনেকের মনে হয় একঘেয়ে। জীবনে এই একঘেয়ে অপ্রিয় ঘটনাটি অবশ্য বহু ঘটে এবং আজ অবধি বাংলা চলচ্চিত্র-আন্দোলনের কোনো ছবিতে এ ঘটনাটি ঘটে নি। তাছাড়া এ-ঘটনা পরিচালক যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে এ প্রশ্ন ওঠা অনুচিত। শুধু রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই এর সমাধান হয়। তবে দৃশ্যটির দৈর্ঘ্য বা কেটে "এখন আমাদের কি হবে" আসার মধ্যে আপত্তির কারণ থাকতে পারে। সে কথা বলতে গেলে পাহাড়ী সান্যালের নিউক্লিঅর টেস্টের ফলে পাখিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হঠাৎ দুশ্চিন্তা, ছবিবাবুর অতিরিক্ত পিতৃসুলভ স্নেহ প্রকাশ বা অশোকের হাতপা ছুঁড়ে দার্জিলিংস্তুতি ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়তো কমবেশি

আপত্তিকর ঠেকে। এ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কে নিষ্পত্তি মেলে না। কারণ বোধহয় এ ধরনের সূক্ষ্ম ছবি দর্শকের রুচির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ছোটখাট মতান্তরের সম্ভাব্যতা ও বারংবার দর্শনে মতপরিবর্তন তাই এ ছবির ক্ষেত্রে অনিবার্য।

মায়ের "এ পরবাসে" গানটি ও নেপালী শিশুটির শেষ গানটি ভোলা যায় না। তেমনিই কানে বাজে দু-একটি কথার সুর: "আমি কিন্তু আজ বেশি সাজছি-না" বা "অমুমনু এক নয় গো।" কথার বাহাদুরিতে এ ছবি সত্যজিৎ রায়ের সেরা ছবি। বেশি কথা বলা এজগতের স্বভাব। কথায়ই এদের চেনা যায়। রায়বাহাদুর, ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জী···কয়েক ঘণ্টার কথার মধ্যেই এঁরা আগাগোড়া চেনা হয়ে যান। কথার পুনরুক্তি ও একাধিক অর্থের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র অর্থবহতার ব্যাপ্তি অবশ্যই সংলাপে সীমাবদ্ধ নয়—ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জীর সঙ্গে মনীষার পুষ্পতত্ত্বের আলোচনার পর নেপালী শিশুটির সেটা অকাতর চর্বণ, পিঠে বোঝা নিয়ে গাধার দলের যাওয়া ও ব্যানার্জীর ডাকে মনীষার না শুনতে পাওয়া, ব্যাণ্ডের বাজনা, সাহেবদের ছুটন্ত ঘোড়া ও "গুড ইভনিং" বলা, ইত্যাদি।

অভিনয়ে সকলেই কমবেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সব চেয়ে বেশি নেপালী শিশুটি, করুণা বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথন। সঙ্গীতও অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত, অর্থবহঃ যেমন সেই বেহালার চড়া সুরে পাঁচশিকড়ের গাছের আত্মপ্রকাশ—যার তলায় বিবাহবিচ্ছেদ আলোচনারত দম্পতি। এ ছবিতে বোধ করি সত্যজিৎবাবুর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতারোপ।

সবশেষে আবার রঙের কথায় ফিরে আসি। দুর লংশটে লোককে চেনা (বাণ্টি চ্যাটার্জী ও বিদ্যা সিংহ), পোশাকের তারতম্যে লোক চেনা (অশোকের বিদঘুটে পোশাক ও পাৎলুন, রায়বাহাদুরের লাল রুমাল) ইত্যাদি ছাড়াও পুরো editing pattern-এ রঙের পৌনঃপুণ্য ছবিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। হয়তো সাদাকালোয় এক কঠোর ব্যঞ্জনা আসত যা রঙে সব সময় আসেনি। কিন্তু যে দৃশ্যে মনীষা ছুটে পালায়, ফ্যাকাশে সাদা মুখে কাঁদে, ওদিকে ব্যাণ্ড বাজে, ব্যানার্জী চলে যায়—সে দৃশ্যে কঠোর ব্যঞ্জনার কি অভাব আছে? বরং মনীষার ফ্যাকাশে মুখ সাদা কালোয় আসত না। অনেক দৃশ্য হয়তো এরকম ব্যঞ্জনাময় হয়নি, কিন্তু তা কি রঙের দোষ না রঙের ব্যবহারের অসমতা? ছবির শেষে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আরও ভালো হলে ছবির এক রূপক অর্থ সম্পূর্ণ হতো।

সঙ্গীতপরিচালক, সংলাপকার, কাহিনীকার ও পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায় এ ছবিতে সংহতির যে স্তরে পৌঁছেছেন তাতে আমরা আশ্বাম্বিত হই।

জিষ্ণু দে

পরমাণু ও শান্তি সংখ্যা

ভাদ্র
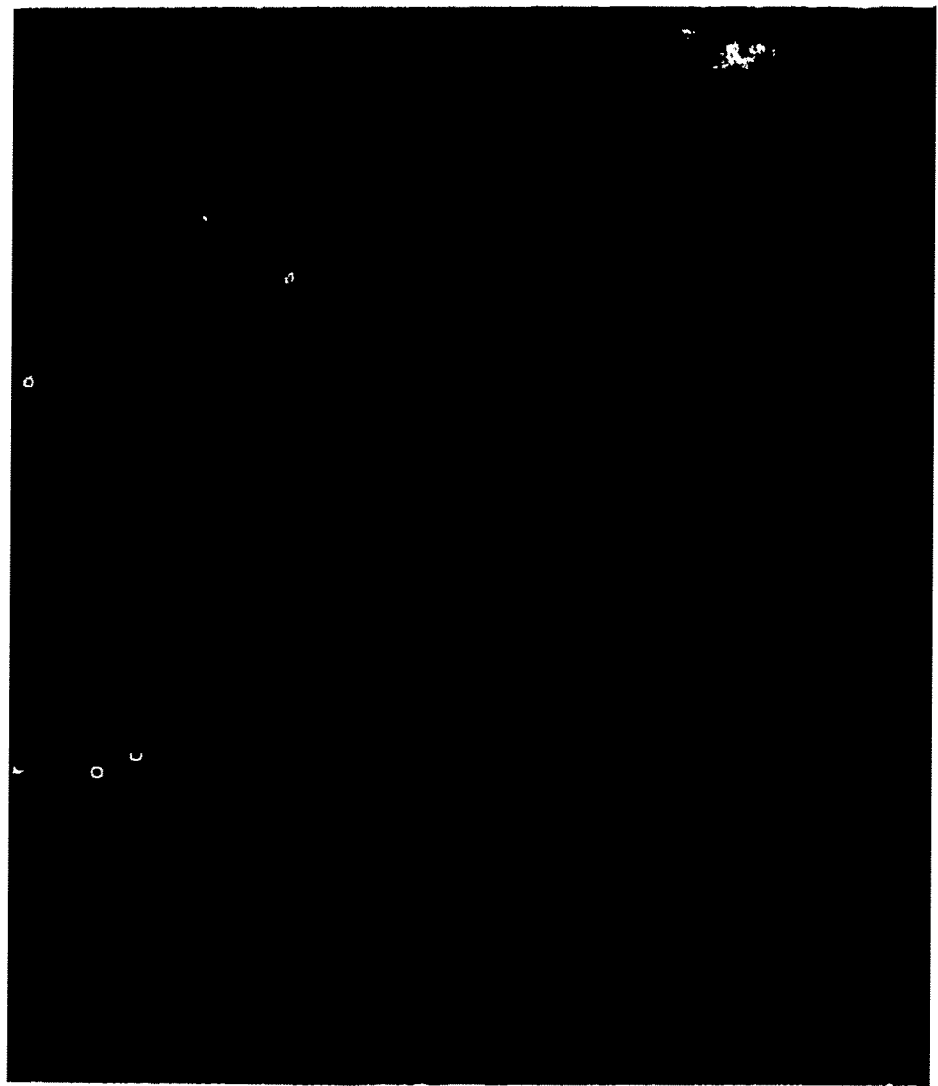
সম্পাদকীয়

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে আমরা হয়তো যথেষ্ট সচেতন নই—এই বোধের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা 'পরিচয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটির পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হয়েছে যে বিষয়টি এত ব্যাপক এবং বিষয়টির সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ ও অন্যান্য নানা জটিল প্রশ্ন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে 'পরিচয়'-এর সীমিত পরিসরে ও অল্পসময়ের প্রস্তুতিতে এই পরিকল্পনার সম্যক রূপায়ন সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের মূল পরিকল্পনাকে নানাভাবে সংকুচিত করতে হয়েছে। যেমন, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক তেজের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি আলোচনা এই সংখ্যায় থাকা উচিত ছিল। প্রবন্ধটির রচনা সময় সাপেক্ষ, অতএব বাধ্য হয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যার জন্যে মূলতুবী রাখতে হলো। তবুও, আমাদের মনে হয়, অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পেরেছি তা থেকে বর্তমান কালের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা ও সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি করা সম্ভব হবে। পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের হুমকি আজকের দিনের পৃথিবীকে যে সর্বাত্মক বিপদের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আমাদের কারও পক্ষেই আত্মবিস্মৃতির এতটুকু অবকাশ নেই। আমাদের নিজেদের প্রতি এবং আমাদের বংশধরদের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্তব্যবোধ যদি আমাদের থাকে তাহলে এই বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের নিশ্চয়ই তৎপর হতে হবে। 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটিকে এই বিপদের বিরুদ্ধেই একটি সময়োচিত হুঁশিয়ারি হিসেবে আমরা উপস্থিত করতে চেয়েছি।

'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটির পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাবার পরে অন্য একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। তিন ও চার নম্বর ভোস্তোকের পৃথিবী-পরিক্রমা। পারমাণবিক বিস্ফোরণে ও তেজস্ক্রিয়তায় কলুষিত আমাদের এই পৃথিবীর মানুষের সামনে ভোস্তোক এক অকল্পিতপূর্ব ভবিষ্যতের

আশ্বাস। পৃথিবীতে যদি শান্তি বজায় থাকে, পৃথিবীতে যদি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির আবহাওয়া গড়ে তোলা যায় তাহলে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির বিস্ময়কর অগ্রগতির ধাপে ধাপে মানুষ যে নতুনতর ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠবে—ভোস্তোক তারই নিঃসন্দেহ সূচনা মাত্র।

অতি অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটি আমরা যে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছি সেজন্যে প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব 'পরিচয়'-এর লেখকদের প্রাপ্য। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের প্রবন্ধটি মূল ইংরেজি থেকে তাঁর বিশেষ অনুমতিক্রমে বাংলায় অনূদিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হলো।

ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তরুণ গবেষক-কর্মী। অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'পরিচয়'-এর জন্যে একটি দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্য যাঁদের লেখা আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি তাঁরা সকলেই আমাদের সহযাত্রী বন্ধু। তাঁদের কাছে ভবিষ্যতেও আমরা আরো অনেক দাবি নিয়ে উপস্থিত হব।

পরিশেষে, 'পরিচয়'-এর পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গর্বের কথা এই যে মস্কোর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত বিশ্ব-মনীষীরা 'পরিচয়'-এর পাঠকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাক্ষর প্রেরণ করেছেন।

আশা করি সংখ্যাটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে এবং তাঁরা তাঁদের মতামত ও সমালোচনা পাঠিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

স্কেচ
পাবলো পিকাসো
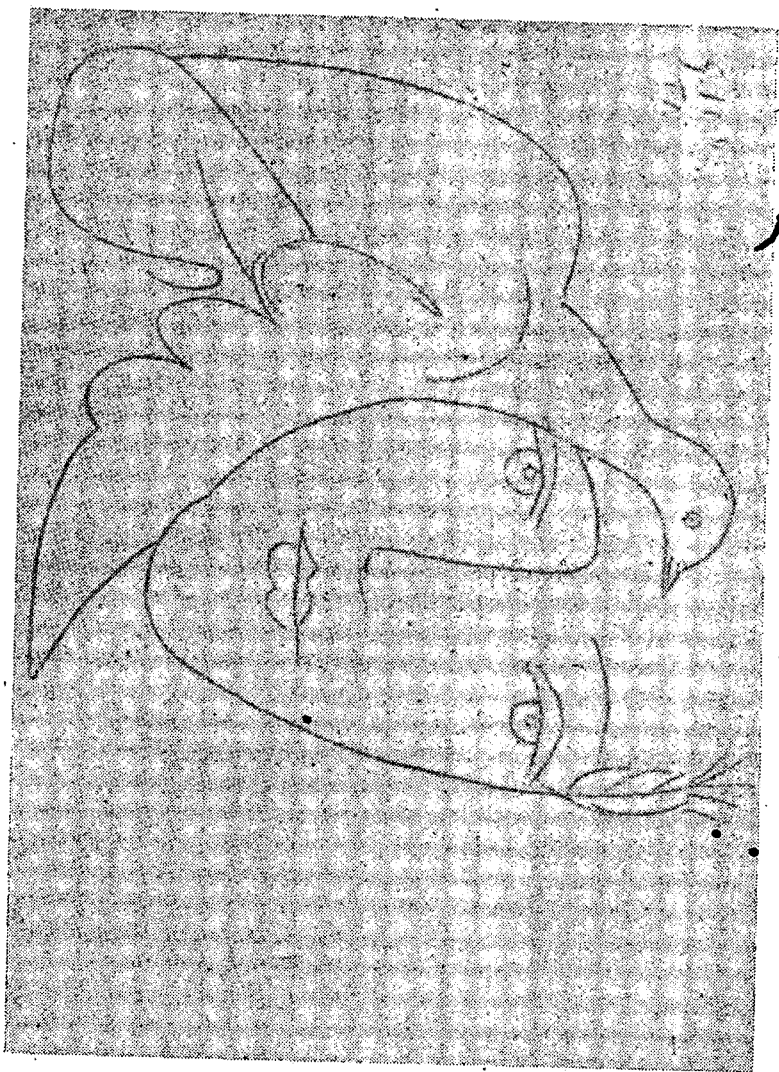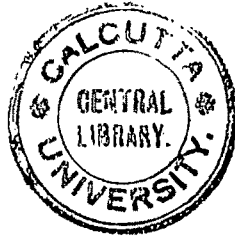
তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

জে. বি. এস. হলডেন

আমেরিকান গভর্নমেণ্ট আবার নতুন পর্যায়ে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন। আপনারা লক্ষ্য করবেন, আমি লিখেছি "আমেরিকান গভর্নমেণ্ট"—"আমেরিকা" বা "আমেরিকানরা" নয়। এই সহজ সতর্কতাটুকুর প্রয়োজন আছে। এর ফলে আমাদের চিন্তা আরো স্বচ্ছ হবে, ঘৃণা আরো হ্রাস পাবে। আমরা যদি লিখি বা বলি "আমেরিকা" বা "চীন", "পাকিস্তান" বা "পর্তুগাল", তা হলে মনে হতে পারে যে আমরা দেশবিশেষের কথা বলছি, যার প্রতীক হতে পারে একটি ঈগল বা ড্রাগন বা অন্য কিছু, এবং যাকে আমরা খুশিমতো পোষ মানাতে পারি বা খুন করতে পারি। এমন কি আমরা যদি বলি "চীনারা ভারতভূমি আক্রমণ করেছে"—তাহলেও কথাটা অর্থহীন হয়। কারণ, চীনা আছে যাট কোটি, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা থাকতে পারে বড় জোর কয়েক শতের। অন্যদিকে, বোমা বিস্ফোরিত হলে বা এ-ধরনের অন্য কোনো ঘটনা ঘটলে মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি সদস্যকেই সেজন্যে দায়ী হতে হয়। যদি তাঁর মতের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটে থাকে তাহলে পদত্যাগ করার অধিকারও তাঁর আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে আমি জানি যাঁরা বিশেষ কোনো সরকারী কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহশীল হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন নি। তাঁরা নিশ্চয়ই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের দেশসেবাটা এতই মূল্যবান যে দেশবাসীকে তা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার তাঁদের নেই। অথচ তাঁরা যদি পদত্যাগ করতেন তা হলেই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যিকারের দেশসেবা করা হতো।

আন্তর্জাতিক আইন

বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের খ্রীষ্টমাস দ্বীপে। এর ফলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আন্তর্জাতিক আইনকে জঘন্যভাবে লঙ্ঘন করেছেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, উপকূলের কাছে খুব সরু একটি ফালি বাদ দিলে সমুদ্র মুক্ত এলাকা। কিন্তু আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সমুদ্রের কোনো কোনো এলাকায় জাহাজ-চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টও পর-পর কতকগুলো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন এবং তার ফলেও সারা পৃথিবীর কয়েকজন নিরীহ মানুষের প্রাণহানির কারণ অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট কোনো ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেন নি।

জবাবে আমাকে হয়তো শুনতে হবে যে সমুদ্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন সেকেলে হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই হয়েছে। আমি যখন ভারতের নাগরিক হই, আমাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে যে ভারত সাধারণতন্ত্রের আইন আমি মেনে চলব। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি, ভারতে কতকগুলো আইন আছে যা অন্যায়, কতকগুলো অর্থহীন, আর অধিকাংশই সেকেলে। কিন্তু একেবারে কোনো আইন না মানার চেয়ে সেকেলে আইন মেনে চলা ভালো। এ-প্রসঙ্গে ব্রিটেনের আইনের কথা যদি ওঠে তো বলি, ব্রিটেনের আইন ভারতের আইনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সেকেলে। ব্রিটেনের আইন মেনে চলব, এমন প্রতিশ্রুতি আমি কোনো কালেই দিইনি এবং মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই তা ভঙ্গ করেছি। আইন মোটামুটি ধনীদের স্বার্থরক্ষা করে। ক্ষুধার্ত মানুষ যদি চুরি করে তা হলে আমরা তাকে জেলে পুরি, কিন্তু এ কথা ভাবি না যে লোকটি বিশেষ রকমের বদ। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি চুরি করে তবে তার সপক্ষে কোনো যৌক্তিকতাই নেই। আর ধনীরা যখন ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ করতে শুরু করে তখনই বিপ্লব হয়ে থাকে আর বিপ্লবের সময়ে আইনমান্যকারী ধনীদের সম্পত্তি খোয়া যায়। জাতি সম্পর্কেও একই কথা। সবচেয়ে ধনী আর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী জাতির গভর্নমেণ্টের আইনভঙ্গ করার কোনো যুক্তিই নেই। এই আইনভঙ্গের ব্যাপারটা চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত ধিকৃকৃত হতে হয় এবং তাতে জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই বিচারে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যা করছেন তা যেমন অসঙ্গত তেমনি অন্যায়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটার পরে নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি

হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলোর পরিণতি কী হয় তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপরে নির্ভরশীল। কতখানি উচ্চতায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে তাও এ-প্রসঙ্গে বিচার্য। বিস্ফোরণ যদি মাটির কাছাকাছি হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় ভস্মপাত হবে। বিস্ফোরণ যদি উঁচুতে হয় তাহলে অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় পদার্থ উঁচুতে উঠে যাবে এবং সম্ভবত স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গিয়ে পৌছবে। বায়ুমণ্ডলের যে বিক্ষুব্ধ স্তরে আমরা বাস করি তার ঠিক ওপরের স্তরকে বলা হয় স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা কমা-বাড়ার সঙ্গে এই স্তরের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। এই স্তরের তাপমাত্রা অব্যবহিত ওপরের বা নিচের স্তরের তাপমাত্রা থেকে অপেক্ষাকৃত কম। তেজস্ক্রিয় ভস্মের মেঘ এই স্তরে পৌছবার পরে পৃথিবীর চারদিকে ভেসে বেড়াতে থাকে—তবে উত্তরে বা দক্ষিণে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

খ্রীষ্টমাস দ্বীপের অবস্থান বিষুবরেখার ঠিক উত্তরে। ফলে, এই দ্বীপের পারমাণবিক বিস্ফোরণের মারাত্মক ফল উত্তর ভারতে যতটুকু, দক্ষিণ ভারতে তার চেয়ে বেশি; আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতটুকু, উত্তর ভারতে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমেরিকানরা খুবই বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে বলতে হবে!

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

ভারতের মাটিতে, প্রধানত বর্ষার সময়ে, নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেমে আসবে। তাদের কিছুটা গিয়ে মিশবে পানীয় জলের সঙ্গে, কিছুটা উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে দুধে। কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ—যেমন সিজিয়াম—মানুষের শরীরে খুব অল্পক্ষণই থাকতে পারে এবং তার ফলে বিশেষ ক্ষতিকারক না হবারই সম্ভাবনা; যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্যই বলতে হবে যে আমাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনের মৃত্যুর কারণ হবে এই সিজিয়াম বা এ-ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ। রাসায়নিক বিচারে সিজিয়াম অনেকটা পটাশিয়ামের মতো। যতদূর জানা যায়, এই পদার্থটি শরীরের কোনো তন্ত্রীতে সংস্থিত হয় না। যেমন হতে পারে অন্য দুটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ—স্ট্রনশিয়াম ও আয়োডিন।

স্ট্রনশিয়াম একটি ধাতু, রাসায়নিক ধরনধারণের দিক থেকে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের শরীরের অস্থিতে প্রচুর পরিমাণে জল আছে, আর

আছে কিছু জৈব পদার্থ। কিন্তু অস্থির কঠিন অংশটুকু প্রধানত গঠিত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট-এ। স্বাভাবিক শরীরের অস্থিতে কিছু পরিমাণ স্ট্রনশিয়ামও আছে। যদি কোনো বাড়ন্ত শিশুর খাদ্যে স্ট্রনশিয়াম থাকে তাহলে এই পদার্থটি তার অস্থিতে সংস্থিত হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। এমন কি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরেও অস্থি ও রক্তের মধ্যে সবসময়ে ক্যালসিয়াম পরমাণুর আদানপ্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে খুবই ধীরে। তা সত্ত্বেও যদি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাদ্য বা পানীয়ে স্ট্রনশিয়াম থাকে তা হলে তা তার অস্থিতে সংস্থিত হতে পারে এবং আবার অতি ধীরে তা নিঃসৃত হয়ে যায়।

স্ট্রনশিয়াম যদি তেজস্ক্রিয় না হয় তাহলে সাধারণত তা ক্ষতিকর নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-বিষয়টি সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি জানি। আমি একদিনে পঞ্চাশ গ্রাম স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাইড গলাধঃকরণ করেছি। আর কারও এই অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার জানা নেই। ফলে প্রথম দিন তিনেক আমার মধ্যে নানা দিক থেকে কিছু অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু শয্যাশায়ী হবার মতো অসুস্থ আমি হইনি। স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাইডের চেয়ে স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট দামে শস্তা। এক গ্রাম স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট এমন কি একজন শিশুর পক্ষেও ক্ষতিকারক নয়।

আয়োডিন জমা হয়ে থাকে থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে। এই গ্ল্যাণ্ডটির অবস্থান গ্রীবার সামনের দিকে, যেখানে গ্রীবা এসে মিশেছে ধড়ের সঙ্গে। শরীরের অন্যান্য তন্ত্রীতে অক্‌সাইডেশন প্রক্রিয়াকে সঠিক মাত্রায় অব্যাহত রাখার জন্যে নানা ধরনের হরমোন্‌-এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আয়োডিন অঙ্গীভূত হয় থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডের এইসব হরমোনে। আমাদের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ও ফস্‌ফরাস। এই উপাদানগুলো আমরা খাদ্য থেকে গ্রহণ করি। এ ছাড়াও আমাদের খাদ্যে অন্য অনেক উপাদান থাকে। কিন্তু সেগুলো আমাদের শরীর থেকে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই নিঃসৃত হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, সীসে ওআর্সেনিক। পরিমাণে যদি খুব অল্প হয় তাহলে সীসে বা আর্সেনিক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু এই অ-ক্ষতিকারক মাত্রার সীসে বা আর্সেনিকও যদি কয়েক মাস ধরে বা কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।

এই পদার্থদুটি বহু মাস ধরে শরীরের মধ্যে থেকে যেতে পারে এবং এমন কি মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত থেকে যায়। এই কারণেই যদি কোনো মুসলমানকে বা খ্রীষ্টানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে হয় তা হলে সীসে বা আর্সেনিক ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টানের শব মৃত্যুর বহুকাল পরেও কবর খুঁড়ে বার করা যেতে পারে।

হত্যাকারীর ভূমিকায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ

যদি কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়স বিস্ফোরিত হয় তাহলে ছিটকে বেরিয়ে আসে একটি ক্ষুদ্র কণিকা ও একগুচ্ছ রশ্মি। এই কণিকাটি সাধারণত হয়ে থাকে একটি ইলেকট্রন বা বিটা কণিকা বা হিলিয়াম নিউক্লিয়স বা আল্‌ফা কণিকা। আর এই রশ্মি সাধারণত হয়ে থাকে গামা রশ্মি, যা স্বভাবের দিক থেকে অনেকটা কণিকার মতোই। তাদের গমনপথে যদি কোনো জীবন্ত তন্ত্রী পড়ে তা হলে হয় তারা সেখানেই থেমে যায় কিংবা তাদের গতি হয় স্তিমিত। তাদের তেজ বা এনার্জি নিঃসরিত হয় পুরোপুরি কিংবা আংশিক ভাবে। এর ফলে ক্রোমোসোমের মতো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি কাঠামোর মধ্যেও ভাঙন আসতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে-ব্যাপারটি ঘটে থাকে তা হচ্ছে জীবকোষের অন্যান্য উপাদানস্থিত জল থেকে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু রাসায়নিক দিক থেকে অতিমাত্রায় সক্রিয় অণু সৃষ্টি করা। এই অণুটি HO হতে পারে বা HO_2। তারপরে সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশের মধ্যে, একটি বৃহৎ অণুর সঙ্গে এই অণুটির রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ঘটে এবং বৃহৎ অণুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে দ্রুতগামী কণিকা বা রশ্মি জীবকোষের ক্ষতিসাধন করে। তারপরে কয়েকটি সম্ভাবনা থাকে। জীবকোষটি হয়তো পুরোপুরি ভাবেই নিজেকে মেরামত করে নিতে পারবে। কিংবা জীবকোষটির সরাসরি মৃত্যু ঘটবে। কিংবা জীবকোষটি পুনরুৎপাদনের ক্ষমতারহিত হবে। যদি ব্যাপকভাবে জীবকোষের মৃত্যু ঘটতে থাকে তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে মানুষটিরও মৃত্যু হতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল এই কারণে। যে-সব জীবকোষের কাজ অপরিহার্য রকমের জরুরি—যেমন নতুন রক্ত বা চামড়া গড়ে তোলা—তাদের মধ্যে শতকরা একভাগের মতো জীবকোষের যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে মারাত্মক কোনো ফল হবে না বলেই আশা করা চলে। কিন্তু গর্ভের

শিশুরা পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে বা এমন কি শিশুদের চেয়েও অনেক বেশি স্পর্শকাতর। হয়তো এমন কয়েকটি জীবকোষের মৃত্যু ঘটল যা চোখ বা হাত গড়ে তুলত—তার ফলে শেষপর্যন্ত জন্ম হলো বিকট একটি জীবের। এমন কি যদি অন্যান্য জীবকোষ মৃত জীবকোষের স্থলাভিষিক্তও হয় তাহলেও তাদের পক্ষে ঠিক সময়টিতে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় না। আর মানুষের শরীর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি এতই জটিল ও এতই সূক্ষ্ম যে সময়ের সামান্যতম হেরফেরেও বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

আর পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনাটা অন্যভাবে আসে। এক্ষেত্রে জীবকোষের কাজের ধরন পালটে যায়। কিন্তু জীবকোষটি বেঁচে আছে এবং জীবকোষ থেকে পুনরুৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু জীবকোষটি নিজেকে পুরোপুরি মেরামত করে নিতে পারছে না। এ-ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় মিউটেশন বা বিকৃতি। মিউটেশন কখনো কখনো হয়তো সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তা ক্বচিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফল হয় প্রাণনাশ। পশুদের মধ্যে দেখা যায় তেজস্ক্রিয়তার নানাবিধ লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অকালমৃত্যু। কিন্তু পশুদের মধ্যে আরো অনেক বেশি সংখ্যকের মৃত্যু হয় এমন একটি রোগে যা মানুষের মধ্যেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়। এই রোগটির নাম কর্কট বা ক্যানসার।

ক্যানসার ও লিউকিমিয়া

মানুষের শরীরে কতকগুলো কোষ কোনো সময়েই বিভক্ত হয় না। মস্তিষ্কের কোষ সম্পর্কে সম্ভবত এই উক্তি করা চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোষ তখনই বিভক্ত হয় যখন তাজা কোষের প্রয়োজনীয়তা থাকে। একটি নিরোগ যকৃৎ যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে সেই ক্ষতি এইভাবে পূরণ হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য কোষরা অনবরতই বিভক্ত হচ্ছে। তবে অবশ্যই শরীরের যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হারে নয়। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক গায়ের চামড়ার কোষ। এই কোষগুলো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। প্রত্যেকবার বিভক্ত হবার পরে দুটি করে "কন্যা" কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি "কন্যা" শক্ত হতে হতে শেষপর্যন্ত মারা যায় এবং তার খসখসে অবশেষটুকু ঘষা খেয়ে গা থেকে খসে পড়ে। অন্য "কন্যাটির" অবস্থান আরো গভীরে। সেই "কন্যাটি" তখন আবার বিভক্ত হয়। এখন, চামড়ার কোনো একটি অংশে যদি

বেশি ক্ষয় হতে থাকে—যেমন হতে পারে পায়ের গোড়ালিতে—তাহলে সেই বিশেষ অংশে কোষ-বিভক্তির হারও খুবই বেড়ে যায়।

যে-সব কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় বিভক্ত হয় না, তারা যদি বিভক্ত হতে শুরু করে, কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় যারা বিভক্ত হয় তাদের বিভক্তির হার যদি অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়—তা হলে যে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় তারই নাম টিউমার। টিউমারের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আঁচিল। এই দৃষ্টান্তটি পরিচিত কারণ আঁচিল আমরা চোখে দেখতে পাই ও হাত দিয়ে ছুঁতে পারি। আমার গায়ের চামড়ায় বর্তমানে কোনো আঁচিল নেই। কিন্তু সম্ভবত আমার শরীরের অভ্যন্তরের প্রত্যঙ্গে অদৃশ্যভাবে গোটাকতকের অস্তিত্ব আছে।

টিউমার যদি ছড়িয়ে না পড়ে তা হলে তাকে বলা হয় "বিনাইন"। কিন্তু এই টিউমারও পীড়াদায়ক হতে পারে, বা এমন কি মৃত্যুর কারণও—যদি টিউমারের অবস্থান হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গে। তবে সাধারণত এ-ধরনের টিউমার শল্য-চিকিৎসায় অপসারিত হতে পারে। যে-সব টিউমার ছড়িয়ে পড়ে তাকে বলা হয় "ম্যালিগন্যাণ্ট" বা ক্যানসার। লিউকিমিয়া এমনি একটি ম্যালিগন্যাণ্ট পীড়া হিসেবে গণ্য। অস্থির মজ্জায় এবং অন্যান্য তন্ত্রীতে এমন কতকগুলি কোষ আছে যা চামড়ার কোষের মতো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। একটি কন্যা-কোষ নিঃসৃত হয় রক্তের মধ্যে এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে বেঁচে থাকে। একেই বলা হয় রক্তের শ্বেতকণিকা বা "লিউকোসাইট"। এই শ্বেতকণিকা জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে। লিউকিমিনিয়া হলে এই শ্বেতকণিকাই প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হতে থাকে এবং বলা বাহুল্য সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে। রোগটিকে বোঝাবার জন্যে খুব একটা মোটা রকমের উপমা দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী থাকে অন্য রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্যে। রাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই সৈন্যবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব। কিন্তু এমন রাষ্ট্র যদি থাকে যেখানে আভ্যন্তরীন ব্যাপারেও সর্বত্র এই সৈন্যরাই জাঁকিয়ে বসেছে তা হলে এই অবস্থাটিকে তুলনা করা যেতে পারে লিউকিমিয়ার সঙ্গে।

ক্যানসারের গবেষণায় প্রচুর তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ধারণা, এই গবেষণার বেশির ভাগটাই নিরর্থক, কারণ ভুল প্রশ্নটি তোলা হয়েছে। গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, "ক্যানসারগ্রস্ত কোষকে ধ্বংস

করার উপায় কী?" বরং অনেক বেশি ফল পাওয়া যেত যদি প্রশ্নটা হত এই: "অধিকাংশ কোষই কেন বিভক্ত হয় না, কিংবা, তখনই শুধু বিভক্ত হয় যখন আরো অধিকসংখ্যক সমজাতীয় কোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়?" একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যাক। আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি—"কোনো কোনো লোক কেন চুরি করে?" কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলতে হবে—"অধিকাংশ লোকই কেন চুরি করে না?" জবাবে নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে যে এই শেষোক্তদের মা-বাবারা তাদের এমনভাবে মানুষ করেছেন যে তারা চুরিকে ঘৃণা করতে শিখেছে। কখনো কখনো চোরকেও শোধরানো যেতে পারে।

সুইডেনের একটি গবেষণা থেকে এ-সম্পর্কে একটি সূত্র পাওয়া গিয়েছে। এই গবেষণায় জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে লিউকিমিয়াগ্রস্ত কোষের নিউক্লিয়স-স্থিত ক্রোমোসোমের একটি বিশেষ অংশ খোয়া যায়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে একটি নিউক্লিয়সের মধ্যে তেইশটি বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম থাকতে পারে। উল্লিখিত গবেষণায় দেখা যায়, লিউকিমিয়াগ্রস্ত অধিকাংশ কোষের ক্ষেত্রে এই তেইশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে একটির একই অংশ খোয়া গিয়েছে। খুব সম্ভবত এই বিশেষ অংশের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা মজ্জাস্থিত কোষের বৃদ্ধির মাত্রা—অর্থাৎ শ্বেতকণিকার সৃষ্টির মাত্রা—কমিয়ে দেয়। যাই হোক না কেন, লিউকিমিয়া রোগীর ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে এই বিশেষ অংশটি খসে পড়েছে। এ থেকে নিরাময়ের একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। ক্রোমোসোমের যে বিশেষ অংশটি খোয়া গিয়েছে সেটিকে যদি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলেই বিপথগামী কোষগুলোকে আবার স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হতে পারে।

আংশিক রক্ষাব্যবস্থা

যদি তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়ামের নিউক্লিয়স সমন্বিত একটি পরমাণু মানুষের শরীরে সংস্থিত হয় তাহলে এই নিউক্লিয়সটির বিস্ফোরণ সম্ভবত কুড়ি বছর ধরে চলবে। বিস্ফোরণের মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না এবং বিস্ফোরণের পৌনঃপুনিকতা হ্রাস পাবে খুবই ধীরে ধীরে। এই বিস্ফোরণের ফলে অন্য কয়েক ধরনের তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু এই স্ট্রনশিয়ামের নিউক্লিয়সগুলোর অর্ধাংশ দুই মাসের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়ে যায়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

ভারতের মাটিতে নেমে আসার আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিশেষ পর্বের বিস্ফোরণ সমাধা হয়ে যাবে। কিন্তু যে বিশেষ ষ্ট্রনশিয়ামের বিস্ফোরণ কুড়ি বছর ধরে চলতে থাকে তা থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রন অস্থির কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে—যার ফলে দেখা দিতে পারে, ক্যানসার—বা, মানুষের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে দেখা দিতে পারে লিউকিমিয়া। তেমনি, বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়-আয়োডিনের অর্ধাংশ দুই মাস ধরে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং তার ফলে থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডের ক্যানসার হওয়া অসম্ভব নয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি যা করতে চাই তা এই: আমি এক কিলোগ্রাম ষ্ট্রনশিয়াম কার্বনেট ও আধ কিলোগ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড কিনেছি। যদি আমাদের অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হয় তাহলে আমি ও আমার পরিবারের লোকরা এই দুটি জিনিসই অল্প পরিমাণে খেয়ে যাব। যদি একগ্রামের পাঁচভাগের একভাগও খাই তাহলেও উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়তো পরিমাণের দিক থেকে একটু বেশিই হয়ে যাবে। খুব অল্প পরিমাণে যদি কোনো পদার্থ গ্রহণ করা যায় তাহলে তা শরীরের মধ্যে বহুকাল ধরে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা খুবই বেশি যে শরীরের কোনো একটি প্রত্যঙ্গে তা সংস্থিত হবে। কিন্তু পরিমাণ যদি বেশি হয় (২০০ মিলিগ্রাম ষ্ট্রনশিয়াম কার্বনেট বা পটাশিয়াম আয়োডাইডকে পরিমাণের দিক থেকে বেশি বলেই ধরা যেতে পারে) তাহলে শরীরের ভেতর থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা নিঃসৃত হয়ে যায়। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, আমি আমার রক্তের মধ্যে ষ্ট্রনশিয়ামের পরিমাণকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছি। এক্ষেত্রে আমার শরীর থেকে যে-হারে ষ্ট্রনশিয়াম নিঃসৃত হবে তা দশগুণের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের শরীরের অন্ত্র ও কিড্‌নির কাছে তেজস্ক্রিয় ও সাধারণ ষ্ট্রনশিয়ামের পার্থক্য ধরা পড়ে না। ফলে—যেহেতু আমি সাধারণ ষ্ট্রনশিয়াম খেয়ে চলেছি—আমার শরীর থেকে অনেক অল্প সময়ের মধ্যে ষ্ট্রনশিয়াম নিঃসৃত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আমার শরীরের অস্থিতে তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনশিয়াম সংস্থিত হবার সম্ভাবনা কম।

আমার পূর্বতন সহকর্মী, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পোচিন আয়োডিন আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই আয়োডিন আইসোটোপ খুবই দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অর্ধসংখ্যক নিউক্লিয়স বিস্ফোরিত হতে সময় নেয় আড়াই ঘণ্টা ও আট দিন। গবেষণায় জানা গিয়েছে, যদি

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন শরীরের ভেতরে যাবার চার ঘণ্টা পরেও সাধারণ আয়োডিন খাওয়া যায় তাহলেও থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে আয়োডিন সংস্থিত হবার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে। তবে আয়োডিনের মতো দ্রুতভাঙনশীল আইসোটোপের বিপজ্জনক অস্তিত্ব তখনই সম্ভব যখন খুবই কাছাকাছি অঞ্চলে পারমাণবিক চুল্লি বা বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। অতএব মার্কিন বা সোভিয়েত পরীক্ষাকার্যের ফলে অন্তত এই ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ-জনিত বিপদের সম্ভাবনা ভারতের ক্ষেত্রে নেই। যেমন আছে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপ-জনিত বিপদ। কিন্তু তবুও আয়োডিন খাওয়াতে আপত্তি নেই। আমার মতে পরিমাণটা হবে এই: পূর্ণবয়স্কের জন্যে প্রথম দিন ২০০ মিলিগ্রাম এবং তারপরে প্রতিদিন ৫০ গ্রাম। শিশুদের জন্যে এই অনুপাতে আরো কম মাত্রায়। যদি এক লিটার জলে এক গ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড মেশানো যায়, তবে এই মিশ্রিত জলের ২০০ ঘন সেন্টিমিটারে ২০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড পাওয়া যাবে।

ভারতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে স্ট্রনশিয়াম ও আয়োডিন কম্পাউণ্ড পাওয়া সম্ভব নয় এবং ক্রয় করাও সাধ্যাতীত। কিন্তু রসায়নের দিক থেকে স্ট্রনশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের মধ্যে মিল এতই বেশি যে স্ট্রনশিয়াম না খেয়ে ক্যালশিয়াম (চুন) খেলেও প্রায় একই কাজ হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ক্যালশিয়াম কার্বনেট খাওয়া যেতে পারে, যা দামে খুবই সস্তা। চুনাপাথর বা চকখড়ি গুঁড়ো করে নিলেও কাজ হতে পারে এবং এক গ্রাম করে খাওয়াই যথেষ্ট। যারা সমুদ্রের ধারে থাকে তারা যদি দিনে একগ্লাস করে সমুদ্রের জল খায় তাহলেই যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিনের যোগান থাকতে পারে। সমুদ্রের জল যদি পরিমাণের দিক থেকে পাঁচগুণ বেশি মিষ্টিজলের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা খেতেও খুব সুস্বাদু। যদি শহরের কাছের সমুদ্র হয় তাহলে সমুদ্রের জল ফুটিয়ে খাওয়াই ভালো। যারা সমুদ্র থেকে দূরে থাকে তাদের পক্ষে আয়োডিন পাবার সহজ কোনো উপায় নেই। তবে আয়োডিনের চেয়ে অনেক বেশি বিপদ হতে পারে স্ট্রনশিয়াম থেকে। এ-প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত টিউবওয়েলের জলকে স্পর্শ করতে পারে না, যেমন পারে খোলা জলকে। বাড়িতে যদি টিউবওয়েল থাকে তাহলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাতের পরে তরিতরকারি টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নেওয়া সমীচীন।

আমি আশা করছি এই প্রবন্ধের পাঠকরা আমাকে অজস্র চিঠি লিখবেন। আমি কোনো চিঠিরই জবাব দেব না। ভারতে লক্ষ লক্ষ ডাক্তার ও রসায়নবিদ আছেন যাঁরা এই প্রবন্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারবেন। আমি শুধু পাঠকদের জানিয়ে রাখছি, যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলোর কথা আমি বললাম তা খুবই অসম্পূর্ণ। আর আমি মনে করি, আমেরিকান, সোভিয়েত, ব্রিটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য (উল্লিখিত ক্রমানুসারে), তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে যতটুকু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব—জোটবহির্ভূত দেশের জনসাধারণের জন্যে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমি জানি, তাঁরা এমন কি নিজেদের দেশের জনসাধারণের জন্যেও এই ব্যবস্থাটুকু করতে রাজি হবেন না।

এই প্রবন্ধ পড়ার পরে অনেক পাঠক বিজ্ঞানীদের এই বলে গালাগালি দেবেন যে বিজ্ঞানীদের জন্যেই জীবন এতখানি বিপদগ্রস্ত হয়েছে। খুব স্পষ্টভাবে একটি কথা বলা যাক। বিজ্ঞান রোগ-নিবারণের ওষুধ আবিষ্কার করেছে এবং তার ফলে শত শত জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে প্রত্যেকেরই ভবিতব্য হচ্ছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় জীবনহানি। কোনো কোনো দেশের গভর্নমেণ্টেরও তাই ইচ্ছে। জীবনরক্ষার চেয়ে জীবন-সংহারের দিকেই তাঁদের আগ্রহ বেশি। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য যত টাকা খরচ করা হচ্ছে তার দশভাগের একভাগও যদি পাকিস্তানের বসন্তরোগ নির্মূল করার জন্যে ব্যয়িত হতো তাহলে সাম্প্রতিক বসন্তরোগটি মহামারি হয়ে দেখা দিত না এবং পাকিস্তানী প্রবাসীদের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে কয়েক ডজন ইংরেজ রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাত না। গভর্নমেণ্ট যদি অসৎ হয় আর অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী যদি অসৎ গভর্নমেণ্টর সঙ্গে সহযোগিতা করে—তাহলে বিজ্ঞানীদের সেজন্যে দোষী করা চলে না।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও মানবজাতির বিপদ

রাধাকান্ত মণ্ডল

সারা পৃথিবীর মানুষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে। এই সকল পরীক্ষায় কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হবে, তার ব্যাপ্তি কতখানি হবে এবং সর্বোপরি এই তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানুষের কি ধরনের ও কতটা ক্ষতি হবে তা নির্ণয় করবার মতো পর্যাপ্ত তথ্য বর্তমানে বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এই কারণেই জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশংকা বেশি। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবার আগেই অপরিসীম ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

তেজস্ক্রিয়তা

মূল বক্তব্যে আসার আগে তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু ইলেকট্রন, নিউট্রন ও প্রোটন এই তিন রকম অন্তিম কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। নিউট্রন ও প্রোটনের সমবায়ে গঠিত ধন আধানযুক্ত 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রীনের চারদিকে ঋণ আধানযুক্ত ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায়। একটি পরমাণুকে যদি আমাদের সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায়—তবে 'কেন্দ্র' হচ্ছে তার সূর্য আর ইলেকট্রনগুলি গ্রহ। কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সংখ্যা (যা বহিস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান) দিয়েই মৌলিক পদার্থের ধর্ম স্থিরীকৃত হয়। কোনো উপায়ে এই সংখ্যার অদলবদল করতে পারলে একটি মৌলিক পদার্থ অন্য একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সংখ্যা খুব বেশি হলে বা প্রোটন ও নিউট্রনের সাম্য নষ্ট হলে পরমাণু অতিরিক্ত শক্তিযুক্ত ও অস্থায়ী হয়ে পড়ে। এইরূপ চঞ্চল পরমাণুকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় উত্তেজিত বা তেজস্ক্রিয় পরমাণু বলে। এইরকম উত্তেজিত পরমাণু তার অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে দিয়ে একটি স্থায়ী পরমাণুতে পরিণত হতে চায়। অস্থায়ী পরমাণু থেকে মুক্ত এই শক্তিই তেজস্ক্রিয়তা। রেডিয়াম,

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মৌলিকের পরমাণু স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত। আবার কতকগুলি মৌলিকের কেন্দ্রীনকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন, আলফা-কণিকা প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করে তার প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা অদলবদল করে উত্তেজিত করা যায়। কোবাল্ট-৬০, ফসফরাস-৩২ প্রভৃতি এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ। পরমাণু বোমার বেলায় ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম এবং হাইড্রোজেন বোমার বেলায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম পরমাণুর মধ্যে ভাঙন বা রূপান্তর একবার শুরু হলে তা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় (chain reaction) ক্রমাগত বেড়ে চলে যতক্ষণ ভাঙন-যোগ্য পদার্থ বা ইন্ধন থাকে এবং তার ফলে অমিত শক্তি মুক্ত হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকীরণ তরঙ্গ বা কণিকা হিসাবে নির্গত হতে পারে। রঞ্জন-রশ্মি ও গামারশ্মি তরঙ্গ। এরা তাপ ও আলোকের মতোই তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম—এক ইঞ্চির এককোটি ভাগেরও কম। বস্তু কণিকা হিসাবে তেজস্ক্রিয় নির্গত হয় প্রধানত ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও আলফাকণা হিসাবে। ইলেকট্রন (বিকীরিত ইলেকট্রনকে বিটা-কণাও বলা হয়) ক্ষুদ্রতম কণা—এর ভর অতি সামান্য—হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় দুহাজার ভাগের একভাগ এবং একক পরিমাণ ঋণ আধানযুক্ত। প্রোটন এক ভর বিশিষ্ট ও একক পরিমাণ ধন আধানযুক্ত। নিউট্রন এক ভরবিশিষ্ট, কিন্তু আধানশূন্য, আর আলফাকণিকা চার ভর ও দুই একক ধন আধানযুক্ত। বিকীরিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে এবং কণিকার গতি যত বেশি হবে তত বেশি তাদের ক্ষমতা হবে জীবকোষ বা অন্য কোনো পদার্থ ভেদ করবার। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সব পরমাণু একসঙ্গে বিকীরণ ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীরণের হার বা দ্রুতি বিভিন্ন। এই দ্রুতি মাপা হয় তাদের 'অর্ধজীবনকাল' দিয়ে। যে সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে যায় ঐ সময়কে তার 'অর্ধজীবনকাল' বলে। যেমন ফসফরাস-৩২-এর অর্ধজীবনকাল চৌদ্দ দিন, আবার কার্বন-১৪-এর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর। যে পদার্থের অর্ধজীবনকাল বেশি, তারা অনেক বেশিদিন ধরে তেজস্ক্রিয় থাকে বলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের সময় শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় পরমাণুর ভাঙন বা রূপান্তরের ফলে অমিত তেজই শুধু নির্গত হয় না, এর ফলে প্রায় শতাধিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক বা আইসোটোপও তৈরি হয়। এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেঘপুঞ্জরূপে ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরে ওঠে এবং বিভিন্ন সময়ে তা আবার 'তেজস্ক্রিয়ভস্মপাত' রূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। ভস্মপাতের ব্যাপ্তি এবং বিস্ফোরণ ও পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার অন্তর্বর্তীকালীন সময় অনুসারে ভস্মপাতকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই স্থানীয়ভাবে যে ভস্মপাত হয় তাকে 'তাৎক্ষণিক' বা নিকটস্থ ভস্মপাত বলা হয়। এটা তেজস্ক্রিয়তা তীব্রতার দিক থেকে খুব বেশি হলেও বিস্ফোরণ-স্থলের কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেহেতু পারমাণবিক পরীক্ষা নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা সমুদ্রে করা হয় সেইজন্য এই ভস্মপাত মানুষকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে মাধ্যমিক বা 'ট্রপোস্ফেরিক' ভস্মপাত যা বায়ুমণ্ডলের পাঁচ থেকে দশ বারো মাইল উঁচু স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং কয়েক দিন থেকে কয়েক মাসের মধ্যে নেমে আসে। এই ভস্মপাতের কাল নির্ণীত হয় বিভিন্ন বায়ুস্রোতের মিশ্রণের দ্রুতি, তাদের গতিপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত হাওয়া প্রভৃতির উপরে। গত বৎসরে রাশিয়ার পরীক্ষার কয়েকমাসের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে এই ভস্মপাতের ফলে তেজস্ক্রিয়তা চারণভূমির ঘাসে এবং গোরুর দুধে সঞ্চারিত হয়েছিল। ভারতের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতেও এই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। গত এপ্রিলে খ্রীষ্টমাসদ্বীপে আমেরিকার পরীক্ষার পরে কলকাতার বৃষ্টিতে তেজস্ক্রিয়তা উল্লেখযোগ্যরকম বৃদ্ধি পায়। কলকাতার একটি বিখ্যাত গবেষণাগার এবিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহে ব্যাপৃত আছে। সবচেয়ে ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও বিলম্বিত 'স্ট্রাটোস্ফেরিক' ভস্মপাত অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার আকারে ঊর্ধ্বে বায়ুস্তরে সঞ্চিত থাকে এবং ধীরে ধীরে কয়েকবছর ধরে সারা পৃথিবীতে নেমে আসে। অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক হ্রস্বজীবী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এখন আন্দাজ করা হচ্ছে যে, বর্তমান পর্যায়ের রাশিয়ান বা আমেরিকান বিস্ফোরণের

ফলে উদ্ভূত এই তৃতীয়শ্রেণীর ভস্মপাত আগামী দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে পৃথিবীতে নেমে আসবে।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতে যে সব আইসোটোপ থাকে তাদের মধ্যে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হচ্ছে প্রধানত স্ট্রনশিয়াম-৯০, আইয়োডিন-১৩১ এবং সিজিয়াম-১৩৭। রেডিয়োস্ট্রন্‌শিয়াম বিটা-রশ্মি বিকীরণ করে এবং এর অর্ধজীবনকাল ২৮ বৎসর। তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম বিটা এবং গভীরে-প্রবেশক্ষম-গামারশ্মি বিকীরণকারী, অর্ধজীবন ২৭ বছর। তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনও বিটা ও গামারশ্মি বিকীরণ করে, তবে এর অর্ধজীবনকাল মাত্র ৮ দিন।

মানুষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন

মানুষ সাধারণভাবে তিনধরনের উৎস থেকে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হচ্ছে। প্রথমত ভূত্বকের শিলা-মৃত্তিকায় অবস্থিত স্বতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং বহির্বিশ্ব হতে আগত মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে—এই দুইয়ের সমষ্টি স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়তা। দ্বিতীয়ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত এক্সরে, রেডিয়ো-থেরাপী প্রভৃতির জন্য তেজস্ক্রিয় বিকীরণ। তৃতীয়ত মনুষ্যসৃষ্ট পারমাণবিক চুল্লির অপচিত দ্রব্যাদি এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ভস্মপাত থেকে। এই সকল বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ স্থান বিশেষে এবং একই স্থানের ব্যক্তিবিশেষে এত বিভিন্ন যে একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করাও প্রায় অসম্ভব। যেমন স্থানবিশেষে পারিপার্শ্বিক বিকীরণের অনেক তফাৎ। বৃষ্টিপাত, বায়ুস্রোত, বিস্ফোরণের স্থান থেকে দূরত্ব ইত্যাদির উপরে কোনো স্থানের ভস্মপাতজাত তেজস্ক্রিয়তা নির্ভর করবে। আবার একই স্থানের সকল ব্যক্তি একই প্রকার তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে না। বিশেষ করে ভস্মপাতের তেজস্ক্রিয়তার বেলায় এটা মনে রাখা দরকার। আরও বিশদভাবে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্যে ভস্মপাতের তেজস্ক্রিয়তা বাইরে থেকে আমাদের প্রভাবিত করা ছাড়াও কিভাবে আমাদের দেহে সঞ্চারিত হতে পারে তা আলোচনা করা যাক। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত কোনো স্থানে ব্যাপকভাবে হলে তা ঐ স্থানের শাকসব্জি, কৃষিজ দ্রব্য, গোমহিষাদির চারণভূমির ঘাসে সঞ্চারিত হবে। এর কতক অংশ ধূলিকণার আকারে ঘাসপাতার গায়ে লেগে থাকবে—ভালো করে ধুয়ে নিলে যার অনেক অংশই চলে যাবে। কিন্তু দ্রবণীয় অংশ বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে প্রবেশ করবে এবং

তা উৎপন্ন ফসলের বা শাকসব্জির অভ্যন্তরে যেতে পারবে, ধুয়ে নিয়ে যা দূর করা যাবে না। তৃণভূমি থেকে দুধের মাধ্যমে এবং ছাগমেষাদির মাংসের মাধ্যমেও ঐ তেজস্ক্রিয়তা মানুষের দেহে আসতে পারে। সমুদ্রে পরীক্ষা বা ভস্মপাতের দরুণ তেজস্ক্রিয়তা প্রতি একক আয়তন জলে অত্যন্ত কম হলেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবের দেহে তা অনেকটা ঘনীভূত হতে পারে। এই জীবগুলি আবার কতকগুলি মাছের প্রধান খাদ্য। আবার ঐ মাছ মানুষে খেতে পারে। এই ভাবে জলের তেজস্ক্রিয়তাও স্বাভাবিক খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের দেহে ঘনীভূত হতে পারে। দেখা গেছে যে, পারমাণবিক পরীক্ষার অল্পদিনের মধ্যে 'নিকট ভস্মপাতের' জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গোদুগ্ধে তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন (আইয়োডিন-১৩১)-এর পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। মানব দেহে আইয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে ঘনীভূত হয়। শিশুরা সাধারণত বেশি দুগ্ধপান করে বলে তাদের থাইরয়েডে ঐ আয়োডিন ঘনীভূত হয়ে তেজস্ক্রিয়তা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌছতে পারে। ভস্মপাতে বর্তমান আর একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ অত্যন্ত দীর্ঘজীবী এবং ক্যালসিয়ামের সঙ্গে এর গুণগত সাদৃশ্যের ফলে খাদ্যের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ দেহে সঞ্চিত হয়। ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ এবং সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্যে ক্যালসিয়াম প্রচুর থাকে বলে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ লঘু বা diluted হয়ে যায় ও সবটা শরীরে শোষিত হয় না। দুধ তার ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধির জন্য এজন্য খুব উপকারী। গরীব লোকেরা দুধ বা ক্যালসিয়ামযুক্ত অন্য খাদ্য কম খেতে পায় বলে তারা ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ ঘটিত তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে বেশি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে—মানুষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন এটা বলা খুব শক্ত। তবে, মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশানাল রিসার্চ কাউন্সিলের 'বিকিরণের জৈবিক প্রভাব' সম্পর্কে বিবরণ থেকে। একজন আমেরিকানের প্রজননগ্রন্থিগুলিতে প্রাপ্ত (এই গ্রন্থিগুলিই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল) ৩০ বছরের মিলিত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা গড়ে নিম্নরূপ: (১) পারিপার্শ্বিক বিকীরণ—৪.৩ রোন্‌জেন্ (রোন্‌জেন্ হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকীরণের মাত্রার একটি একক; এই মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য বলা যেতে পারে—একটি সাধারণ এক্স-রে যন্ত্র রোগীর দেহের চিকিৎসিত অংশে ৫ থেকে ৮ রোন্‌জেন্ বিকিরণ করে, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরস্থ

দূরবর্তী অংশে—যেমন জননকোষগুলিতে—এই মাত্রার প্রায় হাজার ভাগের এক ভাগ পড়ে) (২) বিকিরণ চিকিৎসা, এক্স-রে প্রভৃতি থেকে—প্রায় ৩ রোন্‌জেন্‌ (আমাদের দেশে আরও কম), (৩) তেজস্ক্রিয়ভস্মপাতের দরুণ—০.১ থেকে ০.৫ রোন্‌জেন্‌। এ হচ্ছে ১৯৫৬ সালের হিসাব। তার পরে সম্প্রতি কালের রাশিয়ান ও আমেরিকান পরীক্ষার ফলে শেষোক্ত মাত্রা দুই থেকে দশ গুণ বেড়ে গেছে। স্থানবিশেষে হয়তো আরও বেশি—কে জানে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—যদিও ভস্মপাতের দরুণ তেজস্ক্রিয়তা এখনও আর দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত মাত্রা থেকে কম—তবু যে হারে এই পরীক্ষা চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই এই মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া, এ বিষয়ে আরও একটা কথা বলার আছে। শান্তির জন্য বা চিকিৎসায় রোগমুক্তির জন্য বিশেষ একটি শুভফললাভের উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি নেয়—তার একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের উপর যে পরিমাণই হোক না কেন—একটা অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি চাপানোর কোনো যৌক্তিকতা বা অধিকার কারও নেই।

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব

এখন মানুষের উপর তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানবজাতির সম্ভাব্য বিপদ প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের ব্যক্তিগত দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি। দ্বিতীয়ত, আক্রান্ত জনসমষ্টির ভবিষ্যৎ বংশধরদের এবং সমগ্রভাবে মানব সমাজের ক্ষতি। তৃতীয়ত, মানুষ যে পরিবেশে বাস করে এবং বেঁচে থাকে—অর্থাৎ তার চারপাশে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ নিয়ে যে পরিবেশ—সেই সমগ্র জীবজগতের সাম্য ও স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের ক্ষতি। এই সমস্যাগুলি এত ব্যাপক ও জটিল যে, কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় কতটা ক্ষতি হতে পারে তা নির্ণয় করা বেশির ভাগই এখনও অনুমানসাপেক্ষ।

তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে জানা গেছে প্রধানত জীবাণু, মাছি, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর উপরে পরীক্ষা থেকে। তা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত কিছু মানুষ, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আক্রান্ত

মানুষের উপর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকেও অনেক কিছু জানা গেছে। অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হলে মানুষ এবং যে কোনো জীবই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মারাত্মক মাত্রার নিচে বিভিন্ন পরিমাণের তেজস্ক্রিয়তায় স্বল্পায়ুতা, অকালবার্ধক্য, প্রজননশক্তির হ্রাস বা লোপ, ক্যানসার, রক্তের ক্যানসার বা লিউকিমিয়া, পোড়া, চর্মের কর্কশতা, চুল পড়ে যাওয়া, আভ্যন্তরীন রক্তমোক্ষন, পেটের গণ্ডগোল প্রভৃতি হতে পারে। এই সব লক্ষণের জন্য খুব অল্পসময়ের মধ্যে কয়েক রোন্‌জেন্ থেকে কয়েক শ রোন্‌জেন্ পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা দরকার। এই সকল শারীরিক অসুস্থতার দিক থেকে একটি গুরুমাত্রা থেকে অনেকগুলি হালকা মাত্রায় কম ক্ষতি হয়। কারণ, তেজস্ক্রিয়তার ফলে সঞ্জাত অসুস্থতার অনেকগুলি সাময়িক এবং নিরাময়যোগ্য। এই সব বিচার করে মানুষের জন্য একটি ঊর্ধ্বতম 'নিরাপদ মাত্রা' স্থির করা যেতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তার পক্ষে সবচেয়ে সংবেদনশীল হচ্ছে প্রাণীদের প্রজনন-ব্যবস্থা। যে কোনো তেজস্ক্রিয় বিকীরণ প্রজননগ্রন্থিতে (স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় বা পুরুষের অণ্ডকোষ) পৌঁছলে সেখানে অবস্থিত জিন বা বংশধারা নিয়ামকের পরিব্যক্তি (**Mutation**) ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তিত জিন আবার বংশগতির নিয়মানুসারে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পরিব্যক্তির জন্য কোনো নিম্নতম মাত্রা নেই। যে কোনো পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা প্রজননকোষে পৌঁছলে কিছু পরিমাণ পরিব্যক্তি ঘটাবেই যার অধিকাংশই ক্ষতিকর। তাই অল্পমাত্রার তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তির আপাতত কোনো ক্ষতি পরিলক্ষিত না হলেও পরিব্যক্তিজনিত ক্ষতি ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেকের মধ্যে দেখা যাবে। এই পরিব্যক্তি আঙ্গিক বা মানসিক বৈকল্য, জননক্ষমতার হ্রাস প্রভৃতিতে প্রকাশ পেতে পারে। কোনো ক্ষতিকর পরিব্যক্তির ফল মনুষ্যসমাজ থেকে ততদিন দূরীভূত হবে না যতদিন সেই বংশধারা পৃথিবী থেকে সম্পুর্ণ লোপ না পায়। প্রজননব্যবস্থার উপর তেজস্ক্রিয়তার এই অনিষ্টকর প্রভাব নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির সারা জীবনে প্রাপ্ত মোট মাত্রার উপরে—বিশেষ করে পনের বছর বয়স থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত (যে সময়ের মধ্যে দেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বেশি জন্মায়)—এই ত্রিশ বছরে প্রাপ্ত মোট মাত্রার উপরে। এইজন্য এই সক্রিয় প্রজননশীল ত্রিশ বৎসরই পূর্বে লিখিত ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের হিসাবে ধরা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয়তা-ঘটিত পরিব্যক্তি সম্বন্ধে সঠিক জানা না থাকলেও মানুষের

উপর কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় কতটা পরিব্যক্তি হতে পারে তার সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা হয়েছে। এর জন্য একটি মাত্রা ধরা হয়েছে যার নাম 'দ্বিগুণকারী মাত্রা'—অর্থাৎ যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় সমগ্রভাবে মানবজাতির পরিব্যক্তি স্বাভাবিক পরিব্যক্তির দ্বিগুণ হবে। মোটামুটিভাবে এই মাত্রা হচ্ছে ৩০ থেকে ৫০ রোন্‌জেন্‌। এখানে মুশকিল হচ্ছে—বিশ্বের জনসংখ্যার মধ্যে স্বাভাবিক পরিব্যক্তির হার কিরূপ তাও সঠিক জানা নেই। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক কমিটি এবং ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের হিসাব থেকে এ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র। বর্তমানে আমেরিকার শিশুদের দুইশতাংশ কোনো না কোনো প্রকার জন্মগত বৈকল্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ৩০ থেকে ৪০ রোন্‌জেন্‌ তেজস্ক্রিয়তায় প্রত্যেক আমেরিকান যদি আক্রান্ত হয় তবে এই হার হবে দ্বিগুণ অর্থাৎ চার শতাংশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক কমিটির মতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি ১৯৫৮ সালে বন্ধ হতো তবে পরের কয়েক পুরুষ ধরে আড়াই হাজার থেকে এক লাখ শিশু জন্মগত বৈকল্য নিয়ে জন্মাত। তার উপরে পঁচিশ হাজার থেকে দেড়লাখ লোক ভুগত লিউকিমিয়ায়। ১৯৫৮ সালের পরে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ এই বিপদের মাত্রাও দ্বিগুণ। এ থেকে মোটামুটি বিপদের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বোঝা যায়।

মানবজাতির মঙ্গল অমঙ্গল তার পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। পৃথিবীতে মানুষ অন্যজীব-নিরপেক্ষ হয়ে বাঁচতে পারে না। গাছপালা, পশুপাখি—এরাই আমাদের খাদ্যের যোগান দেয়। কতকগুলি কীটপতঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের খাদ্যসরবরাহ না করলেও তারা হয়তো অন্য প্রাণীর খাদ্য, যারা আবার আমাদের খাদ্য। শিয়াল প্রভৃতি জন্তু, কাক, শকুন প্রভৃতি প্রাণী নোংরা জিনিষ খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। যেহেতু তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল সব জীবের উপর সমান নয়, সেইজন্য এর ফলে আমাদের ও আমাদের চারপাশের জীবজগতের স্বাভাবিক সাম্য (Natural Ecology) নষ্ট হলে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার ফলে অন্তত আঞ্চলিক ভাবে ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত পরিব্যক্তি বেশি হবে যার ফলে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত তেজস্ক্রিয়তা-সহিষ্ণু আগাছা ও কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। তা ছাড়া এক বা ততোধিক প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলে বর্তমান স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যেও ভাঙন আসতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে,

আমাদের মঙ্গলের জন্য শুধু মানুষকেই তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে না, অন্যান্য জীবকেও রক্ষা করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তজ্জনিত তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত সারা বিশ্বের পক্ষে এক অভিশাপ ডেকে আনতে চলেছে। সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত বিংশ শতাব্দীর মানুষ আজ যেন নিজেই নিজের হাতে গড়া সভ্যতা বিলুপ্ত করে দিতে চাচ্ছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের দানবশক্তিতে শ্রেষ্ঠ হবার সদম্ভ প্রচেষ্টায় বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের জীবনের কোনো মূল্যই স্বীকার করা হচ্ছে না। এই মারণযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়ার আগেই সারা পৃথিবীর মানুষকে একযোগে প্রতিবাদ জানাতে হবে—দাবি জানাতে হবে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জনের এবং সামগ্রিক ভাবে নিরস্ত্রীকরণের। কারণ পৃথিবীর কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষই যুদ্ধ না, চায় শান্তি।

পরমাণু ও পারমাণবিক শক্তি

শঙ্কর চক্রবর্তী

বিচিত্র বস্তুর সমবায়ে আমাদের এই পৃথিবী ও বিরাট বিশ্বজগৎ গড়ে উঠেছে। বস্তুর তিন রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। এর যে কোনো একটা রূপে বস্তুকে ক্রমাগত ভেঙ্গে চললে যে সর্বক্ষুদ্র অবস্থায় পৌছনো যায়, তার নাম অণু বা molecule। বিভিন্ন পদার্থের অণু আবার নানা পরমাণু বা atom-এর সমবায়ে তৈরি। এ্যাটম একটি গ্রীক কথা, অর্থ হলো অবিভাজ্য, কিন্তু পরমাণু যে বিভাজ্য হতে পারে, তার সহস্র প্রমাণ বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। পরমাণুরা এত ক্ষুদ্র যে অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এদের দেখার উপায় নেই।

বস্তুরহস্য

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের পরমাণুর অন্দরমহলে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রোটন ও সেই কেন্দ্রীনের চারপাশে একটি কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। সবচেয়ে ভারি মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন ও একাধিক বহির্কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে ৯২টি ইলেকট্রন। প্রোটন হলো পজিটিভ বা ধনবিদ্যুৎসম্পন্ন বস্তুকণা এবং ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ বা ঋণবিদ্যুৎসম্পন্ন বস্তুকণা ও এই দুটি বিদ্যুৎশক্তি পরস্পর সমান। যে কোনো মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে যতগুলো প্রোটন থাকে, কেন্দ্রীনের বহির্কক্ষেও ততগুলো ঋণাত্মক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়—যে কারণে পরমাণুর বৈদ্যুতিক সমতা রক্ষা পেয়ে থাকে। প্রোটনের সংখ্যার ওপরে আবার পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে থাকে।

ইলেকট্রনের ভর বা mass প্রোটনের ভরের দু-হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। একটি পরমাণুর ভর হওয়া উচিত তার মোট প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের যোগফলের সমান। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, বিভিন্ন পরমাণুর ভর তার চেয়ে অনেক বেশি দাঁড়াচ্ছে। এই বাড়তি ভরটুকু এলো কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন নামে একটি নতুন বস্তুকণিকা আবিষ্কার করে বসলেন। একটি জটিল সমস্যার সমাধান হওয়ায় বিজ্ঞানীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দেখা গেল, নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান, কিন্তু তার মধ্যে কোনো তড়িৎধর্মের সন্ধান পাওয়া গেল না। ইলেকট্রনের ভর তুলনায় খুব কম বলেই পরমাণুর কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের সমষ্টিকেই 'পারমাণবিক ভর' বলা হয়ে থাকে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের মিলনেই একটি নিউট্রনের জন্ম। বিদ্যুৎ ব্যাপারে উদাসীন এই বস্তুকণাটি পরমাণুকেন্দ্রীনের বাঁধন থেকে মুক্ত হলেই ভোল পালটে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনোর জন্ম দিয়ে বসে। নিউট্রিনো একটি সম্পূর্ণ নতুন বস্তুকণা। এর কোনো বিদ্যুৎধর্ম নেই ও ভরও অতি সামান্য। পরমাণুকেন্দ্রীন সংক্রান্ত কতগুলো ভারি জটিল সমস্যার সমাধানে এটি বিজ্ঞানীদের হাতে খুব কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

দেখা দিল আরো বড় সমস্যা। পরমাণুকেন্দ্রীন জায়গাটা এত ছোট যে তার কোনো ধারণাই করা যায় না। যে দূরত্ব নিয়ে এখানকার কারবার তার পরিমাণ হলো এক মাইক্রনের একশকোটি ভাগের একভাগ—আর মাইক্রনের মাপ হলো মিলিমিটারের হাজার ভাগের মাত্র একভাগ। তাহলে অত ছোট জায়গার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনেরা গাদাগাদি করে রয়েছেই বা কি করে? ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর (ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ বা জুড়িদার, যাদের কথা পরে আসবে) কথাই ধরা যাক, যার পরমাণুর কেন্দ্রীনে বাসা বেঁধে আছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন। প্রোটনেরা ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা। ধনাত্মক বিদ্যুৎকণারা সবসময়েই পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং ফলে পরমাণুকেন্দ্রীনটার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার কথা। তাহলে কোন শক্তির শাসনে এই চিরবিরুদ্ধ প্রোটনের দল ভালোমানুষের মতো পরমাণুর কেন্দ্রীনে শান্তিরক্ষা করে চলেছে? বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, দুটি সমধর্মী বস্তুকণার পারস্পরিক দূরত্ব যখন স্বল্পাতি-স্বল্প হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের স্বাভাবিক বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক প্রবল আকর্ষণশক্তি কার্যকরী হয়ে ওঠে—তারা নিজেদের মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। এই শক্তিকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন আদানপ্রদানের শক্তি (exchange force)। দুটি প্রোটনের মধ্যেকার বিকর্ষণশক্তির তুলনায় যা কোটি কোটি গুণ বলশালী। এই শক্তিই যেন সিমেন্টের মতো বস্তুজগতকে একত্রিত করে রেখেছে।

ইউকাওয়া নামে এক জাপানী বিজ্ঞানী 'মেসন' নামে আর একটি নতুন বস্তুকণার আবিষ্কার করলেন। তাঁর মতে এই মেসনও পরমাণুকেন্দ্রীনকে আঠার মতো জুড়ে থাকতে সাহায্য করে। এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌছয়, তার মধ্যেই এই মেসনের সন্ধান প্রথম পাওয়া গিয়েছিল।

বিজ্ঞানী এ্যাণ্ডারসন গবেষণাকালীন অবস্থায় আর একটি বস্তুকণা আবিষ্কার করে বসলেন, যার ভর ও অন্যান্য গুণাগুণ সমস্তই ইলেকট্রনের মতো কিন্তু বিদ্যুৎধর্মের প্রকৃতি ধনাত্মক। ইলেকট্রনের এই বিপরীত-বস্তুকণাটির নাম দেওয়া হলো পজিট্রন। আধুনিককালে বস্তুকণার গতিবর্ধক যন্ত্র সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন, প্রোটন-সিনক্রোট্রন, বিভাট্রন ইত্যাদির অভ্যন্তরে এ্যান্টি-প্রোটন (প্রোটনের সমগ্র গুণবিশিষ্ট, শুধু ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী) ও এ্যান্টি-নিউট্রন (নিউট্রনের সমগ্র গুণবিশিষ্ট, শুধু স্পিন বা আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তনের ধরনটা বিপরীত) ইত্যাদি আরো কয়েকটি বিপরীত-বস্তুকণা ও অনেকগুলি নতুন বস্তুকণার আবিষ্কারের ফলে পরমাণুকেন্দ্রীনের নানা রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে চলেছে।

বস্তু ও শক্তি

কল্পনাতীত ক্ষুদ্র পরমাণুর মোট চেহারার তুলনায় তার কেন্দ্রীনের মাপটা আবার এত ছোট যে সমস্ত পরমাণুটাকে একটা ফাঁকা জায়গা বললেও মোটেই ভুল হবে না। অথচ কি অনন্ত রহস্য তার অন্তঃপুরে। এও যেন মহাকাশেরই দোসর। বিরাটত্বে একটি যেমন অনন্ত, অসীম ক্ষুদ্রতার বিচারে অন্যটিও ঠিক তাই। পরমাণুর মধ্যেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন আলাদিনের দৈত্যের শক্তিকে। বস্তুকে ধ্বংস করে শক্তিতে রূপ দেওয়া যায়, আবার শক্তিকে রূপ দেওয়া যায় বস্তুতে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে একটি ঐতিহাসিক আঙ্কিক সূত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ঘটনায় বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের সর্বনাশা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হলো বিশ্ববাসীর। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল, সভ্যতার অপরিমেয় সম্পদের কত চিহ্ন মুছে গেল ওই জনপদ দুটি থেকে।

অপরাধী ছিল কে—পরমাণু? বর্তমানে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা হিরোশিমা-বোমার চেয়েও সহস্রগুণ বেশি শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করেছে। মধ্যযুগে আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ তার সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে যত আগ্নেয়বোমা ব্যবহার করেছে, তার চেয়েও প্রায় তিনগুণ বেশি শক্তিধারণ করে একটি আধুনিক হাইড্রোজেন বোমা। এ জাতীয় একটি বোমার বিস্ফোরণে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, কলকাতার মতো বিপুল জনবহুল শহরের বুক থেকে শুধু যে সমগ্র প্রাণীজগত, গাছপালা বা ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাই নয়, আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মতো এলাকার বারোআনা অংশ সর্বাত্মক ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে।

আগুন আবিষ্কার করে একদিকে মানুষ যেমন তার সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, তেমনি তাকে পুড়িয়ে ছারখারও করেছে। দোষটা আগুনের ছিল না। পরমাণুর বিপুল ধ্বংসের চেহারাটাই তার সত্য পরিচয় নয়। যে অপরিমেয় শক্তির উৎস সেই পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে আছে, তার কল্যাণময় রূপটাই বড়—যে রূপের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় গ্রহণে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা অগ্রণী হয়েছেন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে যে মহতী বিশ্ববিজ্ঞান সম্মেলন হয়েছিল, যে সম্মেলনে পৃথিবীর ৭২টি দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ভাববিনিময়ের পরম সুযোগ পেলেন—সেখানেই রাখীবন্ধন হলো মানুষের শুভবুদ্ধির সঙ্গে পরমাণুর অপরিমেয় শক্তিভাণ্ডারের। সেই সম্মেলনের বাণী আজও বিজ্ঞানীদের প্রেরণাস্থল হয়ে আছে—সমস্ত অকল্যাণের ওপর যে একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। আমরা অত্যন্ত গর্বিত, আমাদের ভারতেরই বিজ্ঞানী হোমী ভাবা সেই বিশ্ববিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ওপর বিজ্ঞানীরা কেন এতখানি গুরুত্ব আরোপ করছেন, তার বিশেষ কারণ রয়েছে। কয়লা এবং খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম—এই দুটি জ্বালানি হলো পৃথিবীর শক্তিব্যবস্থার প্রধান উপাদান। ভূগর্ভে এদের মোট পরিমাণের একটা মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে, পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শিল্পব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে এই সঞ্চয় আনুমানিক দুশ বছরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়বে। অতএব, বিকল্প শক্তিব্যবস্থার কথা এখন থেকেই বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়। পারমাণবিক বোমার সর্বনাশী

ধ্বংসক্ষমতার প্রথম পরিচয় বিজ্ঞানীদের মনে যে বিরাট প্রশ্নের ঝড় তুলেছিল। তার উত্তর খুঁজে পাওয়ার ওপরেই নির্ভর করছিল মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। শক্তিসৃষ্টির নতুন অনুসন্ধানপর্বের প্রধান নায়ক হয়ে দাঁড়াল—পরমাণু।

বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ছোট্ট হিসেব নেওয়া যাক। এক কিলোগ্রাম (এক হাজার গ্রাম, প্রায় এক সের দেড় ছটাক) ওজনের কয়লাকে জ্বালিয়ে ৮½ কিলোওয়াট-ঘণ্টার মতো শক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই শক্তি দিয়ে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আটটি ও পাঁচশ ওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক বাতিকে একঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। এ হলো কয়লা ও অক্সিজেনের পারস্পরিক দহনজাত রাসায়নিক উপায়ে পাওয়া শক্তি। কিন্তু এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টার সমান। অর্থাৎ এই শক্তির সাহায্যে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আড়াই হাজার কোটি বাতিকে এক ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। একটা হিসেব করে দেখা হয়েছিল, এই বিপুল শক্তির দ্বারা ১৯৩৯ সালের গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্পব্যবস্থার পুরো দুমাসের বৈদ্যুতিক চাহিদা মেটানো যেত। এক কিলোগ্রাম বস্তুর সমগ্র পরমাণু শক্তিতে রূপান্তরিত হলেই এই অকল্পনীয় ঘটনাটি ঘটতে পারে। তাহলে কেউ যদি বলেন, মাথার একটা চুলকে ছিঁড়ে নিয়ে তাকে একই ভাবে শক্তিতে পাল্‌টে দিলে একটা মোটর গাড়ি পুরো একবছর নিশ্চয়ই চালু থাকতে পারে—তার কথাটাকে মোটেই বিদ্রূপ করা যায় না। অবশ্য সব বস্তু থেকে এভাবে শক্তি পাওয়া যাবে না। যাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বস্তুজগতে কৌলিন্যে তাদের আসন সকলের ওপরে। শক্তির এ রূপটা হলো পারমাণবিক। আর এর চেহারাটা যে কত বড়, রাসায়নিক ও পারমাণবিক শক্তির পাশাপাশি তুলনাতেই তা ধরা পড়ে। এই শক্তির চাবিকাঠি পরমাণুর প্রতি বিজ্ঞানীরা কেন যে এতটা প্রলুব্ধ হয়েছেন, তা সহজেই বোঝা যায়।

পারমাণবিক শক্তি

পৃথিবীর মানুষের কাছে পারমাণবিক শক্তি ব্যাপারটা নতুন হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সে ছবিটা অনেকদিনের পুরনো। নক্ষত্র সূর্যের কথাটাই ধরা যাক।

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য আলো এবং তাপের বিপুল পরিমাণ এক শক্তিকে ছড়িয়ে চলেছে। সে শক্তির স্পর্শ ছাড়া পৃথিবীর আকাশ, মাটি ও জলের এলাকা জুড়ে এত বিচিত্র প্রাণীজগতের সৃষ্টি কখনোই হতে পারত না। সে শক্তির যে উৎস—তার আসল চেহারাটা কি রকম। বিজ্ঞানের কথায় বলতে গেলে সে হলো এক পারমাণবিক কড়াই—যেখানে প্রচণ্ড তাপের ঠেলায় (চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুরা মিলে চারগুণ বেশি ভারি হিলিয়ামের পরমাণুদের গড়ে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। পদার্থের এই ভোল-পালটানোর সময় হাইড্রোজেনের খানিকটা করে ভর খোয়া যাচ্ছে। সূর্যের সমগ্র দেহে পদার্থের দৈনিক লোকসানের পরিমাণটা হলো ৩০০০০ কোটি টন। এই গঠন প্রক্রিয়ার ফলে প্রতিমুহূর্তেই বিকিরিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ তেজ, যার খুব সামান্য অংশ পৃথিবীতে পৌঁছয়, বাকিটা মহাকাশে ছড়িয়ে যায়। সূর্যের হাইড্রোজেনের ভাণ্ডারে এই বিপুল ঘাটতির অঙ্কটায় কেউ যেন আতঙ্কিত না হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো সূর্যের সমগ্র জন্মকালে তার মোট সঞ্চয়ের শতকরা বড় জোর এক ভাগ হাইড্রোজেন ফুরিয়ে থাকবে, তার বেশি নয়।

আমাদের প্রয়োজন পারমাণবিক শক্তি ও সেই শক্তির উৎস হলো পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র। সে শক্তিলাভের উপায় আমাদের জানা আছে। তা হলো, পরমাণুকেন্দ্রের ধ্বংসসাধন। বস্তু ধ্বংস করে পেলাম শক্তি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে বস্তুটারই দেহ বা কাঠামো আছে, আর শক্তিটা হলো প্রেত, বিদেহী আত্মা। শক্তিরও ওজন আছে, চাপ আছে। একটা বিশেষ শক্তির গামা-রশ্মিকে সীসের মতো গুরুভার পদার্থের ওপর ছুঁড়ে মারলে তা থেকে যুগল বিদ্যুৎকণা—ইলেকট্রন ও পজিট্রন জন্মলাভ করে বসে। শক্তি থেকে বস্তু-সৃষ্টির নমুনা পেলাম। তাহলে একথা যদি কেউ বলেন, যা ছিলনা তাই পেলাম, যেমন বস্তু থেকে শক্তি, আবার কিছুনা থেকে কিছু পেয়ে গেলাম যেমন গামারশ্মি থেকে বস্তুকণা, তাহলে ভুল বলা হবে। বরং একথাটা বলাই বিজ্ঞানসম্মত হবে—বস্তুর মধ্যে লুপ্ত হয়ে ছিল যে তেজ, তাই ছাড়া পেল এবং রশ্মির মধ্যে যে বস্তুসম্ভাবনা ছিল তাই ফুটে বেরোল। এভাবে পদার্থ ও শক্তির যে নিত্যতা, তা রক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীতে বস্তু ভেঙ্গে গিয়ে ক্রমেই শক্তির পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে না, বা শক্তি ভোল পালটে বস্তুর পরিমাণটা বাড়িয়ে তুলছে না।

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

রুশবিজ্ঞানী মেন্দেলিয়েভ তাঁর পর্যায়িক ছকে (Periodic table) হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পৃথিবীর ৯২টি মৌলিক পদার্থকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে তাদের ক্রমিক নম্বর পরমাণু কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জের সমান থাকে। ঐ ছকে এক নম্বর উপাদান হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন, কাজেই কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জ হলো এক। ৯২ নম্বর উপাদান হলো ইউরেনিয়াম, তার কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন, কাজেই এক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জ হলো ৯২। বর্তমানে মৌলিক পদার্থদের রাজ্যে আরো তেরটি নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে। এদের অবশ্য প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এরা জন্ম পেয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে ও বেশির ভাগই খুব স্বল্পস্থায়ী। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা তাহলে বর্তমানে দাঁড়াল ১০৩টি।

পর্যায়িক ছকের একেবারে শেষে যাদের জায়গা—যেমন রেডিয়াম, য়্যাকটিনিয়াম, থোরিয়াম, প্রোটোয়্যাকটিনিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে এদের সংসারের চেহারাটা মোটেই স্থায়ী নয়। আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল সেই ১৮৯৬ সালে, যেদিন ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেল ইউরেনিয়াম ধাতুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় ক্ষমতাকে আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল এই বস্তুটি ক্রমাগত নিজেকে খুইয়ে চলেছে আলফা (হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন), বিটা (ইলেকট্রনকণা) ও গামা রশ্মির আকারে। ক্ষয় পেতে পেতে ইউরেনিয়াম ধীরে ধীরে পর্যায়িক ছকের ৮২নং উপাদান সীসায় পরিণত হচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষয়ক্রিয়া এত ধীরগতি যে আজ থেকে সাড়ে চারশ কোটি বছর পরেও পৃথিবীর ইউরেনিয়াম-সঞ্চয় মাত্র অর্ধেক নিঃশেষিত হবে।

বেকেরেলের কিছুদিন পরে পিয়ের ও মাদাম কুরী সুদীর্ঘ সন্ধানে আবিষ্কার করলেন রেডিয়ামের। ইউরেনিয়ামের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে এই রেডিয়াম, কিন্তু এর তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশ লক্ষগুণ বেশি।

প্রকৃতির রাজ্যে এ এক বিচিত্র রহস্য। অকারণে কতকগুলো বস্তু যেন প্রায়োপবেশনে বসে কৃশাঙ্গ হবার ব্রত নিয়েছে। মোটামুটিভাবে একটা সিদ্ধান্তে এভাবে পৌছনো সম্ভব হলো—যে বস্তুর পরমাণুর কেন্দ্রীনে বেশি সংখ্যায় নিউট্রন রয়েছে তাদের ভাগ্যে নিজেদের এভাবে ভেঙে বিলিয়ে দেওয়া

ছাড়া অন্য পথ নেই। পর্যায়িক ছকের শেষ পাঁচটি সদস্যের পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৩ ও ১৫০।

ইউরেনিয়াম ও জুড়িদার

বস্তুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে পাওয়া শক্তির পরিমাণ এত সামান্য ও ধীরগতি যে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রীনের ভাঙনকে আরো দ্রুতগতি করে তুলতে হবে এবং সেটা কৃত্রিমভাবেই সম্ভব।

পরীক্ষার বস্তুরূপে ইউরেনিয়ামকেই কেন বিশেষভাবে নির্বাচন করে নেওয়া হলো আলোচনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সাধারণ ইউরেনিয়ামের মধ্যে তিনটি আইসোটোপ বা জুড়িদার রয়েছে—ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫ ও ইউ-২৩৪। প্রতিটি জুড়িদারের পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা হলো ৯২টি, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৪৬টি, ১৪৩টি ও ১৪২টি। প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা যোগ করে গেলেই প্রতিটি জুড়িদারের ঘরের চেহারা মিলে যাবে।

আইসোটোপের আইসস্ মানে হলো সমান আর টোপ্‌স্ মানে হলো স্থান। তাহলে কথাটির অর্থ দাঁড়াল—যারা সমান বা একই স্থান অধিকার করে থাকে বা জুড়িদার। সব মৌলিক পদার্থেরই এমনি জুড়িদার আছে। রাসায়নিক গুণাগুণের বিচারে মূল পদার্থের সঙ্গে তাদের জুড়িদারদের কোনো হেরফের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে দুয়ের মধ্যে তফাতটা কোথায়? দুয়ের পরমাণুর ভরের মাপ কষতে গিয়ে সে তফাতটা বেরিয়ে পড়ল।

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের কথাই ধরা যাক। হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে একটিমাত্র প্রোটন ও সেই প্রোটনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। অনুসন্ধানে একটি নতুন পরমাণু পাওয়া গেল, যার রাসায়নিক গুণাবলী সাধারণ হাইড্রোজেনের মতোই কিন্তু ওজনে তুলনায় দুগুণ বেশি ভারি। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডয়টেরিয়াম বা ভারি হাইড্রোজেন। ইনি হঠাৎ এমনধারা ভারিই বা হলেন কেন? দেখা গেল এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি উদাসীন নিউট্রন ঢুকে বসে আছে। কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিই মাত্র ইলেকট্রন। তড়িৎশূন্য নিউট্রনকে পেয়ে 'পারমাণবিক ভর' দুগুণ হলো বটে, কিন্তু, কেন্দ্রীনের তড়িৎ-

চার্জে কোনো উনিশ-বিশ না হওয়ায় ডয়টেরিয়াম পরমাণুটির রাসায়নিক গুণাগুণ যেমন ছিল তেমনই রইল। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে এও সাধারণ হাইড্রোজেনের মতোই জলের অণু গঠন করবে। তাকে বলা হবে ভারি জল (Heavy water)। পাঁচ-ছ হাজার বালতি সাধারণ জলের সঙ্গে প্রায় এক বালতি ভারি জল মিশে থাকে।

সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর শতকরা ৯৯·৩ ভাগ হলো ইউ-২৩৮, বাকি প্রায় ·৭ ভাগ হলো ইউ-২৩৫। ইউ-২৩৪-এর পরিমাণ অতি নগণ্য—তাই একে হিসেব থেকে বাদ দিয়েই ধরা হয়। ইউ-২৩৮ ও ইউ-২৩৫, এই দুটি জুড়িদারকে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করার উপায় নেই। অথচ সে পন্থাটি উদ্ভাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ একমাত্র ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকেই কৃত্রিমভাবে ভেঙে ফেলা সম্ভব। ইউ-২৩৮-এর পরমাণু-কেন্দ্রীনের বেলায় এই ভাঙার কাজটি ঘটার কিন্তু কোনো সম্ভাবনাই নেই। অন্য সব মৌলিক পদার্থকে বাদ দিয়ে ইউরেনিয়ামকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল, এতক্ষণে বোঝা গেল। অন্তঃপুরে রয়েছে সোনার কাঠি—জুড়িদার ইউ-২৩৫। বস্তু ভেঙে শক্তি—এই রূপান্তরের সম্ভাবনায় যে উজ্জ্বল।

হাতিয়ার নিউট্রন

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে তা হলে যে পদার্থটি আমাদের দরকার, সেটি হলো ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার ইউ-২৩৫। এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে ভাঙন ঘটানোর জন্যে হাতিয়ার চাই। সেই হাতিয়ার বা বুলেটের কাজ যে করবে, সে হলো নিউট্রন। হঠাৎ নিউট্রনকে এ কাজের জন্যে বেছে নেওয়া হলো কেন? কারণটা অনুধাবন করা মোটেই শক্ত নয়। নিউট্রন বিদ্যুৎব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বস্তুকণা। ইউ-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে চলেছে ইলেকট্রনরূপ মেঘের আবর্তন। ঋণাত্মক বস্তুকণাদের এই রক্ষীব্যূহের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করতে নিউট্রনকে কোনো বেগই পেতে হবে না। পরমাণুকেন্দ্রীনকে জুতসইভাবে ঘা মারতেও নিউট্রনের অসুবিধেটা তাই কম। কেউ ভাবতে পারেন ঘা-টা যত জোরে পড়বে, ততই ভালো। আসলে কিন্তু দেখা গেছে, দ্রুতগতি নিউট্রনের চেয়ে ধীরগতি নিউট্রনে কাজ হয় অনেক বেশি।

একটা ধীরগতি নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকেন্দ্রীনকে আঘাত করলে ব্যাপারটা

দাঁড়ায় এই, নিউট্রন বেচারা কেন্দ্রীনের ফাঁদে বেমালুম বন্দী হয়ে পড়ে। ধীরগতির জন্যে সে কেন্দ্রীনের কাছে একটু বেশি সময়ক্ষেপ করে ফেলেছিল, তাইতেই এই ফ্যাসাদ। ঘটনাটা ঘটে অবশ্য এক সেকেণ্ডের লক্ষকোটি ভাগেরও একশকোটি ভাগের একভাগ সময়ে। পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি বেশি নিউট্রন যোগ হওয়ায় পারমাণুটির 'পারমাণবিক ভর' বেশি হয়ে দাঁড়াল, আর আমরা লাভ করে বসলাম একটি নতুন পরমাণু—প্রথমটির একটি তেজস্ক্রিয় জুড়িদার।

ইউ-২৩৫ পরমাণুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এখন একটু অন্যরূপ নিতে শুরু করে। এর কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি ধনাত্মক প্রোটন এবং প্রত্যেকটি প্রোটনেরই আবার দুটো করে চরিত্র। একদিকে কেন্দ্রক শক্তির (Nuclear force) প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের ফলে কেন্দ্রীনের অন্য প্রোটন বা নিউট্রন কণিকাগুলোর সঙ্গে তা জোরালো আকর্ষণের টানে বাঁধা পড়ে আছে। অন্যদিকে ধনাত্মক তড়িৎশক্তি তাকে অন্য সমস্ত সমধর্মী প্রোটন থেকে যথাসম্ভব দূরে বিকর্ষিত করতে চাইছে। নিউট্রনটি কাছাকাছি এগুতেই কেন্দ্রীনের ঘূর্ণিপাক শক্তির দ্বন্দ্ব বেড়ে গেল তার ঘরের বাসিন্দা প্রোটন ও নিউট্রনদের (নিউক্লিয়নেরা) সঙ্গে। নিউট্রনটি আকর্ষণ করতে লাগল নিউক্লিয়নগুলোকে, যারা উলটে আকর্ষণ করতে লাগল নিউট্রনকে। এই দোটানার মধ্যে খাবি খেতে থাকা কেন্দ্রীনের নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে পারস্পরিক টানটা কিছু দুর্বল হয়ে দাঁড়াল। অমনি বিকর্ষণের শক্তি সুযোগ পেয়ে ঘাড়ে চেপে বসল। তড়িৎ-যুক্ত প্রোটনগুলো দুই বিপরীত দিকে সরতে শুরু করল, কেন্দ্রীনটি হয়ে দাঁড়াল অস্থায়ী ও বিস্ফোরণের সঙ্গে ভেঙে দুটো টুকরো হয়ে গেল।

বিভাজন

একটি কথা। নিউট্রনের আঘাতে ইউ-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রীণের বস্তুর সবটুকু কিন্তু ভেঙে পড়ল না। ভাঙল এক-হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আর তাইতেই জন্ম নিল প্রচণ্ড শক্তি আর সেই সঙ্গে দুটি হালকা তেজস্ক্রিয় জুড়িদার। প্রচণ্ড বেগে ছাড়া পেল কয়েকটি বিটা কণার দল ও গামা রশ্মি। আর সবচেয়ে দরকারি যে উপাদানটি আমরা পেলাম, সে হলো আরো বেশি নিউট্রন। নিউট্রনের ওপর কেন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া? কারণটা খুবই পরিষ্কার। নিউট্রন ছাড়া ইউ-২৩৫ এর বাকি পরমাণুদের কেন্দ্রীনগুলোকে ভাঙার কাজটা চালাবে কে?

একটি পরমাণুকেন্দ্রীন থেকে ছাড়া পাওয়া নিউট্রনেরা ইউরেনিয়ামের মধ্যে দিয়ে প্রায় উড়েই চলে। (কারণ পরমাণুর বেশির ভাগ জায়গাটা ফাঁকা বললেই হয়।) এরা আবার প্রতিবেশী পরমাণুদের কেন্দ্রীনে ভাঙার কাজ জুড়ে দিল। ছাড়া পেল আরো বেশি নিউট্রন ও জন্মেই অন্য পরমাণুকেন্দ্রীনদের ভাঙার কাজে লেগে গেল। ভাঙার কাজটা এভাবে শিকলি বা শৃঙ্খলের মতো ছড়িয়ে যায় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে পরম্পর প্রক্রিয়া (chain reaction)। ইউ-২৩৫-এর পরমাণুদের কেন্দ্রীনের পর কেন্দ্রীনে ভাঙন ঘটতে ঘটতে ছাড়া পাবে এক বিপুল শক্তি আর তাই থেকে উদ্ভব হবে এক প্রচণ্ড তাপের। পারমাণবিক বোমার কাজের ধারাটাও ঠিক এমনি। বহুসংখ্যক ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনের ভাঙন থেকে এভাবে হিরোশিমার ওপর ফেলা পরমাণু বোমার তাপ ও ধ্বংসের ক্ষমতা জন্ম নিতে পারে। নিউট্রনের দ্বারা পরমাণুকেন্দ্রীনের এই ধ্বংসপ্রক্রিয়ার নাম হলো বিভাজন (Fission)।

ভূগর্ভে প্রচুর ইউরেনিয়াম রয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা প্রকৃতি নিজে থেকে তার সেই ভাণ্ডারে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে না; পারলে সমস্ত পৃথিবীটাই পরমাণু বোমার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। আসল প্রয়োজনটা হলো, বাইরে থেকে একটা উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি করা—কিছু বুলেটরূপী নিউট্রনের জোগান দেওয়া। তারপর সেই বুলেট চালানোর জন্যে বাড়তি শক্তি খরচার দরকার নেই। ইউ-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রীনের বিভাজন চলবে নিজেরই তাগিদে।

একটা কথা ভাববার আছে। যে বাড়তি নিউট্রনগুলো তৈরি হচ্ছে ইউ-২৩৫-এর মধ্যে, তারা যদি বাকি পরমাণুকেন্দ্রীনগুলোর ঘাড়ে না পড়ে ফসকে বেরিয়ে যায়, তা হলে বিভাজনের পালার সেখানেই ঘটবে ইতি। পরমাণুগুলো প্রায় ফাঁকা গড়ের মাঠ বলেই এই ভাবনাটা রয়েছে। অতএব আমাদের চাই ইউরেনিয়ামের এতবড় একটা স্তূপ (pile), যাতে ফসকে যাওয়া নিউট্রনের সব ক্ষতি পূরণ হয়েও কাজ চালানোর মতো নিউট্রনের সরবরাহ চালু থাকে। পরমাণুবিজ্ঞানীরা এই ইউরেনিয়াম স্তূপকে নাম দিয়েছেন ক্রান্তিমাত্রিক ভর (critical mass)।

একটি পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে এই ক্রান্তিমাত্রিক ভরের পরিমাণ এক কিলোগ্রাম বা এক সের দেড় ছটাকের কম হলে চলে না। বস্তুখণ্ডকে দুটো টুকরোয় আলাদা করে রাখা হয়। একসঙ্গে জুড়ে দিলেই শুরু হয়ে

যায় পরম্পর প্রক্রিয়া ও বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ে। সমস্ত বস্তুর একহাজার ভাগের একভাগ মাত্র ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার চেহারা দেখেই আমাদের আতঙ্কের শেষ নেই। পুরো ভরটা শক্তিতে রূপ পেলে যে কি হতো, তা ভাবার চেষ্টা না করাটাই ভালো।

গোত্রান্তর

ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে ইউ-২৩৮ জুড়িদারটাই জুড়ে আছে প্রায় সবখানি জায়গা। নিউট্রনের আঘাত হেনে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনে বিভাজন ঘটানো গেল ঠিকই, কিন্তু ইউ-২৩৮-এর অতখানি বস্তু কি অনাবাদী পড়ে থাকবে? ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, দেখা যাক। ইউ-২৩৮-এর পরমাণুকেন্দ্রীনে নিউট্রনও বন্দী হয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু তার ফলে সেখানে বিভাজন ঘটে না, পরিবর্তে এক ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ ইউ-২৩৯ জন্ম নেয়। আর জন্মেই ইউ-২৩৯-এর পরমাণু একটি কাজ করে বসে—কেন্দ্রীনে আছে যে নিউট্রনের দল তাদেরই কোনো একটির ইলেকট্রনকে মুক্ত করে মুক্তি দেয় সঙ্গী প্রোটনটাকে দুয়ের যুগ্ম বাঁধন থেকে। অমনি একটি তড়িৎ-চার্জ বেড়ে উত্তর-ইউরেনিয়াম সম্পূর্ণ একটি নতুন পদার্থ ৯৩ নং নেপচুনিয়ামের জন্ম হয়। নেপচুনিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রীন বড় ক্ষণস্থায়ী। চট করে আর একটি নিউট্রনের ইলেকট্রনকে মুক্তি দিয়ে, এক ইউনিট তড়িৎ-চার্জ বাড়িয়ে নেপচুনিয়ামের গোত্রান্তর হয় একটি সম্পূর্ণ নতুন পদার্থে—যার নাম প্লুটোনিয়াম। পরমাণুবিজ্ঞানের সৌভাগ্যবশত এই নবসৃষ্ট মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রীন ক্ষণস্থায়ী নয় এবং তার অন্তঃপুরে বিভাজন ঘটানোয় কোনো বাধা নেই। সম্পূর্ণ অনাবাদী ইউ-২৩৮ ক্রমাগত ভোল পালটে, আপন বন্ধ্যাত্বকে ঘুচিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি পারমাণবিক জ্বালানিরূপে নবজন্ম পরিগ্রহ করল। একটা বিরাট কাজ যে হলো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পারমাণবিক চুল্লি

পরম্পর প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি হলো নিউট্রন। ক্রমাগত জন্মাতে থাকা বাড়তি নিউট্রনের কল্যাণে একতাল ইউ-২৩৫-এর মধ্যে এ প্রক্রিয়াটা ছড়িয়ে যায় অত্যন্ত তীব্র গতিতে। এ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে না থাকলে পরিণতিটা হচ্ছে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। আর সে গতিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারলে পাওয়া যাবে পারমাণবিক শক্তি। এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তা থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের স্বচারু আয়োজন যে যন্ত্রে করা হয়েছে, তাই হলো পারমাণবিক চুল্লি (Nuclear Reactor)। সংক্ষেপে আমরা রিয়্যাকটর কথাটাই ব্যবহার করব।

রিয়্যাকটরে জ্বালানির কাজ করবে ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার ইউ-২৩৫। তবে সেখানে কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথম কথা, যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ জ্বালানিকে রাখতে হবে। তা না হলে যে নিউট্রনেরা ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনে আঘাত হানবে, তাদের বেশির ভাগেরই ইউ-২৩৮ ও অন্যান্য বিমিশ্র পদার্থের পরমাণুর ফাঁদে ধরা পড়ে গিয়ে একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা, নিউট্রনদের পক্ষে রিয়্যাকটরের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়। সেরকম কিছু হলে নিউট্রনদের ঘাটতির সংখ্যা বেড়েই চলবে। আর তৃতীয় কথাটা হলো, নিউট্রনদের ছুটে চলার বেগটা এমনিতেই একটু বেশি বলে তারা অমনিধারায় অন্য পদার্থের পরমাণুর ফাঁদে ধরা পড়ে যায়। এ দুটি সমস্যার সমাধান দরকার।

আসল কথাটা হলো, রিয়্যাকটরের কাছ থেকে কাজ পেতে গেলে পরম্পর প্রক্রিয়াকে চালু রাখতেই হবে। ঠিক সেই কারণেই আমাদের নজর রাখতে হবে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুদের বরাদ্দে নিউট্রনের ঘাটতি যেন না পড়ে। সেজন্যে দরকার নিউট্রনকে মন্দগতি করে তোলা। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পারে? বোরোন বা কার্বন ধাতুরই একরূপ গ্রাফাইটকে নিউট্রনদের মডারেটর বা ব্রেক হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক হলো। যে মধ্যস্থতা করে তাকেই মডারেটর বলা হয়। মডারেটররূপী এই গ্রাফাইটের মধ্যে পথ করে নিতে গিয়ে নিউট্রনেরা আপনা থেকেই মন্দগতি হয়ে আসে, তাই তাদের আবার বন্দী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

একটি আধুনিক রিয়্যাকটরের চেহারা মোটামুটিভাবে কল্পনা করা যাক। সমান আকারের কতকগুলো গ্রাফাইটের খণ্ড একটি জায়গায় পরস্পরের মধ্যে খানিকটা ফাঁক বজায় রেখে পাশাপাশি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বসানো আছে। দুটি গ্রাফাইট খণ্ডের মাঝে ওই ফাঁকটুকু রাখা হয়েছে গোলাকৃতি টিউব বসানোর জন্যে। টিউবগুলোর মধ্য দিয়ে জল আনার বন্দোবস্ত করা হবে চালু রিয়্যাকটরের তাপকে ঠাণ্ডা করার জন্যে, আবার

ওরই মধ্যে ইউরেনিয়াম ধাতুখণ্ডদের বসবার আসন তৈরি করে রাখা হয়েছে। দুটো ইউরেনিয়াম ধাতুখণ্ডের মাঝে এভাবে গ্রাফাইটের একটা আড়াল থেকে গেল।

ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকে ভাঙার হাতিয়ার নিউট্রন আসবে কোথা থেকে? সে ব্যবস্থার জন্যে রেডিয়াম ধাতুর একটি টুকরোকে রিয়্যাকটরের মধ্যে কোথাও জায়গা করে দেওয়া হলো। রেডিয়াম থেকে সবসময় বিকীরণ ঘটছে আলফা রশ্মির। এই রশ্মির গতিপথে বসানো রয়েছে বেরিলিয়াম ধাতুর একটি হালকা পাত। ধাতুপাতের সঙ্গে আলফা রশ্মির সংযোগ হতেই জন্ম নিল নিউট্রনের দল। জন্মেই ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীন ভাঙার কাজে লেগে গেল। পরস্পর প্রক্রিয়ায় সমস্ত ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনগুলো একসঙ্গে ভেঙে বসতে পারে। জন্মানো প্রচণ্ড শক্তির আলোড়নে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের রূপ নিয়ে বসবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ করতে হবে, অথচ শক্তিও চাই। সমস্যার সমাধানের জন্যে রয়েছে ক্যাডমিয়াম ধাতু বা বিশেষভাবে তৈরি ইস্পাতদণ্ড। নিউট্রনদের চমৎকারভাবে শোষণ করার ক্ষমতা এদের রয়েছে। রিয়্যাকটরে এদের নিচের দিকে নামিয়ে দিলেই পরস্পর প্রক্রিয়া মন্দগতি হয়ে পড়বে, আবার ওপরের দিকে টেনে তুললেই সে গতি যাবে বেড়ে।

রিয়্যাকটর কিছুক্ষণ চালু থাকলেই ভেতরে প্রচণ্ড তাপ জমে ওঠে। সে তাপ কমানোর জন্যে সবসময়ে ঠাণ্ডা জলের চালু ব্যবস্থা রাখা দরকার। আর একটি কাজে ত্রুটি ঘটলে চলবে না। তা হলো, রিয়্যাকটরের চারদিক পুরু সিমেণ্ট ও কংক্রিট দিয়ে গেঁথে দেওয়ার কাজ। যে সব নিউট্রন, গামা ও অন্যান্য রশ্মি পরমাণুকেন্দ্রীন থেকে ছাড়া পাচ্ছে, মানবদেহের জীবকোষের ওপর তাদের প্রভাব হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক। বাইরে আসার সার্টিফিকেট এরা যেন কোনোমতেই না পায়। তাই এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

রিয়্যাকটরে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকে ভেঙে যে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া গেল, তা থেকে তড়িৎশক্তি পাব কিভাবে? রিয়্যাকটরে জন্মাচ্ছিল যে প্রচুর তাপ, সেটা গোড়ার দিকে তৈরি রিয়্যাকটরগুলোতে নষ্টই হতো। সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম তাকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করলেন। রিয়্যাকটরের তাপ ঠাণ্ডা করতে ঢুকে জল বাষ্পে ভোল পালটে বসছিল। সেই বাষ্পকে বাইরে বার করে নিয়ে এসে বাষ্পশক্তিচালিত টারবাইনকে

চালু করা হলো, সেই টারবাইন চালাল জেনারেটরকে। জেনারেটরকে কোনো শক্তি দ্বারা চালু করতে পারলেই তার থেকে পাওয়া যায় বিদ্যুৎশক্তি। পারমাণবিক শক্তির কল্যাণময় রূপ ধরা দিল যার মধ্যে, সেই পরমাণুশক্তিকেন্দ্র (Atomic Power Station) তৈরির প্রথম গৌরব অর্জন করলেন রুশ বিজ্ঞানীরা। পাঁচ হাজার কিলোওয়াট (এক কিলোওয়াট= এক হাজার ওয়াট ; ওয়াট হলো তড়িৎশক্তির একক বা মাপনী) তড়িৎশক্তি তৈরির ক্ষমতা ছিল সেই স্টেশনের। বর্তমানে রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে কয়েক লক্ষ কিলোওয়াট মাপের পরমাণুশক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারতবর্ষেও বোম্বের কাছে ট্রম্বেতে কয়েকটি পারমাণবিক রিয়্যাকটর নির্মিত হয়েছে। তবে বিদ্যুৎশক্তি পাবার ব্যবস্থা সেখানে নেই। আপাতত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই শুধু পাওয়া যাবে। ভারতের প্রথম পরমাণু শক্তিকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে গুজরাটের তারাপুরে ; তিন থেকে চার বছরের মধ্যে যেটি কার্যকরী হয়ে উঠবে। উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হবে ৮০ মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট= ১০ লক্ষ ওয়াট)। ভারতের ত্রিবাংকুরের সমুদ্র উপকূলে বালুরাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট আছে। এই মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নামে একটি বস্তুকে নিষ্কাশিত করা যায়, যার পরমাণুকেন্দ্রীন ইউরেনিয়ামের মতোই বিদারণশীল। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ভারতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

কয়লা ও পেট্রোলের বিকল্প জ্বালানির আসন গ্রহণ করেছে পদার্থের পরমাণু। ভবিষ্যতের ছবিটা খুবই রোমান্টিক বলে মনে হতে পারে। একটা বিরাট পরমাণুচালিত যাত্রীবাহী জাহাজের সারা বছরের চলবার পাথেয় হবে একটি বড় ড্রামভর্তি তরল নিউক্লিয়র গ্যাস। পরমাণুশক্তিচালিত রুশ বরফভাঙ্গার জাহাজ 'লেনিন' ও আমেরিকান সাবমেরিন 'নটিলাস'-এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে। ছোট একটিন পারমাণবিক জ্বালানিতে একটি বড় যাত্রীবাহী বিমানের সারা বছরের সমস্যা মিটবে। মোটরগাড়ির পথের দুপাশে আর পেট্রোল স্টেশনের দরকার নেই, কারণ ওর পরমাণু-চালিত ট্যাংকে একবার জ্বালানি ভরলেই গোটা বছর চলে যাবে। একটি সাধারণ পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (Thermal Power Station) সারা বছর চালাতে হলে কয়লা লাগে এক লক্ষ ওয়াগন। আর একই শক্তির পরমাণু কারখানা সারা বছর ধরে চালাতে লাগবে মাত্র তিন কি

চার ভাবা সাধারণভাবে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম। এ সব কল্পনাই একদিন সত্যি হয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

তেজস্ক্রিয় জুড়িদার

পারমাণবিক রিয়্যাকটরে আর একটি অপরূপ বস্তু তৈরি হবে—তেজস্ক্রিয় জুড়িদার (Radioactive Isotope)। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরা এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। একটি রিয়্যাকটরে খুব সহজেই এদের তৈরি করা যায়। চালু অবস্থায় একটি রিয়্যাকটরে বিভাজনের কাজে নিযুক্ত ছাড়াও কিছু উপরি নিউট্রন মজুত থাকে। তবে ওরা কিন্তু কেউ স্থির হয়ে নেই—সদা অস্থির, সদাচঞ্চল ওদের মতিগতি। রিয়্যাকটরে যদি স্থায়ী (stable) কোনো মৌলিক পদার্থ রেখে দেওয়া যায়, তাহলে ওদের পরমাণুকেন্দ্রীনেরা ওই উপরি নিউট্রনদের মধ্য থেকে দু-একটিকে বেমালুম উদরস্থ করে বসবে। অমনি শুরু হবে প্রতিক্রিয়া। বাড়তি নিউট্রন লাভ করে পরমাণুদের তড়িৎ-চার্জ বাড়ল না, রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হলো না। কিন্তু কেন্দ্রীনের প্রতিক্রিয়ায় সরল সাদাসিধে পরমাণুগুলো একটা তেজস্ক্রিয় জুড়িদারের জন্ম দিয়ে বসবে। জন্মেই কি নিস্তার আছে? সেই মুহূর্ত থেকে এরা নিজেরাই মেতে ওঠে আপন আপন মৃত্যুর ব্যবস্থাপনায়। জন্মলগ্নে যেটুকু তেজ এরা লাভ করেছিল, সেটুকুই বিটারশ্মি, ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলফারশ্মি বিকীরণের কাজে লেগে যায়। এই বিভিন্ন রশ্মির কল্যাণে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি—যেমন ক্যান্সার টিউমার প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। তেজস্ক্রিয় ফসফোরাস প্রয়োগ করে জমির ফলন পর্যন্ত বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। তবে এদের অনেকেরই আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই তৈরি হবার স্বল্প সময়ের মধ্যেই এদের কাজে লাগিয়ে দিতে হয়।

লঘু কেন্দ্রকের সঙ্গম : ফিউসন

বিজ্ঞানীরা আবার চিন্তিত হয়েছেন উত্তরপুরুষদের কথা ভেবে। হিসেব করে দেখা গেল কয়লা ও পেট্রোল যখন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তারপর পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে তার সমগ্র ইউরেনিয়াম সঞ্চয় আরো দুশ বছরের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন শক্তির চাহিদা মিটবে কি দিয়ে?

সেটা নিয়েই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। আর একটি যে দুর্ধর্ষ মারণাস্ত্র তৈরি হয়েছে, সেই হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে যদি শান্তিমূলক কাজে লাগানো যায়, তাহলে কোটি কোটি বছরেও মানুষের আর কোনো শক্তিসমস্যা দেখা দেবে না।

তার কারণ, হাইড্রোজেন বোমার মূল উপাদান ডয়টেরিয়াম বা ভারি হাইড্রোজেন সমুদ্রের জলে আছে প্রচুর মাত্রায়। পৃথিবীর জলসম্পদের ছ হাজার ভাগের একভাগই হলো ভারি জল। ভারি জলের উপাদান ডয়টেরিয়ামের পরিমাণও তাই বিপুল অংশের কোঠায় গিয়ে পৌছবে। ইন্ধন হিসেবে এত সস্তাও আর কিছু নেই। চারশ টন ডয়টেরিয়ামে অনায়াসে একশকোটি টন তেল আর কয়লার কাজ চলে যাবে।

ডয়টেরিয়ামের কাছ থেকে প্রচুর শক্তি পেতে হলে তুলনায় ভারি হিলিয়াম পরমাণুতে এর রূপ পালটে ফেলতে হবে। তার জন্যে এর সঙ্গে সঙ্গম ঘটাতে হবে হয় সাধারণ হাইড্রোজেনের, না হয় হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় জুড়িদার ট্রাইটিয়ামের (পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন)। সঙ্গমের জন্যে যে গুরুদক্ষিণার বরাদ্দ রয়েছে তার অঙ্কটায় চক্ষুস্থির হবার ব্যাপার। ট্রাইটিয়ামের সঙ্গে ডয়টেরিয়ামের সঙ্গমে হিলিয়ামে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সাফল্য ঘটতে পারে দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের পরিমণ্ডলে। কিন্তু ট্রাইটিয়াম প্রকৃতির রাজ্যে বড়ই দুর্লভ। কাজেই ডয়টরিয়ামকে নিজেরই সগোত্র বা সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে হবে এবং সে অবস্থায় হিলিয়াম গঠনের সাফল্য অর্জনে প্রয়োজনীয় তাপের মাত্রা হলো ত্রিশ কি চল্লিশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

হাইড্রোজেন বোমাকে ফাটানোর আগে তার কেন্দ্রে বসানো একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সেই তাপে হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুরা জুড়ে গিয়ে হিলিয়ম পরমাণুকে তৈরি করে। পরমাণু বোমার তুলনায় অনেক বেশি ভর এখানে শক্তিতে পরিণত হয়, ফলে সেই শক্তির চেহারাও হয় প্রচণ্ড ভয়াবহ। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের বুকে অহরহ এ ঘটনা ঘটে চলেছে। সূর্যে চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের পরিমণ্ডলে পরমাণুদের পরস্পর ঠোকাঠুকি বেড়ে যায়। এই ধরনের এক-একটি সংঘাতে খসে যেতে থাকে কেন্দ্রকের সঙ্গে পরিধির ইলেকট্রনের যোগবন্ধন। সমগ্র গ্যাসীয়মণ্ডল হয়ে ওঠে পুরোপুরি আইওনাইজ্‌ড্‌ অর্থাৎ রাশি রাশি ধনাত্মক

প্রোটন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের এক জগাখিচুড়ি। সাধারণ গ্যাসের অবস্থা সেটা আর নয়। একেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্লাজ্‌মা বা পদার্থের বিশেষ চতুর্থ দশা। এ দশার ধর্ম পদার্থের কঠিন, তরল বা বায়বীয় কোনো অবস্থার সঙ্গেই মেলে না।

এত তাপ বজায় রেখে লঘু হাইড্রোজেন ও ডয়টেরিয়াম পরমাণুদের সঙ্গম ঘটাতে গেলে পৃথিবীর যে কোনো তাপপ্রতিরোধক পাত্রই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কুণ্ডলাকার কোনো ফাঁপা নলের দেয়ালে তাদের জায়গা না দিয়ে ঠিক মাঝামাঝি ফাঁকা স্থানটায় রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সমস্যাটার আংশিক সমাধান ঘটে। প্রচণ্ড মাত্রায় বিদ্যুৎশক্তি পাঠিয়ে, সেই ডয়টেরিয়াম প্লাজ্‌মার তাপ ক্রমাগত বাড়িয়ে লঘু হাইড্রোজেন পরমাণুদের সঙ্গম ঘটানো (Fusion) সম্ভব হবে—যার পরিণতি হলো হিলিয়াম পরমাণু। সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার একটি পরিকল্পনা রুশ বিজ্ঞানীরা উপস্থাপিত করেছিলেন। বছর কয়েক আগে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র বানিয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন Zeta (Zero Energy Thermonuclear Assembly) বা তাপ-কেন্দ্রক সংযোজনাগার। শূন্য তেজের বিশেষণটা খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কারণ এখানে পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় প্লাজ্‌মা থেকে যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যাচ্ছে, খরচ হচ্ছে তার লক্ষ কোটি গুণ বেশি তেজ। কর্মপটুতা (Efficiency factor) প্রায় শূণ্যের কোঠায়।

যে বিরাট সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত এই সব পরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে কল্পনা স্তম্ভিত হয়ে উঠবে। মানুষ দরকার হলে কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারবে তার পৃথিবীর ওপরে। যে সূর্য হবে নক্ষত্র সূর্যের সম-দীপ্তিমান, কিন্তু তার তেজের কারখানাটা সম্পূর্ণই মানুষের নিয়ন্ত্রণে। মানুষ তার প্রয়োজনমতো শক্তি সেই তেজভাণ্ড থেকে গ্রহণ করে নেবে।

পরমাণুর অভ্যন্তরে ধ্বংসের চেহারা আমরা দেখেছি ঠিকই। কিন্তু তার কল্যাণের রূপটাই অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি সত্য। সে রূপ, সে শক্তির শান্তিপূর্ণ রূপায়ণে মানুষ তার ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আজ সে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখি, তা বাস্তব হয়ে উঠবে আমাদের উত্তরপুরুষদের হাতে।

শান্তির সংগ্রামে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুদ্ধ ও শান্তির বা সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ইওরোপে তথা সমগ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্রনীতি ছিল অত্যন্ত সরল। যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে, সে প্রয়োজন ও ইচ্ছা বোধ করলেই পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী পররাজ্যকে আক্রমণ করতে পারে, তার অংশবিশেষ দখল করতে পারে অথবা সমগ্র দেশটাকেই আত্মসাৎ করতে পারে। তার পথে বাধাস্বরূপ কোনো নীতি বা বিবেকের প্রশ্ন ছিল না, একমাত্র অপর কোনো শক্তিমান রাজ্যের লোভ বাদ সাধতে পারত। এমনও দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে ইওরোপের পরাক্রান্ত একাধিক রাষ্ট্র কোনো দুর্বল প্রতিবেশীকে শুধুমাত্র তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বারেবারে গ্রাস করে, শেষ অবধি তার অস্তিত্বই শতবর্ষের জন্য লুপ্ত করে দিল (পোল্যাণ্ডের মর্মান্তিক ব্যবচ্ছেদ)। আর হিংস্র শ্বাপদের মতো এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য গড়ার কাহিনী তো সর্বজনবিদিত। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ডঃ জনসনের সেই উক্তিটি স্মরণীয়: "আমেরিকাতে (কানাডা) ইংরেজ ও ফরাসীরা সব ব্যাপারেই ঝগড়া ও যুদ্ধ চালাচ্ছে, শুধু একটা ব্যাপারে তারা উভয়েই একমত—তা হচ্ছে এই যে উত্তর আমেরিকা ইংরেজ বা ফরাসী যার দখলেই আসুক না কেন, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ঐ দেশে কোনো অধিকারই নেই।"

এমনই এক যুগে, যখন বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে হিংস্র পররাজ্যলোভী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের জয়পতাকা উড়ছে সর্বত্র, তখন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এক গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল নতুন পৃথিবীর প্রথম সন্তান—ফরাসী বিপ্লব। আকাশে উড়ল নতুন আদর্শের নিশান—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতি ও জনগণের জন্মগত অধিকার। আইনের চোখে সব মানুষই সমান, জীবনে বিকাশের সমান সুযোগ সকলকেই দিতে হবে। যুদ্ধ নয়, পররাজ্যহরণ নয়, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী। ফরাসী দেশের নতুন সার্বভৌম সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের

২২শে মে তারিখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নতুন পররাষ্ট্রনীতির গোড়াপত্তন করে জানাল :

> "পরদেশ জয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধে নামার নীতিকে ফরাসী জাতি নিন্দা করছে, পরিত্যাগ করছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে যে কোনও দেশে জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা কখনও শক্তি ব্যবহার করবে না।"

তখনকার বাস্তব অবস্থাটি আমাদের মনে থাকা প্রয়োজন। ফ্রান্সে বিপ্লব বিজয়ী, কিন্তু রাজতন্ত্র তখনও নির্মূল হয় নি। রাজতন্ত্রী অভিজাতরা গোপন ষড়যন্ত্র করছে বিদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফরাসী বিপ্লবকে শৈশবেই হত্যা করার। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সহ রাজন্যবর্গের বিরাট সেনাদল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, জনগণের সদ্যোলব্ধ অধিকারকে রক্তস্রোতে মুছে দিয়ে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংকল্প ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে, মাতৃভূমি ও বিপ্লবকে রক্ষা করার দুর্জয় সংকল্প নিয়েই বিপ্লবী ফ্রান্সও যুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রেই আসে ১৭৯২-এর মে মাসের ঐ বিখ্যাত ঘোষণাটি। বিপ্লবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দল ও সতর্ক প্রহরী জ্যাকোবিনরা এই সূত্রে তাদের নীতি আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে। রোবস্‌পিয়ের বলেন "ফ্রান্স নিজের এক ইঞ্চি জমিও আত্মসমর্পণ করবে না, ফ্রান্স পররাজ্যের এক ইঞ্চি জমির প্রতিও লোভ করে না।"

১৭৯২-এর ১০ই আগস্ট পারী সহরের জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে বিপ্লব প্রজাতন্ত্রের পথে পা বাড়াল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটের ভিত্তিতে গঠিত হলো নতুন সার্বভৌম গণপরিষদ—মহাসম্মেলন (The Convention)। বিপ্লবের প্রজাতন্ত্রী ও বামপন্থী সমর্থকরাই এ সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিল গুরুতর মত পার্থক্য। দেশরক্ষার প্রশ্নে বিদেশী রাজাদের সেনাদলকে মাতৃভূমি থেকে পরিপূর্ণভাবে বিতাড়িত করার প্রশ্নে সবাই একমত। কিন্তু তারপর? বিজয়ী বিপ্লবী সেনাদল কি প্রবেশ করবে পররাজ্যের অভ্যন্তরে? অস্ত্রের জোরে উচ্ছেদ করবে পরদেশের সামন্ততন্ত্রকে, অভিজাততন্ত্রকে, মুক্ত করবে জনগণকে? না, পররাজ্যের সীমানায় পৌছে থেমে যাবে বিজয়ী বিপ্লবীরা? সীমানা থেকেই ঘোষণা করবে রোবস্‌পিয়েরের দৃপ্ত বক্তব্য যে "ফ্রান্স নিজের দেশের এক ইঞ্চি জমি অপরকে ছেড়ে দেবে না, কিন্তু ফ্রান্স অপরের দেশের এক চুল জমিও চায় না?"

মহাসম্মেলনে যুদ্ধকে সর্বত্র প্রসারিত করার সপক্ষে বলতে গিয়ে ব্রিসো (Brissot) পররাজ্যে ফরাসী বিপ্লবের সেনাদলের যুদ্ধকে "প্রায় যুদ্ধ" (Just war) বলে আখ্যা দেন। বেলজিয়ম থেকে ফিরে এসে দাঁত (Danton) ঘোষণা করেন "আমাদের সীমানা একমাত্র ইতিহাসই স্থির করবে।" রোবস্‌পিয়েরপন্থী একজন সদস্য যখন মহাসম্মেলনে চিৎকার করে ওঠেন "পররাজ্য জয় করা চলবে না" (No Conquests)—তখন দাঁত জবাব দেন "চলবে—ন্যায়ের সপক্ষে অভিযান।" ১৭৯২-এর ১৫ই ডিসেম্বর মহাসম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে ফ্রান্স অপর সকল দেশকে সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে ও ঐ সকল দেশে সামন্ত-বিশেষ-অধিকার-সমূহ বাতিল হয়ে যাবে। বিপ্লবী সেনাদলের সাহায্যে ইওরোপকে মুক্ত করার নামে নতুন ধরনের যুদ্ধনীতি শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু এ নীতির বিরোধিতা করল গোড়া থেকেই রোবস্‌পিয়েরের নেতৃত্বে জ্যাকোবিন দলের একাংশ। বিপ্লব স্যুটকেসে ভরে একদেশ থেকে আর এক দেশে গায়ের জোরে চালান করা যায় না এ কথা এঁরা স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন। এঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ (তা সে যে কারণেই হোক) বেশিদিন চললে জনগণের অধিকার হয় বিপন্ন, গণতন্ত্র হয় বিকৃত—মাথা চাড়া দিয়ে ক্রমে চেপে বসতে থাকে সামরিক একনায়কত্ব। ১৭৯২-এর আরম্ভে গণপরিষদে একটি বক্তৃতা দেবার সময় রোবস্‌পিয়ের যুদ্ধের মারফৎ বিপ্লবকে প্রসারিত করার নীতিকে আক্রমণ করে বলেন :

> "রাজনীতিবিদদের মাথায় যতরকম উদ্ভট পরিকল্পনা জন্মাতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে এই যে বিদেশের জনগণের সামনে আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী যদি গিয়ে হাজির হয়, তাহলেই তারা আমাদের আইন ও সংবিধান গ্রহণ করবে। সশস্ত্র দূতদের কেউই পছন্দ করে না এবং তাদের প্রথম স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে এই দূতদের শত্রু বলে প্রত্যাখ্যান করা। ...আমাদের সেনাবাহিনীকে দেখে বিপ্লবী আদর্শের অগ্রদূত না ভেবে, তাদের শৃঙ্খল-রচয়িতা বলে মনে করাটাই হবে স্বাভাবিক। আমরা যদি সত্যিই চাই যে দেশবিদেশে আমাদের বিপ্লবের প্রভাব ছড়াক, তবে সসৈন্যে সেসব দেশে হাজির না হয়ে আসুন আমরা নিজেদের দেশে বিপ্লবকে আরো দৃঢ়মূল করি।"

ঐ বছরেরই শেষে সশস্ত্র সৈন্যদলের সাহায্যে পররাজ্য আক্রমণ করে

বিপ্লবকে প্রসারিত করার ভ্রান্তপথকে তীব্রতম ধিক্কার দিয়ে রোবস্পিয়ের বলছেন :

> "সশস্ত্র অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছিল। আর এখন যুদ্ধবাদীদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের দেশকে সকলের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করা হচ্ছে, কলঙ্কিত করা হচ্ছে বিপ্লবকে।"

মহাসম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ কেন যুদ্ধের পথে গেলেন? কারণ তাঁরা দেশের মধ্যে বিপ্লবকে প্রসারিত করার বদলে, আসলে সামাজিক রক্ষণশীলতার পথ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় যতক্ষণ সশস্ত্র জনগণকে মাতিয়ে রাখা যাবে ততক্ষণ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক প্রগতির যাত্রা যে ব্যাহত হচ্ছে তা তাদের চোখে পড়বে না। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই বিপ্লবী জনগণ দেশে ফিরে দাবি করবে বিপ্লবের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক। কেঁপে উঠবে বিপ্লবকে যারা বিপর্যস্ত করতে চায় সেই রক্ষণশীলদের মসনদ। তাই যুদ্ধের উন্মাদনা থামাতে তারা রাজি ছিল না, প্রস্তুত ছিল না রোবস্পিয়েরদের পরামর্শ শুনতে। একজন রক্ষণশীল নেতা তো স্পষ্ট বলেই ছিলেন : "সশস্ত্র জনগণ ফিরে এলে আমাদের মাথা কাটবে।"

পরবর্তীকালের ইতিহাস রোবস্পিয়ের ও তাঁর বন্ধুদের সমালোচনার যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে। ফ্রান্স তার বিপ্লবী রাষ্ট্রকে হারাল তার কারণ অন্যান্য দেশের জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হলো মহান ফরাসী বিপ্লব। রোবস্পিয়ের দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে, এমন কি ইংলণ্ডেও ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে যে উদ্দীপনা প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল, তাই ছিল বিপ্লবের প্রধানতম সম্পদ। বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হওয়া উচিত ছিল "আমাদের দেশের অত্যাচারীদের আমরা উচ্ছেদ করে জনগণের সার্বভৌম অধিকার অর্জন করেছি, আমরা তোমাদের বন্ধু, আমাদের পাশে দাঁড়াও, আমাদের শান্তিতে এগোতে দাও।" তাহলেই ছড়িয়ে পড়ত দেশে দেশে বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব। আর বন্দুকের জোরে ফরাসী আদর্শকে অপর দেশের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করায়, সেই সব দেশের জনগণ ফরাসী বিপ্লবকে এক নতুন ধরনের 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে ধরে নিল এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শকেই সম্বল করে ফরাসী সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। রোবস্পিয়ের ঠিকই বলেছিলেন আর সে কথা আজও সত্য : "বেয়নেটের ডগায় করে স্বাধীনতা কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া

যায় না।" ফরাসী বিপ্লবের ও মানবপ্রগতির দুর্ভাগ্য যে রোবস্‌পিয়েরদের মত সেদিন 'বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী' উন্মাদনার স্রোতে ভেসে গেল!

বহু বছর পরে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ মার্কসবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বন্দীশালাকে ভেঙে পৃথিবীর এক ষষ্ঠমাংশে বিজয়ী করল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। শোষণহীন শ্রেণীহীন নতুন মুক্ত মানবসমাজের জয়পতাকা উড়ল। ঘোষিত হলো নতুন পররাষ্ট্রনীতি—পৃথিবীর জনগণের জন্য শান্তি চাই। কেমন ধরনের শান্তি? "Peace without annexations, Peace without indemnities"—ক্ষতিপূরণ নয়, পররাজ্য হরণ নয়, প্রকৃত শান্তি। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে এক হাতে প্রতিহত করল তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র, অন্য হাতে বাতিল করল রুশ সাম্রাজ্যবাদের সই করা সমস্ত পররাজ্য হরণ ও পীড়নের অন্যায় সন্ধিপত্রগুলি। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির লেনিন-নির্দিষ্ট ভিত্তি হলো বিশ্বশান্তি ও বিভিন্ন সামাজব্যবস্থায় গঠিত রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। বিপ্লব নিজ দেশে মজবুত করার মাধ্যমেই সারাজগতে আজ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রভাব। রোবস্‌পিয়েরদের প্রসিদ্ধ ঘোষণারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে সমাজবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কণ্ঠে:

> "আমরা মাতৃভূমির একচুল জমি অপরকে দখল করতে দেব না, পররাজ্যের এক চুল জমিও আমরা চাই না।"

শান্তির পতাকা হাতেই সেদিনও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, শান্তিকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা আজও তাই সাম্যবাদী বিপ্লবের ও প্রগতির সকল যোদ্ধাদের প্রধানতম কর্তব্য।

"বহু নদী স্রোতে সমুদ্রের দিকে যাত্রা পথে আমরা যারা দৃঢ় সংকল্প, তারা উৎসের প্রতি আনুগত্যকে কখনোই ভুলে যাব না।"

সোভিয়েত রাশিয়া এবং নিরস্ত্রীকরণ

[১৯২২—১৯৩৪]

সুনীল সেন

।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা আলোচিত হয়েছিল, নিখিল বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসেছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের অফুরন্ত যুক্তিতর্ক শোনা গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হয়, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক অস্ত্রীকরণ বৈঠকে পরিণত হয়। এর পরিণতি কি হয়েছিল তা আমাদের জানা আছে। বর্তমানে অস্ত্রসজ্জার দুরন্ত প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা পিছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব যে, তখন একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো কেন? নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা কি ছিল? নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নীতির মূল গতি কোন দিকে ছিল?

লীগ অব নেশনসের অনুশাসনের অষ্টম ধারায় উল্লিখিত ছিল যে, 'জাতীয় নিরাপত্তা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অস্ত্রসজ্জাহ্রাস শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রয়োজন। 'জাতীয় নিরাপত্তা' এবং নিরস্ত্রীকরণ—এই দুই নীতির মধ্যে বিরোধ বাধে। প্রধান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্ন তুলে নিজেদের দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করতে কুণ্ঠিত ছিল, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা এই সমস্যাটি বিচার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম। 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্ন শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই গৌণ ছিল না। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির 'হস্তক্ষেপের যুদ্ধ'-র নিদারুণ অভিজ্ঞতা তার ছিল। তৎসত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট থাকে। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে।

১৯২২ সালের বিষণ্ণ বৎসরে সোভিয়েত রাশিয়া সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেল, সেটা ছিল জেনোয়া

সম্মেলন। হস্তক্ষেপের যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা সবে সে পার হয়ে এসেছে। তার অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। সম্প্রতি প্রকাশিত লেনিন-চিচেরিন পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে, লেনিন স্বয়ং সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের জেনোয়া সম্মেলনে অনুসৃত নীতির কাঠামো নির্ধারণ করেছিলেন। তিনিই প্রতিনিধি-দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁর জেনোয়ায় যাওয়া হয় নি, সোভিয়েত জনগণের মনে আশঙ্কা ছিল যে, ধনতান্ত্রিক দেশে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হতে পারে। ইতিপূর্বে ডারা কাপলানের গুলিতে লেনিন আহত হয়েছিলেন। বৈদেশিক বিষয়ের মন্ত্রী চিচেরিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন, তাঁর সহকারী ছিলেন লিটভিনভ। রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে চিচেরিনের জন্ম। কয়েকটা বিদেশী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। সোভিয়েতের প্রথম যুগের প্রধান কূটনীতিবিদদের তিনি অন্যতম। জেনোয়া সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। চিচেরিন তাঁর বক্তৃতায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের সম্পর্কের কথা তুললেন এবং সেই প্রসঙ্গে অস্ত্রসজ্জা কমানোর প্রস্তাব পেশ করলেন। চিচেরিনের বক্তৃতা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

> However, all efforts toward the reconstruction of the economic position of the world are vain, so long as there remains suspended over Europe and the world the menace of new wars, perhaps still more devastating than those of the past years.... The Delegation intend to propose...the general limitation of armaments, and to support all proposals tending to lighten the weight of militarism, on condition that this limitation is applied to the armies of all countries.

চিচেরিনের এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনব, এবং ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিদের কাছে অপ্রত্যাশিত। ফরাসী প্রতিনিধি ব্রায়াঁ এই প্রস্তাবের আলোচনা বন্ধের দাবি জানান। চিচেরিনের প্রস্তাব জেনোয়া সম্মেলনে আলোচিত হবার মর্যাদা পেল না। 'প্রাভদা' লিখল : "সর্বদেশের জনগণ জানবে, কমিউনিস্টরাই নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, আর

বুর্জোয়া সরকারেরা তা আলোচনা-বহির্ভূত করেছিল।" (২২শে এপ্রিল, ১৯২২)

জেনোয়া সম্মেলনের কিছু পরে সোভিয়েত রাশিয়া মস্কোতে এক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করল (১২ই জুন, ১৯২২)। এটাই সোভিয়েত রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করে। সোভিয়েত প্রতিনিধি-দলের নেতা ছিলেন লিটভিনভ। এই সম্মেলনে সোভিয়েত প্রস্তাব ছিল, দেড় বা দু-বৎসরের মধ্যে সেনাবাহিনীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কমানো হোক। পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য রাষ্ট্র এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। মস্কো সম্মেলনের ব্যর্থতার পরে দশম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস দুনিয়ার জনগণের উদ্দেশে এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রচারপত্র প্রকাশ করে :

> In Genoa, Soviet Russia and her allies proposed general disarmament. When this was rejected, the proletarian government sought to secure disarmament within the limited area of the countries bordering on Soviet Russia.... But that initiative, too, was wrecked by the refusal of Russia's neighbours to accept effective reduction of their armies... Let the peoples demand peace of their governments. The cause of peace is in the hands of the people. (ইজভেস্তিয়া, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২২)

শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে দুনিয়ার জনমত গড়ে তুলবার এই প্রচেষ্টা অভিনব।

লীগ অব নেশনসের অনুশাসনের অষ্টম ধারা এতকাল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। লোকার্নো চুক্তির পরে, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে জার্মানির পুনঃপ্রবেশের পর্ব থেকে লীগ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং অষ্টম ধারার কথা আবার শোনা গেল। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য ১৯২৫ সালে একটি কমিশন নিয়োগ করা হলো। জেনেভাতে ১৯২৬ সালে প্রস্তুতি কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে। আমন্ত্রিত হয়েও সোভিয়েত রাশিয়া এই অধিবেশনে যোগদান করে নি। কিছু পূর্বে স্থইট্জারল্যাণ্ডে সোভিয়েত কূটনীতিবিদ ভোরোভ্স্কি এক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। স্থইট্জারল্যাণ্ডের

সঙ্গে সোভিয়েতের বিরোধের মীমাংসা হয় এবং ১৯২৭ সালের শারদীয় অধিবেশনে সোভিয়েত যোগদান করে। এবারে প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন লিটভিনভ। এর পরেও বহুবার লিটভিনভ সোভিয়েত প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। লিটভিনভ বলশেভিক পার্টির একজন পুরনো সভ্য। ১৯০৫ সালের সুবিখ্যাত লণ্ডন কংগ্রেসে তিনি অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। লেনিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী লিটভিনভ জেনোয়া সম্মেলনে চিচেরিনের সহকারী হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝবার বিষয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। মস্কো সম্মেলনে তিনি সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। অধুনা প্রসিদ্ধ 'যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা' গঠনে তাঁর ক্লান্তিহীন দৃঢ় প্রচেষ্টা ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুবিদিত। 'নিউ কেমব্রিজ হিষ্ট্রি'র লেখক লিখেছেন: জেনেভায় লীগের অনুশাসনের তাঁর মতো উৎসাহী প্রচারক আর কেউ ছিলেন না (*New Cambridge Modern History, Vol. XII*, পৃঃ ৪৮৯)। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রাক্কালে লিটভিনভের জায়গায় নিযুক্ত হন মলোটভ।

ই. এইচ. কার লিখেছেন, প্রস্তুতি কমিশনের শারদীয় অধিবেশন লিটভিনভের্ উপস্থিতিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। ১৯২৭ সালের ৩০শে নভেম্বর লিটভিনভ কমিশনের চতুর্থ অধিবেশনে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবে সমস্ত স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর বিলোপ; সমস্ত মারণাত্মক অস্ত্র এবং যুদ্ধ-জাহাজের ধ্বংস; নৌ এবং বিমানঘাঁটির বিলোপ; যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানার ধ্বংস; সরকারী বাজেটে সামরিক খাতে অর্থ বরাদ্দের অবসান প্রভৃতি দাবি করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে, কিংবা পর্যায়ক্রমে চার বৎসরের মধ্যে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার সুপারিশ করা হয়। ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেন না। জনগণের মধ্যে তখন যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান। তাঁরা কৌশলের আশ্রয় নেন এবং বলেন যে, প্রস্তুতি কমিশনের সামনে আলোচ্য বিষয় অস্ত্রহ্রাস, পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নয়। এইভাবে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করা হয়। অবশ্য অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কেও প্রধান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একমত হতে পারে না। জার্মানির প্রতিনিধি বার্নস্টরফ জোরের সঙ্গে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের দ্রুত অগ্রগতি দাবি করেন। জার্মান-আক্রমণের অতীত স্মৃতি ফ্রান্সের মনে জীবন্ত, ফ্রান্স আগাগোড়াই

'জাতীয় নিরাপত্তা'র দাবি জানায়। অবশেষে ১৯৩০ সালে একটা খসড়া প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে রাসায়নিক এবং জীবাণু-যুদ্ধ নিষিদ্ধ করবার সুপারিশ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল না। ইটালি, জার্মানি এবং সোভিয়েত রাশিয়া খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।'

অবশেষে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসে। বহু বৎসর এবং বহু সুযোগ ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই সম্মেলনের ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের যে সম্ভাবনা ছিল, ১৯৩২ সালে তা ছিল না। ইতিমধ্যে ঘটেছে বিশ্বঅর্থনৈতিক মন্দা (১৯২৯-৩২), যার আঘাতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিৎ কেঁপে উঠেছিল। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং পরের বৎসরে সাংঘাই-এর উপর বোমাবর্ষণ লীগের অনুশাসনকে ব্যঙ্গ করছিল। জার্মানিতে নাৎসি দলের উত্থান ছিল আর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল রাইখ্‌স্টাগে ১০৭টি আসন (ভোটসংখ্যা ৬৫ লক্ষ) লাভ করে, পূর্বের নির্বাচনে তার আসনসংখ্যা ছিল মাত্র ১২ (ভোটসংখ্যা ৮ লক্ষ)। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের এই ছিল পটভূমি।

নিখিল বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তিতর্কের এক গোলকধাঁধা সৃষ্টি করলেন, লিটভিনভের ভাষায় বলা যায় "there was a complete lack of agreement on any single concrete proposal, and even on a general formula." ফ্রান্স একটা সশস্ত্র বাহিনী রাখবার প্রস্তাব করল, কোনো দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করলে এই বাহিনী তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। আমেরিকার প্রস্তাব ছিল—এক-তৃতীয়াংশ নিরস্ত্রীকরণ। ব্রিটেন এই প্রস্তাবের মধ্যে দেখতে পেল তার ক্রুইজার-বাহিনীর সংখ্যা কমানোর দুরভিসন্ধি। বৃটেনের পক্ষে সার জন সাইমন 'qualitative limitation'-এর প্রস্তাব দিলেন। সংখ্যাগত ভাবে অস্ত্র কমানো নয়, বিশেষ ধরনের 'আক্রমণাত্মক অস্ত্র' সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল: 'আক্রমণাত্মক অস্ত্র'-র সংজ্ঞা কি? জার্মানি সমানাধিকারের দাবি তুলল; হয় ভার্সাই চুক্তিতে তাকে যেমন নিরস্ত্র করা হয়েছে, অন্যান্যদেরও তেমন করা হোক, কিংবা তাকে

পুনরস্ত্রসজ্জার অধিকার দেওয়া হোক। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা লিটভিনভ ১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি নতুন করে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ করলেন। লিটভিনভ বললেন :

> The idea of complete and general disarmament differs from all other schemes in its simplicity, practicability and effective control of its implementation.... Only complete disarmament can assure *equal security* and *equal conditions* for all the countries.

পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব ধনতান্ত্রিক দেশগুলি গ্রহণ করবে, এমন রঙিন আশা লিটভিনভের ছিল না। তিনি তাই শতকরা ৫০ ভাগ অস্ত্রসজ্জা হ্রাস, কয়েকটি বিশেষ ধরনের আক্রমণাত্মক অস্ত্রের (যেমন, ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান, ভারি বোমারু জাহাজ) বিলোপ এবং সর্বপ্রকার রাসায়নিক এবং জীবাণুযুদ্ধের নিষিদ্ধকরণের দাবি করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব এবারও অগ্রাহ্য হয়।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মানিতে নাৎসি দল ক্ষমতা লাভ করেছে, যে দলের অন্যতম রণধ্বনি ছিল ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা। জার্মানি লীগ থেকে বেরিয়ে আসে এবং অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। ইতিপূর্বে জাপানও লীগ বর্জন করেছিল। মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালি অস্ত্রসজ্জার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিল।

যবনিকার আড়ালে আর একটা চক্র অবিরাম যুদ্ধচক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানার মালিকরা এই চক্রের নায়ক। ১৯১৩ সালে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেনিন বিলাতের মেসার্স আর্মস্ট্রং এণ্ড কোম্পানির অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের বিস্তীর্ণ ব্যবসার বিবরণ দিয়েছিলেন, উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোনের উদারনৈতিক পুত্র ছিলেন এই কোম্পানির অন্যতম প্রধান মাতব্বর। পণ্ডিত নেহেরু এই চক্রের ভূমিকার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন: "এরা হচ্ছে নরহত্যার পাইকারি ব্যবসাদার ; এদের মৃত্যুবর্ষী যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে তাকেই বেচতে রাজি থাকে।··· বিভিন্ন দেশের এই রণসজ্জা নির্মাণের কারখানাগুলোর পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগ আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা ; এদের নিজেদের কারবার চালাবার বেলায় এরা ঘোর আন্তর্জাতিকতাবাদী—এদের নামই দেওয়া হয়েছে 'গুপ্ত আন্তর্জাতিক'।

নিরস্ত্রীকরণের কথায় এরা ঘোরতর আপত্তি তুলবে এ তো খুবই স্বাভাবিক।···এদের গুপ্তচরেরা প্রত্যেক দেশের ঊর্ধতন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করেন।" জর্জ সেলড্স তাঁর *Iron Blood and Profits* বইতে আমেরিকার ডু পণ্ট, জার্মানির ক্রুপস্, ইংলণ্ডের ভাইকার্স প্রভৃতি দৈত্যকায় কোম্পানির কার্যকলাপের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

এই চক্র আড়াল থেকে সুতো টানেন, আর রঙ্গমঞ্চে রাজনীতিবিদরা পুতুলের মতো নাচেন। এই পুতুলনাচের ইতিকথা জানবার এখনও অনেক বাকি।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অবশ্য অনেক সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের তখনও মীমাংসা হয় নি। আসলে এর অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল অবাস্তব। ১৯৩৪ সালের শেষে সম্মেলনের অধিবেশন ডাকা বন্ধ হলো। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অন্তিম মুহূর্তে লিটভিনভ প্রস্তাব করলেন, সম্মেলনকে একটি স্থায়ী শান্তি সংগঠনে পরিণত করা হোক এবং নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচিত হোক। ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের যুদ্ধের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় নিরাপত্তার প্রশ্ন স্বভাবতই পুরোভাগে এসে পড়েছে। তখন থেকেই লিটভিনভের 'যৌথ নিরাপত্তা' নীতির শুরু।

এই প্রবন্ধের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত বই এবং পত্রিকা থেকে :

E. H. Carr : *International Relations between the Two world wars*, 1919-1939.

G. M. Gathorne-Hardy : *A Short History of International Affairs*, 1920-1939.

New Cambridge Modern History, vol. XII.

Nehru : *Glimpses of World History.*

New Times, No 11, 27, 28. [1962]

History of the Communist Party of the Soviet Union. [1960]

নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা

শ্যামল চক্রবর্তী

অবশেষে এ বছরের ১৫ই মার্চ তারিখে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণের বৈঠক আবার বসল : এ যেন অরক্ষণীয়া মেয়েকে পার করবার জন্যে বারে বারে কনে দেখাবার পালা। হৈ-চৈ করে বরপক্ষ কনে দেখতে আসছেন, পান-তামাক খাচ্ছেন, অনেক বড় বড় নীতিকথা আওড়াচ্ছেন, মেয়েকে যথা-অযথা অনেক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে সভা ভঙ্গ করে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কনে পছন্দও হয় না ; সম্বন্ধও পাকা হয় না।

১৯৪৬ সালের আণবিকশক্তি কমিশনের পর, ১৯৪৭ সালের প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশনের বিলোপ হয় ১৯৫০-এর জানুয়ারি মাসে।

১৯৫১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয় এক কমিটি গঠন করে। এদের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত হয় ঐ প্রতিনিধিদের নিয়েই এক নিরস্ত্রীকরণ কমিশন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই কমিশন আলাপ-আলোচনা চালাল। এর পরে এলো দ্বাদশ শক্তির কমিশন এবং তার আবার পঞ্চশক্তির সাব-কমিটি ; চলল আরো কথা, আরো আলাপ। আবার চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রস্তাবে গড়া হলো দশ রাষ্ট্রের কমিশন, যার কার্যকাল ১৯৬০ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত। তারপর আবার এই ৬২ সালের বৈঠক।

সম্প্রতি *U. S. News and World Report* হিসেব দিয়েছে যে ১৯৪৬ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত, এই ষোল বছরে, নিরস্ত্রীকরণের ওপর আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়েছে ৮৬৩টি ; এতে ১৭০০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করা হয়েছে এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ কথা উচ্চারিত হয়েছে।

বুকভাঙা কাহিনী, মনভাঙা কাহিনী ঘোষণা করছে এত সব বৈঠক ; সত্যিকারের Heart-Break House-এর গল্প।

মনে হচ্ছে; কনে দেখবার উপমা দিয়ে ভালো করি নি। কারণ, মেয়ের

বিয়ে না হলে যে ট্র্যাজেডি তা নিতান্তই একটি মেয়ে বা একটি পরিবারের একান্ত নিজস্ব। কিন্তু যে ট্র্যাজেডির কথা আমি তুলেছি এখানে, তার কালো ছায়া আবৃত করেছে সারা দুনিয়ার মানুষকে। একটা প্রচণ্ড ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা। অতীতের সমস্ত ধ্বংসলীলাকে ছাপিয়ে এক মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনার সম্মুখীন আজ পৃথিবী, যেখানে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ জ্বলে ছাই হয়ে যাবে; আর ছাই হবে বহু হাজার বছরের বহু পরিশ্রমে, বহু ভালোবাসায় গড়ে তোলা মানবসভ্যতা। যারা বেঁচে থাকবে তারাও হয় অর্ধমৃত অবস্থায় মৃত্যুর শীতল স্পর্শের জন্যে অপেক্ষা করবে, নয় মাটির গভীর তলদেশে আশ্রয় নেবে যেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা পৌছবে না। আর, আমাদের এই অতি পুরাতন, অতি পরিচিত, অতিপ্রিয় পৃথিবী, "অচল অবরোধে আবদ্ধ," "মেঘলোকে উধাও," "গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যান-নিমগ্না," "নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী," পড়ে থাকবে শুধু বীজাণু আর আরশোলাদের জন্যে—কারণ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সমগ্র প্রাণি-জগতে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করবার ক্ষমতা ওদেরই সবচেয়ে বেশি। জ্ঞানসাগরে জাল ফেলে তোলা কলসীর মুখ খুলে বেরিয়েছে যে জিন্, তাকে বাঁধতে পারলে প্রভূত সম্পদ লাভ হবে মানুষের, আর বাঁধতে না পারলে এই জিন্ই মানুষকে বিনাশ করবে।

ভালো হতো, যদি সত্যিই আরব্যোপন্যাসের গল্প হতো এটা। কিন্তু তা হলো কই? হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনা ঘটল এই তো কয়েক বছর মাত্র আগে। তখন ছোট দুটো আণবিক বোমা মস্ত দুটো শহর ধ্বংস করেছিল। আর আজ পারমাণবিক অস্ত্র তার বহুগুণ শক্তি নিয়ে ফুঁসছে; প্রতিযোগী দুই পক্ষের গোপন অস্ত্রাগারে যে পারমাণবিক অস্ত্র সঞ্চিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা তার পরিমাপ জানিয়েছেন ২৫০,০০০ মেগাটন বা ২৫,০০০ কোটি টন টি. এন. টির সমান। অন্যার্থ, পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসী মানুষের জন্য মাথা পিছু ৮০ টনের বেশি বিস্ফোরক জমা হয়ে রয়েছে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

শুধু খাতার পাতায় কষে দেখানো হিসেব এ নয়; অস্ত্রগুলোও যাদুঘরের আলমারিতে তোলা নেই। যে কোনো মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য এ মারণাস্ত্র রয়েছে বিভিন্ন গোপন রকেট-উড্ডয়ন কেন্দ্রে, রয়েছে উড়ন্ত বিমানের জঠরে, রয়েছে সাগরের তলায় ভ্রাম্যমান ডুবোজাহাজে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে

নির্দেশের কয়েকমিনিটের মধ্যেই রকেট উড়বে, বোমা পড়বে, গোলা বর্ষিত হবে।

এমন প্রচণ্ড সর্বনাশ মাথায় নিয়ে এত কথা আর এত সময় অপচয় করে মানুষ কোন যুক্তিতে ?

যুক্তি অবশ্য অনেক দেখানো হয়ে থাকে। তবে সে যুক্তিগুলির সারবত্তা বা অসারতা বিচার করতে গেলে বিশ্বরাজনীতির ওঠাপড়া এবং নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার গতিপথের কিছুটা পরিক্রমা প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলা যুদ্ধোত্তর মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছিল ; সুতরাং যুদ্ধের পরে স্থাপিত হয় জাতিসঙ্ঘ বা League of Nations। যার কভেন্যান্টের ভূমিকাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে জাতিসঙ্ঘে যোগদানকারিগণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ না করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ("the acceptance of obligations not to resort to war")। তারপর জাতিসঙ্ঘের আওতার ভিতরে ও বাইরে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পত্তন করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে সাফল্যের একমাত্র নিদর্শন দেখানো হয়ে থাকে ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন নৌবাহিনী সীমিতকরণের চুক্তিটিকেও (Washington Naval Limitation Treaty of 1922) ; কিন্তু সে চুক্তিও আসলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নৌশক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিসর্জন ছাড়া আর কিছু নয়— অস্ত্রহ্রাস সম্বন্ধে তাতে কোনো উল্লেখই ছিল না। বরং এ পর্যায়ে সকলে অবাক হয়েছিল যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে ১৯২৭ সালে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তুতি কমিটিতে সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আসে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এ প্রস্তাবকে অবান্তর রসিকতা হিসাবে দ্রুত বর্জন করেন। আজও মনে পড়ে ডেভিড লো-র বিখ্যাত কার্টুন : আপাদমস্তক মধ্যযুগীয় নাইটের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তিবর্গ বিরক্তিভরা ভ্রূকুঞ্চিত মুখে তাকিয়ে রয়েছেন চ্যাপলেইনের পোশাক পরা সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভের দিকে, কারণ তিনি হাসিমুখে একটি অলিভপাতা ওদের বর্মের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রীতিমতো সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।

অবশ্য এরকম ঘটাই তখন স্বাভাবিক ছিল। কারণ মহাযুদ্ধের অবসানে

সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের মারফতে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলেও, বাকি পৃথিবীতে তখনও সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রভূত্ব। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অসম্ভব ছিল। ব্যাপক মানবসমাজের শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব অনিবার্য করে তুললেও, সে সমস্ত প্রয়াসকেই সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় বাগবিস্তারের নিরর্থক ধূম্রমণ্ডলীতে পর্যবসিত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কিন্তু কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বময় সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হওয়া দূরে থাক, সারা ইওরোপে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসাবে সে আবির্ভূত হয়েছে। অগ্রগামী লালফৌজের নিরাপত্তা-বর্মের পেছনে পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বময় অভূতপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ওদিকে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তি-সূর্য অস্তমান। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হিসাবে প্রাধান্য অর্জন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; যুদ্ধের আগুনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগে নি তার মাটিতে; বিশ্বময় যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করে সামরিক অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে তার অধিষ্ঠান নিশ্চিত করেছে; সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো যে আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন-কৌশল একমাত্র তারই জানা, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে তার ভয়াবহ ধ্বংসকারিতা সে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করেছে এবং এই মহাবল পাশুপত অস্ত্রের একমাত্র অধিকারী হিসাবে বিশ্বময় নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সে উন্মুখ।

বহু লক্ষ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর, কামান বন্দুক ও রকেটের বিস্ফোরণে অস্থির, পোড়ামাটি ও প্রাসাদ-নগরীর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে পৃথিবী তখন রণক্লান্ত, যুদ্ধবর্জিত শান্তিময় জীবনযাত্রার কামনায় অধীর। তাই আবার গড়ে উঠল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার শুভ উদ্দেশ্য নিজ সনদে ঘোষণা করে। জাতিসঙ্ঘে পূর্বানুসৃত ভ্রান্তির পুনরাবর্তন শুরু যাতে না হয়, সেজন্য গৃহীত হলো বৃহৎশক্তি নিচয়ের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করার নীতি। কারণ শুধুই সংখ্যাধিক্যের

জোরে এদের ওপরে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে গেলে জাতিপুঞ্জে ভাঙন অনিবার্য এবং এরা একমত হয়ে শান্তি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা বন্ধ করা সম্ভব।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই ভিন্নধর্মী রাষ্ট্রের মত ও পথের বৈপরীত্য প্রথম থেকেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। বিরোধ বাধল পূর্ব ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও গ্রীসে ও অন্যত্র রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি যখন ফ্যাসিবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষে, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের অবসান এনে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন ঘোষণা করছে; তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাথী ও সাকরেদ ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগেছে। দুই মতের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এবার প্রতিক্রিয়াশীলতার আদর্শগত লক্ষ্যকে উপস্থাপিত করলেন মিঃ চার্চিল। ৫ই মার্চ, ১৯৪৬ সালে, তিনি তাঁর ফুলটন বক্তৃতায় বিশ্বময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিভীষিকাময় (?) ছবি এঁকে ঘোষণা করলেন যে সাম্যবাদকে প্রতিহত করবার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তি একটা "অনিশ্চিত, কম্পমান শক্তির ভারসাম্য" (quivering, precarious balance of power") সন্তুষ্ট না থেকে, অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি করতে হবে।

তখন থেকে বিশ্বরাজনীতিতে যে যুগের শুরু হলো তাকে অভিহিত করা হয়েছে 'শীতযুদ্ধ'-এর যুগ বলে। শীতযুদ্ধ বলা হচ্ছে এই জন্যে যে ঠিক বিশ্বযুদ্ধ বাধছে না বটে, তবে পৃথিবী বারবার এসে দাঁড়াচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহ গহ্বরের কিনারায়। দেখতে দেখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে যুদ্ধঘাঁটি বানিয়ে তুলতে লাগল; মানচিত্র দেখলে বোঝা যাবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সীমানাকে ঘিরে ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সামরিক ঘাঁটি দিয়ে বেষ্টিত করে ফেলা হয়েছে। সৃষ্টি হলো মার্কিন নেতৃত্বে উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংগঠন বা NATO; তারিখ, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও এগিয়ে গেল দক্ষিণপূর্ব এশিয়া

চুক্তি সংগঠন (SEATO), মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংগঠন (MEDO), অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতির মারফৎ এক ছুনিয়াজোড়া চুক্তি-শৃঙ্খলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখতে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে স্বদেশে এবং যথাসম্ভব বিদেশে, কমিউনিস্ট অনুসন্ধান ও বিতাড়নের নামে সর্বত্র মার্কিন রাজনীতির বিরোধী সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমাজচ্যুত ও অশক্ত করে রাখবার প্রয়াস; এ প্রচেষ্টা কুখ্যাত সিনেটার ম্যাকার্থির নামের সঙ্গে চিরতরে যুক্ত হয়ে থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে চেষ্টা করে এসেছে নিজের প্রতিরক্ষা শক্তিকে উন্নত ও সংহত করে তুলতে; সমাজতান্ত্রিক মিত্ররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে, যার প্রত্যক্ষ ফল ওয়ারশ চুক্তি; এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে মিত্রশক্তি বিচার করে নিয়মিতভাবে তার সমর্থন করতে।

১৯৪৬ সালে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শীতযুদ্ধ একদিকে যেমন গুলি-গোলা বোমা-বারুদে অগ্নিময় যুদ্ধে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে কোরিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ভিয়েৎনামে, সুয়েজখালের তীরে, তেমনি অপরদিকে অন্য কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৪৯ সালে চীনে গলিত চ্যাং-কাই-শেক শাসন ভেঙে নূতন সমাজতান্ত্রিক চীনরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পরের বারো বছরে প্রায় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। এমনকি ল্যাটিন আমেরিকাতেও কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রাধান্য থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছে এবং সে ঘোষণার প্রতিধ্বনি উঠেছে ঐ মহাদেশের অন্যান্য অংশে। ফলে, শীতযুদ্ধের শক্তি সমাবেশ ভেঙে গেছে; বিশ্বরাজনীতিতে আর এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নামকরণ হয়েছে নিরপেক্ষ শক্তিসমূহ বা Neutralist Powers। যুদ্ধে এদের আগ্রহ স্বভাবতই নেই; এরা চাইছে শান্তির পরিবেশে থেকে দীর্ঘকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে দ্রুত অগ্রগতি।

পরিবর্তন আরও ঘটেছে:

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল—সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল।

১লা নভেম্বর, ১৯৫২ সাল—প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল মার্কিন সামরিক কর্তৃত্বাধীনে।

২১শে আগস্ট, ১৯৫৩ সাল—পারমাণবিক বিস্ফোরণের রহস্য সোভিয়েতেরও করায়ত্ত।

গত দশ বছরে রকেট-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে তার সর্বাধুনিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেছে নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একেবারে পেছিয়ে নেই; ইতিমধ্যেই গ্লেন শেপার্ড ও কার্পেণ্টার মহাকাশ ঘুরে এসেছেন। এর পাশাপাশি অবশ্য যুদ্ধাস্ত্র ও সমরসম্ভার সীমাহীন ভয়াবহতায় উন্নীত হয়েছে। ৫০, ১০০ বা ততোধিক মেগাটন বিস্ফোরক শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক অস্ত্র, আন্তর্মহাদেশীয় রকেট তো বটেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন জানাচ্ছেন যে গ্লোবাল রকেট বা রকেট-বিধ্বংসী-রকেটও তাঁদের করায়ত্ত।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আণবিক ও পারমাণবিক শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন প্রাধান্য ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমনি আর নেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সর্ববিষয়ে তাদের সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং শান্তির সপক্ষে তাদের সুনিশ্চিত মতবাদ জানিয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির একচেটিয়া প্রাধান্য আজ কোনো পক্ষের নেই সত্যি, কিন্তু তা বলে যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে বর্তমান বিভীষিকার ভারসাম্য বা Balance of Terror-এর জন্যই যুদ্ধ আর বাধবে না, তাঁরা সুখের স্বপ্ন দেখছেন। কারণ, এ ভারসাম্য সর্বদাই অস্থির; উভয়পক্ষই নিরন্তর চেষ্টা করছে এবং করবে ভারসাম্যকে নিজের পক্ষে টানতে। অতীতে শক্তির ভারসাম্য যেমন বারবার ভেঙে পড়ে যুদ্ধের আবর্তে পৃথিবীকে ডুবিয়েছিল, তেমনি বিভীষিকার ভারসাম্যও যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলতে বাধ্য। কঙ্গো থেকে লাওস, বার্লিন থেকে কিউবা পর্যন্ত বিস্তৃত বিরোধের উত্তপ্ত আবহাওয়ায়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা ছাড়া শক্তিপ্রয়োগের পথ যতক্ষণ খোলা থাকবে, ততক্ষণ সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা গভীরভাবে বর্তমান।

আর একদল লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে যুদ্ধ বাধবেই, ঠেকাবার উপায় নেই, সুতরাং হেসে নাও দু দিন বৈ তো নয়···

এটা ঠিকই যে সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য বিসর্জন দেওয়ার বদলে যুদ্ধই কামনা করবে। কিন্তু মনের কামনা তাদের যাই হোক না কেন, এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে দুর্বল সাম্রাজ্যবাদ অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হয় নি ; অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু জায়গায় তাকে ঔপনিবেশিক গ্রাস ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে।

এও ঠিক যে যেসব সমরনায়ক যুদ্ধের মারফতে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও মর্যাদাবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরাও যুদ্ধ বাধাবার প্রচেষ্টাতেই সক্রিয় থাকবেন। তেমনি সক্রিয় থাকবে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত, অস্ত্রব্যবসায়ে মুনাফার পাহাড় সঞ্চয়ে ব্যস্ত, একচেটিয়া পুঁজিপতির দল। এই সমরনায়ক ও শিল্পপতির মিতালি থেকে যে ঝড়ের সঙ্কেত আসছে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন—কোনো সাম্যবাদী প্রচারবিদ নয়—স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর বিদায়ী অভিভাষণে :

> This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in American experience. The total influence—economic, political, even spiritual—is felt in every city, every state and every office of the federal government···In the councils of government we must guard against the acquisition of unwanted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for disastrous use of misplaced power exists and will persist.

অবশ্য এ ছাড়াও আছে স্বল্পসংখ্যক রাজনীতির বিষবাষ্পে অন্ধ বা উন্মাদ ব্যক্তি, যারা 'Better dead than Red' জিগির তুলে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমরাস্ত্র ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত মুনাফা করবার সুযোগ নেই। দুনিয়াময় যুদ্ধ ঘাঁটি তাদের ছড়ানো নেই। ওখানে আইন পাশ করা হয়েছে যুদ্ধপ্রচারের বিরুদ্ধে। এজন্য নয় যে ভয়াবহ যুদ্ধপ্রচার চলছিল এবং আইনের সাহায্যে সে প্রচার দমন করতে হয়, বরং, সব দেশেই যে যুদ্ধের

সপক্ষে প্রচার আইনের চোখে অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তারই উদাহরণ স্থাপন এ-আইনের উদ্দেশ্য। সোভিয়েত দেশের মানুষের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যু আর ধ্বংসের ভিতরে যে চূড়ান্ত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না সারা দুনিয়ায়। সোভিয়েতের মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তিতে বাঁচতে চায়—এ সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন সকলেই, যাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে এসেছেন অথবা সোভিয়েতের মানুষজনের সঙ্গে মিশেছেন।

কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নাই হয়, সমরাস্ত্রসজ্জিত রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতবার না হলেও, বারবার পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, যার কুফলও ব্যাপক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কৈফিয়ৎ হলো: আমাদের দেশকে চারিদিকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে ঘিরে রাখা হয়েছে; একটার পর একটা সামরিক চুক্তি গড়া হয়েছে আমাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ বারেবারে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুংকার তুলেছেন ও তুলছেন; আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত ডুবোজাহাজ ঘুরছে সাগরে, আকাশে উড়ছে বিমান; ন্যাটো-চুক্তির দ্বারা গঠিত সামরিক বাহিনী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহড়া দিচ্ছে আমাদের সীমানার অপর পারে; আমাদের সামরিক গোপনীয়তা ভেদ করবার জন্য গোয়েন্দাগিরির জটিল জাল ছড়ানো হয়েছে; এ অবস্থায় নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়েছে; এবং, এতদিন যে যুদ্ধ বাধে নি তার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণও হলো যে আমরা যথেষ্ট বলশালী।

আবার এ কথাও সত্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের যুদ্ধের সঙ্গে কোনো স্বার্থসম্বন্ধ নেই; তারাও যুদ্ধ চায় না, শান্তিই চায়। তবুও এ সব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা নিজ নিজ রাষ্ট্রের অনুসৃত অস্ত্রসজ্জা ও সমরমুখী নীতি সমর্থন করে আসছে।

জিজ্ঞেস করলে এরা বলবে: আমরা যুদ্ধ চাই না; সোভিয়েত দেশ তার নিজের মতে চলুক তাতে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু আসলে আমরা তাদের বিশ্বাস করি না। প্রচণ্ড ধ্বংসকারী পারমাণবিক অস্ত্র ওদের হাতে;

ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক স্থলবাহিনী ওদেরই ; লালফৌজের উপস্থিতি না থাকলে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র আসত না, সাম্যবাদীরা শাসন চালাতে পারত না ; চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি বা জার্মানির ইতিহাস হতো অন্যরকম ; কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করবার জন্য কোরিয়া বা তিব্বতে চীনের সৈন্য অস্ত্র হাতে নেমেছে ; ঐ একই উদ্দেশ্যে ওরা ফের অন্য দেশে একই কাজে লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নেতারা নিরস্ত্রীকরণের যে সব শর্ত দিচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন তা মেনে নেয়, ভালো ; নিরস্ত্রীকরণ হবে। নইলে নিরুপায়।

এদের সন্দেহ যথার্থ কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। ঘটনা হলো, এ সন্দেহ তারা সত্যই পোষণ করে।

এটা খুব পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে, উভয়পক্ষের অপরের সম্বন্ধে গভীর আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে নিরস্ত্রীকরণের কোনো প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং, সেই প্রস্তাবেরই ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যাতে নিরস্ত্রীকরণ চলে সমান তালে, কোনো পক্ষকেই অপরের তুলনায় বেশি সুযোগ না দিয়ে।

কিন্তু এমন ফর্মুলা যদি বার করাও যায়, তবে নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারা কি সে প্রস্তাব মানবে।

সামরিক বিশেষজ্ঞ আর পেশাদার কূটনীতিক, যাঁদের অনেকেরই টিকি বাঁধা আছে একচেটিয়া যুদ্ধশিল্পের সঙ্গে, যদি একমাত্র দায়িত্বে থাকেন, তাহলে নিরস্ত্রীকরণ ঘটবে না কোনদিনও। সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপ যদি ঘটে, তাহলে যুদ্ধবিহীন পৃথিবী সৃষ্টি সম্ভব।

দুনিয়াটা বদলেছে অনেক। একদিন ছিল, যখন কর্ম হতো কেবল কর্তার ইচ্ছায়। এখন বাচ্যের পরিবর্তন ঘটছে ; কর্মকারকরাও কর্তৃকারক হয়ে বসছে।

অথচ তা যে ঘটবেই, একথা হলফ করে বলা যায় না। মানুষকে বাঁচতে গেলে যুদ্ধকে মারতে হবে। এ যুগে যুদ্ধ আর নিয়তির মতো দুর্বার নয়, তেমনি নিয়তির মতো অনিবার্য নয় শান্তি।

> "Mankind can and must live without war. War in the contemporary epoch is not fatally inevitable. But neither is peace fatally inevitable."—বলেছেন খ্রুশ্চেভ্।

অথচ বিপদ বাড়ছে দিনে দিনে। পারমাণবিক অস্ত্র নতুন নতুন রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলে, তার নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও হয়ে উঠেছে আরও কঠিন। ছোটখাট যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফ্রান্সে O. A. S. বিদ্রোহ যে রূপ নিয়েছিল, তাতে সেনাবাহিনীর হাতে যথেষ্ট পরিমাণে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্র ছড়ানো থাকলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যে সব বিমান উড়ছে তাদের কোনো এক দুর্ঘটনার ফল মারাত্মক হতে পারে। এই তো ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন Strategic Air Command-এর অধিনায়ক জেনারেল পাওয়ার Radar-এর ভুল নির্দেশে সমস্ত মার্কিন ঘাঁটি থেকে সমস্ত বোমারু বিমান পাঠিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে। তারা এগিয়েছিল পুরো বারো মিনিট ধরে। পরে ভুল ধরা পড়ায় তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু যদি ভুল ধরা পড়তে দেরি হতো, যদি রকেট উড়ত তার আগেই,…

নষ্ট করার মতো সময় মোটে নেই। বিপর্যয় ঘটবার আগেই উভয় পক্ষেরই আক্রমণ করার বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে একই সঙ্গে। আর নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যথোপযুক্ত তদারকির।

এই পটভূমিকাতেই বিচার করতে হবে সতেরো রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের জেনিভায় বৈঠক ও তার প্রস্তাবাদি।

ইতিপূর্বে এক কোটি আশি লক্ষ কথার ফুলঝুরি জ্বললেও সবটাই বৃথা হয় নি। নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকটা ঐক্যমতে পৌছনো গেছে; নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাকে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করে কয়েকটা বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের চতুর্দশ অধিবেশনে সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

১৯৬১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষোড়শ অধিবেশনের সামনে সোভিয়েত ও মার্কিন যুগ্ম-রিপোর্ট পেশ করা হয়, যাতে তাঁরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আলোচনার মূল নীতিগুলি উপস্থাপিত করেন।

এ আশঙ্কা দীর্ঘকাল থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মনে ছিল যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি সমরসজ্জার সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছে যে নিরস্ত্রীকরণ ঘটলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য। কিন্তু সতেরো রাষ্ট্রের বৈঠকের সামান্য কিছু আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল 'নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল' নামে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে পরিষ্কার করে ঘোষণা করা হয়েছে যে যুদ্ধের পরে মন্দা এড়িয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যেভাবে সম্ভব হয়েছিল, নিরস্ত্রীকরণের পরেও শান্তির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেও তেমনি মন্দা এড়ানো যাবে; উপরন্তু এ অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ হবে অনেক ব্যাপক ও বিস্ময়কর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এই রিপোর্টে একমত হয়ে স্বাক্ষর দিয়েছেন অন্যান্যদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি।

বৈঠকের সদস্যদের চরিত্রও পাল্টেছে। প্রথম দিকে বৈঠক বসত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সঙ্গে ক্যানাডাকে নিয়ে। অর্থাৎ, একদিকে সাতটি পশ্চিমী শক্তি, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬০ সালে দশ জাতির বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে পূর্ব ইওরোপীয় আরও চারটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থান হলো। এবারে উপরোক্তদের সঙ্গে আসন পেয়েছে ব্রেজিল, ব্রহ্ম, ইথিওপিয়া, ভারত, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া, সুইডেন ও সংযুক্ত আরব রিপাবলিক। অর্থাৎ, নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠীর কার্যকরী অবদান রাখবার সুযোগ ঘটেছে এখানে।

কিন্তু দুর্লক্ষণেরও অভাব ছিল না। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব ছিল আঠেরো জাতির বৈঠক করানো। কিন্তু ফ্রান্স বলল এ বৈঠকে তারা যোগ দেবে না। ফ্রান্স সাহারায় আণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে; ফ্রান্স ন্যাটো যুদ্ধজোটের অন্যতম পাণ্ডা; সেই ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে নিরস্ত্রীকরণ হয় না। অবশ্য তেমনি হয় না চীনকে বাদ দিয়ে; অথচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিদের ফলে আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জে চীনের স্থান করানো গেল না। উপরন্তু আলোচনা শুরু হবার আগে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী খ্রুশ্চেভ্ প্রস্তাব করেছিলেন যে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা হোক রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে; কারণ, তাঁরাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাতিল করে দিয়েছেন। বৃহত্তম অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সময়সূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রিস্টমাস দ্বীপে মার্কিন পারমাণবিক পরীক্ষার

পুনরারম্ভ, যে পরীক্ষামালায় সব চেয়ে বড় অন্যায় হলো মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো। অথচ, এই বিস্ফোরণের প্রস্তাবেই সারা পৃথিবীতে, এমন কি খ্যাতনামা ইংরাজ ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের ভিতর থেকেই তীব্র আপত্তি ঘোষিত হয়েছিল।

সুতরাং শুরুতেই সন্দেহ করার কারণ ছিল যে এ বৈঠক থেকে ফলপ্রসূ কিছু পাওয়া যাবে না।

জেনিভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রস্তাব রাখা হলো সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের। এ প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ :

> সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ করা হবে তিনটি পর্যায়ে; প্রতি পর্যায়েই দেখা হবে যে কোনো এক পক্ষ যেন বিশেষ সামরিক সুবিধা না পায়; এই তিন পর্যায় সমাপ্ত করা হবে চার বৎসরের মধ্যে; প্রতি পর্যায়েই নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথোপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের তাৎপর্য হলো, সমস্ত সামরিক বাহিনী ভেঙে ফেলা হবে; সব রকমের অস্ত্র বাতিল করা হবে; বিদেশে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিগুলিকে বিনষ্ট করা হবে; বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদল ফিরিয়ে আনতে হবে; আণবিক, পারমাণবিক, রাসায়নিক, বীজাণু-ঘটিত ও তেজস্ক্রিয়-অস্ত্রের মজুত ধ্বংস করা হবে, উৎপাদন বন্ধ করা হবে; কনস্ক্রিপশন বন্ধ থাকবে, সাধারণের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে না; যুদ্ধ দপ্তর তুলে দেওয়া হবে, জেনারেল স্টাফ বাতিল করা হবে, সামরিক বাহিনীর জন্য বিশাল অর্থবরাদ্দ বন্ধ করা হবে। থাকবে শুধু—আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দমনের প্রয়োজনে ও জাতিপুঞ্জের আহ্বানে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে হাল্কা গুলি-গোলায় সজ্জিত শান্তিরক্ষা বাহিনী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব। বলা হচ্ছে, প্রথম পর্যায়েই, অর্থাৎ, ১৫ মাসের মধ্যে অপরের উপর পারমাণবিক অস্ত্র হানবার সব রকমের ব্যবস্থা ও বিদেশে অবস্থিত যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি বরবাদ করতে হবে এবং সামরিক বাহিনী ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে আনতে হবে। বিস্তারিত বললে দাঁড়ায়, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সব রকমের রকেট, সামরিক বিমান, যুদ্ধজাহাজ, ডুবোজাহাজ, পারমাণবিক গোলা ছোঁড়বার দূর পাল্লার ভারি কামান, বাতিল করতে হবে। এগুলির মজুত নষ্ট করতে হবে; আর উৎপাদন করা চলবে না। পাশাপাশি বিদেশে

অবস্থিত সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি নষ্ট করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয়েরই সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত জনশক্তিকে ১৭ লক্ষে নামিয়ে আনতে হবে, বাড়তি প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করতে হবে, প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনেও নিয়ন্ত্রণ বসাতে হবে, সামরিক ব্যয়বরাদ্দ কমাতে হবে। মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো চলবে না, মহাকাশে রকেট পাঠানো হবে নিতান্তই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। অন্য কোনো দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ করা চলবে না; পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বাহিনীর ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জের শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে হবে। সমস্ত ব্যবস্থাগুলির তদারকির জন্য আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা (International Disarmament Organisation) গঠিত হবে; এরা তদারকির কার্যে নিযুক্ত অফিসারদের মারফতে কাজ করবে।

প্রথম পর্যায়ের এই কাজগুলির ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সফল করা হবে।

লক্ষ্য করা দরকার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী পশ্চিমী রাষ্ট্রবৃন্দও শুধু সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যই মেনে নিয়েছেন। তাঁরাও মনে করেন জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা গড়বার ব্যাপারে তাঁরাও একমত। তাঁরাও মানেন যে প্রথম পর্যায়েই মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন এবং রকেট পাঠানোর সংবাদ সকলকে আগে থেকে জানানো দরকার। তাঁরা স্বীকার করেন প্রথম পর্যায়েই নতুন কোনো রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ করা বন্ধ করা উচিত এবং সকলেই একমত যে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি যদি স্বতন্ত্রভাবে আগে থেকে করা সম্ভব না হয়, তাহলেও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির প্রথম পর্যায়েই তাকে স্থান দিতে হবে।

কিন্তু দুই পক্ষের ফারাকগুলো নজর করা উচিত আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

প্রথমেই মতান্তর সময়ের প্রশ্নে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বলছে, প্রথম দুই পর্যায় হবে প্রত্যেকটি ১৫ মাসের করে এবং এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে হাজির হতে ও সমগ্র নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গে করতে লাগবে মোট চারবছর। মার্কিন বক্তব্য হলো, প্রথম দুটি পর্যায়েই লাগবে প্রত্যেকটি আড়াই বছর করে

পাঁচ বছর, এবং তৃতীয় পর্যায়ে যে কত সময় লাগবে তার কোনো হদিস তাঁরা দিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় পার্থক্যটি আরও গভীর। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে বলছে যে প্রথম পর্যায়েই পরদেশ আক্রমণ, বিশেষ করে আকস্মিক আক্রমণের, মূলে আঘাত করা প্রয়োজন; সেখানে মার্কিন পক্ষ আপত্তি তুলছে যে পারস্পরিক বিশ্বাস আনতে হবে ধীরে ধীরে; সেইজন্য তাদের মতে প্রথম পর্যায়ে শুধু শতকরা ত্রিশভাগ অস্ত্রশক্তি বাতিল করলে চলবে এবং বিদেশে অবস্থিত ঘাঁটি বাতিল করতে তারা রাজি শুধু তৃতীয়, অর্থাৎ, শেষ পর্যায়ে।

তৃতীয় দফা মতান্তর সমান গুরুতর। সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য নিরস্ত্রীকরণ যতখানি হলো, অর্থাৎ যে অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করা হলো বা অস্ত্র উৎপাদন যে বন্ধ করা হলো, এর সম্বন্ধেই তদারকি চলবে। মার্কিন পক্ষ দাবি করছে যে কার, কোনখানে, কতখানি অস্ত্র রইল সে সম্বন্ধেও তদারকি চালাতে হবে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত হলো যে এর কার্যকরী শান্তিরক্ষাবাহিনী আসবে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী থেকে এবং এর কাজকর্ম চলবে ঐক্যমতের নীতির ভিত্তিতে; সে জায়গায় মার্কিন চাহিদা হলো যে এই নিরাপত্তাবাহিনী স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে গড়ে উঠবে এবং তার কাজ চলবে সংস্থার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে।

বিস্তারিত প্রস্তাবে মতপার্থক্য আরও প্রচুর রয়েছে; কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে এই কটিকেই আগে নেওয়া গেল। প্রথম তিনটি পার্থক্যকে এক সঙ্গে ধরলে বিষয়ের গুরুত্বটা বোঝা যাবে। আজকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যে পরিমাণ মজুত রয়েছে উভয়ের অস্ত্রাগারে, তার সামান্য ভগ্নাংশ দিয়েও পৃথিবীতে প্রলয় বাধানো যায়। এ অবস্থায় শতকরা ত্রিশভাগ অস্ত্রবর্জনে আক্রমণের আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও কমবে না। উপরন্তু নিরস্ত্রীকরণের কার্যক্রমকে যত দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে, ছোটখাট নানা বিষয়ে মতপার্থক্য ততই দেখা দেবে; সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হবার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। সুতরাং এরকম সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সামগ্রিক তদারকির প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুতেই মানতে রাজি হবে না। কারণ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হলো গোপনীয়তা। যে কোনো সময়েই, আকস্মিক আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা

থাকলে, নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অপরপক্ষের তদারকিতে তুলে দেবে, এ অবস্থা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না।

মার্কিন পক্ষ বলছে, তোমাদের বিশ্বাস করি না! উত্তরে বলা যায়, মুখের কথা বিশ্বাস করার দরকার কি? আকস্মিক আক্রমণের সব ব্যবস্থা নষ্ট যদি উভয় পক্ষই করে, তবে সে কাজটা মৌখিক প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক জোরদার নয় কি? আর সোভিয়েত তার রকেট অস্ত্র বিসর্জন দেবে, এ দাবি করলে, স্বভাবতই বিদেশে অবস্থিত যুদ্ধঘাঁটিগুলো তুলে আনা যুক্তিসঙ্গত নয় কি?

তাছাড়া, তদারকি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান সোভিয়েত প্রস্তাব আরও সুষ্ঠু করে তোলা যায় না, এ কথা সোভিয়েত ইউনিয়নও বলবে না। এটা তাদের খসড়া-প্রস্তাব, চরমপত্র নয়। কিন্তু তদারকিকে উন্নত করতে গেলে, যুদ্ধের বিষদাঁত উপড়োবার দায়িত্বও নিতে হবে।

প্রচারের ধূম্রজালের মধ্যে আসল কথাটা ভুললে চলবে না। তা হচ্ছে, বৈঠক, আলোচনা, সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে দেওয়া আর নেওয়া। নিজের কোট নিয়ে বসে থাকলে মীমাংসা হবে না। কিন্তু অপরপক্ষকে মূর্খ ভেবে চালাকি করে কার্যসিদ্ধ করে নেওয়ার কল্পনাও বাতুলতা।

সতেরো জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক চলল মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত। এর মধ্যে একবার দুই মাসের বিরতি হয়ে গেছে। আর একবার বিরতি হতে চলল। এর মধ্যে কোনো বিষয়েই মীমাংসা করা যায় নি।

এত বড় বিষয়ে দ্রুত কিছু হয়ে যাবে, এতটা আশাবাদ হয়তো অনেকেরই ছিল না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ না হোক, পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি, এটম্-বিহীন অঞ্চল গঠন, মহাকাশে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত—এরকম কিছুও তো ঘটতে পারত!

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এসেছিল ভারত প্রভৃতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে। এদের প্রস্তাব ছিলঃ আজকের দিনে যে কোনো দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ অপরদেশে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী ব্যবস্থা মারফতই ধরা যায়। সুতরাং সন্দেহ জাগাবার কারণ যেখানে হয়েছে, সেখানে, নিরপেক্ষদের দ্বারা, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে, তদারকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তদারকি সর্বনিম্নপর্যায়ে আবদ্ধ রাখাই

সংগত। সুতরাং এরকম তদারকির ভিত্তিতে পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি করা সম্ভব।

নিরপেক্ষদের এ প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিচারযোগ্য বলে জানান। গত ১৩ই জুলাই মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে সোভিয়েত সরকার এ প্রস্তাবকে চুক্তির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। পশ্চিমী বিরোধিতা এখনও অনড়।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানুষ নিরপেক্ষদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন পরীক্ষাবন্ধের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হিসাবে। তবু জেনিভায় তা গৃহীত হয় নি।

কিছু যে হয় নি—সে কথা বলেই এ কাহিনী শেষ করা যেত। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। কিছু যে হয়েছে, তাও মনে রাখা দরকার। সন্দেহে বা হতাশায় অন্ধমন নিয়ে না দেখলে, দেখা যাবে যে উভয়পক্ষের ন্যায্য সন্দেহ দূর করার বাস্তব ভিত্তির দিকে অনেকখানি এগোনো গেছে ও যাচ্ছে। ব্রিটেন, আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে বিশ্বময় নির্দলীয় সাধারণ মানুষ আজ অনেক বেশি আগ্রহ ও দায়িত্ব নিয়ে শান্তির পক্ষে মুখর হয়েছে, কার্যকরী পদ্ধতি নেবার দিকে চলেছে। শান্তি অনিবার্য না হলেও, যুদ্ধও অনিবার্য নয়; শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সময়ের সঙ্গে দৌড়ে সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা জিততে পারবে কি না, তার ওপরেই যুদ্ধ বা শান্তির শেষ মীমাংসা নির্ভর করছে।

নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস

বিপ্লব দাশগুপ্ত

কথায় আছে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।" বিগত ত্রিশ দশকের প্রথমভাগে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের পর পুঁজিবাদী দেশগুলির মনোভাবও প্রায় একই রকম। এই মন্দাবাজারের ঢেউয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাশ্চাত্যকুলের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯৩৩ সালে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুহূর্তেও শতকরা পঁচিশ ভাগ লোকের কোনো কাজ ছিল না, সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য ছিল স্বাভাবিক অবস্থার থেকে শতকরা ষাট ভাগ নিচে, এবং একমাত্র ১৯৩২ সালেই ১৪০০ ব্যাঙ্ক সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হয়ে যায়। সর্বোপরি এই মন্দাবাজার সনাতন পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলিকে অবাস্তব প্রমাণিত করে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে পুঁজিবাদ কোনোরকমে সেই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে নেয় সনাতন পুঁজিবাদী অর্থনীতির তত্ত্বে ও বাস্তব প্রয়োগে অনেকগুলি বড় রকমের সংশোধন করে এবং শক্তিমান সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে—যা পুঁজিবাদী ধারণায় ইতিপূর্বে অন্যায় বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই গোঁজামিলের ভিত্তি যে খুব শক্ত নয় তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে কয়েক বছর অন্তর নিয়মিতভাবেই এক একটি মন্দাবাজারের ঢেউ সংকটকে তীব্রতর করে তুলছে। ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা এবং কার্যকরী চাহিদা হ্রাসের সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, একথা স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাই যে কোনো অর্থনৈতিক সংকটের ছায়াও তাঁদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং পুঁজিবাদের সমূহ বিনাশের আশঙ্কায় তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠছেন। শেয়ার বাজারের দর একটু কমতে সুরু করলেই তাঁদের স্মরণে আসে ১৯২৯ সালের 'শেয়ার বাজারের সংকট'-এর কথা এবং সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রায় একযোগে 'ব্ল্যাক মনডে' বা অন্য কিছু নিয়ে সোরগোল পড়ে যায়।

নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে ওঁদের আপত্তির কারণও ঠিক তাই। নিরস্ত্রীকরণের ফলে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত প্রচুর দ্রব্য সম্পদ এবং মানুষ অকেজো হয়ে পড়বে; যার ফলে অতি উৎপাদন, বেকার সমস্যা এবং কার্যকরী চাহিদাহ্রাস ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং এই রকম সংকটের সমাধান পুঁজিবাদ করতে পারবে না। এই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন মার্কিন সমরবিদরা এবং যুদ্ধোপকরণ ব্যবসায়ীরা, যাঁরা এই নিরস্ত্রীকরণের ফলে আঘাত পাবেন সবচেয়ে বেশি। নানাভাবে অজস্র অর্থ ছড়িয়ে তাঁরা এই যুক্তির প্রচার করছেন এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে একটি বাঙ্ময় জনমত তৈরি করে তুলেছেন। সরকারের ওপরও এঁদের প্রভাব অসীম। তাই প্রতিটি নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় নানা সূক্ষ্ম এবং জটিল তর্ক ও কূটতর্কের জালে তাঁরা জড়িয়ে ফেলছেন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এবং প্রাণপণে নিরস্ত্রীকরণের সহজ ও সরল সমাধানের পথটি আটকে রাখছেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, এই আশঙ্কা কতটুকু সত্য এবং মন্দাবাজারের সম্ভাবনা এড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব কিনা।

অনুন্নত অর্থনীতি ও নিরস্ত্রীকরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে আমরা উন্নত এবং অনুন্নত—এই দুইভাগে বিভক্ত করতে পারি অর্থনীতির বিচারে। উন্নত দেশগুলির আলোচনায় পরে আসছি, অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা খুব জটিল বা সমাধান-বহির্ভূত নয়। অনুন্নত দেশগুলির—কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক—একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব। এসব দেশে সাধারণত খনিজ বা প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের অভাব বিশেষ প্রকট নয়, জনসম্পদও প্রয়োজনানুগ, কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক বা জনসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না মূলধনের অভাবে। অথচ প্রাথমিকভাবে যদি কিছু মূলধন পাওয়া যায়, তার ব্যবহার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে অনেকখানি, অনেক মানুষের কর্মসংস্থানে সহায়ক হয় এবং সর্বমোট ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি করে জিনিসপত্রের কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এই বর্ধিত কার্যকরী চাহিদা আবার উৎপাদন, কর্ম ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে লগ্নিকৃত পুঁজির বেশ কয়েকগুণ বেশি জাতীয়সম্পদ তৈরি হতে পারে এর ফলে। এই পুঁজির অভাবে এদের হাত পাততে হয় বিদেশে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অনেকখানি বহুক্ষেত্রে খর্ব হয় এর ফলে।

নিরস্ত্রীকরণ অনুন্নত দেশগুলির পুঁজির অভাব পূর্ণ করতে পারে। গরীব হওয়া সত্ত্বেও স্নায়ুযুদ্ধের চাপে সমরোদ্যোগ এদের করতে হয় অনেকখানি এবং জাতীয় আয়ের এক বড় পরিমাণ অপচয় ঘটে অস্ত্রসজ্জায় এবং যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে। নিরস্ত্রীকরণ এই অপচয় রোধ করবে এবং যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে, তার প্রায় সবটুকু জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্যে প্রয়োগ করা যাবে। এর ফলে বিদেশীনির্ভরতা কমবে এবং দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে তোলা যাবে।

অবশ্য একটি নতুন অসুবিধা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশের বাজারে এই অনুন্নত দেশগুলির প্রধান বিক্রয়সামগ্রী হলো কৃষিপণ্য। নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হলে উন্নত দেশগুলি এখন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা অনেকখানি নিজের বাজার থেকেই মিটিয়ে নেবে, যেহেতু মূলধনের এক বড় অংশ এখন ওই প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব, নিরস্ত্রীকরণের ফলে অনুন্নত দেশে উন্নত দেশগুলির লগ্নি বাড়বে, যা অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পোন্নত করে তুলবে এবং বিদেশের বাজারে নতুন সামগ্রী যেখানে সহায়তা করবে।

সমাজতন্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ

অপরপক্ষে উন্নত দেশগুলিতে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাজব্যবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী ভিন্নরূপ নেবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে যুদ্ধ-অর্থনীতি থেকে শান্তি-অর্থনীতিতে উত্তরণ শুধু পরিকল্পনার প্রশ্ন মাত্র। নিরস্ত্রীকরণের ফলে জাতির সম্পদের এক বড় অংশ হঠাৎ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে। এই উদ্বৃত্ত যুদ্ধোপকরণ বা মানুষগুলিকে আবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে সময় নেবে কিছুটা, এবং এর ফলে সংঘর্ষজনিত কিছু বেকারসমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পুনর্নিয়োগের জন্য সময় যত বেশি লাগবে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাপ পড়বে তত বেশি। কিন্তু যেহেতু এই দেশগুলির অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত, কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং পরিকল্পনা-নির্মাতাদের দক্ষতা এবং কুশলতার ওপর সাময়িক অস্বস্তির পরিমাণ নির্ভর করবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে, "In the socialist economics maintenance of effective demand while reducing military expenditure would be simply a matter

of the efficiency of the planning technique." উপরন্তু নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার ও জনসম্পদ শান্তিপূর্ণ অর্থনীতির জন্য পাওয়া যাবে তার পুনর্নিয়োগ পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক জয়কে সুনিশ্চিত করে তুলবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাই পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করতে পারবে।

ধনতন্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের কাজ খুব সহজ নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন যুদ্ধের ব্যয় সংকুচিত হয়ে আসে তখন (১৯২১-২২ সালে) একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। ১৯২৯-৩৩ সালের ভয়াবহ মন্দাবাজারের অন্যতম কারণ ছিল এই পূর্ববর্তী পুনর্বিন্যাসের সংকট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে কোনো গভীর সংকট দেখা দেয়নি। তার কারণ, (ক) বিদেশে মার্কিন বাজার প্রসারিত হয়ে কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করে, (খ) জনসাধারণের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা (যা যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় নি) ব্যবহৃত হয়, এবং সর্বোপরি (গ) সমরসজ্জা খুব বেশি হ্রাস পায়না। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন চাহিদা কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যধরনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে পুনর্বিন্যাসের কাজকে সহজ করে তোলে। কিন্তু সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী হঠাৎ কার্যকরী চাহিদা অনেকখানি সংকুচিত করে ফেলবে এবং সমানপরিমাণ কার্যকরী চাহিদা অন্য কোনোভাবে সৃষ্ট না হলে অনিবার্যভাবে বেকারসমস্যা ও মন্দাবাজারের সংকট দেখা দেবে।

কিভাবে এই সংকট গভীরতর হতে পারে, খুব সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়। নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-উপকরণগুলির চাহিদা হ্রাস পাবে এবং নাগরিক বাহিনীর এক বড় অংশ বেকার হয়ে পড়বে। এর ফলে জনসাধারণের আয় এবং ক্রয়শক্তি কমবে এবং জিনিসপত্রের চাহিদাও কমবে স্বাভাবিক কারণেই। অপরপক্ষে জিনিসপত্রের উৎপাদন নির্ভর করে চাহিদার ওপর। চাহিদা কমলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন হ্রাস করবে এবং কিছু লোক ছাঁটাই করবে। বর্ধিত বেকারসংখ্যা আবার জনসাধারণের সর্বমোট ক্রয়শক্তি হ্রাস করবে। যার ফলে উৎপাদন, কার্যকরী চাহিদা আবার হ্রাস পাবে; বেকার আরও বাড়বে ইত্যাদি। এর ফলে একটি বিপজ্জনক চক্র সৃষ্টি হবে। যা ক্রমাগতই

উৎপাদন ও চাহিদা কমিয়ে আনবে এবং বেকারসমস্যা বৃদ্ধি করবে। এই সংকটের গভীরতা হবে অতলস্পর্শী, যেহেতু মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণও বিপুল।

পরিকল্পনার অভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও মানুষের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অবশ্য জাতীয় অর্থনীতির লগ্নির ধরন কিছুটা অদলবদল করে নিয়ে সমস্যার গভীরতা হয়তো কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। যেসব যুদ্ধশিল্পগুলি রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা মোটর সাইকেল তৈরি করে তাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে। এমনকি "কোনো কোনো সামরিক শিল্পকে অল্পবিস্তর অদলবদল করে ভারি ট্রাক, ট্রাক্টর, মাটিকাটার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি হতে পারে। এর জন্য কিছু অতিরিক্ত খরচ নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু তার পরিমাণ অস্বাভাবিক নয়।" অথবা সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের কর্মসূচী ধাপে ধাপে কার্যকরী করলেও সমস্যাটা হঠাৎ খুব বড় হয়ে ওঠে না। সর্বোপরি কর এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন করে নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিদের হাতে কিছু বেশি টাকা দেওয়া যেতে পারে। এদের সঞ্চয় যেহেতু কম, প্রায় পুরো টাকাটাই খরচ হয়ে কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক চাহিদাবৃদ্ধির এই কয়টি পথ কিন্তু যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সীমারেখার মধ্যে এই সমস্ত পন্থায় এমন কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি হবে না যা নিরস্ত্রীকরণের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত কার্যকরী চাহিদার সমান। অতএব সংকট থেকেই যাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে গভীরতর রূপ নেবে।

এই সিদ্ধান্ত সত্য এবং তথ্যানুগ এবং পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যেই এই সংকটের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। এমনকি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান করতে পারলেও এই সংকট দূর হবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার না করেও এখনও কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধির কয়েকটি পথ খুঁজে বের করতে পারে যা নিরস্ত্রীকরণ সৃষ্ট সংকটের কালোছায়াকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক ভাষণে[১] প্রখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতা অসকার লাঙ্গে এমন কয়েকটি পথের সন্ধান দিয়েছেন, যার আলোচনা আমরা

১. *Polish Perspectives.* October, 1960. Oscar Lange: *Disarmament and the world economy.*

করব। ১৯৬২ সালের মার্চমাসে রাষ্ট্রসংঘ-মনোনীত একটি দশরাষ্ট্রবিশেষজ্ঞ কমিটিও এই সমাধানগুলির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। ০

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার

বিগত কয়েকটি দশকের স্নায়ুযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনাকে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মমুহূর্ত থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলি নানাভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং শত্রুতার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছিল। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় কোনোরকম বৈদেশিক সাহায্য পায়নি। এর ফলে যদিও ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজনের দিক থেকে সোভিয়েত জনসাধারণকে প্রথম ৩৬ বছর, বিশেষ করে ত্রিশ দশকের প্রায় পুরোটা, অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়নি। এমনকি খুব দ্রুতহার উন্নতির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবরোধের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

১৯১৭ সালে যে উদ্দেশ্য পুঁজিবাদ সাধন করতে পারেনি, আজ তার সাফল্য অলীক স্বপ্নবিলাসমাত্র। বর্তমান পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অঙ্গীভূত এবং অপর একতৃতীয়াংশ অন্তত শত্রু নয়। অতএব অর্থনৈতিক অবরোধের কোনো পরিকল্পনা আজ অবাস্তব। এ যেন পৃথিবীর অর্ধেক অপর অর্ধেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এর ফলে কার বেশি ক্ষতি হচ্ছে বলা মুশকিল।

অথচ এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ বেছে নেয়নি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীনতার কার্যসূচী মেনে চলছে। এর ফলে ভৌগোলিক, আবহাওয়াগত ইত্যাদি নানাদিক থেকে প্রয়োজনানুগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভাগবাঁটোয়ারা হতে পারছে না। দুটি শিবিরই প্রতিটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে, যদিও অনেক বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলে ব্যয় সংক্ষেপ হতো এবং উভয়পক্ষই অর্থনৈতিকভাবে লাভ করত।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এই অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করছে। এমনকি এশিয়ার

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের পথেও কৃত্রিম প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে এই মনোভাব। উদাহরণস্বরূপ চীন ও জাপানের সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অথচ মার্কিন-প্রভাবে বর্তমানে জাপান এই সম্পর্ক বজায় রাখছে না। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে দুই পক্ষেরই এবং বিশেষত জাপানের। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের বাজার হস্তচ্যুত হবার ফলে যেমন, তেমনই এইসব অঞ্চল থেকে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের সরবরাহের অভাব, জাপানের শিল্পের সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অর্থনৈতিক পীড়নেরই প্রতিক্রিয়া জাপানের আইসেনহাওয়ার-বিরোধী আন্দোলন।

অথচ এই অর্থনৈতিক সম্পর্কহীনতার অপসারণ দুই শিবিরের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে তো বটেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শিল্পায়নের হার প্রতি বৎসরে শতকরা দশভাগ, কোনো কোনো রাষ্ট্রে আরও বেশি। এই দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচী বহু নতুন সামগ্রীর প্রয়োজন সৃষ্টি করছে যা সরবরাহ করতে পারে পুঁজিবাদী দেশগুলি।

নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে পরিমাণ কার্যকরী চাহিদা হ্রাস পাবে তার অনেকখানি পূরণ করা যাবে যদি পুঁজিবাদী দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এক বড়সংখ্যক এখনও অর্থনীতির বিচারে অনুন্নত। এদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যন্ত্র, কাঁচামাল, শিল্প ও রসায়ন সামগ্রী, যা সরবরাহ করবার সুযোগ পেতে পারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ। এমনকি যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত শিল্প থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে এসব। সোভিয়েত্ ইউনিয়ন বা চেকোস্লোভাকিয়ার মতো উন্নত দেশের জন্য প্রয়োজন স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য, যা পুঁজিবাদী দেশগুলি যুদ্ধশিল্প থেকেই সরবরাহ করতে পারে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী দেশগুলির উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নি করা যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপুল চাহিদা পূর্ণ করবার জন্য। এই সুযোগ সহজেই গ্রহণ করতে পারে এরা এবং অর্থনৈতিক সংকটের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে পারে।

অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য

পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকট সমাধানের আর একটি পথ অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে এই ধরনের

সহযোগিতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু নতুন নতুন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে জাতীয় প্রয়োজনে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চাইছে। অথচ অর্থনৈতিক বিচারে উন্নত দেশগুলির তুলনায় এরা পিছিয়ে রয়েছে অনেকখানি। স্বাভাবিক কারণেই তাই এদের অগ্রগতির হার খুব দ্রুত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ উন্নত রাষ্ট্রগুলির নাগাল এরা কোনোদিনই পাবে না। অথচ যে বিরাট পরিমাণ মূলধন না পেলে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তার অভাব অনুভূত হচ্ছে প্রতিটি দেশে। বিশেষ করে বিদেশীমুদ্রার অভাব এদের অর্থনীতির প্রসার হতে দিচ্ছে না। অপরপক্ষে যে বিদেশী সাহায্য এরা পাচ্ছে, সেটুকুও নানা-কারণে সমস্যার সমাধানে খুব বড় রকমের সাহায্য করছে না। প্রথমত, বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, এই সাহায্যের এক বড় পরিমাণ বহু দেশে খরচ হচ্ছে সাহায্যকারী দেশগুলি থেকে সমরোপকরণ কিনবার প্রয়োজনে। তৃতীয়ত, এই সাহায্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঠাণ্ডাযুদ্ধের উদ্দেশ্য। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সংগতি রেখে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন 'মিগ-বিমান-ক্রয়', কাশ্মির বা গোয়ার ব্যাপারে সরকারী মনোভাব সাহায্যকারী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি বরদাস্ত করেনি এবং সাহায্যদানের প্রশ্ন ক্ষেত্রবিশেষে স্থগিত রেখেছে।

অথচ এই অনুন্নত দেশগুলির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি, বিশেষত ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, ভারি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি, যার যোগান সহজেই দিতে পারে উন্নত দেশগুলি। এবং এক্ষেত্রেও নিরস্ত্রীকরণের পরও পূর্বতন যুদ্ধশিল্পগুলির মারফতই যোগান দেওয়া যেতে পারে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। অর্থাৎ নতুন এক বড় বাজারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে উন্নত দেশগুলি। প্রতিটি নতুন দেশেরই সহস্র সহস্র কোটি টাকার বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলি একযোগে মেটাতে পারে আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠন, যেমন রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কোনো সাহায্য বিতরণ করা হলে অনুন্নত দেশগুলিরও গ্রহণ করতে বিশেষ আপত্তি হবে না, যেহেতু জাতীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা সে ক্ষেত্রে থাকবে না।

অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত দেশগুলির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করবে কিনা।

এ আশঙ্কা অমূলক। ভবিষ্যতে অনুন্নত দেশগুলি এমন অনেক সামগ্রী তৈরি করতে সক্ষম হবে যা এখন উন্নত দেশগুলি সরবরাহ করে এবং নিঃসন্দেহে সেই সমস্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির বাজার সংকুচিত হবে। কিন্তু অপর পক্ষে একটি উন্নতিকামী অথবা উন্নত অর্থনীতির প্রয়োজনে আরো অনেক নতুন নতুন সামগ্রীর জন্য চাহিদার সৃষ্টি হবে এই দেশে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চাহিদার শেষ নেই এবং একটি ঐক্যবদ্ধ, যুদ্ধহীন পৃথিবীতে এই সমস্ত নতুন উন্নত দেশগুলির তখনও অনেক কিছু ক্রয় করবার থাকবে বর্তমান উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে। অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক তখন বর্তমানের মতো একপক্ষ কাঁচামাল অপরপক্ষ তৈরি মাল বিনিময়ের স্তরে থাকবে না। তখন উভয় পক্ষই কাঁচামাল এবং তৈরি মাল বিনিময় করবে অন্যপক্ষের কাঁচামাল এবং তৈরি মালের সঙ্গে। ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত সুবিধার জন্য জনসাধারণের বিশেষ কুশলতার জন্য যে দেশ যে বস্তু সবচেয়ে সস্তায় সবচেয়ে বেশি তৈরি করতে পারবে, তারাই করবে। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হবার ঝোঁক কেটে গিয়ে পারস্পরিক-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। এই ঝোঁক আবার শান্তির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে অনেকখানি।

অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির অপূর্ণ কার্যকরী চাহিদারও সুযোগ নিতে পারে উন্নত দেশগুলো।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

কার্যকরী চাহিদাবৃদ্ধির আরেকটি পথ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। দুটি দিক দিয়ে এই পথ উন্মুক্ত: এক, আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে; দুই, মহাকাশ অভিযানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে। এই দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি বড় দেশ স্বীয় প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছে অনেকখানি। কিন্তু দু-টি ক্ষেত্রেই আরো অনেক দ্রুতহারে আরো অনেক কিছু করা চলে যদি আরও অনেক অর্থ উভয়পক্ষ ঢালতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এই মুহূর্তে উভয় দেশেরই সাধ্য-বহির্ভূত। অথচ দুটি দেশের সম্মিলিত অর্থ খুব কম নয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ বা মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে অনেকখানি যেতে পারে এরা। ভবিষ্যতে হয়তো আরো কয়েকটি দেশ যোগ দেবে এদের সঙ্গে, এই কর্মপ্রচেষ্টায়। সব মিলিয়ে মানবসভ্যতা

বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহু যোজন এগিয়ে যেতে পারে এবং মানব ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা হতে পারে। এর ফলে প্রচুর অর্থ লগ্নি করবার একটি বড় ক্ষেত্রও পেয়ে যাবে পুঁজিবাদী দেশগুলি।

উপসংহার

উপসংহারে গোড়ার প্রশ্নটুকুরই জবাব দিতে চাই। প্রথমত, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে আছে, যা বারবার অর্থনৈতিক সংকটের পথে পুঁজিবাদকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, নিরস্ত্রীকরণের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কার্যকরী চাহিদা হঠাৎ অনেকখানি হ্রাস পাবে, যা আভ্যন্তরীনভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর রদবদলের মাধ্যমে পূরণ করা পুরোপুরিভাবে সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধহীন পৃথিবীতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প, বিশেষত পূর্বতন সমরশিল্পগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদার অভাব হবে না এবং পুঁজিবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা এড়িয়েই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণ শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক সর্ব ক্ষেত্রেই এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। অবশ্যই এই সমাধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির সচেতন প্রচেষ্টা এবং জনমতের নৈতিক চাপই নিরস্ত্রীকরণের মহান উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবে।

যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র

ধ্রুব গুপ্ত

"Mass Killing……does not the world encourage it !"……

মঁসিয়ে ভের্দু [চার্লস চ্যাপলিন]

শিল্পীর সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্বসম্পর্কিত মীমাংসার অতীত বাগ্‌বিতণ্ডা মুলতবী রেখে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সমসাময়িক বিশ্বসমস্যা শিল্পীচিত্তকেও আলোড়িত করে এবং তার শিল্পকর্ম সে আলোড়নের সাক্ষ্যবহন করে। অসূয়া প্রসূত কিংবা অজ্ঞতাজাত সকল রকম বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে চলচ্চিত্র শৈশবেই সস্তা আমোদের প্রকরণ সরবরাহের ব্যবসা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ শিল্পাঙ্গের অধিকার অর্জন করেছে এবং এই ক্ষেত্রের শিল্পীরাও জীবনে মূল্যবোধকে অন্বিষ্ট করেছে নিজ নিজ মানস অনুযায়ী। আর মানবিক মূল্যবোধের চরম বিনাশের আশঙ্কা এই শিল্পীদেরও উদ্বেগাকুল করেছে, তাদের বেদনাকে উন্মথিত করেছে।

আজকের দিনের একজন বিদ্যার্থী বালকও জানে আণবিক অস্ত্রে যুদ্ধসজ্জায় সমগ্র মানবজাতির কি ভয়াবহ পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত আছে। জাতিগত বা বর্ণগত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পৃথিবীকে যে সর্বব্যাপী মারণযজ্ঞের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তার আংশিক হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দু-দুবার অর্জন করেছে ইওরোপ এবং অন্তত একবার দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। প্রথম দুই মহাযুদ্ধই মানুষের মূল্যবোধকে সমূলে নাড়া দিয়েছে। চলচ্চিত্র-শিল্পীর বিবেক ও ঔচিত্যবোধও অন্যান্য শিল্পাঙ্গের স্রষ্টাদের চিত্তবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে প্রকম্পিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী লোভ, জাতিগত বিদ্বেষকে সযত্নে আচ্ছাদিত করে যুদ্ধবাজেরা যুদ্ধে বীরত্বের গুণগান করেছেন—এদের প্রতি কোনো চলচ্চিত্রশিল্পী নিক্ষেপ করেছেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ, কেউ বা অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে মানুষের এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, কারো অভিশাপ ধ্বনিত হয়েছে সুতীব্র ধিক্কারে, অহৈতুকী আত্মবিনাশের ট্র্যাজেডী চিত্রিত করেছেন কেউবা বেদনাবিধুর চিত্রভাষায়।

যে কজন মহৎ শিল্পীর প্রসাদে চলচ্চিত্র প্রথম নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো—আমেরিকার ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ্‌ তাঁদের অন্যতম। সুমহৎ কল্পনার রূপায়ণে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল মহাকাব্যোপম ছবি *Intolerance*. প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রিফিথ্‌ এ ছবিতে আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত মানুষের অসহিষ্ণুতার ধারাবাহিক দৃশ্যইতিহাস রচনা করেছেন—যে অসহিষ্ণুতা যে কোনো যুদ্ধের প্রধান ও প্রাথমিক ইন্ধন। চলচ্চিত্রশিল্পের অন্য এক প্রতিভা আইজেনস্টাইন মেক্সিকোর ইতিহাস অবলম্বনে যে অসামান্য চিত্রকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন কুচক্রী ব্যবসায়ীর প্রতিকূলতায় সে স্বপ্ন সম্ভব না হলেও *Time in the Sun* নামে তার কিছু চিত্রাংশ রক্ষা পেয়েছে মিস্‌ মারী সিটনের প্রচেষ্টায়। ঐ ছবির মূল বিষয় অবশ্য জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংসের পারস্পরিক সম্পর্ক-আশ্রয়ী গভীরতর ও ব্যাপকতর দার্শনিক তত্ত্ব-অবলম্বী ; কিন্তু মেক্সিকোর ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যলোভীর অত্যাচার বর্ণনায় এ ছবিতে ঐ মানবিক অসহিষ্ণুতারই নির্মম চিত্রণ লভ্য। সুনির্দিষ্টভাবে 'যুদ্ধবিরোধী' ছবি না হলেও এই পর্যায়ে ঐ সব মানবিক আবেদন-সম্পন্ন মহৎ শিল্পকৃতির প্রাথমিক প্রেরণার কথা অবশ্য স্মরণীয়। চলচ্চিত্রশিল্পের অপর এক প্রতিভা চার্লস চ্যাপলিনের 'মানবদরদী' আখ্যা প্রায় প্রবচনে পরিণত। নির্বাকযুগেই তাঁর শিল্পকৃতি একবার যুদ্ধের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষায় *Shoulder Arms* ছবিতে।

সবাক যুগের সরাসরি যুদ্ধবিরোধী ছবি হিসাবে প্রথমেই স্মরণে আসে মাইলস্টোনের আমেরিকান ছবি *All quiet on the Western Front*-এর (১৯৩১) কথা। এ ছবির অবলম্বন অবশ্য রেমার্কের জনপ্রিয় উপন্যাস, জাতিগত স্বার্থরক্ষার নামে দেশের যুবশক্তি-অপচয়ের যে প্রচণ্ড অন্যায় ও ভয়াবহ ক্ষতি, তার বিরুদ্ধে এমন নালিশ চলচ্চিত্রের ভাষায় খুব কম জানানো হয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কে যুদ্ধ যে বিচ্ছেদ টানে তাকে মাইলস্টোন ভাবালুতাবর্জিত গভীরতায় বেদনাবহ করেছেন্‌। শেষদৃশ্যে close up-এ ব্যবহৃত চিত্রকল্পে যুদ্ধের ঐ জীবনবিধ্বংসী সৌন্দর্যগ্রাসী রূপ চিত্রিত হয়েছে সুন্দর সাংকেতিকতায়। রণক্লান্ত বন্ধুবিহীন তরুণ সৈনিক একা বসে আছে ট্রেঞ্চে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে নিয়ে—একটা সুন্দর প্রজাপতি বসেছে ট্রেঞ্চের বাইরে—হাতের নাগালের মধ্যেই ; প্রজাপতির

দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সৈনিক; পর্দাজুড়ে দেখা গেল প্রজাপতি এবং সৈনিকের ক্রমাগ্রসর হাতখানির close up···cut করে দেখানো হলো সৈনিকের হাস্য-দীপ্ত উৎসুক মুখ; অকস্মাৎ এক শত্রুসৈন্যের গুলি বিঁধল তার মুখে; প্রজাপতি উড়ে গেল—পর্দাজুড়ে পড়ে রইল হতপ্রাণ সৈনিকের অবশ হাতটি। এর অনেক পরে—গতদশকে—জার্মানির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় যুদ্ধ যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল তাই নিয়ে রচিত রেমার্কের আরেক উপন্যাস 'তিনবন্ধু'ও চলচ্চিত্রায়িত করবার কাজ শুরু হয়েছিল আমেরিকাতেই, কিন্তু কোস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতা হামফ্রি বোগার্টের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অর্ধপথে সে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ত্রিশদশকে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ নাৎসিবাদ পরিপুষ্ট হলো জার্মানিতে হিটলারের চেষ্টাযত্নে। আর্যরক্তের অভিমানে মত্ত হয়ে অনার্যের রক্তপান করতে লোলুপজিহ্বা বাড়াল জার্মানি। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, ধনতন্ত্রের ভোজসভায় জার্মানির পাত পাড়তে দেরি হয়েছিল, তাই সে গোঁ ধরল যার পাত পায় কেড়ে খেতে হবে। শক্তিমত্ত জার্মানিকে বিদ্রূপ করে চ্যাপলিন নির্মাণ করেছিলেন *Great Dictator*, আর ঐ উন্মত্ততার ফলে জগৎ জুড়ে ঘটল যে হত্যাকাণ্ড তাকে উচ্চকণ্ঠে ভৎর্সনা করলেন 'মঁসিয়ে ভের্দু'-র শেষ বিচার দৃশ্যে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ছিল প্রত্যক্ষ ধ্বংসের সীমা থেকে দূরে—লণ্ডন ও পার্লবন্দরে বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও একথা বলা চলে। হিটলারি হত্যাকাণ্ডের কুরুক্ষেত্র ছিল প্রধানত পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চল; হিটলারের প্রধান শত্রু ছিলেন ইওরোপবাসী অগণিত ইহুদি নরনারী। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে এ ভূখণ্ডের বিনাশ ঘটেছে ভয়াবহভাবে, এই ভূখণ্ডের চলচ্চিত্রশিল্পে সেই বিনাশের প্রতিফলন তাই এমন সর্বব্যাপী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নালিশ তাই এত সুনিশ্চিত।

সাধারণত প্রতিরোধ আন্দোলনের চিত্রণের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রে নাৎসিবর্বরতার বিরুদ্ধে ঐ নালিশ জানানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনো শিল্পী অবশ্য আহত দেশাত্মবোধে প্রতিরোধকারীদের গৌরবান্বিত করেছেন, তাদের বীরত্বের বন্দনাও গেয়েছেন—ফ্রান্সে রেনে ক্লেমের 'ব্যাটল অফ দি রেইল'-এর কথা স্মরণীয়, আবার কেউবা পোল্যাণ্ডের ওয়াইদার মতো ক্রুদ্ধস্বরে বলেছেন এই অহৈতুকী আত্মবিনাশে কোনো গৌরব নেই কোনো

পক্ষে। ফ্রান্সে নির্বাকযুগে শিল্পী জঁা রেনোয়ার 'গ্র্যাণ্ড ইলিউশন' ছবিতে যুদ্ধের অনৌচিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে ঐ দেশের চলচ্চিত্রে নব্যপন্থী শিল্পীরা অবশ্য আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং ব্যক্তিসমস্যার ভিন্নতর প্রশ্নে নিমগ্ন এবং আলা রেনের 'হিরোশিমা মন আমুর' কিংবা আন্দ্রেই কায়াতের 'ক্রসিং অফ্ দি রাইন' ছবিতে যুদ্ধের তাণ্ডব পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ঐ সব ছবির মূলসুর এতই অন্তধর্মী যে ওদের 'যুদ্ধবিরোধী' ছবির শ্রেণীভুক্ত করবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ইটালিতে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তৈরি হয়েছিল রসেলিনির 'ওপেন সিটি' এবং 'পৈসান'। প্রতিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতার ট্র্যাজেডির নির্মম চিত্রণে এসব ছবিতে নরহত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। 'পৈসান' ছবির একটি চিত্রকল্প প্রাণনাশের এই ভয়াবহ মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির রূপায়ণ—নাৎসি সৈন্যের গুলিতে নিহত ইটালিয়ান প্রতিরোধকারীর দলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে জলার ধারে কুঁড়ে ঘরের সামনে, ঐ মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নিঃসঙ্গ শিশু, পটভূমিকায় ভোরের সূর্য। প্রতীকী রচনার ক্ষেত্রে এই দৃশ্যাংশ চলচ্চিত্র শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইটালীয় চলচ্চিত্রে এযাবৎ হলিউডী আদর্শে গড়া 'সাদা টেলিফোন' যুগ (নায়িকার শয়নকক্ষে সাদা টেলিফোনের অবশ্যম্ভাবী অবস্থিতি থেকে এ নাম) চলছিল। যুদ্ধের ধাক্কায় সে প্রভাব কাটিয়ে কোনো কোনো চেতনাদীপ্ত শিল্পী চলচ্চিত্রে বাস্তবসমীক্ষার অবতারণা করলেন। ফলে লভ্য হলো নব্যচিত্ররীতি ও চিত্রদর্শন : 'নিও-রিয়ালিজম'। যুদ্ধোত্তর জীবনের সমস্যাই হলো ছবির উপজীব্য—ডি সিকার 'বাই সাইকল থিভস্'-এর কাহিনীর মৌলিক প্রশ্ন হলো বেকার সমস্যা—যুদ্ধোত্তর ইটালিকে যুদ্ধের দান। অতি সাম্প্রতিককালে ডি সিকা মোরাভিয়ার উপন্যাস অবলম্বনে 'লা চিওচিয়ারা' নামে যে ছবি নির্মাণ করেছেন সে ছবি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও যুদ্ধের বর্বরতা ও অভিশাপের বিরুদ্ধে সে ছবিতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন বর্বরতার ভয়াবহ ছবি পাওয়া যায় ইটালির তরুণ পরিচালক গিলো পণ্টেকর্ভোর 'কাপো'তে। সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী ছবিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের উপর অমানবিক অত্যাচারের দৃশ্যবিবরণে এই ছবি ইটালীয় বাস্তবতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ইহুদিদের প্রতি নাৎসি-অত্যাচার, কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পের দুঃস্বপ্নসম

নরকত্ব পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির যুদ্ধবিরোধী ছবিগুলির প্রধান উপজীব্য। পূর্ব জার্মানির পরিচালক মেট্‌জিগের 'ম্যারেজ্ আণ্ডার দি শ্যাডোজ্' ইহুদির প্রতি নাৎসি অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি। 'লিসি' ছবিটির নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কন্‌রাড্ উল্‌ফের 'স্টার্‌স্' এবং 'প্রফেসর ম্যাম্‌লক্' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'স্টার্‌স্' ছবিতে এক জার্মান সৈনিক এক ইহুদি রমণীকে ভালোবাসে যুদ্ধকালীন সমস্ত কৃত্রিম বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে। আসলে সে ছিল শিল্পী; রূপময় পৃথিবীকে রেখার সীমায় ধরার সাধনা ছিল তার, যুদ্ধের অমানবিক বীভৎসতার মধ্যেও সে ছোট টিলার ওপরে বসে প্রাকৃতিক শোভার ছবি আঁকে। যুদ্ধবাজের অলঙ্ঘ্যণীয় অনুশাসনে শিল্পীকে তুলি ছেড়ে বন্দুক ধরতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে তার প্রণয়পাত্রীকে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের যন্ত্রণা ভোগ থেকে উদ্ধার করতে পারল না—মালগাড়িতে পিণ্ডাকৃতি মনুষ্যস্তূপের মধ্যে সে মেয়ে চলল কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের দিকে—অক্ষম বেদনায় তাড়িত হয়ে সৈনিক মালগাড়ির পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল কিছুদূর পর্যন্ত। কাহিনীর মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায় চেকোস্লোভাকিয়ার জিরি ওয়াইসের ছবি 'রোমিও, জুলিয়েট এণ্ড ডার্কনেস' এবং ইউগোস্লোভিয়ার ষ্টিগলিকের 'নাইন্থ সার্কল' ছবির সঙ্গে। ঐ দুই ছবিতেও দেখানো হয়েছে ইহুদি মেয়ের প্রতি এক চেক এবং এক ইউগোস্লাভ যুবকের প্রেমের ভয়ংকর পরিণতি। ভাবালুতা বর্জনে এবং ভয়াবহ শূন্যতা রচনায় 'নাইন্থ সার্কল' অবশ্য গুণগত বিচারে চেক ছবিটির চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী। জন্তুসদৃশ ক্যাক্‌টাসের পাশে একসারি ইহুদি মেয়ের মাটি কাটার দৃশ্যটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের চিত্রণে দান্তে-সুলভ নারকী বর্ণনার আভাস (ছবির নামকরণেও দান্তের প্রভাব লক্ষণীয়), আর সবশেষে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালাবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে বিদ্যুতাঘাতে নায়কনায়িকার মৃত্যুর পর কয়েক সেকেণ্ড সাদা পর্দায় ভয়াবহ সর্বগ্রাসী শূন্যতা চিত্রিত হয়েছে।

অবিভক্ত জার্মানির অসামান্য চলচ্চিত্রকলার (যুদ্ধবিরোধী ছবি হিসাবে পাব্‌স্টের 'ওয়েস্টফ্রন্ট ১৯১৮' স্মরণীয়) ঐতিহ্যের গুণগত ফলশ্রুতি ঘটল প্রধানত পূর্ব জার্মানির ছবিতেই। পশ্চিম জার্মানি বহুকাল পর্যন্ত চিনিমাখা রোমান্স আর দু-একটি 'মন্দ নয়' গোছের কমেডি রচনা করেই চলচ্চিত্রে কাজ সীমাবদ্ধ

রেখেছিল। ইহুদিবিদ্বেষের অযৌক্তিকতা নিয়ে ৎজোয়াইগের গল্প অবলম্বনে রচিত 'রয়্যাল গেম' যুদ্ধবিরোধী ছবির তালিকাভুক্ত হতে পারে হয়তো, কিন্তু ঐ অপরিণত রচনা কোনোমতেই চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরববৃদ্ধি করেনি। প্রায় অকস্মাতই সে দেশ থেকে তৈরি হলো অভিনেতা বার্নাড ভিকির যুদ্ধ-বিরোধী মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি 'দি ব্রীজ'। জাতীয় কর্তব্যের নামে যুদ্ধদানবের পায়ে যৌবনকে বলিদানের নৃশংস চিত্রণের মাধ্যমে বার্নাড ভিকি তীব্র বেদনার সঙ্গে নালিশ জানিয়েছেন জীবনের এই অন্যায় অপচয়ের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শিল্পী ডেভিড লীনের ব্যয়বহুল সুদীর্ঘ রঙীন ছবি 'ব্রীজ অন রিভার কোয়াই'-কে ইংরেজ সমালোচকরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল কোয়ায়েট আখ্যা দেবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সম্মান বার্নাড ভিকির এই ছবিরই প্রাপ্য।

নরমেধযজ্ঞে জীবনযৌবনের ঐ বিনাশের দরুণ পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রশিল্পী ওয়াইদার বিক্ষোভ আরো তীব্র, তিরস্কার আরো তীক্ষ্ণ, তাঁর বেদনা আরো সুগভীর। জীবনের সুস্থ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির অচরিতার্থতাজনিত ক্ষতির জন্য 'কানাল' ও 'এ্যাশেজ এণ্ড ডায়মণ্ডস্'-এ তাঁর গভীর শোক, তাঁর চিত্তদাহ সমগ্র মানবের সপক্ষে, মানুষের অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। তাঁর কান্নায় ব্যর্থ যৌবনের যন্ত্রণার বেদনার অনবরুদ্ধ প্রকাশ। ঐ দুটি ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পে প্রায় সর্বত্রই সেই বেদনাকে দৃশ্যময় করা হয়েছে। বোমাবিধ্বস্ত বাড়িতে ভাঙ্গা বেসুরো পিয়ানো, জনশূন্য আবর্জনাময় রাস্তায় একটি চেয়ার, আণ্ডারড্রেনের অন্ধকারে ভাসমান মৃতদেহ, নৈঃশব্দ্যকে ভয়াবহ করে তুলে বিকৃতমস্তিষ্কের বাঁশির করুণ সুর, বাঁচার তাগিদে প্রাণান্তকর ব্যর্থ সংগ্রামের শেষে "বেদনার পাশে শুয়ে গান"; অথবা কণ্টককিরীট যিশুখ্রীষ্টের উল্টে পড়া মূর্তি, হাওয়াতে উড়ে যাওয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কিংবা আবর্জনা স্তূপে যুবকের বীভৎস মৃত্যু—সমস্ত চিত্রকল্পই মানুষের আত্মবিনাশের বেদনায় অধীর, প্রতিকারহীন অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর। প্রতিরোধ আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে গৌরবান্বিত করবার কোনো উদ্দেশ্য ওয়াইদার নেই, অকালমৃত্যুর অস্বাভাবিকতাজনিত ট্র্যাজেডিকে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চিত্রায়িত করাই তাঁর অন্বিষ্ট। প্রথামাফিক 'প্যাসিফিস্ট ছবি' না হলেও সুগভীর মানবপ্রেমের খাতিরেই ঐ দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি 'যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র' পর্যায়ে অবশ্য স্মরণীয়।...পোলাণ্ডের অপর শক্তিমান শিল্পী আন্দ্রেই মুঙ্ক

ব্যঙ্গকৌতুক রচনায় সিদ্ধহস্ত—যুদ্ধবাজদের অসার বীরত্ববোধকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর ছবি 'ইরয়িকা'-তে।

পোলিশ ছবির তীব্রতা বা irony কিছুই লভ্য নয় সাম্প্রতিক রাশিয়ান ছবিতে এবং চুকরাই তাঁর কবিত্ব নিয়ে যুদ্ধ অবলম্বনে 'ব্যালাড' রচনাতেই তৃপ্ত। সৈনিকের স্ত্রীর বারবণিতায় পরিণতি দেখিয়ে চুকরাই যুদ্ধের অমঙ্গলের আভাস দেন অবশ্য, বিকলাঙ্গ সৈনিকের দুশ্চিন্তাকেও কিছুটা আমল দেন তিনি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছবিতে মধুর ও করুণ রসের প্রাধান্য 'যুদ্ধ বিরোধ'কে অনেকটাই মোলায়েম করেছে, যদিও প্রথম দৃশ্যে তরুণ সৈনিকের প্রতি তাড়া করে আসা ট্যাংকের কৌশলপূর্ণ শট্‌টি কিছুটা প্রতীকী অর্থবহ। বরঞ্চ কালাটোসভের 'ক্রেন্‌স্ আর ফ্লাইং'-এ ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি রচনাতে যুদ্ধের অমঙ্গল কিছুটা প্রতিষ্ঠিত। বান্দারচুকের 'ম্যান্‌স্ ডেস্টিনি' যুদ্ধ বিরোধকে প্রকট করেছে বটে, কিন্তু দু-একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যাংশ ছাড়া এ ছবি অতি অপরিচ্ছন্ন, কাঁচা হাতের রচনা।

আণবিক বোমাবিধ্বস্ত জাপানি নরনারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই সম্ভাব্য তৃতীয়ের স্বরূপকে চিনতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। শুধু তাৎক্ষণিক প্রাণহানিই নয়, বিজাতীয় ব্যাধিতে ভবিষ্যৎ মানবেরও দেহমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে হাহাকার তাই জাপানি ছবিতে এত মর্মান্তিক—'হিরোশিমা' ছবিটি সে হাহাকারের প্রামাণ্য চিত্র এবং কেনেতো সিন্দোর 'চিল্‌ড্রেন্ অফ হিরোশিমা'ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী যুদ্ধমতলবী যদি ঐ ছবি দেখে, এবং তার মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা ভুলে সে নিছক ভয়ের বশেই অস্ত্রপরীক্ষা ত্যাগ করবে।

হলিউডের বাণিজ্যপণ্য নির্মাণের কারখানাঘরেও মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংবেদনশীল চিত্র নির্মাতা যুদ্ধ তাণ্ডবে জীবনের বিনাশে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মাইলস্টোনের 'এ ওয়াক ইন দি সান', বিলি ওয়াইল্ডারের 'স্টালাগ সেভেন্‌টিন্', ফ্রেড জিনেমার্নের 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি,' নিকোলাস রে-র 'বিটার ভিকট্রি' এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। 'বিটার ভিকট্রি' ছবিটিতে মানসিক স্বাস্থ্যে যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব দৃশ্যময় করা হয়েছে। আমেরিকার সার্থক যুদ্ধবিরোধী ছবি স্ট্যানলি কুব্‌রিকের 'পাথ্‌স্ অফ গ্লোরি'র নাম-করণেই যুদ্ধ নেতাদের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করবার অমানবিক প্রবৃত্তির

প্রতি বিদ্রূপটি স্পষ্ট হয়েছে। 'War heroics'-কে মূলধন করে 'টু হেল এণ্ড ব্যাক' বা 'ব্যাট্‌ল্ হিম্' জাতীয় পয়সা পিট্‌বার মতলবে তৈরি অগুনতি ছবির মধ্য থেকে ঐ সব ছবিকে আমাদের বেছে নিতে হয় সতর্ক দৃষ্টিতে। ইংলণ্ডের চিত্র নির্মাতারাও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'the good sides of war' দেখানোর সুমহৎ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলেন। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 'ড্যাম বার্স্টার', 'রিচ্ ফর দি স্কাই' বা 'ব্যাটল অফ্ দি রিভার প্লেট' জাতীয় যুদ্ধের গুণগান সম্বলিত ছবি! ডেভিড লীনের সাম্প্রতিক ছবি 'ব্রীজ অন্ রিভার কোয়াই'কে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ 'যুদ্ধ বিরোধী' ছবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। কিন্তু ঐ ছবিতেও ইংরেজ সৈন্যের বীরত্বের গুণগানে ছবিটিতে প্রায় Chauvinistic সুর লেগেছে। হলিউডী আদর্শে নির্মিত এই বিপুলাকৃতি ছবিতে যুদ্ধের বিভীষিকার চেয়ে তার romantic grandeur-ই ফুটেছে ভালো। বরঞ্চ লেস্‌লি নরম্যানের সাম্প্রতিক ছবি 'দি লং এণ্ড দি শর্ট এণ্ড দি টল'-এ এক জাপানি ও এক ইংরেজ সৈন্যের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মানবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিক এবং এ ছবির অন্তিম tragic irony অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। লীনের ছবির spectacular কর্মকাণ্ডের পর ডাক্তারবাবু বিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মতো যখন রায় দেন "যুদ্ধটাই পাগলামি" তখন তাকে ফাঁকা আওয়াজ মনে হয় অথচ প্রাণভয়ে ভীত নির্বাক জাপানি সৈনিকের শঙ্কিত মুখের 'ক্লোজ আপ'-এই যুদ্ধের ভয়াবহতা চলচ্চিত্রের দৃশ্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে নরম্যানের ছবিতে।

মনোবিজ্ঞানীর মতে যুদ্ধ হলো collective psychosis-এর চূড়ান্ত উৎকট প্রকাশ। কারো মতে সে মনোবিকারের উৎস হলো বিশেষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; তা যদি হয় তবে চিকিৎসার পথ সহজ না হলেও সুনির্দিষ্ট। আবার কারো মতে সে মনোবিকারের প্রকৃতি Congenital, মানুষের স্বভাবসঞ্জাত, আদি এবং অকৃত্রিম; চিকিৎসার উপায়ও তবে অনিশ্চিত। কারণ যাই হোক, কার্যটি আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে ভয়াবহ, সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আমাদের সেই ভয়কে, যন্ত্রণাকে, অনীহাকে চলচ্চিত্রশিল্পীরা দেশে দেশে নিজস্ব শিল্পকর্মে দৃশ্যমান করেছেন। সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের আসল স্বরূপ হয়তো এখন আমাদের কল্পনাতীত, কিন্তু আশঙ্কার সর্বব্যাপী ছায়া সমগ্র বিশ্ববাসীর চৈতন্যকে আচ্ছাদিত করেছে। আজকের ঠাণ্ডাযুদ্ধের শঙ্কাকুল জগতে রাবীন্দ্রিক

বিশ্ববোধের প্রেরণায় চলচ্চিত্রশিল্পীরা তাঁদের শিল্পমাধ্যমে বিশ্বমৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন—কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব তাগিদ না থাকলে সে উপদেশ বাইরে থেকে দেবার কোনো তাৎপর্যই নেই। অপরদিকে বৈজ্ঞানিকের চিকিৎসাও কতদূর আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ হবে জানা নেই। ইতিমধ্যে তবে কি হবে? ঐ সর্বব্যাপী আশঙ্কার তাড়নায় ফেলিনির 'দলচে ভিতা'-র স্টাইনারের মতো কেউ হয়তো শিশু সন্তানসহ আত্মঘাতী হবে, কিংবা সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পক্ষীপ্রেমিকের মতো পারমাণবিক বিযাক্ত-বাষ্পে নিহত পথভ্রান্ত পাখির ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাত্রিকে বিনিদ্র করবে!

Pátzay Pál Budapest VI. Népköztársaság útja 52.
(Hungarian sculptor)
prof. Kisfaludi Strobl Zsigmond (Hungarian sculptor)
Budapest XIV. Népstadion-u, 20
Jacques Madaule, 4, rue du Douanier. Rousseau. Paris. XIV
(French writer)

(میرزا ترسون زاده (تاجکستان
mirza TIRSUNZADE, Doshambacity, Tajikistan

Sartre 42 rue Bonaparte Paris (6e)

Nazim Hikmet (Nazim Hikmet)

(Alexei Surkov) Ал. Сурков
Moscow. Vorovsci 52.
Geo Bogza (Rumanian writer)
Piața Kuibîşev 5-A
BUCUREŞTI 36.
Георгий Леонидзе (Georgi Leonidze)
Тбилиси пр. И. Табидзе N 5
(Georgian poet)

JOHN OKAI (Ghanian writer), c/o Ghana
Embassy, Moscow

'পরিচয়'-এর প্রতি
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের শুভেচ্ছা

আবার 'বিশ্বমনীষী-সঙ্গমে'

চিন্মোহন সেহানবীশ

'পরিচয়'-এর এক শারদীয় সংখ্যার পাতায় যে কাহিনী একদিন শুরু করা গিয়েছিল আবার তারই জের টানতে বসেছি ঠিক সাত বছর পরে। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সমবেত নানা দেশের মনীষীদের সঙ্গে ক্ষণিক সাক্ষাৎ সেবার ঘটেছিল হেলসিঙ্কিতে, এবারে মস্কোয়। অসাধারণদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই—তাই হেলসিঙ্কির মতো এবারও ভরসা করে লিখতে বসেছি মস্কোর কাহিনী।

কিন্তু হালের বৃত্তান্ত শুরু করার আগে এই সাত বছরে পৃষ্ঠপটের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তার দিকে একটু নজর ফেরানো দরকার। আসলে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন এ কাহিনীর নিষ্ক্রিয় পৃষ্ঠপটমাত্র নয়, তার সজীবতার পক্ষে আলো-জল-মাটিরই সামিল। তাই গোড়াতেই সাত বছর আগে-পরের ব্যবধান কতটা তার হিসেব নেওয়া যেতে পারে কিছুটা।

১৯৫৫ সনে হেলসিঙ্কির শান্তিতীর্থে জড়ো হয়েছিলেন পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ১৬৪০ জন প্রতিনিধি, ৯২ জন অতিথি ও ১০৯ জন দর্শক। এবার মস্কোয় এসেছেন ১২১টি দেশ থেকে ১৯০৬ জন প্রতিনিধি, ২৩৯ জন অতিথি ও ৩৩১ জন দর্শক। এর মধ্যে মহাদেশ হিসাবে সব চাইতে বেশি দেশের (৩৮) প্রতিনিধি এসেছেন আফ্রিকা থেকে, যার মধ্যে অনেকগুলির স্বাধীন সত্তাই ছিল না সাত বছর আগে। এমনকি যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনও সার্থকতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছয় নি—সেই এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের রণক্ষেত্র থেকেও এসেছেন স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিকের দল আর ন-বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সদ্য অস্ত্র তূণে ভরে শান্তিযজ্ঞেও যোগ দিতে এসেছেন আলজিরিয়ার দেশপ্রেমিকেরা। এশিয়ার ২৫টি দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ ও জাপানের প্রতিনিধি সংখ্যা শতাধিক। ল্যাটিন আমেরিকার ২৫টি দেশ থেকেও এবার এসেছে বড় বড় দল, তার মধ্যে ব্রেজিল তো পাঠিয়েছে সম্মেলনের তৃতীয় বৃহত্তম দল—১৭৪ জনের। আর সারা

ছুনিয়ার দৃষ্টি যে দেশের পরে সেই ছোট্ট কিউবা থেকেও এসেছেন ৪১ জন। নিজ দেশের শান্তি-শত্রুর চক্রান্তে বারবার বিড়ম্বিত হতে থাকলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরাও বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে সম্মেলনের বৃহত্তম প্রতিনিধি দল (১৯০ জনের) এসেছেন খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে—হেলসিঙ্কিতে যেখানে কোনোমতে এসে পৌঁছেছিলেন ৪ জন মাত্র। এই ঘটনার গুরুত্ব যে কতখানি তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি—ইওরোপের এই প্রধান দেশগুলির প্রত্যেকটি থেকেও এবার এসেছেন শতাধিক প্রতিনিধি। স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, গোয়াটেমালা, পানামা, ফিলিপাইনসের মতো দেশ থেকে স্বৈরাচারী শাসনের বেড়াজাল পেরিয়ে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বেশ কিছু নির্ভীক মানুষ। সম্মেলনের মঞ্চে এসে মিলেছেন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দল।

এতো হলো সংখ্যার হিসেব। অন্য বিচারেও বিপুল প্রসারের সাক্ষ্য মেলে ভুরিভুরি। যেমন সম্মেলনের উদ্যোগপর্বে ও তার অধিবেশনে মতবৈচিত্র্যের সমাবেশ। এমন সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এবারে সম্মেলন আহ্বানে বিশ্বশান্তি সংসদের সঙ্গে একযোগে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাঁরা এতাবৎ ঐ সংসদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এসেছেন। আর প্রতিনিধি বা দর্শক পাঠিয়ে বা আতিথ্য গ্রহণ করে সম্মেলনের কাজে যোগ দিয়েছেন ঐ রকম অসংখ্য ব্যক্তি বা সংগঠন।[১] এঁদের মধ্যে অনেকেরই গোড়ায় গোড়ায় সংশয় ছিল সম্মেলনে

১। যেমন ব্রিটেন থেকে এসেছেন লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল-পরিচালিত 'কমিটি অফ হাণ্ড্রেড'-এর ও পাদ্রী কলিনস পরিচালিত 'ক্যাম্পেন ফর নিউক্লিয়ার ডিসারমামেণ্ট'-এর দল, আমেরিকা থেকে 'উইমেন স্ট্রাইক ফর পিস', এমনকি কিছুটা মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তরঘেঁষা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এ সেন নিউক্লিয়ার পলিসি'-র প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ক্রিশ্চান পিস কনফারেন্স', বেদান্ত মুভমেণ্ট' (ব্রিটেন) 'ন্যাশনাল কোয়েকার অর্গানাইজেশন', মেথডিস্ট চার্চ (আমেরিকা)-এর মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, 'ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস কমিটি', 'ইন্টারন্যাশানাল মুভমেণ্ট ফর এ ফেডরাল ওয়ার্ল্ড গভর্ণমেণ্ট, 'ইণ্টারন্যাশনাল রেডিও এণ্ড টেলিভিশন অর্গানাইজেশন', 'দিইউনিভার্সাল এসপ্যারাণ্টো এসোসিয়েশন' -এর মতো বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস', 'উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন', 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ,' 'ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস, ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েন অফ ডেমোক্র্যাটিক ল ইয়ার্স,' 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফজার্নালিস্টস', 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ সাইন্টিফিক ওয়ার্কার্স'-এর মতো শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং 'দি ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড উইদাউট দি বম্ব কনফারেন্স' (আক্রায়

যোগদানের সার্থকতা সম্পর্কে। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল অবাধ আলোচনার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে এঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে উদ্যোক্তাদের প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে এবং যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে তা ঐ যুক্ত আলোচনারই ফল এবং প্রায় সর্ববাদী-সম্মতও (সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন ২১৮৬ জন, বিপক্ষে ২ জন এবং ভোটদানে বিরত ছিলেন ৭ জন)। সম্মেলনের সার্থকতার এই একটা বড় দিক। দ্বিতীয়ত, আলোচনার সুস্থ আবহাওয়ার দরুণ বিরোধী বক্তব্য সকলেই ধৈর্য ধরে শুনেছেন ও অনেক বদ্ধমূল ধারণা পাল্টেছেন। আর তার ফলে সমৃদ্ধতর হয়েছে তাঁদের ঐক্যচেতনা। এর শুভ ফল নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে আগামী দিনে।

আর এক দিক থেকেও এ সম্মেলনের গুরুত্ব অসামান্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বরাবর প্রায় সরকারীভাবেই পোষকতা করে এসেছেন শান্তি আন্দোলনের। এবারকার মস্কো অধিবেশন তো তার চরম নিদর্শন। প্রায় ২৫০০ প্রতিনিধি, দর্শক ও প্রতিনিধির (আর সেই সঙ্গে ৩২২ জন দপ্তরের কর্মী) সবরকম তত্ত্বাবধানের নিখুঁত ব্যবস্থা যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে সোভিয়েত শান্তি সংসদ, সোভিয়েতের সাধারণ মানুষ ও সরকার একযোগে এ কাজে হাত না দিলে এমনটি সম্ভব ছিল না। এমন কি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধার নিকিতা ক্রুশ্চভ স্বয়ং এসেছেন শান্তি সম্মেলনের অধিবেশনে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে তাঁর সরকারের মতামত জানাতে।

তবু এবারে কিন্তু আর শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়—এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি থেকে যে সব প্রতিনিধি দল এসেছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার অনেকগুলির পিছনেই আছে দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। বহু দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীতে দু-একজন মন্ত্রী বা রাজপুরুষ এসেছেন—কোথাও বা এসেছেন শাসক দলের এক বা একাধিক নেতা। বিভিন্ন দেশ থেকে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য এসেছেন ২২০ জন—এত বেশি সংখ্যক পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য আর কোনো শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকেননি এতাবৎ। এর মধ্যে সোস্যালিস্ট, ক্যাথলিক, লিবারাল, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট—সব দলেরই লোক অবশ্য আছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন বিপুল বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে তেমনই

অধিষ্ঠিত), 'কনফারেন্স অফ আফ্রিকান পিপলস,' 'আফ্রো এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি কাউন্সিল' (কায়রোয় অধিষ্ঠিত), 'ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেণ্টেরিয়ান ফর পিস,' 'সুইশ মুভমেণ্ট এগেনস্ট নিউক্লিয়ার ওয়েপনস', জাপানের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল এগেন্স্ট এ এণ্ড-এইচ বম্বস' প্রভৃতির মতো মহাদেশীয় বা জাতীয় সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা তো ছিলেনই।

অন্যদিকে বলা চলে যে সমাজতান্ত্রিক এবং এশিয়া আফ্রিকার সদ্যমুক্ত দেশগুলির সরকারী, অন্তত আধা-সরকারী সমর্থনে পুষ্ট হয়ে এবারকার মস্কো সম্মেলন সমগ্র 'শান্তি অঞ্চল'-এর (peace zone) প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে বহুলাংশে। এইখানেই রয়েছে এবারকার শান্তি মহাসম্মেলনের বিপুল সার্থকতা।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এবার দু-চারটি কথা বলে মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাব। গতবারের মতো এবারেও দলের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু। অসুস্থতার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই বর্ষিয়সী নেত্রী যেভাবে শান্তি আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য। তাঁর সহজ মর্যাদাদীপ্ত নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আসনকে আরো সুপ্রতিষ্ঠ করতে সাহায্য করেছে বিশ্ব-শান্তির দরবারে। তিনি ছাড়া দেওয়ান চমনলাল, ডাঃ তারাচাঁদ, ডাঃ পি এন সাপ্রু, ডাঃ অনুপ সিং ও শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর মতো প্রখ্যাত কংগ্রেসী পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যেরাও ছিলেন প্রতিনিধি দলে (পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের আইনসভার কংগ্রেসী সভাপতিরাও ছিলেন এঁদের সঙ্গে)। অন্যদিকে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীগোবিন্দন নায়ারের মতো সুপরিচিত পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য, পশ্চিম বাংলার আইন-সভার বিরোধী পক্ষের খ্যাতনামা নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও বোম্বাই-এর প্রাক্তন মেয়র শ্রীমিরাজকর এবং পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার দুই সদস্য শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযামিনী সাহা ছিলেন বিরোধী পক্ষ থেকে। এ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের দুই বর্ষীয়ান নায়ক, 'গদর' দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও সংগঠক বাবা করম সিং চিমা ও বাবা ভাগ সিং কানাডিয়ানও ছিলেন আমাদের দলে। এঁদের বয়স যথাক্রমে ৯৫ ও ৮৭ বছর হওয়া সত্ত্বেও এঁদের আগ্রহ অনেক তরুণকেও লজ্জা দিতে পারে। 'গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশন'-এর সহ-সম্পাদক শ্রীওম প্রকাশ গুপ্ত ও কিছু সর্বোদয়পন্থী ছিলেন প্রতিনিধি দলে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কৌশাম্বী ও সাহেব সিং শোখে মহাশয়। সংবাদপত্রজগত থেকে ছিলেন বিশ্বশান্তি সংসদের অন্যতম নেতা শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও 'ব্লিৎস' সম্পাদক শ্রীকারাঞ্জিয়া। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিলেন শ্রীকাকা সাহেব কালেলকার, শ্রীনীলমনি ফুকন, ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ, শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর, 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীজীবনন্দন, শ্রীসাজ্জাদ জহীর, শ্রীকুরুমডি রাজাগোপালম, ডাঃ ভগবতীশরণ উপাধ্যায়, শ্রীশিউদান সিং চৌহান, শ্রীথেরুভট রমণের মতো হিন্দী, উর্দু, গুজরাটি, বাঙলা, অসমীয়া, তামিল ও মালয়ালম ভাষার সাহিত্যিকবৃন্দ। সঙ্গীতের

ক্ষেত্রে সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং আমাদের শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী মীরা দেববর্মণ এবং নৃত্যকলার দিক থেকে ছিলেন 'ভারতনাট্যম' নৃত্যশিল্পী কুমারী ভারতী। এ ছাড়া শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীরা ছিলেন অনেকেই। এই নিয়ে আমাদের ১৩০ জনের ভারতীয় দলটি ছিল সম্মেলনের চতুর্থ বৃহত্তম দল।

শান্তি সম্মেলন শুরু হলো ৯ই জুলাই, বেলা নটায় মস্কোর বিখ্যাত হল অফ কংগ্রেসে। গত বছর নভেম্বর মাসে এইখানেই অধিবেশন হয়েছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসের—তাই এই নামকরণ। ক্রেমলিন এলাকায় এই বিশাল ছ-তলা প্রাসাদটি গড়া হয়েছে সম্প্রতি—একেবারে আধুনিকতম স্থাপত্যরীতিতে। পুরোদস্তুর ছিমছাম, stream-lined এর চেহারা। সভা সম্মেলন ছাড়া ব্যালে, অপেরা, থিয়েটার বা কনসার্টেরও এখানে ব্যবস্থা হয়ে থাকে প্রায়ই। ভিতরে বসার আসন ৬০০০ মানুষের। মঞ্চ থেকে বক্তৃতা প্রথম থেকে শেষ সারি পর্যন্ত, ঘরের সর্বত্রই শোনা যায় সমান জোরে প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরেই। আর এখানে রয়েছে পৃথিবীর ছ-টি প্রধান ভাষায় যুগপৎ তর্জমার সুবন্দোবস্ত। দেখে শুনে আমরা, ভারতবাসীরা তো তাজ্জব বনতেই পারি—আশ্বস্ত হই যখন দেখি 'নিউ স্টেটসম্যান'-এর ডাকসাইটে ভূতপূর্ব সম্পাদক কিংসলি মার্টিনকেও এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে। তিনিও এসেছিলেন আমাদের মতোই এই সম্মেলনে যোগ দিতে।

অধিবেশন শুরু হতে সামনে তাকিয়ে দেখি মঞ্চের উপরকার বিরাট পর্দায় আঁকা পিকাসোর কপোত—অবশ্য নতুন ছাঁদে। অস্ত্রসজ্জার ধ্বংসাবশেষের উপরে পাখা-মেলা, নিশ্চিন্ত, লঘুভার অথচ অমিতশক্তিধর তার অপরূপ ভঙ্গিমা (কদিন মস্কোর পথেঘাটে, দেওয়ালে ও ঝুলন্ত পর্দায় দেখা গেল এরই প্রতিচ্ছবির অজস্র ছড়াছড়ি)। দু-পাশে ও ছবির তলায় ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, জার্মান, স্প্যানিশ, চীনা ও আরবি ভাষায় লেখা সম্মেলনের নাম—World Congress for General Disarmament and Peace।

২৫০০ মানুষ ক্রমে আসন গ্রহণ করলেন নিজ নিজ দেশের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে। আমাদের ডাইনে ফরাসি ও ব্রিটিশ, পিছনে ইন্দোনেশিয়ান ও বাঁ পাশে ইটালিয়ান ও জাপানি দল। দু-চোখ ভরে দেখলাম বিশাল কক্ষটি জুড়ে সাদা-কালো-হলদে-বাদামী মানুষের মেলা, বিচিত্র তাদের ভাষা, মুখের ছাঁদ ও সাজসজ্জা। বিশেষ করেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানেরা।

তাঁদের পুরুষদের কালো পাথরে খোদাই করা বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, একটি পেশল কাঁধ ও বাহু অনাবৃত, অন্যটির উপর দিয়ে হাল্কাভাবে জড়ানো উজ্জ্বল সবুজ-কালো-হলদে রঙের বিচিত্র নক্সা কাটা শাল—রোমান টোগার মতো। এর উপরে ওগিঙ্গা ওডিঙ্গার মতো নেতাদের আবার আছে মাথায় জমকালো শিরস্ত্রাণ ও হাতে পশুলোমের চামর। আফ্রিকান মেয়েরাও এসেছেন দলে দলে, নানা দেশ থেকে। তাঁরাও চোখ-ঝলসানো চড়া রঙের সুন্দর পোষাকে সজ্জিত—চলনে-বলনে তাঁদের কিছুমাত্র সংকোচের বিহ্বলতা নেই। আফ্রিকার নব জাগরণের দীপ্তিতে তাঁরা প্রত্যেকেই সমুজ্জ্বল।

দেখতে দেখতে নাম ডাকা শুরু হয়ে গেল সভাপতিমণ্ডলীর—প্রত্যেক দেশ থেকে অন্তত একজন, প্রধান প্রধান দেশগুলি থেকে তিনচারজনকেও বরণ করা হলো সভাপতিত্বে। তাঁরা উঠে এসে মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন একে একে। আমাদের ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু, দেওয়ান চমনলাল, ডাঃ তারাচাঁদ ও ডাঃ পি. এন. সাপ্রু মহাশয়। সভাপতিমণ্ডলীতে কিছু চেনা মুখও নজরে পড়ল, সাত বছর আগে যাঁদের দেখেছিলাম হেলসিঙ্কিতে। অধ্যাপক বার্নাল ছাড়া দূর থেকে চিনলাম কিউবার জাতীয় কবি নিকলাস গিলেন, সোভিয়েত লেখক এরেনবুর্গ ও কর্নিচুক, জার্মান লেখিকা আনা সেগার্স, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের নেত্রী ও ফরাসি বিজ্ঞানী মাদাম ইউজিন কতঁ, জাপানের দুই অধ্যাপক হিরানো ও ইয়াসুই এবং বহুদিনের পরিচিত সিংহলের ভিক্ষু শরণঙ্করকে।

হঠাৎ তীব্র বেদনার আঘাতে মনে পড়ে গেল যে মনীষীদের এই মেলায় একেবারে কেন্দ্রের আসনটি আজ শূন্য—ফ্রেডারিক জোলিও কুরির। সাত বছর আগে সেই কর্মচঞ্চল, অস্থির মানুষটিকে দেখেছিলাম হেলসিঙ্কি শান্তি সম্মেলনের মহানায়করূপে। দু-দিন পরেই তাঁকে সেবার দেশে ফিরতে হয় ডাক্তারদের পরামর্শে। পারমাণবিক বিভীষিকার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের সেই নির্ভীক নায়কের দেহ পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে জর্জর হয়েছিল কয়েক বছর ধরে। ১৯৫৮ সনে স্টকহলম শান্তি সম্মেলনে তাই তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি—এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পেলাম তাঁর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ। হেলসিঙ্কির কথা মনে পড়তেই তাই মনটা বেদনায় ভরে উঠল। মনে হলো যেন আসন্ন মৃত্যু ভিতর থেকে জানান দিচ্ছিল থেকে থেকে—তাই তাঁর সেদিনকার অস্থিরতা, কোনোমতে আরব্ধ কর্মের নিষ্পত্তি ঘটানোর

তাগিদে। সে অস্থিরতার আজ ক্ষান্তি ঘটেছে চিরতরে—কিন্তু বিদ্যুতের মতো তার বেগ তিনি সঞ্চার করে গেছেন বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনে।

আরো একটি চেনা মুখেরও দেখা পেলাম না এখানে—আর পাবও না কোনোদিন। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক ফাদিয়েভের সুদৃঢ়, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা সেবার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল হেলসিঙ্কিতে। তারপর হঠাৎ একদিন পাওয়া গেল তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। হয়তো বা পুরনো দিনের দেনা এমনিভাবেই শোধ করলেন ফাদিয়েভ, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায় ?

গতবার যাঁদের দেখেছিলাম তার মধ্যে এবার সম্মেলনে দেখা পেলাম না: চীনের উপরাষ্ট্রপতি কুও মো-জো, উত্তর কোরিয়ার দেশনায়িকা পাক দেন আই, ফরাসি সাহিত্যিক ভেরকর, ব্রেজিলের ঔপন্যাসিক জর্জ আমাদো, চেক লেখক জঁ্য দ্রদা, নিউজিল্যাণ্ডের রিউই এ্যালি এবং হাঙ্গেরির সাহিত্য সমালোচক জর্জ লুকাচের।

আলোচনার স্থত্রপাত করলেন এবার বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বার্নাল। দেশে বিদেশে তাঁকে বহুবার দেখেছি এবং দেখা হলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছি। কারণ বিজ্ঞান ছাড়াও নানা বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অধ্যাপকের আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা সহজ অমায়িকতা আছে যাতে আমাদের মতো অতি সাধারণ লোকেও তাঁর নাগাল পেতে পারে অনায়াসে। তাঁর বিচিত্র ও অসাধারণ কর্মক্ষমতার কথা ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মুখে শুনেছি—এক নাগাড়ে ১২।১৩ ঘণ্টা কাজের পর যখন সকলেই ছাড়া পাবার জন্য উসখুস করছেন, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক বিরামের তাল খুঁজছেন, তখন কি রকম তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলেন : "আমরা এখানেই কিছু কফি ও স্যাণ্ডুইচ আনিয়ে নিয়ে আস্থন চালিয়ে যাই আমাদের কাজ।" অথচ কখনোই মনে হয় না তিনি প্রাণপাত করে খাটছেন। বরং তাঁর কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চেহারার মধ্যে এমন একটা প্রশান্ত স্থৈর্য আছে যাতে তাঁকে মোটেই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরের এক অসাধারণ মানুষ মনে হয় না। তাঁর মস্ত বড় মাথাটি (তাঁর ভিতরকার কথা বলছি না—অবশ্যই তা বলার অপেক্ষা রাখে না) দীর্ঘ, ঘন ও অবিন্যস্ত চুলে ঢাকা—কথা বলার সময়ে বারবার মুখের উপরে এসে পড়ে অবাধ্য চুলের গোছা। তাঁর কণ্ঠ মৃদু অথচ স্পষ্ট।

বার্নাল তাঁর ভাষণে সম্মেলনের স্বর বেঁধে দিলেন গোড়াতেই :

"মস্কোর এই সম্মেলন হচ্ছে নতুন ধরনের। অকপট ভাবেই এটি পরীক্ষামূলক। এখানে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কখনো এর আগে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হননি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একই দেশের প্রতিনিধিরাও মেলেননি। এ কদিনে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে একযোগে কাজ করার কৌশল—আমরা যারা এসেছি নানা দেশ থেকে, নানা দল ও মতের যারা বাহক। সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর স্বার্থে আমাদের সংযত করতে হবে নিজেদের ভাবনা, কারণ আমরা ও আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সত্যকার ও যথেষ্ট পরিমাণ জটিলতা ও মতভেদ।…কার্যকরভাবে এই সর্বপ্রথম শান্তি আন্দোলনের বিভিন্ন, বহুলাংশে স্বতন্ত্র ধারাগুলির প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে এই সম্মেলনে : গোঁড়া শান্তিবাদী ও অহিংস অসহযোগে বিশ্বাসী থেকে শান্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আস্থাশীলেরা পর্যন্ত।

"এখানে কেউ কেউ হিমযুদ্ধে এ পক্ষ বা ও পক্ষের সমর্থক। অন্য কেউ বা মনে করেন দু-পক্ষই সমান অপরাধী। অনেকে এসেছেন সাবেকী ও বেশ বদ্ধমূল সংশয় নিয়ে,তাঁদের আশঙ্কা রয়েছে উদ্দীপনাগ্রস্ত সমাবেশের তোড়ে বাধ্য হয়ে হিমযুদ্ধে এমনভাবে পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যাতে তাঁদের কোনো বিশ্বাস নেই।

"তাঁরা দেখবেন এমনটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে। হিমযুদ্ধে এ পক্ষ বা ও পক্ষের জয়লাভের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নই—আমাদের কাজ হিমযুদ্ধের অবসান ঘটানোই।

"শান্তিপরায়ণতায় আমাদের কোনো একচ্ছত্র অধিকারের অভিমান নেই, কিন্তু আমরা মনে করি যে সীমাবদ্ধ ও কার্যত কিছুটা পরস্পরবিরোধী ঢং-এ বিভিন্ন আন্দোলন চালানোর পক্ষে পরিস্থিতি বড় বেশি গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই—আমার কথাই বলছি এখানে, এ সম্পর্কে আপনারাই পরে সিদ্ধান্ত করবেন, আমি চাই এমন একটা অবস্থা দেখতে যেখানে নানাধরনের আন্দোলন তাদের নিজস্ব খাতে প্রবাহিত হবে, কিন্তু অন্যেরা কি করছে তার খবর রাখবে, তাদের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে মতের মিল হবে সেখানে সমর্থন জানাবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ না করে সম্মেলিত করবে তাদের প্রয়াস। আমাদের সামনে, এই সম্মেলনের কাজকর্মের ফলে এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এই আমার বিশ্বাস।"

বার্নালের বক্তৃতার পর শুরু হলো বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতাদের ভাষণ। একেবারে প্রথমই ডাক পড়ল ভারতবর্ষের। ভারতীয় দলের নেত্রী শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু অসুস্থ ছিলেন—সমস্ত 'হল' উৎকর্ণ হয়ে শুনল তাঁর মৃদু কণ্ঠের ভাষণ। কিন্তু যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে :

"নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব। নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব করে তুলতেই হবে। দুনিয়ার মানুষকে তৎপর হতে হবে পথের সমস্ত বাধা অপসারণের কাজে। মানুষের মাথা আর হাত অস্ত্র বানায়—লক্ষ লক্ষ মানুষ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ না ঘটলে এমন দিন আসবেই যখন সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে অসহযোগিতা করবে, অস্বীকার করবে মৃত্যুশেল বানাতে। জনসাধারণের এই শক্তিই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, প্রতিশ্রুতি দেবেই যুদ্ধবর্জিত, অস্ত্রবর্জিত পৃথিবীর, আমাদের স্বপ্নের দুনিয়ার।"

তখন মৃদু হলেও তাঁর কণ্ঠ আশ্চর্য জোরালো শোনাল।

এরপর দু-দিন ধরে চলল সাধারণ অধিবেশন যেখানে নানাদেশের তরফ থেকে প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা ও বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন একে একে। এর মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে প্রথম দিনে বারট্রাণ্ড রাসেলের টেপ রেকর্ড মারফৎ পাঠানো বাণী। রাসেল ছিলেন এ সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা। তবে নব্বই বছরের জরাগ্রস্ত দেহ নিয়ে তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি—তাই এই বাণী। কিন্তু আশ্চর্যরকম স্পষ্ট ও জোরালো সেই কণ্ঠস্বর শুনলে কে বলবে তাঁর অত বয়স। তা ছাড়া চিন্তার স্বচ্ছতা বা ভাষার প্রাঞ্জলতার কথা তো বাদই দিচ্ছি। তিনি বললেন দু-পক্ষের আলাপ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না কিন্তু উভয়পক্ষেরই সে আলাপ আলোচনা চালাতে হবে কোন মেজাজ নিয়ে? তাঁর মতে :

"আমি চাই পশ্চিমের তরফে যাঁরা আলোচনা চালাবেন তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ঘোষণা করেন : 'কমিউনিজমের বিশ্বব্যাপী জয়লাভের চাইতে পারমাণবিক যুদ্ধ যে খারাপ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' আমি চাই পূর্বজগতের তরফ থেকে যাঁরা আলোচনা চালাবেন তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ঘোষণা করেন : 'ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয়লাভের চাইতে পারমাণবিক যুদ্ধ যে খারাপ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' যে কোনো পক্ষ থেকেই যাঁরা এমন ঘোষণা দিতে অস্বীকার করবেন তাঁরা মানবতার শত্রু এবং মানবজাতির বিলুপ্তির সমর্থক হিসেবেই নিজেদের প্রতিপন্ন করবেন।"

রাসেল ধাপে ধাপে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার তদারকির ভার সামরিক জোট-বহির্ভূত দেশগুলির হাতে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী এবং বর্তমানে শান্তি আন্দোলনের সব থেকে কার্যকর পন্থা হিসেবে এই দাবি নিয়ে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করেই উল্লেখ করলেন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা।

দ্বিতীয় দিন দুপুরের দিকের একটি ঘটনা মনে গেঁথে রয়েছে। হঠাৎ কানে এলো বক্তা হিসেবে নাম ডাকা হচ্ছে পাবলো নেরুদার। কিন্তু কোথায় নেরুদা? সভাপতিমণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সদস্য হলেও কবিকে খুব কমই দেখা যেত তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। তিনি হয় বসতেন তাঁর দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে, নয়তো বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করে বেড়াতেন এধারে ওধারে অথবা কাফিখানায়। তাই 'হল'-এ যখন তাঁকে পাওয়া গেল না তখন অগত্যা অন্য বক্তার ডাক পড়ল তাঁর জায়গায়। কিছুক্ষণ পর ফের শোনা গেল তাঁর নাম সভাপতির আসন থেকে। এবারে হাততালির বহর দেখে বুঝলাম কবিকে পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত।

নেরুদাকে আগে দেখিনি যদিও তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন একবার। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মোটেই তাঁর চেহারা কবিসুলভ নয়। দোহারা চেহারা, মাঝারি ধরনের ফরসা রঙ, মাথার উপরে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অনেকখানি, চোখ দু-টি ছোট ছোট। কিন্তু তাঁর হাসি আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত। সব মিলিয়ে মনে হয় একজন অমায়িক ভদ্রলোক, তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

কিন্তু কবি বোঝা যায় মুখ খুললেই। আমরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম তাঁর ছেলেবেলার কথা—শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পথঘাট কাদায় ঢাকা, অভিভাবকদের জীবিকা অর্জন অনিশ্চিত, চারিদিকে শুধু শোষণ আর থেকে থেকে যুদ্ধবিগ্রহ। তবু মানুষ বেঁচে থাকে একটি মাত্র শব্দের উপরে ভরসা করে—আশা। বড় প্রিয় শব্দ এটি ল্যাটিন আমেরিকায়। কারণ এতে ভর না করলে মানুষ বাঁচে কি নিয়ে? তাই ল্যাটিন আমেরিকাকে যে বলা হয় 'আশার মহাদেশ', তা নিছক পরিহাস নয়।

চিলি তথা দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গত অবস্থা যখন আমাদের কাছে ছবির মতো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ নেরুদার কণ্ঠ দৃপ্ত হয়ে উঠল আবেগে—কেন যুগ যুগ ধরে সইতে হবে মানুষকে এই লাঞ্ছনা? আশা কেন শুধু আকাশ

কুসুমমাত্রই থাকবে আমাদের কাছে? কেন খাদ্য বস্ত্রের প্রাচুর্যে, রোগ নিরাময় শিক্ষা-দীক্ষার বিপুল ব্যবস্থাপনায়, নাচ গান কবিতার অজস্রতায় ঝরে পড়বে না আশা বর্ষার দাক্ষিণ্যের মতো?

পাবলো নেরুদা হঠাৎ নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। দেশবিদেশের সারিসারি মানুষের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন দ্রুত পায়ে। সমস্ত 'হল' তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে তাঁকে স্বাগত জানাতে। কেউ তাঁর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, কেউ বা শুধু একটু স্পর্শ করছে তাঁকে। পিছনে পিছনে ধাওয়া করে যখন তাঁকে ধরলাম হলের বাইরে তখন দেখি ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। কেউ হাতে হাত দিচ্ছে, কেউ জড়িয়ে ধরছে, কেউ বা চুমু খাচ্ছে—"পাবলো" "পাবলো" এ জয়ধ্বনির মধ্যে। বুঝলাম এখন কথা বলার চেষ্টা করা শুধু বৃথা নয়, অশোভনও বটে—এই প্রিয়সম্বর্ধনার সমারোহের মধ্যে।

নেরুদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলাম কদিন পরে। রবীন্দ্র মেলা উপলক্ষে আমরা কবির ছবি সমেত যে স্মারক-চক্র তৈরি করিয়েছিলাম তারই একটি ল্যাটিন আমেরিকার এই প্রখ্যাত কবির কোটে লাগাতে লাগাতে অনুযোগ করলাম তিনি আমাদের মেলায় আসেননি বলে। কবি স্মারক-চক্রটি তাঁর ঠোঁটে ছুঁইয়ে অপরাধ কবুল করলেন। বললেন নানা ধরনের কাজকর্মের চাপে অনেক সময়ে জরুরি কাজও হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। তবে রাজনৈতিক কাজকর্মের ভিড়ে কবিতা চাপা পড়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই—সেটা অসম্ভব। সম্প্রতি কিছু লিখেছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জানালেন নিশ্চয়। এও শুনলাম যে এ বছরই তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমার বই প্রকাশিত হবে, তাতে থাকবে বেশ কিছু নতুন কবিতা।

নেরুদার সঙ্গে আর একদিন দেখা আমরা যে হোটেল ইউক্রাইনায় থাকতাম তার সামনেকার প্রশস্ত সিঁড়ির উপরে। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন কিউবার দুই বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক—নিকলাস গিলেন ও মারিনেল্লো। এর মধ্যে গিলেনকে দেখেছিলাম হেলসিঙ্কিতে। কবি হিসাবে অনেকের মতে তিনি নেরুদার সমকক্ষ। দুই কবিরই খ্যাতি সারা ল্যাটিন আমেরিকা জোড়া। গিলেনকে হেলসিঙ্কির কথা বলে জানালাম যে *Mainstream* পত্রিকার দৌলতে তাঁর কয়েকটি কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বিশেষ করে মেক্সিকোর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সিকোয়েরজের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে হাভানার একটি প্রতিবাদ সভায় গিলেন ও নেরুদা যা বলেন ও যে কবিতা কটি পড়েন তার একটি

চমৎকার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকায়। গিলেন ও নেরুদা দু-জনকেই দেখলাম মেক্সিকোর ঐ শিল্পীকে যে বর্বর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার জন্য বিশেষ বিচলিত।

গিলেনকে রবীন্দ্র স্মারক-চক্র দিতেই তিনি পাল্টা আমার কোটে পরিয়ে দিলেন তাঁদের বীর নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর চিত্রাঙ্কিত চক্র। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশের কথা হচ্ছে। সুদূর ভারতবর্ষেও তাঁর কবিতা ভালোবাসার লোক আছে শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গিলেন নেরুদার থেকে খাটো ও আমাদের মতোই তাঁর গায়ের রঙ। মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকে সর্বক্ষণ।

মারিনেল্লোর চেহারা বীরের মতো। কিউবা থেকে যে দলটি এসেছে, তিনি তার নেতা। তাঁর লেখার সঙ্গে আমরা এ দেশে পরিচিত নই। স্পেনের এক কবি যখন ম্যারিনেল্লো প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি যেন হাতে রাইফেল নিয়ে লেখেন তখন বিশেষ কৌতূহল হলো তাঁর লেখা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে—আবার কিউবা কি সংকটের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তারও পরিচয় পাওয়া গেল ঐ কথা থেকে। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রে কৌতূহল নিবৃত্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারি নি নানা কাজের ভিড়ে।

দ্বিতীয় দিনের বৈকালিক অধিবেশনের সব থেকে বড় ঘটনা অবশ্যই ক্রুশ্চভের বক্তৃতা। এই অধিবেশনটিতে সভাপতি ছিলেন বার্নাল স্বয়ং। ক্রুশ্চভের ভাষণ শোনার আগ্রহে সমস্ত 'হল' ও সভাপতিমণ্ডলীর মঞ্চ পুরোপুরি ভরতি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চভ এলেন এবং নিচে, সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যেই বসলেন। সভাপতি তখন জানালেন যে জেনিভায় যে ১৮টি শক্তির (এর মধ্যে ফ্রান্স যোগ দিচ্ছে না বলে কার্যত ১৭টি শক্তির) নিরস্ত্রীকরণ কমিটি চালু রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মেলনের তরফ থেকে চিঠি গিয়েছিল আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে নিজ নিজ সরকারের মতামত জানাবার অনুরোধ করে। "এর ভিতরে ১০টি দেশের (ভারতবর্ষ সমেত) উত্তর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ন-জন চিঠিতেই তাঁদের বক্তব্য বলেছেন এবং দশম দেশটির প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁর মতামত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আমি এখন তাই সোভিয়েত সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁর বক্তব্য বলার জন্যে।" সমস্ত 'হল' দাঁড়িয়ে উঠে ও হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাল সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীকে।

ক্রুশ্চভ তাঁর বক্তব্য পাঠ করলেন প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা ধরে। তাঁর বক্তৃতার অনেক কিছুই শুনেছি প্রকাশিত হয়েছে এ দেশের কাগজে—তাই তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু রাসেলের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন সেইটেই এখানে তুলে দিচ্ছি :

"লর্ড রাসেলের বাণীকে আমরা এক চরমপত্রদানের আবেদন হিসাবে ব্যাখ্যা করি না : হয় যুদ্ধ ও পারমাণবিক বিনাশ অথবা কমিউনিজমকে স্বীকৃতিদান অথবা উল্টো দিকে—হয় পারমাণিক যুদ্ধ নয় ধনতন্ত্রকে স্বীকৃতিদান। আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো পক্ষই যদি তার মতাদর্শ ও নীতির জয়লাভের জন্য সশস্ত্রবাহিনী বাড়িয়েও, যুদ্ধের আশঙ্কা আরো ঘনিয়ে তুলে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে নিশ্চিতভাবেই ঘটনাস্রোত এগিয়ে যাবে এক বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে। সমগ্র বিশ্বের সামনে আমরা ঘোষণা করছি যে কমিউনিস্ট-মতাদর্শকে বিজয়ী করার জন্য বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর নীতি আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

"আমরা এই ঘটনাকে ধরে নিয়ে শুরু করি যে পৃথিবীতে দু-ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে—ধনতান্ত্রিক নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির এক ব্যবস্থা আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি; সমাজবাদী নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির আর এক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক এক সংগ্রাম চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে সেই সংগ্রামকে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যুদ্ধে পরিণত করা উচিত নয় এবং ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মারফতেই। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ তার সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করুক শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে। বিচারের মূল মাপকাঠি হলো : ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, কোন ব্যবস্থা বেশি বৈষয়িক ও আত্মিক সুবিধা, জনসাধারণের জন্য উচ্চতর জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান এবং ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা যোগায় আর মানুষের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের দ্রুত পরিপুষ্টির নিশ্চয়তা দিতে পারে।"

ক্রুশ্চভের বক্তৃতায় শেষে আবার সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন অভিনন্দন জানাতে। ক্রুশ্চভ মাথা নামিয়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালেন। তারপর বিদায় নেওয়ার উপক্রম করতেই সভাপতি তাঁকে অনুরোধ করলেন সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে এসে অন্য প্রধানমন্ত্রীদের উত্তর শুনতে। বলা মাত্র ক্রুশ্চভ রাজি হয়ে এসে বসলেন সভাপতি বার্নাল ও শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরুর মধ্যে। তারপর

মন্ত্রীদের বাণী পাঠ শেষ হলে আবার বিদায় চাইলেন সভাপতির কাছে। সভাপতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সভাপতিমণ্ডলীর শতাধিক সদস্য এগিয়ে এসে ক্রুশ্চভের সঙ্গে হাত মেলালেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন এরপরেই শেষ হয়ে গেল। তারপর দিন থেকে শুরু হলো কমিশন মিটিং। (ক) নিরস্ত্রীকরণের রাজনৈতিক ও টেকনিকাল সমস্যা (খ) নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ফলাফল (গ) নিরস্ত্রীকরণ ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং (ঘ) নিরস্ত্রীকরণের সামাজিক, ধর্মীয়, আইনগত ও সাংস্কৃতিক দিক—এই চারটি ছিল কমিশনের বিষয়। তারপর শেষের দু-দিন ফের পূর্ণ অধিবেশন বসার পর সম্মেলন শেষ হলো ১৪ই জুলাই তারিখে।

চতুর্থ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক সাব-কমিশনে নীলমণি ফুকন, গোপাল হালদার, মুলকরাজ আনন্দ, বিষ্ণু প্রভাকর, সাজ্জাদ জহীর, ভগবতীশরণ উপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমিও ছিলাম একজন সদস্য। সেখানকার কথাই বলব এখানে কিছুটা সবিস্তারে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে গোড়াতেই কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। সব দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই রকমসকম মোটামুটি একই ধরনের ঢিলেঢালা। অর্থাৎ সভায় দেরি করে আসা, এসেই পরিচিতদের টেনে নিয়ে আড্ডা জমানো, সভা পরিচালনার দায়িত্ব ঠিক কার উপরে, কর্মসূচীই বা ঠিক কি—সেসব তুচ্ছ ব্যাপারে অনির্দিষ্ট থাকা, অব্যবস্থার জন্য বারবার সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটা, হঠাৎ কি জানি কেমন করে অবশেষে কোনোমতে সভা শুরু হওয়া, গোড়ায় গোড়ায় কেউ মুখ খুলতে না চাওয়া, তারপর হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে মুখখোলা ও কিছুতেই মুখবন্ধ না করা! কিন্তু এ সবই চলে এমন চমৎকার একটা খুশির আবহাওয়ায় যে গুরুগম্ভীর কর্তব্যপরায়ণেরাও শেষ পর্যন্ত জোয়ারে গা ভাসাতে রাজি হয়ে যান সানন্দেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই রকম চমৎকার অব্যবস্থার পর টের পাওয়া গেল যে আমাদের সাংস্কৃতিক সাব-কমিশনের সভা শুরু হয়ে গেছে ফরাসি লেখক পিয়ের ব্লকের সভাপতিত্বে। নানা দেশের প্রতিনিধিরা একের পর এক উঠে নানা ধরনের প্রস্তাব করলেন—যুদ্ধ প্রচারের নিষিদ্ধকরণ, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উদ্দেশ্যে ইউনিস্কো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ সরকার মারফৎ বা অন্যভাবে ব্যবহারের চেষ্টা, পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে রচনা, আন্তর্জাতিক শিল্পী দিবস পালন, আন্তর্জাতিক চিত্র বা ফিল্মপ্রদর্শনী, টেলিভিশন

ও রেডিওর মাধ্যমে শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী প্রচার, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক লেনদেনের নানারকম কার্যকর পন্থা নির্দেশ বা এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় ইত্যাদির। এই সব গুরুতর প্রস্তাবের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা হাল্কা কথা-কাটাকাটি বা বিতর্কের আবহাওয়াও জমে উঠেছিল থেকে থেকে। যেমন ব্রিটেনের বিখ্যাত স্বরকার এলান বুশ যখন জানালেন যে অল্ডারম্যাস্টন মিছিলের আনুষঙ্গিক হিসাবে অথবা পোলারিস সাবমেরিন ঘাঁটি বা জার্মান পানৎসার বাহিনীর পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বিলাতে সুন্দর সুন্দর গান রচিত হয়েছে এবং তিনি চান সেগুলিকে অন্যান্য দেশের শান্তির গানের সঙ্গে বদলাবদলি করতে, তখন এরেনবুর্গ বললেন প্রেমের গান বিনিময় করলে উদ্দেশ্য আরো বেশি সার্থক হয়ে উঠবে। এতে এলান বুশ গোড়ায় বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে যখন বোঝানো হলো যে এরেনবুর্গ আসলে বলতে চেয়েছেন যে শুধু শান্তির গান বলে চিহ্নিত গানগুলিই নয়, সব রকম ভালো গানেরই লেনদেন হওয়া উচিত আর পরে যখন দেখা গেল যে বুশ মহাশয়ের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে গোটা প্রস্তাবের অঙ্গ হিসাবে তখন আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুশি হয়ে বৃদ্ধ স্বরকার আমাকে উপহার দিলেন তাঁর প্রিয় *Songs of Peace*।

নানা বক্তৃতা ও প্রস্তাবের ভিড়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈকা প্রতিনিধির কথাগুলি মনে পড়ছে। শ্রীমতী এলিজাবেথ রোয়াট বর্ণের দিক থেকে শ্বেতাঙ্গ কিন্তু সেই উৎকট বর্ণান্ধতার দেশে তিনি সংগ্রাম করছেন কৃষ্ণকায়দের পাশে দাঁড়িয়ে। ইনি একজন অভিনেত্রী। তাঁর বলার ধরন অত্যন্ত সহজ, আন্তরিক অথচ তেজস্বী। একটি লাইবেরিয়ান প্রবাদ শোনা গেল তাঁর মুখে : "To look at a friend you don't have to look down upon him or look upto him but just to look straight at him !" মানুষে মানুষে সেই সহজ মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম।

আর একজনের কথাও ভোলা সম্ভব নয়। মার্কস আনা একজন স্প্যানিশ কবির ছদ্মনাম, যদিও এই নামেই এখন তিনি সর্বাধিক পরিচিত। ফ্রাঙ্কোর সরকার তাঁকে তিনবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। প্রথমবার তিনি রেহাই পান বয়স কম বলে। পরের দুবারেই শাস্তি কমে প্রতিবারে ৩০ বছর অর্থাৎ মোট ৬০ বছর কারাদণ্ডে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের চাপে ২২ বছর পরে সম্প্রতি তিনি বুর্গোস জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কারাগারে

রচিত তাঁর ছোট্ট একটি কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সরকারী খবরদারি এড়িয়ে কোনোমতে বাইরে আনা সম্ভব হয়েছে। স্পেনের প্রতিনিধি হিসেবে এই কবি-যোদ্ধা এসেছেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনে।

মার্কস আনাকে দেখলে কিন্তু এসবের কিছুই বোঝা যায় না—মনে হয় না রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অতীত তাঁর দেহমনের উপরে কোনো ছাপ ফেলেছে। রোগা কিন্তু রুগ্ন নয় তাঁর দেহ, শুধু সামনের চুল কিছুটা পাতলা। অদ্ভুত স্নিগ্ধতা, তারুণ্য তাঁর চেহারায়। তাঁর হাসিটি লাজুক ধরনের—দৃষ্টির একাগ্রতা ও গভীরতা থেকেই শুধু থেকে থেকে ধরা পড়ে যে তারুণ্যের অনভিজ্ঞতা অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন মার্কস আনা।

দুই অধিবেশনের মাঝখানের সময়টুকুতে সেদিন তাঁকে ধরলাম। আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সব থেকে বড় অসুবিধে ছিল এই যে তিনি ইংরেজি জানেন না। কোনোমতে তাঁরই এক বন্ধুর সাহায্যে তাঁর কাহিনী কিছুটা শুনলাম। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড কৌতূহল ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর প্রবল আগ্রহ কবিতার ব্যাপারে—থেকে থেকেই বলেন এতদিন পরে বেরিয়ে আমারই তো প্রশ্ন করার পালা। কবিতা চাইতেই তিনি সাগ্রহে দুটি কবিতা দিলেন একটি মূল স্প্যানিশে; অন্যটি ইংরেজি তর্জমায়। তাঁর কবিতা ও জীবনী বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করব বলাতে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন— ঠিকানা দিয়ে বললেন কপি পাঠাতে।

বিখ্যাত লেখিকা আনা সেগার্সে'রও নাগাল পেলাম ঐ ছুটির সময়টুকুতেই। আশ্চর্য লাগল যে এই সাত বছরে তাঁর চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমস্ত চুল সাদা, ছোট ছোট চোখ দুটি থেকে জীবনের প্রতি টান ও আগ্রহ যেন ঠিকরে পড়ছে। বয়স সত্ত্বেও কখনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকার মানুষ নন আনা সেগার্স—ঘুরে ঘুরে সর্বদাই তিনি আলাপ করছেন নানা মানুষের সঙ্গে। আশ্চর্য প্রখর তাঁর ব্যক্তিত্ব যার দরুণ সাত বছর আগে হেলসিঙ্কিতে "উনিই কি আনা সেগার্স" আমার এই প্রশ্নের জবাবে একজন তরুণ জার্মান লেখক পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন—"who else can she be ?"

ইগ্নাসিও এগ্যোয়ের একজন মেক্সিকান চিত্রশিল্পী। তাঁর সঙ্গেও আলাপ এইখানে। মেক্সিকান চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি জানালেন যে খুবই প্রতিকূল অবস্থা তাঁদের সামনে। মেক্সিকান আর্টের বিখ্যাত ত্রয়ীর মধ্যে ডিয়েগো রিভেরা ও অরোজ্‌কো আজ মৃত, আর তৃতীয় জন সিকোয়েরজ খাটছেন আট বছরের কারাদণ্ড। চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের

শাসন চলেছে দেশে। কাজেই সরকারী চাহিদার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল, ম্যুরাল চিত্রশিল্পের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শিল্পীরা তাই শহর ছেড়ে এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়েছেন যদিও যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের মধ্যে। উড্‌কাটের কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে অবস্থাগতিকে।

জাপানী চিত্রশিল্পী কিওটাকা ওয়াজিমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হোটেলেই, এখানে তাঁর সঙ্গে কিছুটা আলাপ করা গেল। ৪৭ বছরের এই শিল্পী সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে স্কেচ করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে জাপানের সর্বত্র, বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে খোলাখুলি—এসব কথা তাঁর মুখে শুনলাম। তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানো খুবই কঠিন—তাই কিছুক্ষণ পরে আর কথা না খুঁজে পেয়ে তিনি কোনোমতে জানালেন যে তিনি আমায় একটা স্কেচ দিতে চান আর তার মারফতই জানাবেন তাঁর বক্তব্য। ক-দিন পরে আমাদের হোটেলের সামনে প্রতিনিধিদের আনাগোনার সেই স্কেচটি এই সংখ্যা 'পরিচয়'-এই ছাপা হলো।

চতুর্থ দিন বিকেলে পৃথকভাবে লেখকদের সমাবেশ হলো সোভিয়েত লেখক ভবনে। পিয়ের ব্লক প্রস্তাব করলেন যে যেহেতু এখানে অনেক দেশের লেখকেরাই উপস্থিত তাই সভাপতিমণ্ডলীকে যথাসাধ্য প্রতিনিধিত্বমূলক করাই সমীচীন হবে।

প্রথমেই অবশ্য নাম করা হলো জ্যাঁ পল সার্ত্র্, আনা সেগার্স, আর্টার লুণ্ডকৃভিস্ট, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিক্‌মৎ, কনস্ট্যানটাইন ফেডিন, এরেনবুর্গ, কার্লো লেভি প্রভৃতি বিশিষ্টতমদের। তারপর যখন সব দেশেরই এক বা একাধিক নাম করা হতে লাগল তখন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ঔপন্যাসিক ফ্রাঙ্ক হার্ডি ('পাওয়ার উইদাউট গ্লোরির' লেখক) হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন "সভাপতিমণ্ডলী তাহলে 'হল'-এই বসুন আর আমরা যারা কয়েকজন সভাপতিমণ্ডলীভুক্ত হব না আমরা উঠে বসি মঞ্চের উপরে কারণ সভাপতিমণ্ডলীর যা আয়তন দাঁড়াচ্ছে তাতে মঞ্চের উপরে তার স্থান সংকুলান হবে না।" এতে চারিদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল। সোভিয়েত কবি সিমনভ তখন বললেন "খামোখা সময় নষ্ট করার দরকার নেই। নাজিম হিকমৎকে সভাপতি করে কাজ স্থরু করা হোক এখুনই।" তুমুল হাততালির মধ্যে অপ্রস্তুত নাজিম হিকমৎ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেলেন আচমকা।

আলোচনা সুরু করলেন সার্ত্র। হেলসিঙ্কিতে তাঁকে দেখেছিলাম দূর থেকে আর শুনেছিলাম তাঁর আশ্চর্য বক্তৃতা। নাগাল পাওয়ার আগেই তিনি সেবার ফিরে গিয়েছিলেন দেশে। এবারে ঐ হলের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। বেঁটেখাটো মানুষ জ্যাঁ পল সার্ত্র—একটা পা একটু টেনে টেনে চলেন যেন। তাঁর লেখা পড়ে যেমনটি মনে হয়েছিল তার সঙ্গে মোটেই মিলল না তাঁর চেহারা। তবে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে চোখে মুখে। লেখক মহলে তাঁর খাতির দেখলাম অসাধারণ, তবু নম্র অমায়িক ও সহজ তাঁর আচরণ।

সার্ত্রকে যখন বললাম যে তিনি আমাদের রবীন্দ্রমেলায় না আসায় আমরা সকলেই অত্যন্ত হতাশ হয়েছি তখন তিনি জানালেন "দুর্ভাগ্য আমারই। গোড়ায় ভেবেছিলাম পারব—সে কথা জানিয়েও ছিলাম। তারপর পেরে উঠলাম না কোনোক্রমেই।" জানা গেল তাঁর ব্যস্ততার মূল কারণ আলজিরিয়া। সেখানকার রক্তাক্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়ায় এবং আলজিরিয়ার মুক্তিলাভে দারুণ উল্লসিত তিনি। সে-কথা বলার সময় তাঁর চোখ মুখ দেখে বোধ হয় যে সেটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যেরও ঘটনা।

সার্ত্র বললেন ঠিক সাত মিনিট। খুব স্পষ্ট তাঁর চিন্তা আর তাই বলার ধরনও তীক্ষ্ণ ও সোজাসুজি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যথেষ্টই ভাগাভাগি রয়েছে—বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির মধ্যে। এরই সুযোগ নেয় যুদ্ধবাজেরা—তারা যুদ্ধের সাফাই হিসেবে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি রক্ষার দোহাই পাড়ে। এটা ঠিক যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কেন, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপও থাকবে—তার থেকেই আসে তার প্রাণরস। কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সংস্কৃতির আরো একটি দিক থাকে—সেটি তার সর্ব-ব্যাপকতা। আজকের দিনে বিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়ে প্রত্যেক সংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী দিকটার উপর জোর দিতে হবে। তা হলেই গড়ে উঠবে ঐক্য এবং যুদ্ধবাজেরা তখন আর বিশিষ্ট কোনো সংস্কৃতি রক্ষার ধুয়ো তুলে কাজ হাসিল করতে পারবে না আজকের মতো। সার্ত্র তাই প্রস্তাব করলেন যত শীঘ্র সম্ভব আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের আয়োজন করা হোক এই উদ্দেশ্যে।

মোটের উপরে সার্ত্রের এই বক্তব্য ও প্রস্তাবের উপরেই চলল আলোচনা। ইটালির সাহিত্য সমালোচক জিয়ানকার্লো ভিগরেল্লি জানালেন যে তিনি 'ইওরোপিয়ান কমিউনিটি অফ রাইটার্স' নামে ইওরোপীয় লেখকদের যে প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন তাতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে পঁচিশটি

দেশের লেখকেরা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মোটেই ইউরোপীয় লেখকদের পৃথিবার অন্য লেখকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। তিনি ঘোষণা করলেন আফ্রোশীয় দুনিয়া এবং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার লেখকদের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করতেই যে তাঁরা উৎসুক তাই নয়, তাঁরা চান এই সকলকে মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এক কনফিডারেশন গড়ে তোলা।

এরেনবুর্গ বললেন "সার্ত্র প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন শুধু যুদ্ধের সম্পর্কে প্রস্তাবই নেবে না—তাতে শুরু করতে হবে লেখা ও লেখক সম্পর্কিত আলোচনাও। মনে রাখতে হবে আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি থেকে পেছিয়ে রয়েছি—এই একপেশে অগ্রগতি অস্বাভাবিক। হয়তো ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। আমাদের তাই কোটি কোটি পাঠক আছেন কিন্তু নেই কোনো নতুন টলস্টয়। পশ্চিম জগতেও নেই বালজাক, ডিকেন্স, স্তাঁদালের মতো প্রতিভা। কেন এই অবস্থা? এইসব সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য লেখকদের সম্মেলন ডাকা হোক সর্বব্যাপীভাবে। মনে রাখতে হবে আমাদের এই শান্তি সম্মেলনে সব লেখক এখনও যোগ দিতে রাজি নন।"

সাজ্জাদ জহীর জানালেন যে আফ্রোশীয় লেখক সংস্থা সংগঠিত হয়েছে কিছুদিন হলো কিন্তু তার সঙ্গে ইওরোপীয় বা অন্যান্য লেখকদের নিয়মিত যোগাযোগ এখনও স্থাপিত হয়নি। তাই সার্ত্র, ভিগরেল্লি ও এরেনবুর্গের প্রস্তাব খুবই সমর্থনযোগ্য। এ সম্মেলনে আমেরিকার লেখকদের উপস্থিতি অবশ্য আশানুরূপ নয়। তবু এখান থেকেই আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের প্রস্তাব নিতে হবে এবং তাঁর প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটিও গঠন করতে হবে এখনই।

জহীর ছাড়া আমাদের তরফ থেকে শ্রীনীলমনি ফুকন, ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ ও ডাঃ ভগবতীশরণ উপাধ্যায়ও তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। ইটালি, গোয়াটেমালা, নরওয়ে, ব্রিটেন, কিউবা, ভিয়েটনাম, স্পেন, চিলি, হাইটি, পশ্চিম জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, ইরান, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি, ঘানা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, নেপাল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরাও বললেন একে একে। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হলো শুধু সর্বসম্মতিক্রমে নয়, সকলের বিপুল উল্লাসের ভিতরে। আর প্রস্তুতির জন্য যে কমিশন গঠিত হলো তার মধ্যে থাকলেন জাঁ পল সার্ত্র, কার্লো লেভি, আনা সেগার্স, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমৎ প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। ভারতবর্ষ থেকে নাম রাখা হলো ডাঃ মুলকরাজ আনন্দের।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল আগামী বছর এই বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রোমে।

লেখকদের এই সভা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা লিখে শেষ করি। বিরতির সময়ে আমি নানাদেশের লেখকদের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছিলাম যথারীতি। আমার সঙ্গে ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত—*In Homage to Tagore* ও *Tagore and Man*-এর বেশ কয়েক কপি। এগুলি একটা টেবিলে রেখে আমি ঘুরছিলাম এধারে ওধারে। খানিক-পরে ফিরে এসে দেখি জনকয়েক তরুণ নিবিষ্ট মনে ঐ বইগুলি পড়ছেন। গায়ের রঙ দেখে আফ্রিকান বোঝা গেল। আমাকে দেখে তাঁরা জানতে চাইলেন বইগুলি আমার কিনা। উত্তর পেতেই তাঁরা বললেন "আমরা এখানে রয়েছি ঘানা, গিনি, সুদান ও হাইটির লোক।" পরিচয়ও পেলাম প্রত্যেকের—দু-জন ঘানার কবি, জন ওকাই ও শ্রীমতী এলিজাবেথ স্পিও-সিয়ারগ্রা, একজন হাইটির কবি ও উপন্যাসিক রেনি দেপেস্ত্রে, একজন গিনির লেখক মারিও দ্য আঁদ্রেদ আর একজন সুদানের লেখক মোহেদ আহমেদ ওমেদ। এঁরা বললেন "আমাদের প্রত্যেককে না হলেও আমাদের চারটি দেশের জন্য চারটি বই তুমি দিতে পারবে কি? আমাদের বিশেষ দরকার এই বই-এর। তোমাদের কবি সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি কিন্তু জানার আগ্রহ আমাদের প্রত্যেকেরই প্রবল। *Tagore and Man*-এ কবির লেখা পড়ে আমরা অবাক হয়ে গেছি। যদি দিতে পারো তবে এই সব লেখার সঙ্গে আমরা আমাদের দেশের মানুষের পরিচয় ঘটাব নিশ্চয়ই।"

প্রস্তাবে সম্মতি জানাতেই এদের মুখ ভরে গেল হাসিতে। তারপর যখন এঁদের প্রত্যেকেরই কোটে এঁটে দিলাম কবির শতবার্ষিক স্মারকচক্র তখন এঁদের আনন্দ দেখে কে। আমার হাত ধরে তাঁরা বারবার বলতে লাগলেন "তুমি আমাদের সত্যিকারের বন্ধু!" আমাদের দেশে এখন যা লেখা হচ্ছে—বিশেষ করে কবিতা ও ছোট গল্প— তার ইংরেজি তর্জমা পাঠাবার জন্যও এঁরা বিশেষ অনুরোধ জানালেন বারেবারে।

সুদানের তরুণ কবির কাছে শুনলাম যে বিখ্যাত সুদানী কবি, তাজ এল শির এল হাসান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত। তিনি নাকি কবির রচনা থেকে তর্জমা করছেন নিজ ভাষায়।

আফ্রিকার হালের লেখকদের সংস্কৃতিতৃষ্ণার বোধ করি তুলনা নেই। অদ্ভুত

মর্মস্পর্শী এঁদের আকুল আগ্রহ সব কিছু জানবার, সব কিছু বুঝবার। আমাদের কবির কথা হয়তো আমাদের থেকেও এঁদের সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য :

"এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের ;
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধারে
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

ফ্রান্সের জাঁ পল সার্ত্র থেকে ঘানার জন ওকাই—সবাই জড়ো হয়েছেন মস্কোয়—জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর মমতায়। সুদূর বাঙলা দেশের এক জীবনপ্রেমিক তাই শান্তিতীর্থের এই পথিকদের উদ্দেশে আবার পাঠাচ্ছে তার নিবিড় ভালোবাসা।
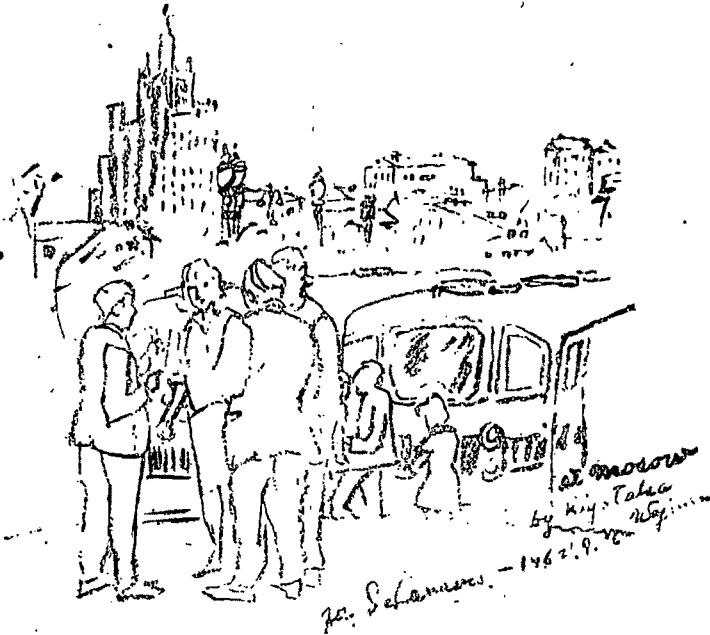
ভারতীয় প্রতিনিধিদের কয়েকজন   কিয়োটাকা ওয়াজিমা

René Depestre (Haitian poet and novelist)
Calle 41. N° 1058
Entre 32 y Av. Kohly
Nuevo Vedado.
La Habana. Cuba.

~~Haitian poet and novelist~~

Pablo Neruda
(Pablo Neruda) 1962

MARIO DE ANDRADE (Literary critic of Guinea).
(MPLA) Angola
B.P. 720 .. Léopoldville
B.P. 800 Conakry

Literary critic

Mrs. Elizabeth Spio-Garbrah from Ghana
c/o P.O. Box 1633
Accra Ghana
West Africa.

Cuba: [illegible]
[illegible] 62.

ARTUR LUNDKVIST
S:t Eriksgatan 114
Stockholm
Sweden

Little children black and white
Hand in hand together we sing
Peace and friendship to all mankind
Let us ~~always~~ ever remember 'Peace'.

E. S. Garbrah.

Inés Moreno (Stage artist)
Flandes 1039 - Santiago - Chile.
Sud américa.

'পরিচয়'-এর প্রতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের শুভেচ্ছা

বিজ্ঞানীর মোহভঙ্গ

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে আধুনিককালের অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরা যে পরিমাণে পরিচিত হয়েছি বোধ হয় ঠিক সেই পরিমাণেই বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছেন। নীরব নিভৃত গবেষণাগারের বাইরে বিজ্ঞানীরা যে আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া মানুষ একথা আমাদের মনেই পড়ে না। আমাদের অনেকেরই কাছে বিজ্ঞানীরা হলেন উগ্র যন্ত্রসাধক, সহস্র সূর্যের অমিত তেজের নিয়ন্ত্রা, লোকক্ষয়কৃৎ মহাকালের সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁদের কথা আমরা ভয়মিশ্রিত বিস্ময়, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা বিজড়িত ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ করি। সময় সময় এই বিস্ময়, এই ক্ষোভ ঘৃণায় যে পরিণত হয় না তা নয়। বিজ্ঞানীদের ও বিশেষ করে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের এর জন্য মর্মপীড়া কম নয়। অথচ বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের শুরু পর্যন্ত পরিস্থিতিটা এই পর্যায়ে ছিল না। তখনও পর্যন্ত নীরবে নিভৃতে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে গবেষণাগারের গজদন্ত মিনারে সত্যের জন্যই সত্যানুসন্ধানের নীতিতে বিজ্ঞানীরা ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী, অবাধে বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রকল্প প্রচারে একান্ত পক্ষপাতী। তখন প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের সাধনাই ছিল তাঁদের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য।

জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতাদখলের (জানুয়ারি ১৯৩৩) ঠিক এক বছর আগে লর্ড রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে গবেষণারত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন পরমাণুকেন্দ্রের অন্যতম মৌলিক কণিকা, তড়িৎ-ধর্মনিরপেক্ষ নিউট্রন (ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)। নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পর, ১৯৩২ সালেই নিউট্রনের তড়িৎ-ধর্মনিরপেক্ষতার সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি-উন্মোচনের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীমহলে প্রথম উত্থাপন করলেন তরুণ অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফ্রিজ হাউটারম্যানস (Fritz Houtermans)। হাউটারম্যানসের বক্তব্যকে বিজ্ঞানীরা তখন তেমন গুরুত্ব কিন্তু দেননি।

Brighter than Thousand Suns. Robert Jungk.

এর তিন বছর বাদে স্টকহোমে (Stockholm) নোবেল প্রাইজ বক্তৃতায় জোলিও কুরীও প্রায় একই কথা বললেন। জোলিও কুরীর বক্তব্য হলো, বিজ্ঞানীরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন মৌলের পরমাণুকে ভাঙতে এবং গড়তে যখন সক্ষম, তখন পরমাণুকে ভেঙে তার মধ্যে বদ্ধ অপরিমেয় শক্তিকে মুক্ত করা তাঁদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব বা অবাস্তব হবে না এবং এই অমিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিধ্বংসী বিস্ফোরণও ঘটানো যেতে পারে। জোলিওর এই ভবিষ্যতবাণীও উপেক্ষিত হলো। নিউট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রনের প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বিজ্ঞানীদের লেগে গেল আরও আটটি বছর, অতিবাহিত হলো ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সাল। নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পর পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন অভিঘাতের ফলাফল সম্পর্কে গবেষণা শুরু হলো কেম্ব্রিজ, প্যারিস, রোম, জুরিখ, কোপেনহেগেন, বার্লিনের বিভিন্ন গবেষণাগারে। জানা গেল নিউট্রন পরমাণু যখন ভাঙে, মৌলের মৌলান্তর যখন ঘটে, তখন ছাড়া পায় অপরিমেয় শক্তি। পারমাণবিক শক্তির এই বন্ধন-মুক্তিটা ঘটে জড় ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সংক্রান্ত আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ অনুসারে। ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও কুরী আর তাঁর স্ত্রী আইরিন কুরী দেখালেন যে অ্যালুমিনিয়ম ও অন্যান্য মৌলিক ধাতুর পরমাণুর কেন্দ্রে দ্রুতগামী নিউট্রনের অভিঘাত ঘটলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার উদ্ভব হয়। ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরা দেখালেন, পরমাণু-কেন্দ্রের সঙ্গে অভিঘাত ঘটানোর আগে জল বা প্যারাফিনের মধ্যে চালিত করে দ্রুতগামী নিউট্রনদের যদি শ্লথগতি করে দেওয়া যায় তাহলে এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় শতগুণে। তাঁদের পরীক্ষায় আরও জানা গেল যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে এই ধরনের শ্লথগতি নিউট্রনদের অভিঘাত ঘটলে বাহ্যত একটি, সম্ভবত কয়েকটি, নূতন মৌলের সৃষ্টি হয়। গবেষণাগারে এই নবজাত মৌলগুলির নামকরণ হলো ইউরেনিয়াম-অন্তিক অর্থাৎ ট্রান্স-ইউরেনিক মৌল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাহ্যত (apparently), সম্ভবত-র (probably) কোনো স্থান থাকতে পারে না। জার্মানির ফাইবুর্গে (Frieburg) গবেষণারত জার্মান বিজ্ঞানী ওয়ালটার নোডাক (Walter Noddack) আর তাঁর স্ত্রী আইডা (Ida) নোডাক তাই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিলেন, মোটেই ট্রান্স ইউরেনিক নয়, এগুলি পূর্ব পরিচিত কতকগুলি মৌলের রস-যমজ অর্থাৎ আইসোটোপ। নোডাক দম্পতির সিদ্ধান্ত হলো শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম

পরমাণুর দ্বিভাজন ঘটার ফলে এই মৌলগুলির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিক দম্পতির সিদ্ধান্ত ফার্মি, হান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ধর্তব্যের মধ্যে আনলেনই না, কারণ তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ছিল পারমাণবিক রূপান্তর সম্পর্কিত প্রচলিত সনাতন সিদ্ধান্তের বিরোধী। নোডাক দম্পতির সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি পেল না তেমনি অন্যদিকে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে উপজাত ইউরেনিয়াম-অন্তিক মৌলগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাও থামল না। ফ্রান্সে জোলিও কুরী, আইরিন কুরী ও তাঁদের যুগোস্লাভ সহকর্মী সাভিচ (Savatich), জার্মানিতে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান, এফ্ ষ্ট্রাসমান (Strassman), এবং অটো হানের দীর্ঘকালের সহকর্মী অস্ট্রিয়ান মহিলা বিজ্ঞানী শ্রীযুক্তা লাইসে মাইট্নারের (Lise Meitner) গবেষণার ফলে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়ম পরমাণু থেকে উপজাত ফার্মি-আবিষ্কৃত তথাকথিত ইউরেনিয়াম অন্তিক মৌলটি হলো বেরিয়ামের একটি রসজমজ অর্থাৎ আইসোটোপ। বিজ্ঞানীদের কাছে এই আবিষ্কার অত্যন্ত অভিনব ঠেকল। কারণ বেরিয়াম, যার পারমাণবিক ভার হলো ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভারের প্রায় অর্ধেক, ইউরেনিয়াম থেকে তার উদ্ভব হতে পারে কি ভাবে? অটো হান (Otto Hahn) ১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর এই অভিনব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। জার্মানিতে হানের গবেষণা নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নে ঘটেনি। ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি হিটলারী জাতি-বিদ্বেষের কবলে পড়ে মাইটনার জার্মানি ছাড়তে বাধ্য হলেন। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং হিটলারের কাছে ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক এবং হান আবেদন জানালেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। আর্য জার্মানিতে অনার্য মাইটনারের ঠাঁই নেই। হান ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করলেন না। শুধুমাত্র মাইটনারের ওপর তাঁর অসীম আস্থা আছে, তিনি যে জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী পরোক্ষে একথা প্রমাণ করার জন্যই ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে উপজাত বেরিয়াম আইসোটোপ সংক্রান্ত নূতন তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পাঠাবার পর হান সেগুলিকে মাইটনারের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে সর্বপ্রথম পাঠিয়ে মাইটনারের মতামত জানতে চাইলেন। মাইটনার তখন আশ্রয় নিয়েছেন সুইডেনে. খ্রীষ্টমাস কাটানোর জন্য আছেন সমুদ্রতীরবর্তী একটি ছোট্ট শহর কুনগেলভে (Kungelv)। মাইটনার যখন হানের চিঠি পান তখন তাঁর কাছে

ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আধুনিক কালের প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী অটো রবার্ট ফ্রিশ (Otto Robert Frisch)। হানের চিঠি পাওয়ার পর মাইটনার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কারণ কয়েক মাস আগে তিনিই তো হানের সহযোগিতায় এই গবেষণা শুরু করেছিলেন। এরপর ফ্রিশ আর মাইটনারের মধ্যে কদিন ধরে চলল হানের গবেষণার তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ, খ্রীষ্টমাসের সমস্ত ছুটিটাই মাটি হলো। ফ্রিশের সহযোগিতায় মাইটনার সিদ্ধান্ত করলেন যে একবিন্দু জল ক্রমশ বড় হতে হতে যেমন সমান দুভাগে ভেঙে যায়, নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেমিয়াম পরমাণুও অনেকটা সেই ভাবে প্রায় সমান দুটি ভাগে ভাঙে। ফ্রিশ সে সময়ে কোপেনহেগেনে নীল বোরের গবেষণাগারে গবেষণা করছিলেন। সুইডেন থেকে কোপেনহেগেনে ফিরে এসে যান্ত্রিক নীরিক্ষার সাহায্যে ফ্রিশ মাইটনারের তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করলেন। ফ্রিশ-মাইটনারের সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সৃষ্টি হলো অভাবনীয় চাঞ্চল্য। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারগুলি থেকে জানা গেল শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন সম্পর্কিত আরও কয়েকটি নূতন তথ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় যার ফলাফল হলো সুদূরপ্রসারী। ইতালির শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি তখন সপরিবারে ইতালি ত্যাগ করে আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন, ব্রিটেন প্রবাসী হাঙ্গেরীয় পদার্থবিজ্ঞানী লিও জিলার্ডও (Leo Dzilard) ব্রিটেন থেকে আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়। ফ্রান্স থেকে জোলিও কুরী আর তাঁর সহকর্মীরা, আমেরিকা থেকে অ্যাণ্ডারসন, ফার্মি, জিলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের স্বরূপ নির্ণয় করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁদের পরীক্ষায় জানা গেল, একটি শ্লথগতি নিউট্রনের অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন যখন ঘটে তখন ইউরেনিয়াম সামান্য পরিমাণ বস্তুসম্ভার অর্থাৎ ভর (mass) আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ অনুসারে রূপান্তরিত হয় তেজে (energy) এবং উদ্ভব হয় অত্যন্ত দ্রুতগতি আরও কয়েকটি নিউট্রনের। এই বাড়তি দ্রুতগতি নিউট্রনগুলির প্রত্যেকটিকেই যদি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের কাজে লাগানো যায় তাহলে ত্বরিৎ-গতিতে নিমেষের মধ্যে ঘটানো যায় এমন একটি শৃঙ্খল-বিক্রিয়া (chain reaction) যার পরিসমাপ্তি হবে কল্পনাতীত চাপ ও তাপজনক কয়েক লক্ষ টন ডিনামাইটের সমতুল্য বিস্ফোরণে। খনিজ ইউরেনিয়ামের তিন রকমের রসযমজ অর্থাৎ আইসোটোপ পাওয়া যায়।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিদ্যুৎভার হলো বিরানব্বুই। ইউরেনিয়ামের এই তিনটি আইসোটোপেরই বিদ্যুৎভার সমান অর্থাৎ বিরানব্বুই; আর এই বিদ্যুৎভার এক হওয়ার জন্যই তাদের রাসায়নিক গুণধর্মের মৌলিকত্বে কোনও তফাৎ নেই অর্থাৎ তারা পরস্পরের রসযমজ হয়েছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পারমাণবিক ওজনে। তাদের পারমাণবিক ভার অর্থাৎ ওজন যথাক্রমে হলো ২৩৮, ২৩৫ এবং ২৩৪। খনিজ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের শতকরা ৯৯·২৮২ ভাগই হলো ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম, বাকিটুকুর মধ্যে শতকরা ০·৭১২ ভাগ পরিমাণে পাওয়া যায় ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম। খনিজ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামে ২৩৪ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়ামের প্রাচুর্য আরও কম, শতকরা ০·০০৬ ভাগ মাত্র। বিজ্ঞানী নাইয়ার (A. O. Nier) ইউরেনিয়ামের এই তিনটি আইসোটোপকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে দেখালেন যে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে প্রায় সমান দুই ভাগে ভাঙে কেবলমাত্র ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম পরমাণু এবং ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ নিউট্রনটিকে আত্মসাৎ করে ধাপে ধাপে মৌলান্তরিত হয়ে পরিণত হয় যথার্থ ট্রান্স-ইউরেনিক মৌল প্লুটনিয়ামে। প্লুটনিয়ামের পারমাণবিক ওজন হল ২৩৯ কিন্তু তার পারমাণবিক বিদ্যুৎভার হল ৯৪। ২৩৯ পারমাণবিক ওজনের প্লুটোনিয়াম ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের মতোই ভঙ্গপ্রবণ। শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাতীয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণশীল ত্বরিৎ-গতি শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সৃষ্টির তত্ত্বীয় দিকটি জোলিও কুরী সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালে এবং এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়াকে আয়ত্তে রেখে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন তিনিই। হিটলার কবলিত জার্মানিতে হাউটারমানস হাইসেনবার্গ (Hissenberg), উৎস্যাকার (Weiszacker), অটো হান প্রমুখ যে সমস্ত তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছেও নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের কথা এবং ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন থেকে উদ্ভূত শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার তত্ত্ব অজানা ছিল না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও ১৯৪০ সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদানপ্রদান চলেছিল প্রকাশ্যে এবং অবাধে। তখনও পর্যন্ত অবাধে

এবং প্রকাশ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদানপ্রদানের নীতিতে গোষ্ঠীগতভাবে বিজ্ঞানীদের প্রগাঢ় আস্থা, অটল বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁদের নিব্যূঢ় নিস্পৃহতা বিন্দুমাত্র কমে নি। নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনজাত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা প্রথম চিন্তা করেন আমেরিকা প্রবাসী হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী লিও জিলার্ড এবং এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে জিলার্ড স্বভাবতই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর এই আতঙ্কের মূলে ছিল তাঁর কৈশোরকালে হাঙ্গেরিতে বেলা কুন (Bela Kun) ও হোর্থির এবং জার্মানিতে হিটলারের অমানুষিক অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন। হিটলার কবলিত জার্মানির তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রনায়কদের হুকুমে সামরিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যে, কর্মপ্রচেষ্টায়, প্রযুক্তিগত দুরূহ বাধা জটিলতা অতিক্রম করে ত্বরিৎ-গতি-শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তিকে পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনের কাজে যাতে লাগাতে না পারেন আর এই কাজে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি হিটলার-বিরোধী রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলির সাহায্য শত্রুপক্ষীয় জার্মান বিজ্ঞানীরা যাতে না পান সেই উদ্দেশ্যে জিলার্ড প্রথমেই মিত্রশক্তির বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি-সম্পর্কিত তাঁদের গবেষণাগুলি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। লিও জিলার্ড একদিকে যেমন এই আন্দোলন শুরু করলেন অন্যদিকে তেমনি আমেরিকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন। জিলার্ড মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন শত্রুপক্ষীয় জার্মান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির সামরিকীকরণের কাজে প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করে মিত্রপক্ষীয় বিজ্ঞানীদের চেয়ে ইতিমধ্যেই অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন। কাজেই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে জিলার্ড পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদের সচেতন করার অভিপ্রায়ে আইনস্টাইনকে মুখপাত্র করে এক আবেদনপত্র সরাসরি পৌঁছে দিলেন আমেরিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে। আগস্টের গোড়ার দিকে জিলার্ড রচিত, আইনস্টাইন স্বাক্ষরিত এই আবেদনপত্র রুজভেল্টের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতি-বিশারদ ব্যাঙ্কমালিক আলেকজাণ্ডার স্যাকস (Alexander Sachs) মারফৎ

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের হস্তগত হলো ১৯৩৯ সালের ১১ই অক্টোবর। বিশ্বযুদ্ধের আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুতগতিতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাত পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত তত্ত্বীয় গবেষণাকে ত্বরান্বিত করার এবং পারমাণবিক কাজে কৃৎকৌশলগত যে সমস্ত জটিলতম এবং দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার সমাধানের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং অসংখ্য তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানী, যন্ত্রকুশলীদের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন আর এই প্রয়োজন সাধিত হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যে ও কর্মোদ্যমেই—একথাও জিলার্ড তাঁর আবেদনপত্রে রুজভেল্টকে জানিয়েছিলেন। এই কর্মপ্রচেষ্টায় জিলার্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আমেরিকার দুজন উদ্বাস্তু নাগরিক, (পোলিশ ?) বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার (Eugene Wigner) ও এবং হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী, অদূর ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের প্রধান উদ্যোক্তা, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উগ্র সমর্থক তীক্ষ্ণধী এডওয়ার্ড টেলার। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক লালফিতায় জিলার্ডের আশা সফল হতে লাগল প্রায় আরও দু-বছর। ১৯৪০ সালের ৭ই মার্চের এক চিঠিতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন সম্পর্কে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে দ্বিতীয়বার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও, ১৯৪১ সালের জুলাই মাস নাগাদ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমেরিকান সরকারকে পারমাণবিক বোমা তৈরির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দেবার পরও এসম্পর্কে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা শুরু হলো না। অবশেষে ১৯৪১ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে পারমাণবিক শক্তির সামরিকীকরণে জিলার্ড প্রার্থিত বিপুল অর্থ এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। সূত্রপাত হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় ভবিষ্যতের, পারমাণবিক যুগের।

জিলার্ড-আইনস্টাইন আবেদনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক এই পটভূমি থেকেই, আমেরিকার উদ্বাস্তু নাগরিক, জুরিখের একটি খ্যাতনামা পত্রিকার সাংবাদিক, রবার্ট য়ুঙ্ক (Robert Jungk) তাঁর 'সহস্র সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল' (*Brighter than Thousand Suns*) বইটি আরম্ভ করেছেন, শেষ করেছেন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের (atomic weapons) সম্ভাব্য ধ্বংসকারী ক্ষমতার পরিমাণ, পারমাণবিক শক্তির অসামরিক প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিপদাপদ, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা,

রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক দায়দায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উদ্যোগে যথাক্রমে ১৯৫৬ সালের জুলাই, ১৯৫৭ সালের এপ্রিল এবং ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তিনটি 'পাগওয়াস' (Pugwash) সম্মেলনের বিবরণ দিয়ে। বইটিতে পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত হয়েছে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ অসামরিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে ডেনমার্কের বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নীল বোরের স্মারকলিপিটি এবং ১৯৪৫ সালের জুন মাসে আমেরিকার তৎকালীন সমরসচিবের কাছে নিবেদিত জেমস্ ফ্রাঙ্ক (James Franck) রচিত এবং জেমস ফ্রাঙ্ক, লিও জিলার্ড প্রমুখ ছয় জন প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত পারমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-শান্তির অজুহাতে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ না করেন, তার সপক্ষে যুক্তি-সম্বলিত বিবরণটি।

রবার্ট য়ুঙ্কের জন্মভূমি হলো জার্মানি, তাঁর বৃত্তি সাংবাদিকতা। চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী এবং শান্তিবাদী। তিনি ইহুদি এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই অপরাধে নাৎসি সরকার তাঁর জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে ১৯৩৩ সালে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। নাৎসি উৎপীড়নের যাবতীয় দুর্ভোগ তিনি ভুগেছেন। য়ুঙ্কের আলোচ্য বইটিকে এককথায় বিজ্ঞানীদের মানবিক (moral) এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বলা যায়। এই ইতিহাস রচনায় য়ুঙ্কের মুন্সিয়ানা অদ্ভুত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আধুনিক কালের যে সমস্ত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের এবং সরকারী বেসরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে য়ুঙ্কের বইটি লেখা হয়েছে। জাপান এবং জার্মানির প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্যও এর মধ্যে বাদ পড়েনি। কিন্তু একমাত্র পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইনফেল্ড (Infeld) ছাড়া অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্য সম্পর্কে য়ুঙ্ক নীরব। ১৯১৮ থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরবর্তীকালে কেম্ব্রিজ, মিউনিখ, কোপেনহেগেন, গটিংজেনে

(Gottingen) বহির্জগতের যুদ্ধোত্তরকালীন রাষ্ট্রনৈতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে রাদারফোর্ড, আরনল্ড সমারফেল্ড (Arnold Sommerfeld), নীল বোর (Niels Bohr) ম্যাকস বোর্ন (Max Born), জেমস ফ্র্যাঙ্ক (James Frank), ডেভিড হিলবার্ট (David Hilbert) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত প্রবীণ পদার্থবিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের সহকর্মী তরুণ গবেষক-মণ্ডলীর সহায়তায় নিত্য নূতন আবিষ্কারের উন্মাদনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার গজদন্ত মিনারে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করতেন; আইনস্টাইন, ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক, কুরী দম্পতি, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে পদার্থের গঠন, জড়ের স্বরূপ, পরমাণুর সংযুতি সংক্রান্ত সনাতনী ধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে, তার মানবীয় দিকটি লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের গবেষণার প্রযুক্তিগত প্রয়োগ ভবিষ্যতের রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে অচিন্ত্যনীয় সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, আগামী দিনে তাঁদের গবেষণাগারগুলিই সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপের পীঠস্থানে পরিণত হবে একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। সে সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির চতুঃসীমায় রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক রীতিতে নিষিদ্ধ ছিল। কোনো বিজ্ঞানী, তা তিনি যতই বিশ্ববিখ্যাত হোন না কেন, এই রীতিভঙ্গ দোষে দোষী হলে তাঁর অপাংক্তেয়তা ছিল অনিবার্য। এর পর য়ুঙ্ক এঁকেছেন গটিংজেনে, তখনকার দিনের অখ্যাত বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত ওপেনহাইমার, জিলার্ড, টেলার, উইৎস্যাকার হাউটারম্যানস, হাইসেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ছাত্রজীবনের ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের সেই আনন্দমুখর, হাস্যোজ্জ্বল দিনগুলির চিত্র। কিন্তু গটিংজেনের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, মধ্যযুগীয় নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা রাজনীতির দাবদাহ থেকে বিজ্ঞানীদের বাঁচাতে পারল না। হিটলারশাহী-জাতিবিদ্বেষের বলি হতে শুরু করলেন আইনস্টাইন, ফ্রাঙ্ক প্রমুখ খ্যাতকীর্তি জার্মান্ বিজ্ঞানীরা। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সৌভ্রাত্রের মূলে কুঠারাঘাত আরম্ভ হলো; রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতে জাতি, ধর্ম, দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে অবাধে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদানের আবহাওয়ায় ১৯৩২ সালে প্রথম সূচিত হলো সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মেঘসঞ্চার। বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির সংঘর্ষ বর্ণনা প্রসঙ্গে য়ুঙ্ক স্তালিনের আমলে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ ও পদার্থতত্ত্ববিদ্ ল্যাণ্ডো (L. Landau),

জারোস্লাভ ফ্রেকনেল (Garoslav Freknel), পিটার ক্যাপিৎজা, জর্জ গ্যামো, ভাভিলভ প্রমুখ বিশিষ্ট রাশিয়ান বিজ্ঞানী এবং রাশিয়ার আশ্রয়প্রার্থী অন্যতম খ্যাতনামা অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফ্রিজ হাউটারম্যানসের ওপর সোভিয়েত রাষ্ট্রতন্ত্র-পরিচালকদের উৎকট নিপীড়নের কথাও পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে এবং সে-সম্পর্কে কটাক্ষ করতেও ভোলেন নি। বইটির অন্যত্র যেখানেই রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গ বা রাশিয়ায় বিজ্ঞানচর্চার কথা এসেছে সেইখানেই যুঙ্কের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা বিসর্জিত হয়েছে। হিটলার-শাহী জাতিবিদ্বেষ নিপীড়িত, মুক্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যুঙ্কের কাছে ফ্যাসিস্ত জার্মানি এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, হিটলার স্তালিন সমপর্যায়ভুক্ত, সমান কণ্ঠনিষ্পেষক। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাইসেনবার্গ, উইৎস্যাকার প্রমুখ যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা জার্মানিতে থেকে হিটলারের সামরিক উদ্যোগে বিনা প্রতিবাদে সাহায্য করেছিলেন যুঙ্কের ঐতিহাসিক সাফাই তাঁদের সপক্ষে গেছে। এ ধরনের ঐতিহাসিক বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে বলা যেতে পারে যুঙ্ক প্রশংসনীয়ভাবে তথ্যনিষ্ঠ। যন্ত্রানুরাগী, নিরালম্ব সত্যাশ্রয়ী বিজ্ঞানীদের মানবীয় দিকটি, তাঁদের ভাবনা-চিন্তার কথাগুলি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার কাজে যুঙ্ক সফল হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কালে হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর রাজনৈতিক কারণে পারমাণবিক বোমাবর্ষণ নিবারণে ব্যর্থকাম, হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের বিরোধিতায় বিফল, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে, বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আমেরিকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির কদর্যতায় পরমাণু বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্তির বিবরণ যুঙ্ক পরমাণু-বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের আপৎকালিন জরুরি কমিটির (Emergency Committee)র কাছে আমেরিকার উদ্বাস্তু-নাগরিক নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কের একটি উক্তিতে এই বিভ্রান্তির কারণ জানা যাবে। জেমস্ ফ্রাঙ্ক তাঁর উক্তিতে বলেছেন…"In general we [scientists] are cautious, and therefore tolerant and disinclined to accept total solutions. Our very objectivity prevents us from taking a strong stand in political differences in which the right is never on one side. So we took the easiest way out and hid in our ivory tower. We felt that neither the

good nor the evil applications were our responsibility." (পৃ ৪১) আমেরিকার আর একজন উদ্বাস্তু নাগরিক বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড্ টেলারের চিন্তা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। টেলারের নেতৃত্বে এবং পরিচালনাতেই আমেরিকায় হাইড্রোজন বোমা উদ্ভাবিত হয়েছে। টেলার মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হাইড্রোজেন বোমা অপরিহার্য। হাইড্রোজেন বোমার তল্পি বহনের জন্য টেলার বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও অপাংক্তেয়। হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন আমেরিকার আর একজন উদ্বাস্তু নাগরিক প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হান্স বেথে (Hans Bethe)। হাইড্রোজেন বোমার সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হান্স বেথের কাছে হলো মানবিকতার প্রশ্ন, ধর্মনীতির প্রশ্ন। ১৯৩২-৩৩ সালে রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষের সূত্রপাতের সমকালে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন সংক্রান্ত যুগান্তরকারী আবিষ্কারের মানবিক দিকটি য়ুঙ্ক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর য়ুঙ্ক সুদক্ষ কথাশিল্পীর নৈপুণ্যে রচনা করেছেন কিভাবে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের গোপন রিপোর্টে আস্থা স্থাপন করে জিলার্ড, ফার্মি টেলার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাঁদের এক সময়কার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হাউটার-ম্যানস্; উইৎস্যাকার, হাইসেনবার্গ প্রমুখ হিটলার-কবলিত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীদের শুভবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস হারালেন, কিভাবে হাইসেনবার্গ, হাউটার ম্যানস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা হিটলারের হুকুমে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছেন এবং আমেরিকার আগেই পারমাণবিক বোমার প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্ত করে জার্মানি আমেরিকার ওপর সেই বোমা বর্ষণ করবে এই সন্ত্রাসের অহেতুক তাড়নায় জিলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সহায়তায় মার্কিন সরকারকে উদ্বুদ্ধ করে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে লাগলেন; কিভাবে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর পরমাণু-বিজ্ঞানীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই বোমা ফেলা হলো হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর; কিভাবে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরপরাধী নিরীহ শিশু শ্রমিক নর-নারী হত্যা করে প্রতিষ্ঠিত হলো আধুনিক কালের পম্পেই—তার ইতিহাস। য়ুঙ্কের মতে উৎকট জাতি-বিদ্বেষের চণ্ডনীতির অংকুশাঘাতে যুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানি থেকে প্রথম শ্রেণীর তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিক এবং কৃৎকুশলী যন্ত্রবিদ বিতাড়ন-নির্বাসনের ফলে যুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জনবলের একান্ত অভাব, রাষ্ট্রীয় পোষকতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার

সামরিকীকরণে নাৎসি সরকারের শৈথিল্য অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য, পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবন ও তার সামরিক প্রয়োগের মতো জটিল কর্মকাণ্ডের উপযোগী যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জামের এবং পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সফলতা সম্পর্কে যুদ্ধরত জার্মানির বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের নেতিবাচক মনোভাব—এই চতুর্বিধ কারণের জন্যই মূলত যুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে জার্মানি পারে নি। হাইসেনবার্গ, উইৎস্যাকার, হান প্রমুখ খ্যাতকীর্তি জার্মান বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে নীরব এবং গোপন অসহযোগিতাকেও পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনে জার্মানির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যুঙ্ক বিশ্লেষণ করেছেন। জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জানা গেল পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমেরিকার চেয়ে জার্মানি অন্তত দু-বছর পিছিয়ে ছিল। এ সময়ে জাপানের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রযুক্তির কথা চিন্তা করাও ছিল সাধ্যাতীত, স্বপ্নাতীত। হিটলারের পতন এবং জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জার্মানির পক্ষ থেকে আমেরিকার ওপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা যখন আর রইল না তখন শান্তিকামী পরমাণু-বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক বোমার উৎপাদন, উদ্ভাবন বন্ধ করে দিতে চাইলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। তাঁদের যুক্তি হলো আমেরিকার ওপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণে একমাত্র সক্ষম প্রবলতম শত্রু জার্মানি আত্মসমর্পণের পর সামরিক প্রয়োজনে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাবার সপক্ষে রাজনৈতিক এবং মানবিক (moral) কোনও কারণই থাকতে পারে না। কাজেই ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি জে. জেফ্রিসের (Zay Jeffries) সভাপতিত্বে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের একটি সমিতি গঠিত হলো। এই কমিটি পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত যুগান্তরকারী নতুন আবিষ্কারগুলির ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিপদ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কয়েকটি বিবরণী রচনা করে ১৯৪৪ সালে ২৮শে ডিসেম্বর এই বিবরণীগুলি দাখিল করলেন মার্কিন পারমাণবিক সংস্থার তদানীন্তন সামরিক অধিকর্তা জেনারেল লেসলি রিচার্ড গ্রোভসের (Leslie Richard Groves) কাছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত এবং বিশ্বশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত বর্ষীয়ান পরমাণু-বিজ্ঞানী নীল বোরও এই সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং আবেদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে জার্মানির আত্মসমর্পণের

পর পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য বোরের এই চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্র-নৈতিক কারণে রুজভেল্ট এবং চার্চিল দুজনেই বোরের কথায় কোনও গুরুত্ব দিলেন না। পারমাণবিক যুগের প্রাক-অভ্যুদয়কালীন এই নূতন পরিস্থিতি বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সনাতনী মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকেও বিচলিত করল ভীষণভাবে, তাঁদের সামনে উপস্থিত হলো সনাতনী সেই জটিল প্রশ্ন—অতঃ কিম? পরমাণু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তি-গত কৃৎকৌশল উদ্ভাবনের পথে এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাটা হবে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের সনাতনী ইহনিষ্ঠায় অত্যন্ত অস্থির প্রজ্ঞার লক্ষণ। তাঁদের মতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন করে বিশ্ব-বাসীর কাছে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রযুক্তির মহাপ্রলয়ংকর ফলাফলের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যখন অন্য কোনো দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রশক্তি গোপনে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে এনে আঘাত হানবে তখন তাকে প্রতিরোধ করার কোনও উপায়ই থাকবে না। ভবিষ্যতে অন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে আনার এই নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার কৃৎকৌশলগত সাময়িক অগ্রসরতাকে কাজে লাগিয়ে তার সামরিক প্রয়োগের কার্যকরী পদ্ধতি আয়ত্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, নান্য পন্থাঃ। এ সময় পরমাণু বিজ্ঞানীদের এই যুক্তির প্রধান সমর্থক ছিলেন নীল বোর। জার্মানির আত্মসমর্পণের পর পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত গবেষণা চালিয়ে যাবার সমর্থনে আর একদল বিজ্ঞানী যুক্তি দিলেন পারমাণবিক গবেষণায় শক্তির যে নূতন উৎস আবিষ্কৃত এবং বিকশিত হয়েছে, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে তা একান্ত অপরিহার্য। ভবিষ্যতে এই শক্তিকে সামরিক প্রয়োজনে বা ধ্বংসসাধনের কাজে ব্যবহার না করে যাতে সৃজনের কাজে লাগানো হয় সে সম্পর্কে তাহলে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে জার্মানির আত্মসমর্পণের পরও পারমাণবিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই টেকে না। পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রথম পীঠস্থান শিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতুবিদ্যার গবেষণাগারের নিভৃত পরিবেশে যখন একদিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গোপনে এই ধরনের আত্মানুসন্ধান

মানবতার খাতিরে জিলার্ড-আইনস্টাইনের আবেদনের ভিত্তিতে জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেবার সাহস রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত নূতন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের হলো না। কারণ রাষ্ট্রনীতি অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ বিজ্ঞানীদের কথায় যে সমরায়োজনে মার্কিন করদাতাদের কুড়ি লক্ষ কোটি (দু বিলিয়ন) ডলার খরচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে তার বাস্তব ফলাফল না দেখে তাকে বাতিল করে দিলে অর্থ অপব্যয়ের অপবাদে যে রাষ্ট্রীয় সংকটের সৃষ্টি হবে তার ঝুঁকি নেবে কে? জিলার্ড-আইনস্টাইনের মানবিক আবেদন তাই ব্যর্থ হলো। ১৯৩৯ সালে জিলার্ড পারমাণবিক শক্তি-মত্ততায় জার্মানি অন্যান্য রাষ্ট্রে যে অত্যাচার যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন, জার্মানি আত্মসমর্পণের পর মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের গতিবিধিতে জিলার্ডের মনে ১৯৪৫ সালে দেখা দিল সেই একই আশঙ্কা। এরপর ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই আকাশচুম্বী লৌহমঞ্চের ওপর রেখে পারমাণবিক বোমার বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যখন লস আল-মোসের মরুপ্রান্তরে ঘটানো হলো তখন পারমাণবিক বিস্ফোরণের নিদারুণ প্রচণ্ডতায়, প্রলয়ংকর ভয়করতায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভয়ে হতচকিত হয়ে গিয়ে-ছিলেন। পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দর্শনে মার্কিন পারমাণবিক সংস্থার অসামরিক অধিকর্তা আঠারোটি ভাষাভিজ্ঞ তীক্ষ্ণধী খ্যাত-কীর্তি বিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমারের মনোভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে য়ুঙ্ক বলেছেন, এ সময়ে ওপেনহাইমারের মনে পড়েছিল অর্জুনের বিশ্বরূপ অবলোকনের কথা, বিশেষ করে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকটি যাতে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে বলছেন

দিবি সূর্য্য সহস্রভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সাদৃশী সা স্যাদ্ভাস্তস্য মহাত্মন॥

পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় মেঘের সেই বিরাট, সেই ভীষণ ধূম-কুণ্ডলী সহস্র সূর্যের দীপ্তি নিয়ে ধীরে ধীরে বহুদূরে যখন মিলিয়ে গেল তখন ওপেনহাইমার স্মরণ করলেন ঐ একই অধ্যায়ের আর একটি শ্লোকাংশ, যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষকে অনায়াসেই বলতে পারেন

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তাঃ

য়ুঙ্কের মতে জাপানের আত্মসমর্পণের পর পরমাণু-বিজ্ঞানীরা ন্যায়সংগতভাবেই আশা করেছিলেন পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে যুদ্ধকালীন সামরিক

গোপনীয়তার নির্মম বিধিনিষেধের অবসান ঘটবে, পারমাণবিক কারানগরী থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন এবং তাঁদের যুদ্ধ পূর্বকালীন অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা পূর্ণ হলো না। যুদ্ধের পরে তাঁরা দেখলেন, সামরিক বিধিনিষেধের কঠোরতা বিন্দুমাত্র তো কমলই না, অধিকন্তু সামরিক বিভাগ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের আদেশে তাঁদের গতিবিধি কথালাপের গোপন ছায়ানুসরণের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে গেল। সংস্থার সামরিক অধিকর্তা জেনারেল গ্রোভস তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছেন সাধারণ মৃত্যুযন্ত্রণার তুলনায় পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার বিষ-বিকীরণ জনিত মৃত্যুযন্ত্রণা অধিকতর আরামপ্রদ—সমর-দপ্তরের এই সীমাহীন হৃদয়হীনতায় পরমাণু বিজ্ঞানীরা পৌছলেন তাঁদের সহ্যের শেষসীমায়। এর পর ১৯৪৫ সালের শরতকালে মার্কিন সমরদপ্তর গ্রোভসের গোপন প্রচেষ্টায় আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য অ্যানড্রু মে (Andrew may) এবং সিনেটের সদস্য এডুইন জনসন (Edwin Johnson) এবং জেনারেল গ্রোভসের সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারমাণবিক গবেষণা সমরদপ্তরের নিব্যূঢ় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উদ্দেশ্যে একটি বিল রচিত হলো এবং যথারীতি প্রচার না করেই সকলের অলক্ষ্যে মে-জনসন রচিত এই বিলটি সমর দপ্তরের কর্তারা যখন বিধিবদ্ধ করাবার চেষ্টা শুরু করলেন তখন সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে উটের পিঠে শেষ কুটোটির মতোই হলো। বিজ্ঞানীরা এই বিলের বিরুদ্ধে সমরদপ্তরের কবল থেকে পারমাণবিক গবেষণাকে উদ্ধার করে অসামরিক কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন—বিজ্ঞানের সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে শুরু হলো বিজ্ঞানীদের ধর্মযুদ্ধ। সেই ধর্মযুদ্ধ আজও চলেছে। ১৯৫৭ সালের ১২ই এপ্রিল ম্যাকস বোর্ন (Max Born), অটো হান, উইৎস্যাকার প্রমুখ আঠারোজন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী যৌথ-ভাবে স্বাক্ষরিত প্রকাশ্য এক বিবৃতির মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে একযোগে ঘোষণা করেছেন যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন, উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং পরীক্ষণের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের কোনো ক্রমেই জড়িত করবেন না বা তার লেশমাত্র সংস্পর্শে আসবেন না। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের এই ধর্মযুদ্ধ আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এই ধর্মযুদ্ধে অংশীদার হয়েছেন সারা বিশ্বের অগণিত শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ।

সংস্কৃতিসেবীদের উদ্দেশে

মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আবেদন

আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি আমাদের পূর্বপুরুষদের শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফল। এই সংস্কৃতিতে সকল মানুষের সমান অধিকার। এই সংস্কৃতি সকল মানুষের ঐশ্বর্য। প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি আছে যা নিয়ে তার বিশেষ গর্ব। জাতীয় সংস্কৃতি সাধারণ সংস্কৃতিরই বিশেষ এক-একটি অঙ্গ। আমরা এই সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক। এই সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ আমাদের ওপরেই ন্যস্ত।

কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী অবিশ্বাস ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত। আমাদের এই পৃথিবীতে যুদ্ধের ছায়া। এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সম্পদ ও মেধার অর্থহীন অপচয় চলেছে, যার ফলে আমাদের এই সংস্কৃতি খুবই বিপন্ন।

চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, আক্রমণের মনোভাব ও মানবজাতির প্রতি অবজ্ঞা ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় প্রকট হচ্ছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে মানুষকে সামিল করা হচ্ছে আরো বেশি বেশি সংখ্যায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রচারযন্ত্র দিশেহারার মতো জাগিয়ে তুলছে যুদ্ধ উন্মাদনা। তরুণদের একাংশের সামনে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তারা অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে তাদের মধ্যে বিপথগামীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

যে অর্থে বিদ্যালয় নির্মিত হতে পারত তা ব্যয়িত হচ্ছে অস্ত্রসজ্জায়। যে সেলুলোজে বিদ্যার্থীর কাগজ তৈরি হতে পারত তা ব্যবহৃত হচ্ছে বিস্ফোরকে। আধুনিক টেক্নোলজির কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যে আশ্চর্য ব্যবস্থা আমাদের আয়ত্তাধীন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে—জ্ঞানের প্রসারের জন্যে নয়, জাতিতে জাতিতে ঐক্যসাধনের জন্যে নয়—ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাসকে আরো ব্যাপক করে তোলবার জন্যে। মানুষের মনকে বিকৃত করে তোলা হচ্ছে জাতিবিদ্বেষ ও ঔপনিবেশিক মূঢ়তায়।

এই অবস্থা সমগ্র মানবজাতিকেই দরিদ্র করে তুলেছে। এই অবস্থা মানুষের ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও শিল্পীগণ, মানবিক সংস্কৃতির ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক্ষেত্রে আপনাদের বিচরণ। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি, বর্বরতার দিকে এই অবনমনকে, মানুষের ইতিহাসের এই অভাবিতপূর্ব বিপর্যয়কে আপনারা প্রতিরোধ করুন। উপনিবেশবাদ ও জাতিবিদ্বেষের আবর্তে মানুষের অধঃপতন এই মুহূর্তেই বন্ধ হোক। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই অবশ্যই গর্ববোধ থাকবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে অপরের সৃষ্টি সম্পর্কে থাকবে উদ্ধত ও অন্ধ ঘৃণা। না মানুষে মানুষে, না জাতিতে জাতিতে, না জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে।

অজ্ঞতাপ্রসূত এই ঘৃণাকে আমাদের অবশ্যই দূর করতে হবে। বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে ও বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যাতে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় সে-চেষ্টাও করতে হবে আমাদের। তাহলেই আমরা যুদ্ধোন্মাদনা প্রসূত ধ্যানধারণাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারব। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আলাপ-আলোচনার। আমরা সমর্থন করব সেই সমস্ত সংগঠন বা ক্রিয়াকলাপকে যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা আরো বিশেষ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মহাদেশের মধ্যে পারিস্পরিক আদানপ্রদানকে প্রসারিত করবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি কাজ করা যেতে পারে। যেমন, ছাত্র বিনিময়, খেলাধুলার আসর, তরুণদের জন্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা, একই ধরনের পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত যৌথ শহর (প্রত্যেক নগরেই যা গড়ে ওঠা উচিত), অনুবাদ, চলচ্চিত্র এবং রেডিও ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম বিনিময়, প্রদর্শনী, জলসা ও সাংস্কৃতিক বৈঠক, ইত্যাদি। এ-ধরনের ক্রিয়াকলাপ যত সূক্ষ্মই হোক একটি সূত্র গড়ে তোলে এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধনকে দৃঢ় করে, যা একদিন সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে। আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দিকে। তাদের জন্যে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানবিক সৌভ্রাত্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে তারা বড় হয়ে ওঠে।

আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হব। আমাদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলব। যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি তাকে আমরা অটুট রাখব, অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলব। আর এই উত্তরাধিকারকেই আমরা তুলে দেব আমাদের পরবর্তীদের হাতে, যাঁদের জন্যে আমরা বেঁচে আছি।

আমরা তাদের কাছে তুলে ধরব শান্তি-সংগ্রামের শহীদ জোরে-র উক্তি : মানুষকে যত রকমের লড়াই করতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও মহৎ হচ্ছে শান্তির জন্যে সংগ্রাম।

পরিচয়

কার্তিক, ১৩৬১
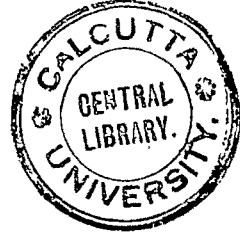
সম্পাদকীয়

ভারতের উত্তর সীমান্তে বান্দুং সম্মেলনের মহৎ অঙ্গীকার সমাধিস্থ হয়েছে। চীনা বাহিনীর আক্রমণে ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা আজ বিপন্ন। বলপ্রয়োগে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের এই নীতিবিগর্হিত প্রচেষ্টাকে আমরা তীব্রতম ভাষায় নিন্দা করি।

এতদিন আমরা বিশ্বাস করে এসেছিলাম যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানাকে কোনো যুক্তিতেই লঙ্ঘন করা চলে না। আজ যখন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটি টলে উঠেছে তখন বিশ্বাসের বদলে ঘৃণা নিয়ে আমরা ঘোষণা করছি, এই সর্বনাশের মূলকে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে পরাভূত করব। যে উদার গণতন্ত্র রূপায়নের জন্যে আমাদের দেশের জনসাধারণ আত্মত্যাগ করেছেন, যে সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে তাঁদের প্রয়াস, যে জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁদের একান্ত সমর্থন—তাকে আমরা জীবনের চেয়েও বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছি। আজ জীবন দিয়েই সেই মূল্যকে বাঁচাতে আমরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জাতির এই সংকট-মুহূর্তে ঐক্যের আবেদন জানিয়েছেন। দেশের জনসাধারণেরও সেই দাবি। আমরাও সারা দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আহ্বানে আমাদের সমর্থন ও শপথ যুক্ত করছি। আমাদের উৎসাহ ও আমাদের সামর্থ্য দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করব।

আমরা আনন্দিত, বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। চারটি স্বতন্ত্র বিবৃতিতে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী দেশরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আমাদের আবেদন, তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হোন, দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করুন, ঐক্যবদ্ধ করুন।

ঐক্যের জন্যে সংগ্রাম, ঐক্যবিরোধী প্রয়াসের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম। আমরা লক্ষ্য করছি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের দুই শিবিরে বিভক্ত করার,

দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার এক সর্বনাশা চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলব। জাতীয় সংকটের দিনে যারা দেশবাসীকে বিভক্ত করে—সচেতনা সেই দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটকে যারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে—সচেতনা সেই সুযোগ-সন্ধানীদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটকে যারা প্রতিহিংসা চরিতার্থের হাতিয়ার করে—সচেতনতা সেই কাপুরুষদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটের সুযোগ নিয়ে যারা শতাব্দীব্যাপী সাধনার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পদদলিত করতে চায়—সচেতনতা সেই মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। আমাদের উদ্দীপিত চেতনার আগুনে মহৎ-শুদ্ধতার জন্ম হোক।

আমরা এ-যুদ্ধ চাই নি। আমরা ভারতবাসী শান্তিপ্রিয়, দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনে বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে রত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ-যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ বন্ধ করেন নি। তাঁরা বলেছেন, চীনারা ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সীমারেখায় ফিরে গেলে যুদ্ধ-বিরতি হতে পারে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত-সমস্যার সমাধানের প্রয়াস করা যেতে পারে। আমরা মনে করি, এ প্রস্তাব অতি যুক্তিপূর্ণ। সম্মানজনক শর্তে সীমান্ত-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান আমাদেরও কাম্য। নইলে অবশ্যই দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্যে আমরা প্রস্তুত।

পরিচয়
বর্ষ ৩২ । সংখ্যা ৪

আর্য ও অনার্য

নৃপেন গোস্বামী

মৃত্যুর প্রাক্‌কালে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ অল্‌টেকার হরপ্পা-আর্য সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করেছিলেন কয়েকটি মন্তব্যের ভিতর দিয়ে। তাঁর মতে আর্যেরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখনও হরপ্পা সভ্যতার বাতিটি জ্বলছে, কয়েক শতাব্দী ধরে হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করেছে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, এই সময়টা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত পাঁচ শত বৎসর। হরপ্পাবাসীরা অসামরিক জনগোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হতে পারে না, তাদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের শক্তি-পরীক্ষা হয়েছে অনেকবার এবং উভয়ের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের বিনিময় হয়েছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত পণিরাই হচ্ছে হরপ্পাবাসী, তারা ছিল দক্ষ ব্যবসায়ী, অযাজক ও দেবতাবিহীন। তাদের কিছু অংশ ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এরূপ আভাস পাওয়া যায় কোনো কোনো ঋক্‌মন্ত্রে।

পণি ও হরপ্পাবাসীর সমীকরণ সম্ভাব্য প্রকল্পমাত্র। ঋক্‌মন্ত্রের হরিযূপীয়ার সঙ্গে হরপ্পার সম্পর্কও কখনও কখনও অনুমিত হয়েছে।

পিগট বলেছেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর অধিবাসীরাই দাস বা দস্যুরূপে ঋগ্বেদে বিশেষিত হয়েছেন। এঁদের একাংশ ছিলেন কৃষ্ণকায় চেপ্টানাসা আদি-অস্ট্রেলীয় নৃবংশ-ভুক্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যুকে দ্রাবিড়দের সঙ্গে সংযুক্ত করবার পক্ষপাতী। ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গতি রক্ষা হয়, যদি সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড়-রূপে প্রতিপন্ন হতে পারেন। দ্রাবিড়েরা এককালে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এরূপ অনুমানের পক্ষে

বেলুচীস্তানের দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুইদের নিদর্শনটি অনেক সময়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে একটি পুরাতাত্ত্বিক আলেখ্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। তা হচ্ছে এই যে সিন্ধুতীরবাসীরা ও দ্রাবিড় অভিন্ন গোষ্ঠী, তারাই আবার ঋগ্বেদোক্ত দাস ও দস্যু, তাদের সঙ্গেই আর্যদের প্রাথমিক সামরিক বোঝাপড়া, সমঝোতা, ও সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়েছিল। আর্য ও অনার্যের প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার লাভ করে হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা ও ঋগ্বেদ-রচয়িতাদের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ইতিকাহিনী।

হাটন (J. H. Hutton) দ্রাবিড় ভাষাভাষীকে সংযুক্ত করেছেন ভূমধ্য (Mediterranean) নৃবংশের সঙ্গে। কিন্তু ইদানীং শশাঙ্কশেখর সরকার দ্রাবিড়দের মধ্যে বেদ্দিদ দীর্ঘমুণ্ডীয় প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মতে বেদ্দিদরাই নাকি ভারতের প্রকৃত আদিবাসী। আদি-অস্ট্রেলীয় ও বেদ্দিদের মধ্যে নৃবংশীয় সাদৃশ্যও রয়েছে। আদি-অস্ট্রেলীয়ের সঙ্গেও দ্রাবিড়ের সন্নিবেশ অনেকের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। দ্রাবিড়ের নৃবংশীয় সনাক্তকরণ এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এদিকে আবার সিন্ধু উপত্যকার নৃবংশীয় উপকরণে অস্ট্রেলীয়, ভূমধ্য বংশীয় ও অ্যাল্পাইন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে। সুতরাং কোনো একটি নৃবংশীয় ধারার সহিত সিন্ধু সভ্যতাকে যুক্ত করার যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং দ্রাবিড়কে সিন্ধু উপত্যকায় টেনে আনাও দুঃসাহসিক কল্পনামাত্র।

সমীকরণ

সংস্কৃত সাহিত্যে আর্য, ব্রাত্য, দ্রাবিড়, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি গোষ্ঠী-নাম দৃষ্ট হয়। এই নামগুলির নৃবংশীয় সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

অনেকেই বলেন যে আর্য শব্দের কোনো নৃবংশীয় দ্যোতনা ছিল না, আর্য কোনো জাতি নয়, পরন্তু একটি ভাষাভাষী বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আর্যদের ভিতরে কোথাও কোথাও দীর্ঘমুণ্ডী নর্ডিক বৈশিষ্ট্য এবং কোনো কোনো অঞ্চলে গোলমুণ্ডী অ্যাল্পাইন বিশেষত্ব অনুমিত হয়েছে। ক্রোয়েবার ককেশীয় নৃবংশের ধারায় নর্ডিক, অ্যাল্পাইন ও হিন্দু এই তিন উপধারাকে পৃথক-রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফন এইক্স্টেড (Von Eickstedt) উত্তর ভারতীয় নৃবংশীয় বৈশিষ্ট্যকে ইণ্ডিড আখ্যা দিয়েছেন। হুটন (E. A. Hooton) উত্তর ভারতের নৃবংশীয় প্রবণতাকে ইন্দো-নর্ডিকরূপে বর্ণনা করেছেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালী, গুজরাটি, আইরিশ ও ফরাসীকে অ্যালপাইন ধারায় স্থাপন করবার পক্ষপাতী।

আর্য মানে শুধু বৈদিক জনতাই নয়, অবৈদিক ব্রাত্যেরাও জিমার, চন্দ প্রভৃতি কর্তৃক আর্য-রূপে গণ্য হয়েছে। আর্যাবর্তের আর্য ও বহির্বৃত্তের আর্যের মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাত্যেরা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা নাকি অ্যালপাইন নৃবংশের অন্তর্ভুক্ত—এই জাতীয় প্রকল্পের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন কেউ কেউ।

প্রকৃতপক্ষে আর্যেরা দ্রাবিড়ের মতোই সাংস্কৃতিক বা ভাষাভাষী গোষ্ঠী। এদের উভয়ের মধ্যেই বিশেষ নৃবংবশীয় ঝোঁক আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কোনো নৃবংশে অন্তর্ভুক্তি নিছক কাল্পনিকতা-প্রসূত। ব্রাত্য নামটিও গোলমেলে। অবৈদিক আর্য ব্যতীত অনার্য-গোষ্ঠীও মনুস্মৃতিতে ব্রাত্য-রূপে কথিত হয়েছে।

বেদোক্ত নিষাদেরা হচ্ছে আদি-অস্ট্রেলীয় এই মত পোষণ করেছেন বি. এস. গুহ প্রভৃতি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিরাত ও ইন্দো-মঙ্গোলীয়ের সমীকরণ সমর্থন করেছেন। কিরাতেরা মঙ্গোলীয় হতে পারে, কিন্তু মঙ্গোলীয় মাত্রই কিরাত নয়। মনুসংহিতায় চীন ও কিরাতের একত্র পৃথক উল্লেখ দেখা যায়। [মনু ১০।৪৪]

নৃবংশীয় সিদ্ধান্ত মাত্রই অনিশ্চয়তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। গর্ডন চাইল্ড, টয়েনবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নৃবংশীয় বিভাগগুলিকে উচ্চ মর্যাদা দিতে চান নি এবং এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত উপেক্ষনীয় নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নৃবংশের যোগসাজস ধরে নেওয়াও বিপজ্জনক। মঙ্গোলীয় প্রবণতা-যুক্ত আসামের খাসিয়া অষ্ট্রিক শাখার মন্-খমের ভাষায় কথা বলে, অথচ অষ্ট্রিক হচ্ছে মোটামুটিভাবে আদি-অস্ট্রেলীয়ের ভাষা। আবার, বেলুচীস্তানের ব্রাহুইরা তুর্কো-মঙ্গোল-বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়েও দ্রাবিড় ভাষাভাষী। ওরাওঁরা আদি-অস্ট্রেলীয়, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা ও সংস্কৃতি অনেক সময়ে এক গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীতে সঞ্চারিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে মৌলিক উপকরণ ও ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নয়, যেহেতু বিশুদ্ধ সংস্কৃতি হচ্ছে বিশুদ্ধ নৃবংশের মতোই অলীকবস্তু। [pp. 52-55, *A stndy of history*, Toyanbee, 1951]

সংস্কৃত গ্রন্থ-গত গোষ্ঠী-নামের সঙ্গে অধুনা-দৃষ্ট গোষ্ঠী বা নৃবংশীয় ধারার একীকরণ সর্বদাই বাধা-সঙ্কুল। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি নাম বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল নাম যে অনার্য কৌমের সূচক

এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করতে পারি না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর একটু অগ্রসর হয়ে একালের কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সমীকরণের যুক্তি নিতান্তই কল্পনা-কণ্টকিত।

শবরের কথাই ধরা যাক। শবরের সদৃশ শম্বর-নামটি ঋগ্বেদীয়। ঋক্ মন্ত্র অনুসারে একজন শম্বর হচ্ছেন ইন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় এবং দাস-রূপে অভিহিত। বর্তমান সম্বলপুরের একটি কৌমের নামও শম্বর, আবার একথাও বলা যায় যে শম্বর-অধ্যুষিত অঞ্চল হয়েছে সম্বলপুর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে শবর এবং উড়িষ্যাবাসী শবরের সংবাদ পাওয়া যায়। বর্তমান নাম ও অতীত নামের এই মিল হয়তো নিরর্থক নয়, কিন্তু সমীকরণে বাধাও রয়েছে প্রচুর।

অথর্ব বেদের আমলে যে কৈরাতিকা কুমারিকা ভেষজ খনন করতেন, তাঁর সঙ্গে কাছার-বাসী কিরাতের কোনো সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব? [অথর্ব ১০।৪।১৪]

শতপথ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি-পুত্র দেব-বৈরী অসুর, ছোটনাগপুরের অসুর কৌম, আসিরিয়ার অসুর বাণিপাল প্রভৃতি রাজাগণ, কামরূপের বর্মণ রাজবংশীয় নরকাসুর প্রভৃতির প্রতি যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এতগুলি বিকল্পের মধ্যে সমীকরণের পথ কোথায়?

মহাভাষ্যে দেখতে পাচ্ছি অসুরদের পরাজয় ঘটছে ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকবার জন্য। তারা "হে অরয়ঃ" উচ্চারণের পরিবর্তে "হে অলয়ঃ" এই অপভাষা প্রয়োগ করে, সুতরাং ম্লেচ্ছ-পদ-বাচ্য। ম্লেচ্ছ না হওয়া যেহেতু বাঞ্ছনীয়, সেইহেতু ব্যাকরণ পড়া কর্তব্য—এই উপদেশ দিয়েছেন পতঞ্জলি। [১।১।১]

এস্থলে অসুরেরা ম্লেচ্ছ-রূপে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁরা অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন, দ্রাবিড় ভাষা কিংবা অষ্ট্রিক ভাষা ব্যবহার করেন না। এই অসুরেরা কি দ্রাবিড় কিংবা আদি অস্ট্রেলীয় কিংবা আসিরীয়-রূপে বিবেচিত হতে পারেন? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই, যদিও সাধারণভাবে অসুর ও অনার্যের সমীকরণে কোনো বাধা দেখছি না।

অসুরকে আসিরীয়-রূপে গণ্য করেছেন আর. জি. ভাণ্ডারকর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। আসুর বিবাহ প্রসঙ্গে এই সমীকরণ সমুচিত হলেও সর্বত্র সমর্থনীয় নয়। বৈদিক আমলের শেষ পর্যায়ে অনার্যমাত্রেই অসুর-রূপে পরিচিত হয়েছেন। [pp. 89-90, *Evolution of ancient Indian law*, N. C. Sen Gupta, 1953]

আর্য ও দাস

ঋগ্বেদে দাস ও আর্যের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। যারা আর্য নয় তারাই সম্ভবত দাস-পদ-বাচ্য। দাস ও আর্যের পার্থক্য না থাকলে একমন্ত্রে আলাদাভাবে উভয়ের উল্লেখ হয় অর্থহীন। [দাসস্য বা আর্য্যস্য বা— ঋ ১০।১০২।৩]

একটি ঋক্ মন্ত্র অনুসারে ইন্দ্র দাস বর্ণকে অভিভূত করেন। আর একটি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ইন্দ্র দস্যুগণকে হত্যা করে আর্য বর্ণকে রক্ষা করেন।

এস্থলে বর্ণ-শব্দের তাৎপর্য গাত্র-ত্বক্‌কে নির্দেশ করছে, জন্ম-গত জাতকে (Caste-কে) নয়। গাত্র-বর্ণের দিক দিয়ে আর্য ও দাসের তফাৎ সূচিত হচ্ছে। [দাসম্ বর্ণম্—ঋ ২।১২।৪ ; হত্বী দস্যূন্ প্র আর্যং বর্ণম্ আবৎ— ঋ ৩।৩৪।৯]

অথর্বমন্ত্রে আর্য ও শূদ্রের পৃথকীকরণ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আর্যেতর মানুষেরা শূদ্র-রূপে বিবেচিত হয়েছেন। [যশ্চ শূদ্রঃ উত আর্য্যঃ—অথর্ব ৪।২০।৪ ; উত শূদ্রম্ উত আর্য্যম্—৪।২০।৮]

পুরুষসূক্তের বর্ণনা অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই যে পুরুষের পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি কল্পিত হয়েছে। এ ধরনের কল্পনায় শূদ্রের সেবাবৃত্তি বা গোলামী (slavery) হয়েছে বিবেচনার বিষয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাস হচ্ছে গোলাম, শূদ্রও গোলাম। আর্যকুলে জাত ব্যক্তিও কখনও কখনও শূদ্রের, অর্থাৎ, গোলামের কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। আর্যপ্রাণ শূদ্রেরা কৌটিল্যের আমলে আবির্ভূত হয়েছেন। [৩।১৩]

মনু সাতপ্রকার দাস বা গোলামের কথা বলেছেন। [৮।৪১৫]

কৌটিল্য বা মনু গোলামকেই দাসরূপে গণ্য করেছেন। কৌটিল্য শূদ্র ও গোলামের মধ্যেও তফাৎ করেন নি।

এই সূত্র ধরে কি বলা যায় যে শূদ্র ও দাস-শব্দের বৈদিক তাৎপর্যও হচ্ছে গোলাম? বৈদিক আমলে অনার্য গোষ্ঠীগুলি থেকে ধৃত ব্যক্তিরাই গোলামের কাজ করতে বাধ্য হতো, সুতরাং তারা ছিল দাস কিংবা শূদ্র-পদ-বাচ্য। আর্যেরা গোলামের কাজ করত না, তাই তারা দাস বা শূদ্র-রূপে গণ্য হতো না।

এ জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্যেরা ছিলেন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা রাজন্য এবং বৈশ্য। অনার্যেরা

ঋগ্বেদে দাস বা দস্যু-রূপে এবং অথর্ব বেদে শূদ্র-রূপে কথিত হয়েছেন। ডি. আর. ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। [pp. 14-15, *Some aspects of ancient Indian culture*, 1940]

দাস ও দহ

ইরাণীয় ভাষায় দহ ও দহ্যু এই দুইটি শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দহ হচ্ছে সংস্কৃত দাসের প্রতিরূপ, দহ্যু ও সংস্কৃত দস্যু অবিকল একরকমের শব্দ।

দহ হচ্ছে কৌম-নাম।

আবেস্তার হোম-যস্ত অনুসারে অঝি দহাক হচ্ছেন একটি সর্প, অর্থাৎ, সাপ-টটেম-ধারী কোনো শত্রু-কৌমের নায়ক। তিনি ইরাণীয়দের গেথ, অর্থাৎ, বসতি-সমূহ ধ্বংস করলেন। তখন তাঁকে ঘায়েল করলেন ইরাণীয় নায়ক থ্রেতন। [৯।৭]

ঋগ্বেদেও দেখছি জবরদস্ত ইন্দ্র অহিকে নিধন করছেন। আবেস্তার অঝি (Azhi) এবং বৈদিক অহির মধ্যে কোনো তফাৎ দেখছি না। [ঋ ২।১২।১১]

আবেস্তীয় দৈঙ্হু প্রাচীন পারসীকে হয়েছে দহ্যু। দৈঙ্হু দেশ-বাচক। কিন্তু প্রাচীনতর তাৎপর্য কৌম হতে পারে।

ইরাণীয় নিদর্শন যদি উপেক্ষিত না হয়, তাহলে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যুকে বৈরী-কৌম-রূপে গণ্য করতে বাধ্য হই আমরা। সম্ভবত গ্রীক 'বর্বর' (barbaros) আখ্যার সঙ্গে তুলনীয় দাস বা দস্যু। অ-গ্রীকরা যেমন বর্বর-রূপে কথিত হতো, তেমনি অনার্য গোষ্ঠীমাত্রই ঋগ্বেদীয় আমলে দাস বা দস্যু-রূপে আখ্যাত হতো।

আদি বৈদিক পর্বের অনার্যেরা সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকাবাসীরাই, তারাই দাস ও দস্যু বিশেষণের লক্ষ্যস্থল হতে পারে। কিন্তু তারা যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত এমন কথা জোরের সঙ্গে বলবার কোনো সূত্র নেই।

দাস-প্রবর্গ

ঋগ্বেদে অন্তত একটি জায়গায় দাস-শব্দের অর্থ হচ্ছে গোলাম। উষস্ দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হচ্ছে রয়ি বা ধন। ধনের নমুনাস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে সুবীর এবং দাস প্রবর্গ। বীর, অর্থাৎ, পুত্রসন্তান এবং কয়েকটি দাস বা

গোলাম যেখানে কামনার বিষয় হতে পারে, সেই সমাজে গোলামী প্রথা না থেকে পারে না। [ঋ ১।৯২।৮]

সায়ণ দাস-প্রবর্গের অর্থ করেছেন অনেকগুলি কর্মকর বা ভৃত্য।

সমৃদ্ধ গৃহস্থালীতে সম্পত্তি-রূপে বিবেচিত হতো পুত্র এবং গোলামেরা ঋগ্বেদীয় পর্বেই।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দাস-পুরুষ গোলামের তাৎপর্য বহন করছে। ধনী বিশ্‌ অনেক দাস-পুরুষের মালিক হতে পারতেন। এস্থলে গোলামের মালিকের ছবি ফুটে উঠছে। [তৈ ব্রা ৩।৮।৫]

ঈদৃশ নিদর্শনে একটি ধারণার উপযোগী উপকরণ মিলছে। অনার্য কৌমের লোকেরা দাস-রূপে পরিচিত হতো বৈদিক সমাজে, আবার গোলামকেও বলা হতো দাস। গোলামীতে নিযুক্ত হতো যুদ্ধ বন্দী অনার্যেরা, তাই তারা 'দাস' আখ্যা লাভ করত।

দাসী-পুত্র ও শূদ্রাপুত্র

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের আখ্যায়িকা থেকে জানা যায় যে দাসী-পুত্র হওয়ার দরুন কবষ অবহেলিত হয়েছেন। "তুমি দাসীর পুত্র, সুতরাং তোমার সঙ্গে আমরা খাব না"—একথা কবষকে বলছেন তাঁর সঙ্গীরা। [শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ১২।৩ ; ঐ ব্রা ২।৩।১]

বিগর্হণের বিষয়ীভূতা দাসী কে হতে পারেন? ইনি অনার্যগোষ্ঠী থেকে গৃহীত স্ত্রী গোলাম ছাড়া আর কেউ নন। এঁর উপর ন্যস্ত হতো গোলামীর বৃত্তি এবং উপপত্নীর মর্যাদা। উপপত্নীর সন্তানেরা সমাজে ছিলেন অপাংক্তেয়।

কোথাও কোথাও আমরা শূদ্রাপুত্র ও অসুরীপুত্রের সাক্ষাৎ পাই। শূদ্রা ও অসুরীও অনার্য স্ত্রী গোলাম-রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। তিনিও উপপত্নীর পদে আসীনা।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বৎস কাণ্ব শূদ্রা-পুত্র-রূপে নিন্দিত হয়েছেন। যেহেতু তিনি শূদ্রার পুত্র, সেই কারণে মেধাতিথি তাঁকে অব্রাহ্মণ-রূপে ভৎর্সনা করছেন। অথচ, উভয়েই এক বাপের সন্তান। এতে বোঝা যায় যে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সামাজিক মর্যাদা পেত, উপপত্নীর পুত্র লাভ করত সামাজিক অবহেলা।

বৎস অন্যত্র ত্রিশোক-রূপে পরিচিত হয়েছেন। একজনের দুই নাম থাকা বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে তিনি বর্ণিত হয়েছেন অসুরী-পুত্র-রূপে।

এইসব বিবরণ থেকে স্ফুট হচ্ছে যে যিনি দাসী-রূপে গণ্যা, তাঁকেই কখনও শূদ্রা-রূপে, কখনও বা অসুরী-রূপে বর্ণনা করা হয়। দাসী, শূদ্রা ও অসুরী অনার্যও বটে, স্ত্রী গোলামও বটে। অনার্য পুরুষ ধৃত হয়ে গোলামের কাজ করে। অনার্য স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে গোলামীর সঙ্গে উপপত্নীর বৃত্তিও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে বৈদিক সমাজে আর্যরক্তের নর-নারী গোলামীর কাজ করত না, অনার্য বন্দী ও বন্দিনীরাই এরূপ কাজে নিযুক্ত হতো। দাসী, শূদ্রা ও অসুরী একই সামাজিক পরিচয়ের সূচক এবং তিনটিই প্রতিশব্দ। এই শব্দগুলিকে একসঙ্গে বিবেচনা করলে অনার্য রমণীর দাস্য-দশা প্রতিভাত হয়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যে বিচার সঙ্গত তা পুরুষের প্রতিও প্রযোজ্য। কোনো এক সময়ে দাস ও শূদ্র অনার্য পুরুষের প্রতিপাদক ছিল এবং তার গোলামীকেও সূচিত করত। [প ব্রা ১৪।৬।৬ ; জৈ ব্রা ৩।১৯৮, ২৩৫]

উপপত্নী প্রথা—Concubinage

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের দাসীপুত্র ও শূদ্রাপুত্রেরা বৈদিক সমাজে উপপত্নীপ্রথার অস্তিত্ব দেখিয়ে দিচ্ছেন।

আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটবার ফলে গোলামী ও উপপত্নী-প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রের নজীর যদি বৈদিক আমলের উপরেও অন্তত আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে উপপত্নী-প্রথার বিষয়ে আমরা অস্পষ্ট ধারণায় পৌছুতে পারি।

বিষ্ণু বলছেন—দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে শূদ্রাকে ভার্যা-রূপে গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু রতির প্রয়োজনে তার সঙ্গ নিষিদ্ধ নয়। [বিষ্ণু, ২৬।৫]

মনুর মতে শূদ্রাকে বৈধভাবে শয়ন-সঙ্গিনী করা চলে না। যদি কখনও অবৈধভাবে শূদ্রা-সঙ্গম ঘটে, সেক্ষেত্রে শূদ্রা-পুত্র ঋকৃথ, অর্থাৎ, পৈতৃক ধন থেকে বঞ্চিত হবেন। [মনু, ৩।১২, ১৩, ১৭ ; ৯।১৫৫]

আর্য পুরুষ ও অনার্য নারীর সন্তান আর্য-রূপে পরিচিত হতে পারে, কিন্তু অনার্য পুরুষ ও আর্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবের ফলে উৎপন্ন সন্তান গণ্য হবে অনার্য-রূপে। [মনু ১০।৬৭]

মনু যে সমাজের চিত্র তুলে ধরছেন আমাদের সামনে, সে সমাজে অনুলোম (hypergamy) যৌন সম্পর্ক সমর্থিত হতো, কিন্তু প্রতিলোম (hypogamy) যৌন সম্বন্ধের কোনো সমর্থন মিলত না। অর্থাৎ, উচ্চবর্ণের পুরুষ মিলিত হতে পারতেন নীচবর্ণের নারীর সঙ্গে, কিন্তু এর বিপরীত রীতি ছিল নিন্দিত। এই নিয়ম অনুসারে আর্য পুরুষ ও অনার্য নারীর সঙ্গম অনুমোদিত হয়েছে, যদিও এদের সন্তান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

আর্যসমাজে উপপত্নী-প্রথার প্রচলন ছিল অনুমান করতে পারি। কিন্তু এর ব্যাপকতা কি পরিমাণে ছিল তা আন্দাজ করা যায় না। শূদ্রা ভার্যা যে নিছক রতির প্রয়োজনে বিহিতা ছিল একথা মহাভারতেও বিবৃত হয়েছে। অনেকে এই প্রথা অনুমোদন করতেন, অনেকে করতেন না। বশিষ্ঠ-প্রদত্ত পুত্র-তালিকায় নিতান্ত হীন স্থান নির্ধারিত হয়েছে শূদ্রাপুত্রের নিমিত্ত। কামসূত্রের বিধানে স্ববর্ণে নর-নারীর 'কাম' হচ্ছে প্রশস্ত, উত্তমবর্ণা নারীতে অধমবর্ণের পুরুষের ভালোবাসা নিষিদ্ধ, কিন্তু নীচবর্ণের নারী ও উচ্চবর্ণের পুরুষের ভালোবাসা শিষ্টাচার নয় কিংবা নিষিদ্ধও নয়। [মহা ১৩।৪৪।১২, ১৩ ; বশিষ্ঠ, ১৭ অ ; কামসূত্র ১।৫]

শূদ্রের গোলামী

পুরুষসূক্তে পুরুষের পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। এস্থলে শূদ্রের নিম্নতম সামাজিক মর্যাদা বোঝা গেলেও অনার্যত্ব পরিষ্কার নয়।

অথর্ববেদে আর্য ও শূদ্রের পৃথকীকরণে শূদ্রের অনার্যত্ব স্পষ্টীকৃত হয়েছে। কিন্তু তার বৃত্তি রহস্যাবৃত। অন্তর্বেদি আর্য্যবর্ণঃ বহির্বেদি শৌদ্রঃ—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত এই বর্ণনায় আর্য ও শূদ্রের মাঝখানে সামাজিক দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না। [জৈ ব্রা ২।৪০৫]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে শূদ্র হচ্ছে অন্যস্য প্রেষ্যঃ বা অন্যের চাকর এবং যথাকামবধ্যঃ, অর্থাৎ, তাকে তার প্রভু ইচ্ছামতো মেরে ফেলতে বা আঘাত করতে পারেন। ঈদৃশ হীনতা-প্রাপ্ত শূদ্র তো গোলাম—প্রাচীন মিশরীয়,

সেমিটিক, গ্রীক ও রোমীয় গোলামদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াবার যোগ্য। [ঐ ব্রা ৭।৫।৩]

খুব সম্ভব অনার্য সংশ্রবের ফলে বৈদিক সমাজে গোলামীর বিকাশ হয়েছিল। অথর্ববেদীয় নজির দ্বারা গোলামী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। অথর্বমন্ত্রে উল্লিখিত নাথ ও কিঙ্কর হচ্ছে যথাক্রমে গোলামের মালিক ও গোলাম। [অথর্ব ৮।৮।২২ ; ১৩।২।৩৭]

শূদ্রের গোলামীবৃত্তিকে আমরা সন্দেহ করতে পারি না, যদিও শূদ্রমাত্রই গোলামের কাজে নিযুক্ত হতো এরূপ অনুমান অসঙ্গত।

শূদ্রের দাস্য মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে। [৮।৪১৩-৪১৫]

বৌধায়ন শূদ্রের উপর পরিচর্যা-বৃত্তি ন্যস্ত করেছেন। [বৌ ধ সূ ১।১০।১৮।৫]

তিনি বৈশ্যের অধ্যয়ন ও যজনে অধিকার স্বীকার করেছেন, কিন্তু শূদ্রের বেলায় এই অধিকারের কথা বলেন নি। আপস্তম্ব খোলাখুলিভাবে বলেছেন :

অশূদ্রাণাম্ উপায়নম্ বেদাধ্যয়নম্ অগ্ন্যাধেয়ম্ ফলবন্তি চ কর্মাণি।

অর্থাৎ, যারা শূদ্র নয় তাদের জন্যই বেদাধ্যয়ন, অগ্ন্যাধেয়-রূপ যজন কর্ম এবং ফলপ্রসূ কর্ম বিহিত। ফলপ্রসূ কর্ম যজন ছাড়া আর কিছু নয়। (আ ধ সূ ১।১।১।৬]

এই উক্তি থেকে ধরে নেওয়া যায় যে শূদ্রেরা বেদাধ্যয়নে ও যজনে অধিকারী ছিল না। যজন-কর্মে পুরোহিতের প্রবর (পূর্বপুরুষ-পরিচিতি) গ্রহণ করতে হতো। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেলায় এই নিয়ম খাটত, কিন্তু যাদের যজন-কর্ম ছিল না তাদের ক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রবর দ্বারা পরিচিতির আবশ্যকতাও ছিল না। সুতরাং বৈদিক আমলে শূদ্রের উপর গোত্রারোপের কোনো বিধি ছিল না এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি আমরা। [কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র—৩।২।১১, কর্কের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেও শূদ্রের গোত্র-পরিচয় ছিল না এবং তার কারণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা তাদের ধর্মীয় কর্মে অংশ গ্রহণ করতেন না। [p. 55, *The Hindu law of marriage and Stridhana,* 1896]

শূদ্রের অধিকার

বৈদিক আমলে শূদ্রেরা যজ্ঞীয় ধর্মে অধিকারী ছিল না এবং সেই কারণে পুরোহিতের গোত্র দ্বারা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত না এবিষয়ে মতানৈক্যের

অবকাশ নেই। অনেকে অবশ্য বলেন যে অথর্ববেদীয় ম্যাজিক-মিশ্রিত ধর্মাচরণে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত ছিল। ইদানীং শেণ্ডে মন্তব্য করেছেন যে অথর্ববেদীয় ধর্মে অংশ গ্রহণ করত আর্য ও শূদ্র, নারী ও পুরুষ, গ্রামবাসী ও নগরবাসী প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এবং এক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধতা-সূচক কড়াকড়ি ছিল না। [pp. 4-5, *The religion and philosophy of the Atharvaveda,* N. J. Shende, 1952]

দার্শনিক বিদ্যায় শূদ্রের অধিকারের প্রমাণও পাওয়া যায়। উপনিষদীয় উপাখ্যানে দেখছি জানশ্রুতি দাতারূপে পরিচিত, তিনি সর্বত্র আবসথ বা পান্থশালা নির্মাণ করেছেন, তাঁকে রৈক্ক শূদ্র-রূপে সম্বোধন করছেন, আবার বিদ্যাশিক্ষাও দিচ্ছেন। [ছা উ ৪।১।১ ; ৪।২।৪, ৫ ; pp. 4-5, *Social and religious life in the Grihya Sutras,* V. M. Apte, 1954]

এখানে আমরা শূদ্রের গোলামীর ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। শূদ্রমাত্রই যে গোলামীবৃত্তির দ্বারা সমাজে পরিচিত হতো না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু বৈদিক পর্বে শূদ্রের অনার্যত্ব স্বীকার করতে বাধা নেই।

আর্য ও অনার্যের মিশ্রণের ফলে শূদ্র-রূপে পরিচিত গোলামের আবির্ভাব হয়েছিল। আর্যসমাজে অনার্যের প্রবেশ ঘটত গোলামরূপে এবং গোলামকে শূদ্র আখ্যা দেওয়া হতো, আবার অনার্য গোষ্ঠীর যে কোনো লোককেই বলা হতো শূদ্র। প্রথম দিকে শূদ্রের যজনাধিকারের প্রশ্ন ওঠেনি, কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনার্য-সঙ্গম বাড়তে থাকে, আর্যসমাজের পরিধিও প্রসারিত হতে থাকে, শূদ্রের যজন ও যাজন নিন্দিত হলেও স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে সময়ে নিন্দিত হয়েছেন, তখন অনার্যের আর্যীকরণ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আর্য ও অনার্যের ভেদগণ্ডী রক্ষার চেষ্টাও চলছে। [বিষ্ণুস্মৃতি, ৮২।১৪]

শূদ্র-পরিচিতির প্রসার

প্রাথমিক সামাজিক বিভাগে আর্য জনসাধারণ, অর্থাৎ, শাসকশ্রেণী বাদে কৌমগত সমস্ত লোক কথিত হতো বিশ্-রূপে এবং শূদ্র ছিল আর্য গণ্ডীর বহির্ভূত। বিশ্ ও শূদ্রের এই ব্যবধান ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়েছে, যখন আর্য ও অনার্যের পারস্পরিক সংশ্রবের ফলে সামাজিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। মনু ও কৌটিল্য শূদ্রের গোলামীর বিষয়ে ছিলেন সচেতন, কিন্তু কৌটিল্য আর্য-

প্রাণ শূদ্রের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্যরক্ত গোলামীর প্রতিবন্ধক নয়। পাণিনি-সূত্রে জটিল সামাজিক পরিবেশের সংবাদ পাই আমরা। পাণিনি শূদ্রবর্ণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে অনিরবসিত, অর্থাৎ, সমাজ থেকে অবহিষ্কৃত এক শ্রেণীর শূদ্র ছিল। এরা বোধ হয় শিল্পজীবী। নিরবসিত বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত শূদ্রের কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। শেষোক্তের উদাহরণ-স্বরূপ ভট্টোজিদীক্ষিত চণ্ডালের নাম উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে শূদ্র-পরিচয়ের ক্রমিক ব্যাপ্তি স্ফুট হচ্ছে। [পা ২।৪।১০]

স্মার্ত বিবরণে বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তিকে তফাৎ করা যায় না।

পরাশরের মতে শূদ্র, বৈশ্য, এমনকি ক্ষত্রিয়ও কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। [২।১৫]

যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন যে দ্বিজশুশ্রূষা ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যে শূদ্রের অধিকার রয়েছে। [১।১২০]

বিষ্ণুও বলছেন,—শূদ্রস্য সর্বশিল্পানি। [২।৫]

এরূপ বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে শূদ্র-পরিচয়ে কোনো বিশেষ বৃত্তি বা অনার্যগোষ্ঠী বিচার্য নয়, ব্যাপক জনসাধারণ শূদ্র-নামের দ্বারা সংজ্ঞিত হচ্ছে। ঈদৃশ সামাজিক পরিস্থিতির পিছনে রয়েছে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণের দীর্ঘায়ত ইতিকাহিনী।

যৌন সংমিশ্রণ

আর্য ও অনার্যের বিরোধ-চিত্রের পাশাপাশি মিলনালেখ্য ঋগ্বেদে প্রদত্ত না হলেও উভয়ের সামাজিক সংশ্রব ঋগ্বেদীয় আমলেই শুরু হয়েছে এবং এর ফলে যৌন সংমিশ্রণের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। অনেকের মতে ভারতে আগমন-কাল থেকেই আর্যেরা অনার্য স্ত্রী গ্রহণ করতেন, যেহেতু তাঁদের সমাজে স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। যদুনাথ সরকার এই মত প্রকাশ করেছেন। সি. ডি. বৈদ্য এমন কথাও বলেছেন যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার জন্য আর্যসমাজে বহুপতি-বিবাহ ও নিয়োগপ্রথার প্রচলন হয়েছিল। [pp. 16-17, *India through the ages,* Jadunath Sarkar, 1928 ; p. 86, *Epic India* C. V. Vaidya, 1907]

প্রাচীন কাহিনীগুলিতে আর্য ও অনার্য নর-নারীর যৌন সংশ্রবের ইতিহাস

লুকিয়ে রয়েছে। যৌন মিলনের অর্থ প্রতিক্ষেত্রেই বিধিপূর্বক পাণিগ্রহণ নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে অস্থায়ী সম্পর্কের আলেখ্য, কতকটা যেন মর্গ্যান্-এঙ্গেল্স্-কথিত pairing family বা মিথুন-পরিবারের লক্ষণযুক্ত। একই ব্যক্তিকে বহুপতি বিবাহের কিংবা বহুস্ত্রী বিবাহের নিদর্শনে ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ভীম ও অর্জুনের নাম উল্লেখ করতে পারি। এতে প্রতিপন্ন হয় যে একই সামাজিক পরিবেশে বহুপতি বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ এবং একবিবাহ বৈধতার সমর্থন পেতে পারে।

অনার্য কন্যা-বিবাহের ভিতর দিয়ে অনুলোম-বিধির উদ্ভব হয়েছে। এই বিধান অনুসারে অনার্য নারী আর্য গৃহস্থালীতে স্থান লাভ করত। অনুলোমের অনুমোদন সহজতর হলেও এর বিপরীত প্রতিলোমের সমর্থন সহজলভ্য ছিল না, কেননা প্রতিলোমের ক্ষেত্রে আর্য রমণীকে অনার্যের গৃহে প্রবেশ করতে হতো। রাক্ষস রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের কাহিনী বিবাহের চিত্র নয়, সুতরাং প্রতিলোমের নিদর্শনরূপে বিচার্য হতে পারে না।

আমরা এস্থলে যৌনসংমিশ্রণের কয়েকটি কাহিনী উপস্থাপিত করছি।

(ক) মহাভারতীয় আখ্যান অনুসারে শান্তনু বিবাহ করেন দাশরাজ-কন্যাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে জানতে পারি যে দাশের জীবিকা হচ্ছে মৎস্য শিকার। ক্ষুদ্র জলাশয়ের সঙ্গে দাশের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং দাশ মৎস্যজীবী হতে পারেন। দাশকন্যার কুমারী অবস্থায় মাছের মতো গন্ধ ছিল, এর তাৎপর্য হতে পারে তিনি জেলের মেয়ে। অনেকেই বলেন যে মাছ আর্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে সমুদ্র, লবণ, মৎস, কাঁসা, পিতল, টিন, উষ্ট্র (Camel), সিংহের বাচক সজাতীয় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয় না। মাছের সঙ্গে আদি-অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিকভাষীদের সম্বন্ধ যদি অনুমিত হয়, তাহলে দাশকন্যার অনার্যত্বে কোনো সন্দেহ থাকে না।

মহাভারতের শান্তনু হচ্ছেন ঋগ্বেদের শংতনু। তিনি একজন আর্য নৃপতি। তাঁর অনার্য বধূ গ্রহণ সত্য হলে বলা চলতে পারে যে ঋগ্বেদীয় আমলেই আর্য ও অনার্যের যৌন সংমিশ্রণ শুরু হয়েছে। [মহা ১।১০০।৪৭, ৪৮, ৫০ ; ১।১০১ ; ১।১০৫।১২ ; ঋ ১০।৯৮।৭ ; তৈ ব্রা ৩।৪।১২ ; pp. 306-307, *Foundations of language*, Gray ; pp. 84-88, *The Aryans*, Gordon Childe]

(খ) দাশ-কন্যার কুমারী অবস্থায় পরাশরের সঙ্গে যৌন মিলন ঘটেছিল। পরাশর হচ্ছে একটি আর্য গোত্র-নাম। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে পরাশর

গোত্রের কোনো লোক অনার্য দাশ-কন্যার সহিত মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলন-জাত কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কৃষ্ণ-ত্বক্ অহেতুক নয়। [মহা ১।১০৫।১৫ ; প্রবর প্রশ্ন ৮।৪৮]

(গ) মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে যযাতি রাজা অসুরদের পুরোহিত শুক্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। যযাতি নহুষের পুত্র, ঋক্ মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেন।

জৈমিনীর ব্রাহ্মণ ও মৎস্য পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী উশনা কবির বংশধর, অর্থাৎ কাব্য। তিনি এবং শুক্র এক ব্যক্তি। কবি হচ্ছেন ভার্গব বা ভৃগুর বংশধর। এই ভৃগু একটি আর্য গণের নাম। আর্য ভৃগুর বংশে অসুর-রূপে পরিচিত উশনা বা শুক্র এলেন কি করে? ঈদৃশ অসঙ্গতি আরও অনেক রয়েছে। এর মূলে রয়েছে আর্যীকরণের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত এবং সেই উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের কৃত্রিম ঘটনা সংযোজন। আর্যীকরণের প্রয়োজনে বহুক্ষেত্রে উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চেপেছে, প্রকৃত ইতিহাসে বিচিত্র রকমের সত্য ও মিথ্যার সমন্বয় ঘটেছে। [মহা ১।৮১।৩৬-৩৭ ; ঋ ১০।৬৩।১ ; কবি ঃ ভার্গব ঃ— জৈ ব্রা ১।১৬৬ ; ১।১২৫ ; মৎস্য ২৫।২৫]

(ঘ) আর্য ও অনার্য শঙ্করের নিদর্শন-রূপে গণ্য হতে পারে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও হিড়িম্বার কাহিনী। উলূপী নাগ-কন্যা। নাগের অর্থ সাপ টটেম। টটেমের ব্যাপারটা অনার্য সমাজীয়—একথাই ইদানীং অনেকে বলছেন। পাণ্ডু কৌমের আর্যত্বে যদি সন্দেহ করা না হয়, তাহলে অনুমান করা চলে যে একটি আর্য কৌমের লোক হয়েও অর্জুন অনার্য উলূপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আর এক রমণীর সঙ্গেও তাঁর সাময়িকভাবে যৌন সঙ্গ হয়েছিল। তিনি চিত্রাঙ্গদা। তাঁর জন্মস্থান মণিপুর, অর্থাৎ, আর্য পরিধির বাইরে।

হিড়িম্বা তো রাক্ষসী। রাক্ষসী মানে অনার্য কৌমের ললনা। তাঁর সাহচর্যে ভীমের আর্যত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। [মহা ১।২১৪।১৮,৩৩,৩৪ ; ১।২১৫।১৫–২৬ ; ১।১৫৫।১৯-৩১ ; pp. 32-34, *Studies in Indian antiquities*, H. C. Ray Chaudhuri, 1932]

গোত্র-তালিকায় অনার্য নাম

বৌধায়নের প্রবরপ্রশ্নে গোত্রের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এর অন্তর্গত কোনো কোনো নামের আর্যত্ব বিশ্বাস করা কঠিন। দু-চারটি উদাহরণ এস্থলে গৃহীত হতে পারে।

গৌতম গোত্রের একটি শাখা হচ্ছে পৌঞ্জিষ্ঠি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নিষাদের সঙ্গে পুঞ্জিষ্ঠের একত্র উল্লেখ থেকে ধারণা হয় যে পুঞ্জিষ্ঠ একটি অনার্য কৌমের নাম।

আসুরায়ণ হচ্ছে কশ্যপগোত্রের শাখা। আসুরায়ণকে অনার্য গোষ্ঠী-রূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত, কেননা অসুরের সঙ্গে আসুরায়ণ সংশ্লিষ্ট। অসুর ও অনার্যের অভিন্নতা প্রশ্নের বিষয় হতে পারে না।

তৃতীয় নমুনা হচ্ছে বালেয়—অত্রিগোত্রের একটি শাখা। বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুসারে বালেয়-রূপে গণ্য হয় কয়েকটি কৌম। যথা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্র। এই কৌমগুলি বলিরাজার পত্নীতে দীর্ঘতমা-কর্তৃক উৎপন্ন হয়েছিল। এরা সকলেই নিষিদ্ধ দেশের অধিবাসী। বৌধায়ন বলেছেন যে :

(ক) অঙ্গ ও মগধ হচ্ছে সঙ্কীর্ণযোনি ;

(খ) পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কলিঙ্গদের দেশে গমন করলে যজন দ্বারা শুদ্ধ হতে হয়।

ঈদৃশ বিবরণের মধ্যে আংশিকভাবে সত্য নিহিত রয়েছে। বৈদিক আর্যদের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী ছিল। এই গণ্ডীর বহির্ভূত আর্যেরা ব্রাত্য-রূপে বিবেচিত হয়েছেন পুরাতাত্ত্বিক-মহলে। রমাপ্রসাদ চন্দ ব্রাত্যের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে অবৈদিক আর্যেরাই শুধু ব্রাত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ছাড়াও অনার্য গোষ্ঠীও কখনও কখনও ব্রাত্য-রূপে কথিত হয়েছে। মনুর মতে খস ও দ্রাবিড় ব্রাত্য রাজন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আর্য ও অনার্যের সীমারেখা আমাদের নিকটে অপরিচিত। তাই এ বিষয়ে প্রকল্পই একমাত্র সম্বল। প্রকল্পের বাইরে কখনও আমরা যেতে পারি না। সহজ বুদ্ধিতে কল্পনা করা চলে যে যজ্ঞীয় চর্যা (cult) যাঁদের আচরণীয় ছিল না তাঁরাই ছিলেন ব্রাত্য। ব্রাত মানে দল বা গোষ্ঠী। ব্রাত্যেরা বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলেন, তাই ব্রাত্য-রূপে তাঁদের পরিচিতি। তাঁরা যজন-রহিত আর্য গোষ্ঠীও হতে পারেন, কিংবা অনার্যগোষ্ঠীও হতে পারেন।

'বালেয়' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলি বৈদিকদের পংক্তি-বহির্ভূত, সুতরাং ব্রাত্য। তাদের ভিতরে কে আর্য কে অনার্য তা নির্ণয় করা কঠিন।

গোত্র-তালিকায় এই নামের অন্তর্ভুক্তি নিরর্থক নয়। এর পিছনে রয়েছে

আর্যীকরণের কলাকৌশল। [প্রবরপ্রশ্ন ২।১৫ ; ৭।৪১ ; ৫।২৭ ; তৈ সং ৪।৫।৪ ; বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৮।১ ; বৌধায়ন ধর্মসূত্র—১।১।২।১৪, ১৫ ; মনু ১০।২২]

ব্রাত্যস্তোম

বৈদিক আমলেই যে আর্যীকরণ শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রাত্য স্তোমের মধ্যে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্য স্তোমের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

ক্যালাণ্ডের মতে ব্রাত্য হচ্ছে Joined group বা দল-বদ্ধ জন-গোষ্ঠী। এরা ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের কর্তব্য হিসেবে বেদপাঠ করে না, কৃষি ও বাণিজ্য বৃত্তি গ্রহণ করে না, উষ্ণীষ ও উপানহ্ (জুতা) পরিধান করে। ব্রাত্য স্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা হীনদশা থেকে নিষ্কৃতি পায়। চারিটি ব্রাত্য স্তোমের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেই। [প ব্রা ১৭।১-৪]

অথর্ববেদে একটি সমগ্র কাণ্ড ব্রাত্যের মহিমা-কীর্তনে নিয়োজিত হয়েছে। ব্রাত্য-রূপী প্রজাপতি ধনুক গ্রহণ করেছেন, তাই হচ্ছে ইন্দ্র ধনু। তাঁর পশ্চাতে আদিত্যগণ, সকল দেবগণ, দিতি, অদিতি, ইড়া, ইন্দ্রাণী ধাবিত হচ্ছেন। তাঁকে অনুসরণ করছে ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নরোশংসী। এই ধরনের অতিশয়োক্তিতে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে ব্রাত্যকে লক্ষ্য করে। বেশভূষার নামকরণে আসল ব্রাত্যকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু মনে হয় যে ব্রাত্য উপলক্ষ মাত্র, দার্শনিক রহস্যবাদ প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। [অথর্ব ১৫।১।১,৬ ; ১৫।২।১-৬ ; ১৫।৬।১১,২০]

পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্রাত্যেরা বেদ ও যজ্ঞকে স্বীকৃতি দিতেন না, সেই কারণে ছিলেন অপাংক্তেয় বৈদিক সমাজে, কিন্তু তাঁরা আর্য গোষ্ঠীগুলির একাংশ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তুলনীয় ঋগ্বেদে উল্লিখিত ব্রত-বিহীন মন্ত্র-বিদ্বেষ্টা জন-গোষ্ঠী। ঋক্‌মন্ত্র-বর্ণিত ব্রহ্মদ্বিষ্ মন্ত্র উচ্চারণ করে না, অপ-ব্রত বা অব্রত মানুষেরা ব্রত পালন করে না। মন্ত্র-বিদ্বেষী যজ্ঞ-বিরোধীদের মধ্যে যজ্ঞীয় সংস্কৃতিকে প্রসারিত করবার জন্যই ব্রাত্য স্তোম উদ্ভাবিত হয়েছিল। অনার্যদের জন্য ব্রাত্য স্তোম বিহিত ছিল না এমন কথা বলা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ চোখে পড়ে না। [ঋ ১।১৩০।৮ ; ৫।৩৩।৩ ; ৫।৪২।৯ ; p. 13, *A Survey of Indian history*, K. M. Panikkar, 1954]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

প্রচ্ছদ :
পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কংশ-র অফিস। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট। আপাত শান্ত নিঝুম পরিবেশ। ফাঁকা চেয়ার। নেপথ্যে ঝড়ের বেগে শুধু টাইপ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নড়ে ওঠে ছায়াটা। দেখা যায়, খোলা জানালার কাছে গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাইপ খাচ্ছে কংশ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই ঘুরে দাঁড়ায়। ত্রস্তে এসে টেলিফোনটা তুলে নেয়।

কংশ : Yes, hm' hm'. No···no. Yes. What is it? I see. I see. No. No....

[টেলিফোন রেখে দু-এক পা এগিয়ে ফিরে এসে টেলিফোন তুলে নেয়]

Ayer! Ayer, see me at once.

[টেলিফোন রেখে চেয়ারে গিয়ে বসে স্তূপীকৃত কাগজপত্রে সই করতে থাকে একটার পর একটা]

[সেক্রেটারি আয়ার-এর প্রবেশ]

···Yes, (চোখ তুলে আয়ার-কে দেখে) ও, কই তোমার মগনরাম মাড়োয়ারী তো এলো না এখনও ?

আয়ার : It is two o'clock. He should have come by now. কেয়া মালুম! তিন বাজেকে অন্দর আ যায়েগা সায়েদ। কিঁউ কি বারা বাজে ম্যয়নে উনকো ফোন কিয়াথা। উনহোনে কহা কী ইনকমট্যাক্স অফিসমে থোড়াসা কামকে ওয়াজেসে উনকা কুচ্ দের হোগা।

কংশ : তো ফির রুপেয়া কী বাত কুছ্ কহা তুমনে ?

আয়ার : খাস কুচ্ বাতায়া নেহি, লেকিন মুঝে ইয়ে মালুম্ হোতা হ্যায় কি কমসে কম দেড়লাখ রুপেয়া তো উনহোনে জরুর দেঙ্গে।

কংশ : আচ্ছা!

আয়ার : নেহি তো মেরে পাস দুসরি এক পার্টি হ্যায়, আপ বাতচিত করলিজিয়ে, ঔর ভাগা দিজিয়ে ইস মাড়োয়ারীকো।

কংশ : লেকিন, টাইম বহুৎ কমতি হ্যায় না! Speculation ক্যায়সে হোগা? Now listen Ayer, বহুৎ হুঁসিয়ারীসে কাম করনা হ্যায়। Mr. Hammerton may drop here any moment from Delhi. Ledger Account বিলকুল Up-to-date হোনা চাহিয়ে। Auditorকে পাস গয়েথে তুম আজ?

আয়ার : জী।

কংশ : তো কেয়া কহা।

আয়ার : কহা তো সব manage কর লেঙ্গে।

কংশ : How? Indian Trading Corporation কী account-কে বারেমে কেয়া হোগা? ইয়ে তো সব Ghast organisation হ্যায় না?

আয়ার : উ তো হ্যায়হি।

কংশ : হ্যায় তো কেয়া ইন্তেজাম করোগে?

আয়ার : Auditor-নে খাস তো কুচ বাতায়া নেহি; লেকিন…

কংশ : I say bribe him by any means.

আয়ার : ম্যঁয় দেখতা হুঁ।

কংশ : আভিতক্ দেখতা হুঁ? পহেলেসেহি কহা কি নেই তুমসে…, you can well understand my position.

আয়ার : You see sir I too have made my position no less precarious.

কংশ : So what! Want to back-out now? At this moment?

আয়ার : No Sir.

কংশ : Then!…

[কার্ড হাতে বেয়ারার প্রবেশ]

…কেয়া মাঙ্তা?

বেয়ারা : [কার্ড দেয়] এক শেঠ সাব।

[কার্ডখানা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভয়ে ফেলে দেয় মাটিতে]

কংশ : উঠাও উল্লু কাঁহিকা!

[কার্ড তুলে দেয় বেয়ারা]

(আয়ারকে) Look.

আয়ার : মগনরাম।

কংশ : (বেয়ারাকে) শেঠজী কো সেলাম দো।

বেয়ারা : জী সাব।

[বেয়ারার প্রস্থান]

কংশ : So I finalise the deal.

আয়ার : Yes sir.

কংশ : You can go...

[আয়ার-এর প্রস্থান ও মগনরাম-এর প্রবেশ]

...Oh, Please come, please come, take your seat, please take your seat.

মগনরাম : আপকি তবিয়ৎ ঠিক হ্যায়?

কংশ : জী হাঁ, বিলকুল, বৈঠিয়ে।

মগনরাম : জেরা সে দের হো গয়ী।

কংশ : কৈ বাত নেহি।

মগনরাম : Income Tax office-মে কুচ কাম থা।

কংশ : ফয়সালা কুচ হুয়া?

মগনরাম : কেয়া ফয়সালা হোগা! মতলব হি নেহি। অফসার নে কহা কি কেস ওঠাবেগা। উঠাবেগা তো উঠাও কেস। রামজী ভরোসা। ...ইস্ জমানেমে বিজনেস উজনেস কুচ হোগা নেহি বাবুজী। বিজনেসম্যান নাচার হো যায় তো ক্যায়সে হো সকতা বিজনেস ইয়ে তো বাতাইয়ে!

কংশ : উ তো ঠিকই হ্যায়।

মগনরাম : রামজী ভরোসা। ...মগর বাবুজী মুঝে আপ সাফ্ সাফ্ কহে দিজিয়ে ম্যঁয় ইস transaction-কে বারেমে কেয়া কর সকতা হুঁ। সাফ্ সাফ্ বাতাইয়ে!

কংশ : আয়ার কো সাথ আপকি কুচ্ বাতচিত হুয়ী?

মগনরাম : আইয়ারকি বাত ছোড়িয়ে, আপ বাতাইয়ে।

কংশ : আপহি বাতাইয়ে।

মগনরাম : ম্যঁায় কেয়া বাতাউঁ···দেখিয়ে এক লাখ পঁচাশ হাজার তক্ ম্যঁায় দে সকতাহুঁ।

কংশ : For fifty tons of Rayon Silk ?

মগনরাম : লেকিন Forward Business কা হাল তো দেখিয়ে···। বাজার বহুৎ মন্দা হ্যায় বাবুজী।

কংশ : Rayon Silk কা লিয়ে নেহি শেঠজী। Import-কা মাল কৌন দেগা আপকো আজ, ইয়ে তো বাতাইয়ে? মেরী কোম্পানীকো India মে sole monopoly হ্যায় ইস Rayon Silk কা।

মগনরাম : উ তো ঠিক বাত হ্যায়।···তো আপহি বাতাইয়ে ম্যঁায় কুছ্ নেহি কহেঙ্গা, এক সালকা কারবার নেহি···

কংশ : Make the amount round two and I close the deal.

মগনরাম : মর জাউঙ্গা, মর জাউঙ্গা বাবুজী।

কংশ : আপকি মর্জি হো তো final কর লিজিয়ে শেঠজী, কেঁও কি দুসরী পার্টিয়োঁ ইস্কে লিয়ে ইন্তেজার কর রহি হেঁ।

মগনরাম : কৌন—নন্দলালা ?

কংশ : হ্যায় কোই।

মগনরাম : আচ্ছা !

কংশ : ঔর এক বাত ইয়ে হ্যায় কি if you agree to pay this sum you will have to close the deal to-day by five P.m., আজ পাঁচ বাজেকে অন্দর আপকো রুপেয়া দেনা পড়েগা।

মগনরাম : পাঁচ বাজেকা অন্দর ? হায় সিয়ারাম ! ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা বাবুজী ? আপ কেয়া সমঝা Reserve Bank কী Currency মেরে ঘরমে বনতা হ্যায় ?

কংশ : তো ফির কেয়া শেঠজী !

মগনরাম : নেহি বাবুজী, উতনা তাগদ্ নেহি হ্যায় মগনরামকা। আপ দুসরি পার্টিকো দে দিজিয়ে। ···কেয়া বলুঁ রামজী ভরোসা

[মগনরাম-এর প্রস্থান]

[কংশ টেলিফোন তুলে নিয়ে আয়ার-কে রিং করে]

কংশ : Ayar, please see me.

[কাগজ ও ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কংশ। একটু পরেই আয়ার প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে টেলিফোনটা আবার জোরে বেজে ওঠে। আয়ার রিসিভার তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে]

আয়ার : Yes···(কংশ-কে) Trunk call from Bombay office sir.

কংশ : Must be Mr. Hammerton.

আয়ার : Just a moment please.

[কংশ-কে রিসিভার দেয়]

কংশ : Yes Mr. Hammerton, speaking—hm'·· hm'···hm'··· no, no, hm'—no, no sir—no further tenders and no further buying and selling of shares—sorry I mean, no no—by shares I meant···Mr. Hammerton—listen Mr. Hammerton—Hallo—Hallo···

আয়ার : By jove, you talked of shares। শেয়ার কি বাত আপনে কেঁও উঠায়া।

কংশ : Did I ! Mistake, A slip of tongue.

আয়ার : A slip !

কংশ : A slip. Give me the phone. (ফোন নেয়) Yes, Hallo Hallo·· Hallo···Hallo, no connection. (ফোন রেখে দেয়)

···But how could I talk of shares !

আয়ার : Just a slip.

কংশ : A slip and I go down. (পায়চারি করে) You can go Mr. Ayer.

আয়ার : Right sir.

[আয়ার-এর প্রস্থান]

[অ্যানির প্রবেশ]

কংশ : Any news Anne ?

অ্যানি : রঞ্জন আসবে, এখনি আসবে। আমি তাকে কিছু বলেছি। তুমি

তাকে বুঝিয়ে বলবে। He is simply mad after your sister.

কংশ : But that's a mad house. Father won't listen and that slip of a girl Kalyani, Oh, hopeless.

অ্যানি : Only a gesture from Kalyani earns you three to five lacks, honestly.

কংশ : আচ্ছা কল্যাণীর সঙ্গে তোমার এখন terms কেমন ?

অ্যানি : খুব ভালো।

কংশ : তুমি বললে সে শুনবে ?

অ্যানি : How do I know that. পার্টি দিলাম, দু-জনকে Dinner-এ নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম, কি হলো ?

কংশ : হুঁ।···(তাড়াতাড়ি গিয়ে ড্রয়ার টেনে চিঠি আর ফাইল পত্তরের কাগজ বার করে ছিঁড়তে আরম্ভ করে এবং পোড়াতে থাকে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় ঘরখানা। আরাম কেদারায় শুয়ে অ্যানির চোখে ঘুম এসেছিল, হঠাৎ সে কাশতে আরম্ভ করে একটানা)

অ্যানি : [কাশতে কাশতে] What this smoke nuisance ? কি করছ তুমি ?

কংশ : উঁ, না। কতকগুলো document—পুড়িয়ে দিলাম। কি হলো তোমার ? অ্যানি !

অ্যানি : A glass of water please···

[কংশ টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস অ্যানিকে দেয়। জল খায় অ্যানি। রুমাল ভিজিয়ে চোখে মুখে কপালে দেয়]

···horrible. What did you say.

কংশ : When ?

অ্যানি : Was it a fire.

কংশ : It is all over.

অ্যানি : Help me. I must take some rest,

কংশ : Come. Give me your hand.

[অ্যানিকে নিয়ে ভেতরে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে আবার কাগজ ছিঁড়তে থাকে]

[রঞ্জনের প্রবেশ]

…এসো এসো রঞ্জন এসো। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে বসে আছি।

রঞ্জন : বৌদি আসেন নি ?

কংশ : এখনি আসবেন। তুমি বসো।

রঞ্জন : তোমার অফিস কি এখনও চালু নাকি দাদা! clerks-রা এখনও কাজ করছে দেখলুম।

কংশ : না, অফিস formally বন্ধ; তবে রাত্রেও কাজ হয়। অসম্ভব pressure তো!…Home life বলতে তো সব ধুয়ে মুছে গেছে।…এর চাইতে field work-ও ভালো। দশটা পাঁচটা খেটে খুটে বাড়ি ফিরে, উঁ…স্ত্রী অপেক্ষা করবেন সেজেগুজে, মান অভিমানের দু-চারটে কথাবার্তা হবে, most normal যা ব্যাপার—nothing is possible in my position. লাখ লাখ টাকার responsibility, businees expand করছে চতুর্গুণ অথচ ব্যাটারা মাছের তেলে মাছ ভাজতে চায়—ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর। আরে তাহলে Incorporated in India কথাটি লিখিস কেন ? তুলে দে।

রঞ্জন : কোম্পানি তো আপনাদের দারুণ solvent দাদা!

কংশ : তবে আর বলছি কি ? India Limited হবার পর থেকে স্রেফ overdraft-এর ওপর কাজ চলছে, cash balance কানাকড়ি। খবর রাখো ? এদিকে পাউণ্ড স্টার্লিং-এর গ্যাঁড়াকল ধরে fifty percent-এর ওপর profit চলে যাচ্ছে বাইরে। National economy, national wealth—এসব হবে কোত্থেকে ?

রঞ্জন : ও সব বড় বড় ব্যাপার। ও নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন ? চাকরী করছেন চাকরী করে যান।

কংশ : তাই তো করছি ভাই। দিনে কুলিয়ে উঠতে পারছি নে বলে রাতেও কাজ করছি, দেখছই তো।

রঞ্জন : Director's Board-এ গেলেই পারতেন এবার। offer তো দিয়েছিল আপনাকে।

কংশ : ঢাল নেই তরোয়াল নেই, অমন নিধিরাম ডিরেক্টর হয়ে আমার লাভ? সেই তো মাইনে নিয়ে কাজ করতে হবে। Share-holder তো আর করবে না?

রঞ্জন : তা অবিশ্যি ঠিক।

কংশ : তো তবে?···By the by, হেসিয়ানের tender-টা তোমরা দিয়েছ ভাই কিন্তু তাতে করে তোমরা কিন্তু honest quotation quote করো নি। আমি অবিশ্যি তোমাদের quotation-ই accept করে নিচ্ছি কিন্তু আমার commission-টা কিন্তু এবার ভাই কত্তাকে বলে···

রঞ্জন : Leave that to us. আপনি কিছু বলবেন না তো!

কংশ : বলিনি তো! বলো, কিছু বলিছি?

রঞ্জন : না, আপনি কেন বলবেন? তাহলে আমরা আর কি করতে আছি।···By the by, আপনার Studebaker Van, সেই যে বলেছিলেন না, ছ-মাস আগেই বাবা সেই order-টা place করেছিলেন; য়্যাদ্দিনে সেটা এসেছে।

কংশ : এসে গেছে!

রঞ্জন : বাবা বলছিলেন—আপনি আবার ইতিমধ্যে আমি আপনাকে বলেছি বলে ফাঁস করে দেবেন না কথাটা। ওটা আগামী 14th September আপনার গ্যারাজে তুলে দেওয়া হবে।

কংশ : ও! But why 14th?

রঞ্জন : বাঃ!

কংশ : ও জন্মদিন! সত্যি অতবড় একজন লোক হয়েও যে আমাদের মতো চুনোপুঁটির জন্মদিনের কথাটা কি করে মনে রাখেন এ এক তাজ্জব ব্যাপার! সত্যিই!

রঞ্জন : পাটের বাজার কিন্তু দাদা এবার সাংঘাতিক মন্দা।

কংশ : হোক না। ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার কথার কোনো খেলাপ হবে না। মাল আমার চাই-ই, মাল আমি নেবও। সুতরাং পাটের দর বাড়ল কি কমল, তোমাদের তো কিচ্ছু এসে যাচ্ছে না।

রঞ্জন : আপনি ভরসা দিলে অবিশ্যি নিশ্চয়ই এসে যাচ্ছে না।

কংশ : এখন কথা হচ্ছে ভরসা তো ভাই দিয়ে যাচ্ছি সবাইকে, এদিকে নিজে কোনোই বরাভয় পাচ্ছি না। কি মানুষ, কি ভগবান, কেউ-ই মুখ তুলে চাইছেন না। আচ্ছা আমরা একটু কফি খাব না? কোথায় গেলে গা? অ্যানি, অ্যানি, অ্যানি! তোমার বৌদির তবিয়তটা আজ খুব একটা ভালো নেই। তাই একটু rest-এ আছে ভেতরে।

রঞ্জন : কি, অসুস্থ নাকি?

কংশ : না, অসুস্থ ঠিক নয়; ···আসছে, এক্ষুনি আসবে।

[চেয়ারে গিয়ে বসে। কাগজপত্র দেখে। ড্রয়ার বন্ধ করে। রঞ্জন ইতিমধ্যে পকেট থেকে একখানা চেক বই বার করে চেক ছিঁড়ে কংশ-র হাতে দেয়]

রঞ্জন : [চেক দেয়] এই নিন দাদা।

কংশ : কি? এটা আমার কি? (দেখে) রঞ্জন!

রঞ্জন : সামান্য ব্যাপার! ওটা কিন্তু আপনার personal..

কংশ : ও। লাখ টাকা নিশ্চয়ই সামান্য বলব না। Need I thank-you for this!

রঞ্জন : না, কোনো দরকার নেই! আপনি হয় তো জানেন না দাদা, Roy and Roy Company-র Director's Board-এ বাবা আমাকে এবার জোর করে ঢুকিয়ে নিয়েছেন।

কংশ : Really! I am really happy Ranjan. খুব ভালো কথা। After all we need stout hearts for stout projects. New blood must come in.

[কফি নিয়ে অ্যানির প্রবেশ]

···শুনেছ অ্যানি, রঞ্জন এবার রয় এণ্ড রয় কোম্পানির ডিরেক্টরস্ বোর্ডে গেছেন।

অ্যানি : Really, how we cherished it Kansha.

কংশ : Happy news, very happy news.

রঞ্জন : আপনারা তো খুশি হবেন জানি-ই। গত বছরই বাবা নিয়ে নেন। আমিই আপত্তি করেছিলাম। বড্ড ঝামেলা আর ঝক্কি।

কংশ : তা নিতে হবে ঝক্কি। তোমরাই তো ঝক্কি নেবে এখন। I am really happy Ranjan.

রঞ্জন : কৈ, কল্যাণীকে তো দেখছি না বৌদি। আসে নি হয়তো!

অ্যানি : কি জানি, আসবার তো কথা ছিল। আমি অপেক্ষা করে আছি তার জন্যে।

কংশ : একবার রিং করে দ্যাখো না।

অ্যানি : করেছিলাম, বাড়িতে নেই।

কংশ : Appointment fail করা কিন্তু ভারি অন্যায়। আমি এটা একদম পছন্দ করি না।

রঞ্জন : না না, appointment কিছু ছিল না।

কংশ : আচ্ছা, বৌদির সঙ্গে তো ছিল। She should have come by this time.

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা : রায় সাব আয়া হ্যায় হুজুর।

কংশ : রায় সাব?

বেয়ারা : জী হাঁ সাব, বড়া রায় সাব।

কংশ : সে কি, জলদি যাও, সেলাম দো—অ্যানি!

রঞ্জন : বাবা হঠাৎ!

[সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় মিঃ রায় প্রবেশ করেন]

মহীতোষ : খবর বার্তা না দিয়েই এলাম।

কংশ : আসুন আসুন।

মহীতোষ : টেলিফোন-এ কথাটা না বলে আমি নিজেই এলাম। (রঞ্জনকে) তুমি কতক্ষণ!

রঞ্জন : এই কিছুক্ষণ হবে। একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম।

মহীতোষ : তা দাও। চেক-টা দিয়ে দিয়েছ?···অ! কিন্তু ব্যাপার হয়েছে যে ইতিমধ্যে একটা emergency develop করেছে; চেকখানা···

কংশ : কিছু বলবেন আমায়।

মহীতোষ : হ্যাঁ, মানে চেকখানা ভাই তুমি 15th-এর পর ব্যাঙ্কে produce করলে ভালো হয়। কেন না, for some reasons of clearence এই account temporarily operate করছে না। After 15th যে কোনো date, কি, অসুবিধে হবে?

কংশ : না, মানে ব্যাপার হয়েছে যে···

মহীতোষ : একটু manage করে নাও, একটু! তাই আমি ফোন না করে একেবারে নিজেই এলাম। (উঠে পড়েন) রঞ্জনকে এবার Director's Board-এ নিইছি, শুনেছ নিশ্চয়ই।

কংশ : সেই কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ।

মহীতোষ : হ্যাঁ নিয়ে নিলাম, আচ্ছাঃ! (অ্যানিকে) What about that dimple, Anne.

অ্যানি : Dimple you said!

মহীতোষ : Yes, dimple on your cheeks when you smiled.

অ্যানি : Oh Mr. Roy, now you will find only the depression.

মহীতোষ : Why, you have not grown older as all that.

অ্যানি : Yes, but too old to have that dimple Mr. Roy.

মহীতোষ : Is it so ?...So it is—hm'—hm'—hm'—churio everybody, good night, good night.

[মহীতোষ ও রঞ্জন রায়ের প্রস্থান]

কংশ : Everything seems conspiring.

অ্যানি : What has happened ?

কংশ : তুমি ঢোকবার একটু আগে, রঞ্জন আমাকে একলাখ টাকার একখানা চেক দিলেন। কিন্তু তারপরই মিঃ রায় এসে সেই চেকটা withhold করতে বলে গেলেন—ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভালো লাগছে না।

অ্যানি : মগনরাম আগরওলা এসেছিল তোমার কাছে। তুমি তাকে কিছু বলেছিলে ?

কংশ : কাজের কথা ছাড়া কি বলেছিলাম মগনরামকে! মনে নেই।

অ্যানি : মিঃ রায় হয়তো মগনরামের কাছ থেকে কোনো কথা জেনে থাকবেন।

কংশ : কিন্তু কি কথা বলতে পারি আমি মগনরামকে!

অ্যানি : সে তুমি জানো কি বলেছ তুমি তাকে।

কংশ : তবে কি বম্বে অফিস টেলিফোনে যোগাযোগ করল মিঃ রায়ের সঙ্গে। বুঝতে পারছি না। না কি মিঃ হ্যামারটন···

অ্যানি : Why lose nerve darling !

কংশ : Anything may happen now, any time.

অ্যানি : But nothing must upset you.

কংশ : I am failing Anne.

অ্যানি : No darling, no. Steady, please be steady...

[বাহুবন্ধনে বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেয় অ্যানি]

...My Lord, oh God.

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইংরুমে সান্ধ্য ঘরোয়া মজলিস বসেছে। কল্যাণী একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। লতা, সুহাস ও অসীম তন্ময় হয়ে সেই গান শুনছে। একটু পরেই গান শেষ করে উঠে আসে কল্যাণী।

কল্যাণী : কি, কাঠপুতলির মতো সব চুপচাপ বসে আছো ! এত কষ্ট করে গান শোনালাম, একটু appreciate করো ! লতা বৌদির নিশ্চয়ই ভালো লাগে নি।

লতা : এমন চমৎকার লাগছিল না, কি বলব !

অসীম : আচ্ছা কল্যাণী, তুমি যখন গান করো, তখন গানের কথাগুলোকে তুমি একান্তভাবেই বিশ্বাস করে গান করো, না ?

কল্যাণী : হ্যাঁ কথামাত্রিক গান, কথাগুলোকে অপ্রধান করলে কোনো গানই ভালো করে গাওয়া হয় না। গাওয়াও হয় না আর শুনতেও ভালো লাগে না।

সুহাস : কথা দিয়ে সুরের খেই মাপা, এ-এক রবীন্দ্রসঙ্গীতেই সম্ভব হয়েছে। দু-তিনটে করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে কি শুনলে আমার তো মনে হয় অসীম, এই যে আমরা রোজ পুজোপাঠ করি না, তারও দরকার হয় না। গার্হস্থ্য জীবনে পাঁচটা কাজের মাঝখানে জীবন-যন্ত্রের এই সরলীকরণ, আমার মনে হয় মানুষের কল্যাণে রবীন্দ্র-প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ অবদান। ফুল চন্দনের মতো ছিটিয়ে দাও, দেখবে মরা মানুষ তাজা হয়ে উঠবে। বড় ভালো লাগে আমার।

অসীম : অতি সত্যি কথা বলেছেন মা আপনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচকরাও ঠিক এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করেন, শুধু পণ্ডিতি করেন বলে তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না।

লতা : আচ্ছা সেই গানটা কল্যাণী, সেই যে সেদিন গাইছিলে না, কি যেন মুখটা, আহা মনে পড়ছে না কথাগুলো···

কল্যাণী : কোনটার কথা বলছ? পূর্ণ চাঁদের মায়ায়?

লতা : উঁহু।

কল্যাণী : তবে?

অসীম : প্রফেসর তো এখনও এলেন না কল্যাণী, আমি উঠি তবে।

কল্যাণী : এত তাড়া কিসের মশাই আপনার?

সুহাস : এক্ষুণি এসে পড়বেন। সময় হয়ে গেছে। আর একটু না হয় বসো।

[রঞ্জনের প্রবেশ]

লতা : রঞ্জন! এসো এসো।

রঞ্জন : অমল আছে?

লতা : এখনই, তার ফিরতে রাত দশটা।

রঞ্জন : অথচ আমাকে টেলিফোন করে বললে যে আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরব তুই অবিশ্যি আসিস, কথা আছে।

লতা : তাহলে নিশ্চয়ই ফিরবে। বসো না।···আলাপ করিয়ে দেই— (অসীমকে) রঞ্জন রায়, নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই।

অসীম : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

লতা : বর্তমানে Mining Federation-এর একজন হর্তাকর্তা, Chamber of Commerce-এর একজন উদ্যোগী সভ্য···

রঞ্জন : আর!

লতা : কেন, অন্যায় কিছু বলেছি?

রঞ্জন : না। তা ওঁর পরিচয়টা দাও।

অসীম : আজ্ঞে আমার নাম অসীম সেন।

রঞ্জন : নমস্কার। আপনিই তো Nuclear Physics-এর ওপর Research Scholarship নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন?

অসীম : আজ্ঞে।

রঞ্জন : বেশ। ও সব বড় বড় ব্যাপার কি যেন মশাই আমার মাথায় আসে না। কল্যাণীরা ভালো বুঝবেন।

কল্যাণী : আপনার মাথায় এলে তো য়্যাদ্দিনে আপনি ছুঁড়েই মারতেন।

রঞ্জন : কি?

কল্যাণী : Atom Bomb.

রঞ্জন : ও! সত্যিই কি অসাধারণ মেধা তোমার কল্যাণী। ভূয়োদর্শনটা তোমার এমন সুন্দর হয়েছে, ভাবতেই পারি নি।

কল্যাণী : সেই জন্যে তো বলি আপনি বোকা। দেখেও বুঝতে পারেন না।

রঞ্জন : তাই দেখছি। তারপর বৌদি, খবর কি আর সব বলো।

অসীম : আমি তাহলে উঠি আজ কল্যাণী। মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে আমি না হয় কাল Laboratory-তে দেখা করব।

কল্যাণী : আচ্ছা।

[রসময়ের প্রবেশ এবং সুহাস ও লতার প্রস্থান]

রসময় : আরে এই যে অসীম! অনেকক্ষণ বসে আছ নিশ্চয়ই! কি করব, Prof Soong এসে মাঝখানে দেরি করিয়ে দিলেন। বিদেশী লোক, অভ্যাগতজন, পণ্ডিতব্যক্তি, উঠি উঠি করে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। এসো এসো, আমরা বরং ওপরে যাই। তারপর রঞ্জন! (অসীমকে) রঞ্জনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে অসীম?

অসীম : আজ্ঞে হ্যাঁ!

রসময় : খুব enterprising ছেলে। ওর বাপ একজন ধনকুবের বললেও হয়—শ্রীযুত মহীতোষ রায়; নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। বর্তমানে Private Sector-এ যে কটা heavy industry গড়ার scheme হচ্ছে তার মূলে আছেন রায়মশাই। খুব করিতকর্মা লোক। তা বসো তোমরা, গল্পসল্প করো। এসো অসীম।

[মহীতোষের প্রস্থান]

অসীম : [কল্যাণীকে] বাঃ, তুমিও চলে যাচ্ছ, উনি একা রইলেন, বসে গল্পটল্প করো!

[অসীমের প্রস্থান]

রঞ্জন : কি হলো ? তুমি গেলে না ?

কল্যাণী : না বসি। আপনি একা বসে থাকবেন !

রঞ্জন : হুঁ, আচ্ছা কল্যাণী !

কল্যাণী : বলুন।

রঞ্জন : বললে তো তুমি আবার চটে যাবে।

কল্যাণী : তা হলে চটাবেন না।

রঞ্জন : হয়তো এ বাড়িতে আর আমার আসা ঠিক নয়, কি বলো ?

কল্যাণী : সেটা আপনিই বুঝবেন ভালো। তবে কেনই বা আসবেন না। বন্ধুর বাড়ি।

রঞ্জন : কে বন্ধু !

কল্যাণী : কেন, আমার ছোড়দা, বড়দা, সবাই তো আপনার বন্ধু। বন্ধু আর তা ছাড়া business relation রয়েছে আপনার তাদের সঙ্গে।

রঞ্জন : হ্যাঁ, তবে business relation রাখার জন্যে রঞ্জন রায়কে কারো বাড়ি যেতে হয় না। এখানে আসি, তোমাকে ভালোবাসি বলে। বিশ্বাস করো কল্যাণী। তুমি ভাবছ…

কল্যাণী : আমি কিছুই ভাবছি না রঞ্জনবাবু। আমি শুধু দায়ে পড়ে বসে আছি। ছোড়দা কি লতা বৌদি যে কেউ আসলেই আমি উঠে যাব।

রঞ্জন : কেন কল্যাণী !

কল্যাণী : ঐ সব কথাই যদি আপনার আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তো তার জবাব আমি আপনাকে অনেকদিন আগেই দিয়ে দিয়েছি।

রঞ্জন : আমিই শুধু বেহায়ার মতো সেই পুরনো কথার অবতারণা করছি, এই তো !

কল্যাণী : হ্যাঁ। আমি উঠলাম।

রঞ্জন : আচ্ছা বসো, আমরা আবহাওয়া নিয়ে কথাবার্তা কই ; কেমন ? কল্যাণী !

কল্যাণী : না।

[কল্যাণীর প্রস্থান]

[রঞ্জন রায় ধপ করে সোফায় বসে পড়ে সিগারেট ধরায়]

[কংশ-র প্রবেশ]

কংশ : কে রঞ্জন।...এই রঞ্জন, তোমরা আমার টাকাটা ভাই কিন্তু আজও দিলে না। দিয়ে দিও, জানো! বড্ড অসুবিধেয় আছি। এই জাগতিক অসুবিধে আর কি। মেমসাহেব বৌদি, বুঝতেই পারছ। সিগারেট আছে? (সিগারেট নেয়) আরে বাবা বড় জোর না হয় দু-দশ বছর জেলই হবে। ফাঁসি তো আর দিতে পারবি না!

রঞ্জন : আপনি বসুন।

[কংশ ধপ করে বসে পড়ে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। রঞ্জন ইত্যবসরে উঠে ঘর থেকে চলে যায়। রঞ্জনের জায়গায় বীরু এসে বসে চুপ করে। কংশ একঝুল ঘুমের পর চোখ চেয়ে দেখে—রঞ্জন নেই। তার জায়গায় বীরু বসে আছে। দেখছে সে তাকে।]

কংশ : রঞ্জন। (বীরুকে) তুমি আবার কোত্থেকে।

বীরেশ : বাবা কোথায় বড়দা?

কংশ : বাবা, বাবা বাবার ঘরে।

বীরেশ : আচ্ছা একটু বসেই যাই।...তারপর বড়দা!

কংশ : কি বড়দা!

বীরেশ : এই খবর-টবর!

কংশ : চলছে।

বীরেশ : না, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কংশ : তারপর, তোমার construction কেমন চলছে?

বীরেশ : খুব জোর, দিনরাত কাজ চলছে। নদীর জল ধাঁক ধাঁক করে বাড়তে শুরু করেছে তো! এখন সব তড়িঘড়ি ব্যাপার।...মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে contractor.

কংশ : তুমি কি করছ?

বীরেশ : আমি আবার কি করব। চাকরি করছি।...যাগগে, ওসব কথা ছাড়ো। তোমার মামলার খবর কি তাই বলো।

কংশ : চলছে মামলা।

বীরেশ : Barrister হাজরা কি বলে?

কংশ : কি আর বলবে। হাজার এক টাকা করে daily গুনোগার দিচ্ছি।

বীরেশ : Justice সেন-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন বাবা ?

কংশ : সম্ভবত।

বীরেশ : ভেঙে পড়ো না, ভেঙে পড়ো না।

কংশ : শালা Indian Constitution-ই ultravires করে দিলে! কপাল কপাল! পড়তো সেন-এর এজলাসে!

বীরেশ : ও সব সমান, সব।…ছাখো কি হয় শেষ পর্যন্ত।

কংশ : আমি ছাড়ব না। আমি ছাড়ছি না। দরকার হলে U. N. O. পর্যন্ত যাব।

বীরেশ : ঐ সব ছাড়ো, হুঁ! U. N. O. যাচ্ছেন!

কংশ : তুমি দেখে নিও। Anne! Anne!

বীরেশ : মনগড়া বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে আছ সব।

[সুহাস-এর প্রবেশ]

…এই যে মা, এসো, বসো।

কংশ : অ্যানি কোথায় মা! অ্যানি!…

[কংশ-র প্রস্থান]

সুহাস : মা তো বুঝলাম ; কতক্ষণ এইছিস ?

বীরেশ : এই কিছুক্ষণ।

সুহাস : তা কি ভুলিও ইতিমধ্যে একবার বাড়ি আসতে পারো নি!

বীরেশ : কি করে আসব! চব্বিশঘণ্টা দিনরাত কাজ চলছে ড্যামে। দাঁড়াও, আগে প্লাবন সামলাই।

সুহাস : এদিকে কংশ-র ব্যাপার নিশ্চয়ই শুনিছিস ?

বীরেশ : কিছু কিছু।

সুহাস : এখন কি হবে বল তো!

বীরেশ : দু-দিন বাদে জজ-এর মুখেই শুনতে পাবে।

সুহাস : কংশ তো বলছে এমন তেমন হলে ও সুপ্রীম কোর্ট অবধি যাবে।

বীরেশ : শুধু সুপ্রীম কোর্ট, U. N. O. পর্যন্ত বলছিল। পাগল না মাথা খারাপ!

সুহাস : তা এখন মাথা খারাপের মতোই হয়েছে!

বীরেশ : বোকার মতো ডান হাত বাঁ হাত করতে গিছলেন কেন? একশ ষাটটা কম্পানি খুলে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যবসা করছে তারা, উনি গেছেন তাদের ওপর টেক্কা দিতে।

সুহাস : কেন, আমাদের সাঁটুল মিত্তির কি করল ? নাবালক দুই ছেলের নামে কোম্পানি খুলে চার কোটি টাকা গায়েব করে দিলে। কেউ তার টিকির নাগাল ধরতে পারলে ! ও বোকা, তাই…

বীরেশ : বোকা হলেই ঠোকা খেতে হবে। এই তো, সামনের ওপর পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি…[কথার মাঝখানে ফোন বেজে ওঠে। বীরেশ ফোন ধরে) হ্যালো, কে ?—কাকে চাই ?…হ্যাঁ আমি বীরেশ গুপ্ত কথা কইছি।…

সুহাস : তা কি রাত্তির বেলা খেয়ে যাবি তো ?

বীরেশ : …আপনি কে কথা বলছেন ? হ্যালো, কি হয়েছে কি ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ ! তা ওখানে য়্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কেউ নেই ? কি আশ্চর্য, আমি…। না ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সবে তো ঘণ্টাখানেক বাড়ি ফিরেছি। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি spot-এ—contractor আছেন ?—গাঙ্গুলি সাহেব ?—কেউ না ?—আমি এক্ষুণি রওনা হয়ে যাচ্ছি—(ফোন রেখে দেয়) যা ভেবেছি !

সুহাস : আবার তোর কি হলো ?

বীরেশ : সাত মাসের কাজ সাত দিনে সারবে, Concrete set in করতেই দিলে না। এবার নির্ঘাত মরিছি।

সুহাস : তা সে বুঝবে এখন কণ্ট্রাকটর ; তার দায়িত্ব।

বীরেশ : Explanation তো আর সে দেবে না। ধরতে চেপে আমাকেই ধরবে। Supervising Engineer ! কয়লা করে ছেড়ে দিলে জান ! আমি চল্লাম।

[কংশ-র প্রবেশ]

কংশ : বীরু হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল ! কি হয়েছে মা ?

সুহাস : গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ওদিকে বীরুর construction site-এ কি যেন গণ্ডগোল হয়েছে।

কংশ : এখন থেকে 15th অবধি রাহুর দশা যাবে মা। প্রত্যেকেরই একটু করে খারাপ যাবে।

সুহাস : তোর এখন এই সব হচ্ছে। পুরুষকার ধুয়ে মুছে গেল, এখন হয়েছে অদৃষ্টবাদ। কি যে করছিস তোরা সব !

কংশ : আমরা আবার কি করলুম মা

[রসময়-এর প্রবেশ]

রসময় : না, সবই তিনি করাচ্ছেন। কি ব্যাপার কি? চেঁচামিচি কিসের?

সুহাস : ওগো বীরুর camp-এ না জানি আবার কি গণ্ডগোল হয়েছে।

রসময় : Camp-এ?

সুহাস : না না Camp-এ কেন হতে যাবে, Dam-এ, Dam-এ।

রসময় : তাই বলো, বাঁধ-এ। কি হয়েছে কি বাঁধে?

সুহাস : কি যেন হড়বড় করে কি সব কথা বল্লে ভালো করে বুঝতেও পারলাম না—কথা বলতে না বলতে এক ফোন—জিজ্ঞাসা করলুম রাত্রে খেয়ে যাবি তো? তা কোথায় খাওয়া কার খাওয়া···

[ফোন বেজে ওঠে]

রসময় : [ফোন তুলে] হ্যালো···হ্যালো······

[নেপথ্যে জলোচ্ছ্বাস-এর শব্দ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

বাঁধ-এর পাঁচ নম্বর গুমটি ঘর। ভেতরটা ভীষণ আর্দ্র, জলাজলা, পিচ্ছিল। লণ্ঠন ও টর্চ নিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। জলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও হাতুড়ি পেটার যান্ত্রিক ধাতব শব্দ শোনা যাচ্ছে। লোকজনের ত্রস্ত আনাগোনার সঙ্গে উচ্চৈস্বর হাঁকডাকও কানে আসছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে দৌড়ঝাঁপ করে। লোহার একটা মই-এ পা দিয়ে ঝুলে দাঁড়িয়ে একজন মিস্ত্রী সিলিং-এ কাজ করছে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দেখা যায়। জলের শব্দ, মিস্ত্রীর হাঁকডাক, লোহা বেড়ি হাতুড়ির শব্দে মুখর পরিবেশ।

জনৈক শ্রমিক ১নং : ইসমাইল।

নেপথ্য উত্তর : হাঁ।

কণ্ট্রাকটর : যুগল কি করছ—চার নম্বর গুমটিতে যাও।

শ্রমিক ২নং : যুগল।

[সাব ইঞ্জিনিয়ারের দ্রুত প্রবেশ]

কণ্ট্রাকটর : কি মশাই সব আপনাদের কাণ্ডবাণ্ড! বীরেশবাবু কোথায়

গেলেন ! Unprecedented ব্যাপার সব ! Crack করে গেল !

সাব ইঞ্জিনিয়ার : সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। Highest high water level exceed করে গেছে স্যার দেখলাম।

কন্ট্রাকটর : আরে স্যার মশাই, তাতে কখনও Dam crack করে? আপনি আমায় শেখাচ্ছেন ? Safety factor নেই ?

সাব ইঞ্জিনিয়ার : Concrete set in করবার সময়ই তো পেল না স্যার। Construction-এর মাত্র তিন হপ্তার ভেতরেই জল highest water level reach করে গেল ; আমি তাই বলছিলাম···

কন্ট্রাকটর : তার জন্যে flood দায়ী। আমি নই।

সাব ইঞ্জিনিয়ার : ছি ছি, আপনাকে কে বলছে ?

কন্ট্রাকটর : হাঁ, কই এখনও তো এলেন না বীরেশবাবু।

[ওপর থেকে কর্মনিরত মিস্ত্রী লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে]

মিস্ত্রী : Spillway Bay-র একটা top দু-ফুট wash out হয়ে গেছে।

কন্ট্রাকটর : য়ঁ্যা, কি বলে কি ! তুমি ঠিক বলছ ? নাঃ !

[দ্রুত প্রস্থান]

২নং ইঞ্জিনিয়ার : Factor of safety দেখাচ্ছেন ! (মিস্ত্রীকে) Soil testing defective ছিল, যার জন্যে foundation হয়তো fail করছে। তা, বলা যাবে এ কথা ! Safety factor-এর পেছনে তোমরাই তো বংশদণ্ড দিয়ে বসে আছ।

মিস্ত্রী : Unadaltrated গঙ্গামাটি মশাই—কে test করেছে cement ? বলতে গেলে অনেক কথা উঠে পড়বে। বলে চাকরী খোয়াব ? ও cement-এর character certificate যিনি দিয়েছেন, তিনি থেকে এখানকার top Boss অবধি ; সবাই সমান। জাল গুটোলে দেখবেন সব বড় বড় রুই কাতলা উঠে আসবে। চেপে যান না।

২নং ইঞ্জিনিয়ার : চাপতে চাপতে তো চাপা পড়বার অবস্থা হলো। কি সাংঘাতিক কাণ্ডবাণ্ড ভাবতে পারেন ?

মিস্ত্রী : লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

২নং ইঞ্জিনিয়ার : গৌরীসেন আর দেবে কোত্থেকে।

মিস্ত্রী : কেন, আবার টেক্স বসবে। ছু-টাকা সের বেগুন কিনব আমরা—ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?

২নং ইঞ্জিনিয়ার : ঐ বোধহয় সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। নিন, একটু ঘোরাঘুরি করুন—কাজ দেখান, কাজ দেখান।

[ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাকটর পরিবৃত বীরেশ গুপ্ত-র দ্রুত প্রবেশ]

বীরেশ : কি হয়েছে কি, দেখি। এই বাত্তি মারো। আলো কোথায় ?...

[শ্রমিকরা আলো হাতে ছুটোছুটি করে। দেখা যায় স্চ্যগ্র ছিদ্র পথ দিয়ে তীরের মতো জল ভেতরে ঢুকছে বিভিন্ন source থেকে]

...গ্যালারির ভেতরকার জল immediately pump out করবার ব্যবস্থা করো। Generator সরিয়েছ ?

সাব ইঞ্জিনিয়ার : এক্ষুনি হয়ে যাবে স্যার।

বীরেশ : হয়ে যাবে, আর কখন হবে ? এতক্ষণ তোমরা কি করছিলে ? সেন কোথায়, সেন ?—যাও, চটপট করো, চটপট করো। Pump house থেকে pumpগুলো সব সরাও। দেরি হলে আর সব পাবে না। ইসমাইল, কাত্তিক-কে ডাকো, কাত্তিক !

[জনৈক মিস্ত্রীর দ্রুত প্রবেশ]

৩নং মিস্ত্রী : Under sluice ছ-নম্বর opening collapse করছে স্যার।

বীরেশ : কি বলছ কি ?

৩নং মিস্ত্রী : হাঁ স্যার।

বীরেশ : কি স্যার ?

৩নং মিস্ত্রী : ছ-নম্বর opening sir.

[কথাবার্তার মাঝখানে তীর্যক গতিতে জল বিভিন্ন ছিদ্রপথ দিয়ে তীরের মতো ঢুকে বীরেশ, কণ্ট্রাকটর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির গায়ে ও ভেতরকার দেওয়ালে লেগে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধূমায়িত হয়ে ওঠে]

কণ্ট্রাকটর : তাহলে !

বীরেশ : তাহলে আপনি তো আমার contract renew করবেন। আমার চাকরীটা খেলেন তো ?

কণ্ট্রাকটর : বিশ্বাস রাখলে আবার চাকরী পাবেন। গবর্নমেণ্ট তো আর কম্বিক হাতে করে Dam Construction করতে আসবে না। বাঁধ বাঁধতে হলে আবার আমাদেরই দ্বারস্থ হতে হবে ; কি বলেন ?

বীরেশ : তখন একটু দেখবেন Sir.

কণ্ট্রাকটর : দেখব বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখব। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে দেখব, পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কখনও কাজ-কারবার চলে ?

বীরেশ : আপনি মাইরি বিশ্বকর্মা !

কণ্ট্রাকটর : তবে, গড়ো আর ভাঙো, ভাঙো আর গড়ো, এই তো লীলাখেলা, নাকি ? হা-হা-হা-হা··· !

[কণ্ট্রাকটরের অট্টহাসির কলরোলে আর দুরন্ত জলকল্লোলের শব্দের হট্টগোলের মাঝে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

মন্থর পর্দা

চতুর্থ দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইং রুম। ফোন বেজে চলেছে। সামনেই বসে আছে অমল গুপ্ত, বসে আছে, অথচ ফোন ধরছে না। বেয়ারা ঢোকে। বাবুকে দেখে বেরিয়ে চলে যায়। ফোন বেজে বেজে থেমে যায় সাময়িকভাবে।

[অমল গুপ্ত-র প্রস্থান]

(আবার ফোন বাজতে থাকে)

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : হ্যালো, কে। অসীম !···তাই নাকি ? কি জানি কেন attend করা হচ্ছিল না ফোন।···হবে। এ বাড়ির এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মেজদার ব্যাপার শুনেছ ?···আমার আর এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না এদের সংসর্গ। তুমি আসবে আজ ? আমি কিন্তু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। আচ্ছা, আচ্ছা ! (রিসিভার রেখে দেয়)।

[লতার প্রবেশ]

লতা : কার ফোন কল্যাণী ?

কল্যাণী : আমার।

লতা : রঞ্জন ফোন করছিল বুঝি !···

কল্যাণী উত্তর দেয় না]

···যাগগে, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার ছোড়দাকে যদি কেউ ফোন করে তো বলে দিও উনি কলকাতায় নেই। আর কিছু বলবার দরকার নেই।

কল্যাণী : আমি তোমায় ডেকে দেবো, তা হলেই হবে।

লতা : তাই দিও। তারপর ?

কল্যাণী : কি তারপর ? হাসছ যে মুখ টিপে ?

লতা : প্রাণ খুলে হাসবার আর সুযোগ দিলে কোথায় বলো। সবটুকু আনন্দই তো একান্তভাবে গোপনীয় করে রেখেছ দিদি। তবু যেটুকু হাসি, একান্তই অনুমানে, অনুভবে; বলতে পারো খানিকটা বোকার মতোই !

কল্যাণী : তাই বুঝি !

লতা : তা নয় তো কি ! এক এক সময় এত কষ্টই হয় কল্যাণী; তুমি বুঝতে পারবে না।

কল্যাণী : সত্যিই ! আচ্ছা বৌদি আমার জন্যেই কি তোমরা সবাই নাচার হয়ে পড়লে সংসারে ?

লতা : মানে ?

কল্যাণী : অ্যানি বৌদিও সেদিন এই ধরনের কথাই বলছিল।

লতা : কি বলছিল ?

কল্যাণী : বলছিল, তুমি যদি তোমার দাদার ইচ্ছেটিচ্ছেগুলো খানিকটা অন্তত accomodate করতে তো মহীতোষ রায় would not have withdrawn his mind from Kangsha. আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন ভদ্রঘরের বউ যে কি করে এই কথাগুলো বলে আমি ভাবতে পারি না।

লতা : এতে করে অ্যানির আমি বলব কোনো দোষ নেই। তোমার দাদা তাকে যা বুঝিয়েছেন অ্যানি তাই বলেছে। নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে কথা বলবার মতো মেয়ে সে নয়।

কল্যাণী : এ বাড়িতে নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে আবার কে কখন কথা বলে! অবাক করলে তুমি লতা বৌদি!

লতা : জানি তুমি কথা বলতে পারো কল্যাণী।...কথা যখন উঠল তা হলে বলেই ফেলি, আমাকেই বা তুমি য়্যাদ্দিন ধরে কি বুঝতে দিয়েছিলে কল্যাণী? আমি কি অ্যানির কথা না হয় বাদই দাও, তোমার বাবা মা বড়দা মেজদা ছোড়দা—এঁরাও কি সবাই বরাবর বানিয়ে বানিয়ে তোমার নামে মিথ্যে কথা বলে এসেছেন? রঞ্জনের সঙ্গে তুমি যথেষ্ট প্রশ্রয় নিয়ে মেলামেশা না করলে কখনই তাঁরা...

কল্যাণী : বৌদি! সমস্বার্থের কাঁটা স্বামীদেবতাদের খাতিরে এখন তোমাদের মনেও খচ খচ করে বিঁধছে; জানতে আর কিছু বাকি নেই আমার।

লতা : তুমি মুখ সামলে কথা বলবে কল্যাণী।

কল্যাণী : মা তো ছেলেদের সম্পর্কে বরাবরই স্নেহান্ধ। তাঁর কথা আর তোমাদের কথা এক হলো?

লতা : আমি বলছিলাম...

কল্যাণী : না তুমি বলবে না। কোনো কথা বলবে না। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে বাধ্য নই।

লতা : এই তো!

কল্যাণী : হ্যাঁ।

লতা : বেশ, কিন্তু একটা কথা আজ আমি তোমায় স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই কল্যাণী...

কল্যাণী : তোমার গোটাটাই অস্পষ্ট। স্পষ্ট করে তুমি কি বলবে?

লতা : সুবচনী বলে তোমার খ্যাতি আমার জানা আছে কল্যাণী! ঠিক আছে। আর প্রয়োজন হবে না কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমার কথা বলবার। ছিঃ!

[লতার প্রস্থান ও সুহাস-এর প্রবেশ

সুহাস : কিরে কল্যাণী! ছোট বৌমার সঙ্গে আবার কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। ছি, অমন করে ঘা দিয়ে কখনও কথা বলতে আছে? একেই বেয়াইমশাই-এর অবস্থা খারাপ; বাপের জন্যে

মন খারাপ হয়ে আছে ছোট বৌমার। হাজার হলেও—ও মা, তুই কাঁদছিস! কল্যাণী!

কল্যাণী : না মা।

সুহাস : আবার না কি! নাঃ, আমার হয়েছে···

[রসময়-এর প্রবেশ ও কল্যাণীর প্রস্থান]

রসময় : তোমার আবার কি হলো?

সুহাস : না, আমার আবার কি হবে!

রসময় : আহা, প্রত্যেকেরই যদি কিছু হয় তাহলে আর কি করে চলে? কিছু লোক থাকবে, যাদের কিছুই হবে না। নইলে শুনবে কে, দেখবে কে? তোমারও কিছু হয়ে কাজ নেই, আমারও কিছু হয়ে দরকার নেই।···

সুহাস : ছোট বৌমার সঙ্গে কি নিয়ে যেন আবার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়ের।

রসময় : হ্যাঁ ও যেমন বাইরে তেমনি ভেতরে; নার্ভ কারোই ঠিক থাকছে না। নেহাৎ মানুষ, এতদিনকার অভ্যেস, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে এখনও একজন আর একজনকে দাঁতে কামড়াচ্ছে না। কি আর বলব!···সবটাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চিৎ করা হিসেবের কড়ি সব মুখ থুবড়ে পড়ছে চোখের সামনে। কলেজে, ইস্কুলে, খেলার মাঠে, হাটে বাজারে, ঘরে—সর্বত্র সমান অবস্থা।···বেয়াইমশাই শুনলুম তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিকেলের দিকে সময় পাও তো একবার দেখে এসো।···অমলের ফেরবার কোনো সংবাদ পেলে?

সুহাস : হ্যাঁ, বৌমার কাছে শুনলুম কাল আসছে। অফিসে ট্রাঙ্ক করেছিল।

রসময় : আর এই Night plane-এ চলাফেরা করা!

সুহাস : sky master-এ কোনো ভয় নেই।

রসময় : হ্যাঁ কোম্পানি বলেছে! speed, খালি speed, কেবল speed, আরও speed.

পর্দা

পঞ্চম দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইং রুম সকাল বেলা। অমল গুপ্ত বম্বে থেকে ফিরছে, তাই তার সম্বর্ধনার খাতিরে সকাল থেকেই বন্ধুবান্ধব, বিভিন্ন জাতের পদস্থ ব্যবসায়ী, তথাকথিত সংস্কৃতিবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক ও সস্তা সিনেমা পত্রিকার ফোটোগ্রাফার—সবাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। এমন সময় অমল গুপ্ত একটি প্যান-আমেরিকান কোম্পানির কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ছায়াচিত্রের হিরোর মতো ড্রইং রুমে প্রবেশ করে। সঙ্গে তার বোম্বাই-এর এক ছায়াচিত্রের অভিনেতৃ—নাম রূপকুমারী। সম্বর্ধনার আতিশয্যে গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালি বন্ধুবান্ধব সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় অমল গুপ্ত-র দিকে।

অমল : হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো!

রতিলালজী : স্থ ছে অমলবাবু!

অমল : জী হাঁ। ···তারপর সুখনলাল?

সুখনলাল : আচ্ছা জী। আপনা তবিয়ত বিলকুল আচ্ছা হ্যায়?

অমল : বিলকুল।

জনৈক পাঞ্জাবী বন্ধু : How do you do.

অমল : Please sit down.

[ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে আসে দুইজন ব্যবসায়ী কুণ্ডু। বিন্যাসে বৈষ্ণব বিধায় গলায় কণ্ঠি—সহজ বেশভূষা—খালি পা।]

কেষ্ট কুণ্ডু : ভালো আছেন!

অমল : আঁজ্ঞে হ্যাঁ, এখন বসুন। আরে রূপকুমারী···

কেষ্ট কুণ্ডু : বসতে আর পারি কৈ! খবরটার জন্যে বিশেষই উতলা আছি। (সঙ্গীর উদ্দেশ্যে) তেনির তো কয়দিন ঘুমই হয় না। আপনে আসবেন আসবেন কইর্যা···। অহন খবর টবর··

অমল : খবর, খবর সব ভালো। আপনাদের টাকা মার যাবে না।

মহিন্দর কুণ্ডু : না, সে মারা তো যাইব না হে জানি। অহন ঘরের টাকা উশুল হইয়া মা লক্ষীর ভাণ্ডারে কিছু আসে, হের লাইগ্যাই না ব্যবসা করতে লামছি। বিশেষ আপনে যখন মধ্যখানে আছেন···

অমল : আমাকে বিশ্বাস করেন তো?

কেষ্ট কুণ্ডু : শ্যাখেন দেহি, শুনলে দেখি হাস আসে আপনার কথা। এই কি একটা কথা হইল!

অমল : ঠিক আছে, ভাববেন না। তবে যতটা আশা করা গিছল, ততটা হবে না।

কেষ্ট কুণ্ডু : ততটা হইব না কতটা হইব ?

অমল : গিয়ে দেখি ওয়াগন থেকে ঝপ ঝপ করে জল পড়ছে।

কেষ্ট কুণ্ডু : ইস্, তোমারে আমি কই নাই মহীন্দর, ও আলু মারা যাইব। তারপর···

অমল : তারপর আর কি, ওয়াগন না খুলেই তক্ষুনি নীলামে ছাড়লাম মাল ; হাজার, দু-হাজার—যা উশুল হয়ে আসে আর কি !

মহীন্দর কুণ্ডু : ভালোই করছেন।

অমল : বাজারদর তখন আঠারো উনিশ। Retail-এ বিক্রি করেও ওর বেশি দর আপনি পেতেন না।

মহীন্দর কুণ্ডু : তয় তো কামই করছেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : [মহীন্দরকে] আপনে মিথ্যাই চিন্তা করেন ; নেন চলেন।

মহীন্দর কুণ্ডু : না না চিন্তা না, তয় ত্থাখেন, এইরকম wholesale কারবার ইয়ার আগে তো করি নাই।

অমল : হ্যাঁ Risk তো আছেই ব্যবসায়।

কেষ্ট কুণ্ডু : 'রিকস্' নাই ? দুই দশ হাজারের জইন্য কেষ্ট কুণ্ডু ডরায় না। তয় কথা কি জানেন, ব্যবসা করতে লাইমা মাইর খাওন কোনো জাত ব্যবসায়ীর লক্ষণ না। হিসাবে ক্যান্ গণ্ডগোল হইব sir ?

অমল : নিশ্চয় নিশ্চয়।

কেষ্ট কুণ্ডু : আইচ্ছা তো চলি স্যার অহন। আপনে বিশ্রাম করেন। অফিস যাইবেন তো ?

অমল : হ্যাঁ দশটায়।

কেষ্ট কুণ্ডু : আইজও দশটায় ! এই আসলেন···

অমল : না ঠিক আছে।

কেষ্ট কুণ্ডু : ত্থাখ মহীন্দর, কর্মযোগী কারে কয়, স্বচক্ষে ত্থাখ।

অমল : [রূপকুমারীকে] কই রূপকুমারী, তোমার relief fund-এ কিছু আদায় করে নাও এই বেলা কুণ্ডু মশাই-এর কাছ থেকে। কুণ্ডু মশাই, আসুন আলাপ করিয়ে দিই, আমাদের রূপকুমারী,

নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—সম্প্রতি 'সাণ্ডে কা তেল' আর 'কদম কদম'-এ দারুণ নাম করেছেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : হেঁ হেঁ, চেনা চেনা লাগে যেন মুখখান মা মণির।

মহীন্দর কুণ্ডু : আরে কত বড় একখান হোর্ডিং নি মারছে বড়বাজারের উপুর।

কেষ্ট কুণ্ডু : হয় হয়, তাইতো! তা কয়েন দেখি কি করতে হইব।

রূপকুমারী : Any sum—Prime Minister's famine relief fund.

কেষ্ট কুণ্ডু : বেশ তো, দিমু অনে। ল্যাখেন্, পাঁচ, না দশ? কত দেওন লাগব?

অমল : পাঁচ দশ কি বলছেন কুণ্ডু মশাই! বুঝতে পারছেন না, Prime Minister's relief fund!

কেষ্ট কুণ্ডু : বেশ তো কয়েন! আর কোনহানে কত লাগব বারবরদারি হে তো আপনেই ভাল জানেন। বসাইয়া নিবেন।

অমল : আপনার একাউণ্টে আমি—রূপকুমারী, লেখো পাঁচ শ।

কেষ্ট কুণ্ডু : নন, নন। ঘর থিকা তো আর দিমু না। পাঁচ গদি থিকা উশুল করুম। নন, নন।

অমল : সেটা আপনি যা ভালো বুঝবেন, করবেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : বাবুর কথা শুনছ নি মহীন্দর। গোবিন্দ গোবিন্দ! আইচ্ছা তো আসি মা মণি। অমলবাবুর থন্ টাকা দিয়া দিমু অনে।

রূপকুমারী : নমস্তে, নমস্তে।

কেষ্ট কুণ্ডু : নমস্তে।…না দিল আছে মা মণির। সব ফেলাইয়া লামছে তো একটা মহা ব্রত নিয়া। ব্রতই তো! না, কি, কও মহীন্দর?

মহীন্দর কুণ্ডু : আইচ্ছা! নিবেদন পাই, আমরা চলি তাইলে অমলবাবু। আসি মা মণি।

[ফোন বেজে ওঠে]

অমল : Yes, speaking, কে? দত্ত?…ভালো ভাই।—এই কিছুক্ষণ হলো।…আচ্ছা, এই between seven and Eight?—পাক্কা!

[রিসিভার নামিয়ে রাখে]

[হোমরা চোমরা দু-জন ব্যবসায়ী বন্ধুর প্রবেশ]

অমল : হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো !

[করমর্দনান্তে কথাবার্তা সুরু হয়]

১ম বন্ধু : তারপর, ওদিককার খবর কি বলুন। নতুন কোনো development হয়েছে ?

অমল : Development এই যে দিল্লী থেকে sanction না পেলে এখানে letter of credit খোলাটা সমীচীন হবে না। আমি অবিশ্যি দু-চার দিনের মধ্যেই দিল্লি যাচ্ছি।

২য় বন্ধু : সেই ভালো। মানে কথা এই যে ও আপনি নিজে না গেলে···

অমল : Quota পেয়ে যাব। As a matter of fact টেলিফোনে আমার সঙ্গে Board of Trade-এর সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে।

১ম বন্ধু : তবে আর কি !

অমল : ইয়াকুস্কি খুবই eager. জানিয়েছে Agency পর্যন্ত দিতেও তাদের কোনো আপত্তি নেই।

১ম বন্ধু : ঠিক আছে ; lunch-এ দেখা হচ্ছে।

অমল : আচ্ছা !···

[টেলিফোন বেজে ওঠে]

Yes spcaking···কে ? আরে ব্যানার্জি ?—তারপর খবর বলো···আমার !···হ্যাঁ, মোটামুটি ভালোই···হ্যাঁ ভালো, ভালো··· আচ্ছা সে হবেখন···বলব, বলব···আরে শোনো, একখানা গাড়ি যে আমার আজকে চাই ভাই···খুব ভালো হয়···O.k.

[রিসিভার রেখে দেয়]

···(রূপকুমারীকে) যাক, তোমার গাড়ির ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।

রূপকুমারী : Oh Amal, you are very nice.

অমল : আরে যাও অন্দর যাও···he at home···(নৃত্যশিল্পীকে) এই ডমরুপানি, রূপকুমারীকে বৌদির সঙ্গে ভজিয়ে দিয়ে এসো তো ! (রূপকুমারীকে) you might have known him—Dancer Damarupani, বড়ে কলাকার —who composed that famous ballet on Lord Krishna.

রূপকুমারী : আচ্ছা! আপকি composition তো ম্যয় নে বহুৎ পসন্দ কিয়া, বহুৎ artistic হ্যায়।

ডমরুপানি : সুক্রিয়া। চলিয়ে।

[ইতিমধ্যে সস্তা সিনেমা পত্রিকার অপেক্ষমান দু-জন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে ছবি নেবে বলে]

অমল : কি, ছবি ?—(রূপকুমারীকে) আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এরা তোমার ছবি নেবে বলছে।

১ম ফটোগ্রাফার : আপনি স্যার একটু দাঁড়ান।

অমল : আবার আমাকে ক্যানো! ··ছাখো, পাচ্ছো ঠিক ঠিক।

২য় ফটোগ্রাফার : Wonderful ! অপূর্ব angle.

[ফ্ল্যাশ বাল্বের চকিত ঝলকে ছবি তোলা হতে থাকে বিভিন্ন angle থেকে]

পর্দা

ষষ্ঠ দৃশ্য

একই দৃশ্য। রাত্রি। Bouffet খানার সঙ্গে পানীয়েরও ব্যবস্থা আছে। গণ্যমান্য অতিথিরা হাতে হাতে ডিশ নিয়ে খাবার তুলছেন, খাচ্ছেন—ঘুরছেন ফিরছেন জটলা পাকিয়ে। সুবেশ লেডিজরাও আছেন, সুবেশ বেটাছেলে পরিবৃতা হয়ে। ফিলম্ স্টারদের কর্ণাভরণ নিয়ন আলোয় ঝকমকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। যেমন হীরের দ্যুতি তেমনি দাঁতের জৌলুস—তেলা মুখ, ভারি 'আই ল্যাস'—লিপস্টিকের মাঞ্জা মারা খুনখারাবি রাঙা ঠোঁট। কংশ, বীরেশ, অ্যানি, লতাও সমুপস্থিত সভায়। রঞ্জন সেনকে কেন্দ্র করে এক পাশে একটা ক্ষুদ্র পরিবেশ গড়ে উঠেছে। অমল এসে রঞ্জনকে সম্ভাষণ জানায়।

অমল : আরে রঞ্জন রায়, কতক্ষণ ?

রঞ্জন : তোমার সম্ভাষণের অপেক্ষা না রেখেই আপ্যায়িত করছি নিজেকে। you can go and look to others.

অমল : আপনাকে খাতির করছি, এটাই কি আমার কম কাজ !

রঞ্জন : রাসকেল !···

[বেয়ারার ট্রে থেকে পেগ তুলে নেয় রঞ্জন]

···ভালো কথা, অমল···কি করলি ?—টাকার ?

অমল : হয়ে যাবে।

রঞ্জন : হয়ে তো যাবে বুঝলাম···

মিঃ মল্লিক : [অমলকে] রঞ্জনবাবু তো বুধবার নাগাদ আবার U. K. রওনা হয়ে যাচ্ছেন !

অমল : যাক না। আপনি তো আছেন !

মিঃ মল্লিক : তা আছি···

অমল : তবে আবার কি !

রঞ্জন : না মানে, ব্যাপার আছে। দিচ্ছিসই তো, কাল কি পরশুর ভেতর দিয়ে দে না টাকাটা।

অমল : অসম্ভব।

রঞ্জন : তবে, give me a date then to your conveniance.

অমল : তুই পাবি, on the 12th.

রঞ্জন : পাক্কা ?

অমল : পাক্কা।

রঞ্জন : ঠিক আচ্ছে। (মল্লিককে) আমি না হয় 15th রওনা হয়ে যাব।···আর শোন, এই অমল! (মল্লিককে দেখিয়ে) এঁকে ফাঁসাচ্ছিস কেন ?

অমল : [মল্লিককে] বলুন স্যার।

মিঃ মল্লিক : না না, আর lightly নেবেন না জিনিসটা মিঃ গুপ্ত। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, লিমিটেড কোম্পানির ব্যাপার, রায় বাহাদুর পর্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন আপনাদের এই সব কাণ্ডবাণ্ড দেখে। কোম্পানি আপনি লিকুইডেশন-এ দিন, জাহান্নামে দিন, যা খুশি তাই করুন; এখন আমার কথা হচ্ছে, আমি আপনাকে হাতজোড় করে বলছি মিঃ গুপ্ত এতগুলো গণ্যমান্য লোকের সামনে, আপনি যে করে পারেন রায় বাহাদুরের টাকাটা মিটিয়ে দিন। আমার টাকা আপনি না হয় না-ই দিলেন।

অমল : আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে আপনি আপনার টাকা পাবেন না !

মিঃ মল্লিক : না না, ও no pious platitudes, enough, enough of it মিঃ গুপ্ত। আমি আর ও সব কথা শুনতে চাই না। তবে জানবেন যে এই মল্লিক ছিল বলে তাই···

অমল : এখন আমি কিছুই জানব না কিছুই শুনব না। This is

not the time and place when I should listen to you all these nonsense.

মিঃ মল্লিক : But tell me where and when Mr. Gupta.

অমল : দেখুন মিঃ মল্লিক, আমারও লিমিটেড কোম্পানির ব্যাপার। কোম্পানিতে আর পাঁচজন ডিরেক্টর আছেন, আপনি তাঁদের বলুন। আমাকেই যে সব করতে হবে, জানতে হবে··· আর as a matter of fact আপনি হয়তো জানেন না, I have already resigned from the board of Directors.

রঞ্জন : But that you can't do.

মিঃ মল্লিক : হ্যাঁ আপনি তা পারেন না মিঃ গুপ্ত।

রঞ্জন : Resignation দিইছি, এ কথাটা বলা চলে না।

অমল : কেন নয়?

রঞ্জন : Because I being one of your board, have not accepted that as yet.

অমল : বুঝলাম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি resignation দিই নি।

রঞ্জন : Law does not guarantee it.

অমল : Hang you law.. Legality! কোনো moral-এর বালাই নেই যেখানে সেখানে আবার···

রঞ্জন : I have hanged Law long before you could think of it Amal. And I need not remind you of the laws of an out law.

অমল : Please don't shout Ranjan, I say.

[রঞ্জন Crockery সমেত সামনের টেবিলটা উল্টে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অমলও রঞ্জনকে তাগ করে একখানা প্লেট ছুঁড়ে মারে। দেওয়ালে লেগে প্লেটখানা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। খানাপিনার মাঝখানে এই উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার প্রশমন করতে মঞ্চের গভীর থেকে পাক খেতে খেতে সামনে এসে ত্রিতালের লয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফিলম্ স্টার রূপকুমারী। সামনে এসে আছড়ে পড়েই পায়ের ঝিঞ্জিরায় রেখা টেনে আবার মঞ্চের গভীরে চলে যায় রূপকুমারী]

পর্দা

[ক্রমশঃ

চিড়িয়াখানার পশুরাজ

রণজিৎ সিংহ

ছিলে তো মেঘছোঁয়া অরণ্যের একচ্ছত্র অধিপতি
হুঙ্কারে দাপটে টলাতে আযোজন
লেজের নাচে বলিহারি দেমাক
মাটির কলজে ফেড়ে ফোটাতে স্বাক্ষর।

চাঁদোয়া ছিল আকাশ
অর্জুন অশথ দোলাত চামর
হরিণ নেকড়ে বরা রটাত তোমার বন্দনা।

আজ এ কী রূপ!
নেই বাহার নেই তেজ।
শরীরে কাদা, চোখে ছানি, ধুঁকছ হরদম,
পথ্যি কিছু মরা মাস, পানীয় নোংরা জল,
পরিচর্যায় সহায় একমাত্র কল্যাণী সহধর্মিনী।

কি সাধ ছিল?
কেন ধরা দিলে ফাঁদে?
মালিকানা বাগালে তাজ্জব খাঁচার?

এধারে ওধারে স্থবির পারিষদ—চিতা কি হায়েনা

মাঝখানে সেজেছ আজব জীব।
কয়েক পয়সার কয়েক পলকের তামাসা।
ছেলে বুড়ো রগড় করে
শহুরে শৌখীন করে খানিক মস্করা
ছুটিতে হরেক রঙের পাল্লায় জোটে বহুত বাচাল।
ফিরেও দেখ না নেই কৌতূহল,
তুমি ক্লান্ত নির্বিকার লোলচর্ম দার্শনিক।

কোথায় সেই কেশরকলাপ!
কোথায় আয়োজন-অহংকৃত-ক্ষুব্ধ মহিমা!

ভুলে যাই স্থান কাল, হাঁকি
'শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর'—
যদি টলে এ আত্মবিস্মরণ, কাটে জরার শৃঙ্খল
যদি জাগো।

একবার দাঁড়াও আপন স্বভাবে বহ্নিমান
ভাঙো হুকুমদারির পরোয়ানা
উপেক্ষায় হাঁকো
গর্জাও—
চিড়ফাড় তল্লাটে ছড়াক ঘোষণা।
থমকাক রাজপথের ব্যস্ততা
কাঁপুন ওই প্রাসাদে প্রাসাদে বিলাসজীর্ণ জীব।

না হয় কাল কাগজে রটবে
'আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক পশুরাজের মাথা বিগড়াইয়াছিল।"

কুড়ি লাইন বিতর্ক

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

শূন্যতা বড়োই তীব্র, যেন এক বিশাল শহরে
শব্দহীন হরতাল। ঠিক রাত বারোটা পঁচিশে
আকণ্ঠ মাতাল চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে;
স্খলিত বাতাসে কার পদশব্দ পুড়ে যায় বাণিজ্যিক বিষে।

যদিচ নিজেকে ঘিরে নাটুকেপনার অপবাদে
ফিটফাট বোলচালে বেশরম কফির দোকান,
মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে তরঙ্গস্তবকে অবসাদে
হৃদপিণ্ডের রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত স্বপ্নের সোপান।

কিন্তু মধ্যবর্তী এক অধ্যায়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা ভীষণ
বিপন্ন, সরলীকৃত মনে হতে পারে। শিকারের
গল্প শুনে নিরাপদ রোমাঞ্চের মদে কিছুক্ষণ
দেবদাস সেজে, কিংবা যূথচারী শুদ্ধ বিকারের
তৈরীকরা হট্টগোলে হরিবোল দিয়ে, পাঁচ মিনিট
নৈঃশব্দ্য সম্ভোগ ভালো: উচ্চাশার স্তূপীকৃত ইঁট
প্রাসাদ গড়ে না, শুধু উদ্বাস্তু সর্পের অধিকার
সদম্ভে ঘোষণা করে। আত্মরতি অব্যাহত থাকে।
নির্ভুল শিকার আমি সাম্প্রতিক মনুসংহিতার।
নেশা ছুটে গেলে ঘুম কষ্টসাধ্য নর্দমার পাঁকে।

এ শূন্যতা বড়ো তীব্র, কারণ তা সাময়িক, আরোপিত বলে;
নদী কেবা খুঁজে পায় মানচিত্রবিহীন ভূগোলে!

যেহেতু বয়স

করুণাসিন্ধু দে

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাবো।
হাত-পা ছড়িয়ে মজ্জায় খুশি তরঙ্গ তুলে ধাবমান
কড়া-রোদ্দুরে ঘরের অসুখ তুবড়ির মতো ফাটিয়ে আমি
ধোঁয়া ও ধুলিতে গড়াগড়ি দেব, কি ক্ষতি যদি বা বিপথগামী,
যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

নিশ্বাসে জ্বালা, আতপ্ত জ্বালা, হৃদয় খুলে
জমাট হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে পোড়াবার মুখে সুখ ঝালাবো,
আহা রে প্রণয় নষ্ট সময়ে দূর পলাতক শীর্ণ রোগী,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে কার যৌবন যায়, কতকাল থাকে ভুক্তভোগী,
এবার প্রাপ্তি নিখাদ স্বর্গে নয়তো শ্মশানে ছাই ওড়াবো।

কে রুখে আমাকে আষ্টেপৃষ্টে, পাঞ্জা কষে,
দৃঢ় দুই হাত, ঘন কেশজাল, দক্ষিণে-বামে পথ ভুলিয়ে
সামনে দাঁড়াবে, পায়ের তলার মাটি ধরে রেখে বুকের হাড়ে ;
শিয়রে জেনেছি ঘাতক-বাতাস ডেকে নিয়ে যাবে যম-দুয়ারে,
যেহেতু আমার শিরায় শোণিতে নিমজ্জনের নাগিনী ফোঁসে।

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাবো।
যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

মৃন্ময়ী বাংলা

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার চোখে ঝড়ের শুধু, ঝড়ের সংকেত ;
শুধুই বুঝি ভেঙ্গে ভেঙ্গে গড়ার আয়োজন,
মেঘের হৃদয় দীর্ণ হলো, চমকাল বিদ্যুৎ—
তবু সবুজ, সুনীল শোভায় রোমাঞ্চিত বন :

হাজার ছবি আঁকার শেষে হাজার তুলি ভেঙ্গে
নতুন করে যেই দিয়েছি টান—
আমারই রঙ আমার তুলি আমার অজান্তেই
তোমার চোখের ভাষায় দিলে ঝড়ের আহ্বান।

চমকাল বাজ ; ব্যর্থতা আজ ব্যর্থ করে দিলে
অলস আমার স্বপ্ন দেখা চোখ ;
গড়লে কৃষাণ বোনের চোখে, মজুর ভায়ের মুখ—
শহর ও গ্রাম, দুঃখ এবং শোক।

আবার কবে ভাঙ্গবে বুঝি মুছবে আঁকা পট
আবার আমি করব আয়োজন ;
রঙ ফুরোলে রক্ত এবার, ভাঙ্গলে তুলি, মন
মৃন্ময়ী মা! তোমার মাটি—চিন্ময় স্পন্দন।

ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

দীনেশ রায়

'আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ', এই শিরোনামায় বাংলা ১৩৬৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীঅশোক রুদ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপনই শুধু করেন নি, সেগুলির জবাবও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রকে "অপ্রচলিত" বলে প্রমাণ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন।

শ্রীরুদ্র উক্ত প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার সারমর্ম হলো নিম্নরূপ :

১। গত দশ বছরে ভারতের অর্থনীতিতে কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন এসেছে ও আসছে। একটি বিশেষ অর্থে ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই "স্বাবলম্বী" হতে যাচ্ছে।

২। কৃষি-অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল ঘটেছে। খাদ্যশস্যের প্রকৃত কোনো ঘাটতি এদেশে আর নেই, বেশ অনেক বছরই নেই।

৩। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনসেবামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৪। গত দশ বছরে জনসাধারণের সমস্ত অংশেরই আর্থিক স্বচ্ছলতা অল্প-বিস্তর বেড়েছে। তার মধ্যে আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বচ্ছলতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি বেড়েছে।

৫। পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃ উৎপাদনের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধি পাবে—মার্কস্-এর এই তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয় নি।

এই প্রবন্ধে আমি শ্রীরুদ্রের চার ও পাঁচ নম্বর বক্তব্যের উপরই প্রধানত আলোচনা করতে চাই। 'ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ', এই শিরোনামায়

১৯৬২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি ১ ও ২ নম্বর বক্তব্যের ওপর কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

শ্রীঅশোক রুদ্র সমগ্র প্রশ্নটি বিচারান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গত দশ বছরে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেড়েছে। তার মধ্যে আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বাচ্ছন্দ্য তুলনা-মূলক ভাবে কিছুটা বেশি বেড়েছে।

লেখকের ভাষায়: "চতুর্থ ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত পাঠকমাত্রই কথাটা পড়েই প্রবল আপত্তি বোধ করবেন। কিন্তু অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করলে একথা ধরা পড়বেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটুকু ঘটেছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। প্রবণতাটি উত্তরোত্তরই বাড়বে" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬৯ সাল; পৃষ্ঠা ১০৩১—১০৩২)

লেখকের বক্তব্যে মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণী এই কারণেই প্রবল আপত্তি বোধ করবেন যে, এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। গত ১৭ই আগস্ট তারিখে, ছাঁটাই ও কাজের চাপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং বেতন ও ভাতা-বৃদ্ধির দাবিতে কলকাতার সওদাগরী অফিসসমূহের কয়েক সহস্র মধ্যবিত্ত কর্মচারীর বিক্ষোভ মিছিলের ভেতর দিয়ে লেখকের বক্তব্যের অসারতা বেশ কিছুটা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শ্রীরুদ্র বলেছেন যে, অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিই কী সব চাইতে বড় সত্য নয়?

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীরুদ্রের যে দাবি, তাতে সম্ভবত কংগ্রেস সরকারও বিব্রত বোধ করবেন। কারণ শ্রীরুদ্র যে দাবি করছেন সে দাবি কংগ্রেস সরকারও করেন না। কংগ্রেস সরকার বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ বোধ করেন।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা সরকার কি বলছেন দেখা যাক। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হচ্ছে:

"এটা সকলেরই জানা আছে যে, এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমবর্ধিত হারে অবনতি ঘটছে, যদিও সামাজিক নেতৃত্ব এখনও এঁদের হাতে রয়েছে এবং আগামী কয়েক দশকের জন্য থাকবে" (পশ্চিম বাংলা সরকারের শ্রম দপ্তর কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'লেবর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—১৯৬১' নামক পুস্তিকা থেকে)। একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, সমস্ত রাজ্যেই একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

যাই হোক, কোন তথ্যের ভিত্তিতে লেখক এই উপসংহার করলেন যে, মধ্যবিত্তদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেড়েছে? উত্তরে তিনি লিখছেন :—

"প্রথমত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে সরকারী চাকুরি বহু পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৫০ সালে সরকারী চলতি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৫ কোটি টাকা ; ১৯৬১ সালে তা ১৮২০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬৯ ; পৃষ্ঠা ১০৩২)।

চলতি খাতে ব্যয়ের অঙ্ক দেখিয়ে লেখক কি প্রমাণ করতে চাইছেন তা পরিষ্কার নয়। চলতি খাতে ব্যয়ের মধ্যে অনেক জিনিসই পড়ে। অবশ্যই শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাও এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, মধ্যবিত্তদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেড়েছে, অথবা, এঁদের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমেছে—এটা প্রমাণ করবার জন্য সরকারী চলতি খাতে ব্যয়বৃদ্ধিব অঙ্ক দেখানোই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত দশকে সরকারী চাকুরি বেশ কিছু পরিমাণ বেড়েছে এবং সরকারী চাকুরির গুণকারক ফল হিসেবে বে-সরকারী চাকুরিও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু এটা বলাই যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে, যে হারে সরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরি বেড়েছে, তার চাইতে কয়েক গুণ বেশি হারে চাকুরিপ্রার্থী সৃষ্টি হয়েছে এবং ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের সামগ্রিক এবং আপেক্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এই ঘটনাকে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ কমছে কি বাড়ছে তা বোঝবার জন্য কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব উপস্থিত করবার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোন সরকারী দপ্তরে অথবা সওদাগরী অফিসে একটু অনুসন্ধান করলেই শ্রীরুদ্র জানতে পারবেন যে কিভাবে একটি, দুটি চাকুরির জন্য শত শত আবেদনপত্র পড়ছে। এই সেদিন পশ্চিমবাংলা সরকারের পুলিশ

বিভাগে ৪২ জন নতুন লোক নিয়োগের কথা ঘোষিত হলে, ৫৫৫০ জন তার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন। বেকার সমস্যার তীব্রতা বোঝবার পক্ষে এই তথ্যটিই যথেষ্ট নয় কী?

মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার সমস্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারী পরিসংখ্যান নেই। ভারতের কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্র সমূহের হিসেবে কোনো সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না, আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। কারণ, বেকারদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এই সমস্ত কেন্দ্রে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের হিসেবই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান যার মাধ্যমে সমস্যার গভীরতার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এই সমস্ত কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত বেকারদের একটা বড় অংশ হচ্ছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

সারা ভারত কর্মস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহে তালিকাভুক্ত বেকারদের হিসেব :

সাল	মোট রেজিষ্ট্রেশন	মোট তালিকাভুক্ত বেকার
১৯৫০	১২,১০,৩৫৮	৩,৩০,৭৪৩
১৯৫৫	১৫,৮৪,০২৪	৬,৯৯,৯৫৮
১৯৬০	২৭,৩২,৫৪৮	১৬,০৬,২৪২

১৯৬০ সালে ৩,০৫,৫৫৩ জনকে কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ যাঁরা ১৯৬০ সালে নিজেদের নাম বেকার হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন তাঁদের শতকরা ১১জন মাত্র কাজ পেয়েছিলেন।

পশ্চিমবাংলার অবস্থা

কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহে তালিকাভুক্ত বেকারদের সংখ্যা :

১৯৫১	৫৫,০০০
১৯৫৫	১,১২,০০০
১৯৬১	৩,২৮,২৯১

তালিকাভুক্ত (পশ্চিমবাংলা) শিক্ষিত বেকারের হিসাব

(ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট ও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল গ্রাজুয়েট সমেত মোট গ্রাজুয়েট) :

সাল	মোট রেজিষ্ট্রেশন
১৯৬০	৬৮,৭৩১
১৯৬১	৬৯,৮০৫

১৯৬১ সালে কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে মোট ৪২৫৭ জন শিক্ষিত বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ, যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাঁদের শতকরা ৬·১জন মাত্র কাজ পেয়েছিলেন।

কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রের হিসাবসমূহ নেওয়া হয়েছে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক পরিবেশিত পরিসংখ্যান থেকে।

কর্মসংস্থানের প্রশ্নের এই দিকটি, অর্থাৎ চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির দিকটি শ্রীরুদ্রের দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে গেল তা বোঝা যায় না।

এইবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির প্রশ্নে আসা যাক। যে তথ্য অথবা যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, ঘটনা হচ্ছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পনেরো বছর পরেও ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন। সরকারী পরিসংখ্যানেও একথা স্বীকৃত।

মধ্যবিত্ত পরিবারদের মাসিক আয় (১৯৫৮-৫৯)

মাসিক আয় গোষ্ঠী (টাকা হিসাবে)		মোট পরিবারের কত জন (শতাংশ হিসাবে)		
		বোম্বাই	কলকাতা	দিল্লী
৭৫—৩০০	...	৫৫,৫৯	৬৭.৪৫	৫৯.৮২
১৫০০ ও তদূর্ধ	...	১.৩২	১.৮৭	১.৯৬

[সূত্র—ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংস্থান সংস্থার শ্রম-পরিসংখ্যান দপ্তর]

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, বোম্বাই, কলকাতা এবং দিল্লীর মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের যথাক্রমে শতকরা ৫৫·৫৯ জনের, ৬৭·৪৫ জনের ও ৫৯·৮২ জনের মাসিক আয় ৭৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই সমস্ত পরিবার দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় বাস করেন। অপর দিকে, ১৫০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মাসিক আয়, এমন পরিবারের সংখ্যা (মোট পরিবারের) হচ্ছে, যথাক্রমে শতকরা ১·৩২টি, ১·৮৭টি এবং ১·৯৬টি। একথা বলা চলে যে, এই মুষ্টিমেয় পরিবারসমূহের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে কি মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের রোজগার বাড়েনি? রোজগার নিশ্চয়ই কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার স্বেচ্ছায় এই রোজগার বাড়িয়ে দেন নি। সামান্য বেতন এবং ভাতার বৃদ্ধির জন্যও গত দশ বছরে কর্মচারীদের, তাঁদের ইউনিয়ন অথবা সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের, কেন্দ্রীয় সরকারী

কর্মচারীদের ১৯৬০ সালের সাধারণ ধর্মঘট, পশ্চিমবাংলা সরকারের কর্মচারীদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের আন্দোলন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আন্দোলন ইত্যাদির কথা স্মরণ করতে বলব। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলেই কিছুটা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু গত দশ বছরে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পাঁচ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্যের অনবরত উর্ধ্বমুখী গতির দরুণ, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত লাভ বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে কর্মচারীদের আর্থিক রোজগার এবং প্রকৃত রোজগারের মধ্যেকার ব্যবধান বেশ কিছু বেড়ে গেছে, অর্থাৎ, প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে এবং আরও পাচ্ছে। ফলে, জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্যও কর্মচারীদের ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। শুনলে আজগুবি মনে হবে; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের শতকরা ৯০ জনই "ঋণগ্রস্ত"। স্বাধীনতা পত্রিকার স্তম্ভেই বেরিয়েছে, কলকাতার লালদিঘি অঞ্চলের একটি সওদাগরী অফিসের তুই শত কর্মচারীর মধ্যে ১৬০ জন হলেন করণিক। এই ১৬০ জন করণিকের মধ্যে ১৫০জনই ঋণগ্রস্ত।

রোজগার বৃদ্ধির নমুনাটা কি? পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারীদের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবাংলা সরকারের অধীনে ২ লাখ ১২ হাজার কর্মচারী কাজ করেন। এঁদের শতকরা ৬৬ জনেরই মাসিক আয় সর্বসাকুল্যে ৫০ টাকার মধ্যে। এটা ১৯৫৭ সালের হিসাব। ১৯৬২ সালেও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

গত কয়েক বছর ধরে কর্মচারীরা তাঁদের বেতন ও ভাতার হার সংশোধনের জন্য "বেতন কমিশন" নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার প্রথম দিকে তাঁদের দাবি গ্রাহ্য করেন নি। অবশেষে, কর্মচারীদের বিক্ষোভ শান্ত করার উদ্দেশ্যে "বেতন কমিশনের" পরিবর্তে "বেতন কমিটি" নিয়োগ করা হলো। "বেতন কমিটি" নিম্নতম কর্মচারীদের জন্য যে বেতন মান নির্ধারিত করলেন তার দ্বারা তাঁদের বেতন মানের কোনোই উন্নতি হয় নি। বেতন কমিটি কর্তৃক নূতন বেতন মান নির্ধারিত করার ফলে নিম্নতম কর্মচারীদের গড়ে মাসিক তিন টাকা মাত্র বেতন বৃদ্ধি হবে। কলকাতা ও হাওড়ার সদর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বেতন বৃদ্ধি হবে এক টাকা মাত্র।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে, এঁদের আর্থিক উপার্জন সামান্য কিছু বাড়লেও; গত দশ বছরে অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে এবং আগামী দিনে উপার্জন কিছুটা বাড়লেও অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটবে না বরং আরও অবনতি ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি।

শ্রীরুদ্রের প্রবন্ধের শেষাংশ হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে তিনি তাঁর সমগ্র বক্তব্যের তত্ত্বগত রূপ দিয়েছেন।

লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুঃস্থতা বৃদ্ধি পায়—মার্কস-এর এই তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয় নি। তিনি এই কথা শুধু ভারতবর্ষ সম্পর্কেই বলছেন না, ভারতবর্ষসমেত সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া সম্পর্কেই বলছেন। লেখকের মতে মার্কসীয় অর্থনীতির এই সূত্রটি, আজ নয় বিংশশতকের গোড়া থেকেই নাকি অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

শ্রীরুদ্র লিখছেন :

"মার্কস ধারণা করেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে এবং শেষপর্যন্ত নিষ্পেষণ যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকজনতা, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুণ এই নিষ্পেষণ, তাকে ভাঙতে উদ্যত হবে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদকশক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের রূপ নেবে।

"কিন্তু মার্কস-এর pauperisation-এর ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য প্রমাণিত হয় নি। (যদিও বলাই বাহুল্য তাতে মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, অন্তত বিংশশতকের গোড়া থেকে, এই প্রবণতা বিদূরিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আলাদা আলাদা না করে দেখে যদি সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে এক সঙ্গে দেখা যায় তাহলে অবশ্য এই সেদিন পর্যন্ত pauperisation-এর থিয়োরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কারণ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আওতার বাইরে গোটা যে ঔপনিবেশিক জগৎ—তাতে জনসাধারণের জীবনমান ক্রমশই অবনত হয়েছে এবং তাদের শোষণের অংশভুক্ত হয়েই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীও, নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে পেরেছে। কিন্তু গত দশ বছরের ইতিহাসে দেখেছি, ভারতবর্ষের মতো দেশেও ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার এই মোড় ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। যত

স্বল্প হারেই হোক, শ্রমিক সাধারণের জীবনমান অবনত না হয়ে উন্নতই হয়েছে এবং এই স্বল্পহারের প্রগতি আরও বিশ-পঁচিশ বছর চালিয়ে নেওয়ার মতো কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে এসে গেছে" (পরিচয়—বৈশাখ, ১৩৬৯ ; পৃষ্ঠা ১০৩৪-১০৩৫)।

পাঠকদের সুবিধার জন্য লেখকের প্রবন্ধ থেকে আমি বিস্তারিত উদ্ধৃতিই দিলাম।

বিংশশতকের গোড়া থেকে পুঁজিবাদের চরিত্র পাল্টে গেছে, পুঁজিবাদ প্রগতিশীল রূপ নিয়েছে সুতরাং মার্কসবাদ অপ্রচলিত হয়ে গেছে (লেখক অবশ্য বলেছেন যে, মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)—পরিষ্কার প্রকাশ না করলেও লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যেন এই সুরই ফুটে উঠেছে। তবে শ্রীরুদ্রের প্রবন্ধের এই সুরের মধ্যে মৌলিকত্ব কিছু নেই।

"জনগণের পুঁজিবাদ" তত্ত্বের জন্মস্থান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই তত্ত্বের নায়ক হচ্ছেন ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গেলব্রেথ, অধ্যাপক জনসন, অধ্যাপক ক্রম প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ। আজ বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদকে এই নতুন পোশাকে উপস্থিত করা হচ্ছে।

"জনগণের পুঁজিবাদ" তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে ; যে বেশেই উপস্থিত করা হোক না কেন, পুঁজিবাদের চরিত্র তাতে পালটিয়ে যায় না।

উৎপাদনের উপায়গুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, শ্রমশক্তির পণ্যতে পরিণত হওয়া, আয় ও সম্পদ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জিভূত হওয়া, শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়া—পুঁজিবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বদলিয়ে যায় না।

মার্কসবাদকে অপ্রচলিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও নতুন কিছু নয়। মার্কসবাদ অথবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম থেকেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে জেহাদ ঘোষণা এবং তাকে অপ্রচলিত বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই মার্কবাদের, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি রোধে সক্ষম হয় নি।

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মার্কসীয় অর্থনীতির বিশেষ সূত্রটিকে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের একাংশ

বিকৃতভাবে উপস্থিত করে থাকেন। এঁরা বিষয়টি এমনভাবে উপস্থিত করেন যেন মার্কস বলেছিলেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে বাড়তে থাকবে, যেন এই দুস্থতা একই গতিতে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক বেড়ে চলবে, তার কোনো উত্থান পতন হবে না, ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য এটা মার্কসীয় অর্থনীতির বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীরুদ্র সচেতন ভাবে বিকৃত করছেন অথবা অপব্যাখ্যা করছেন তা আমি বলি না। তবে বিনীত ভাবে আমি এটা বলব যে, মার্কসীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির তিনি যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা আদৌ সঠিক নয়।

মার্কস, শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধিকে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের একটি সাধারণ ঝোঁক হিসাবে দেখিয়েছেন। এই দুস্থতা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে বছরের পর বছর বেড়ে যাবে, একথা মার্কস বলেন নি। এই সাধারণ ঝোঁক বিভিন্ন দেশে একই ভাবে দেখা দেবে, একথাও তিনি বলেন নি, বরং তিনি বিপরীত কথাই বলেছিলেন।

প্রথম খণ্ড কেপিটালের 'পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সাধারণ নিয়ম' (General Law of Capitalist Accumulation) নামক অনুচ্ছেদে মার্কস লিখেছেন :

"সামাজিক সম্পদ ও সক্রিয় পুঁজির পরিমাণ যত বেশি হতে থাকে, পুঁজির প্রসার ও শক্তি যত বাড়তে থাকে এবং সেইজন্যই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও তাঁদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতাও যত বাড়ে, ততই শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদ শ্রমিকের সংখ্যা (Industrial reserve army) বেশি হতে থাকে। যে সব কারণে পুঁজির বিপুল ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, সেই সব কারণেই পুঁজিপতিরা কাজে লাগাতে পারে এমন শ্রমশক্তিরও বিকাশ ঘটে। তাই, সম্পদের স্থিতিশক্তির (Potential energy) সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদ শ্রমিকসংখ্যা আপেক্ষিক বেড়ে যায়। কিন্তু এই শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদ শ্রমিকবাহিনীর সংখ্যা শিল্পে নিযুক্ত কার্যরত শ্রমিকবাহিনীর তুলনায় যত বেশি হতে থাকে, তত বাড়তি জনসংখ্যার মোট পরিমাণ বেড়ে যেতে শ্রম যত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে সম-অনুপাতেই এদের দুর্দশা বাড়তে থাকে। শেষকথা, শ্রমিকশ্রেণীর কুষ্ঠাদি জঘন্য রোগাক্রান্তদের স্তর এবং শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদ শ্রমিকবাহিনীর সংখ্যা যত প্রসার লাভ করে তাদের দুস্থতাও তত বেড়ে যায়।

এই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের অমোঘ সাধারণ নিয়ম। অন্যান্য নিয়মেরও মতো কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ পরিস্থিতির দরুন প্রকারান্তর ঘটতে পারে।" [কার্ল মার্কস: কেপিটাল; ১ম ভল্যুম, পৃঃ ৬৪৪।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এই সাধারণ নিয়মের কার্যক্ষেত্রে প্রকারান্তর ঘটতে পারে তা মার্কস কেপিটালের অন্য একটি অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করে গিয়েছেন।

মার্কস একই অনুচ্ছেদে আরও লিখেছেন :

"পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদনক্ষমতা উন্নত করার সমস্ত পদ্ধতিই প্রবর্তিত হয় ব্যক্তি হিসেবে শ্রমিকের ক্ষতিসাধন করে। উৎপাদন উন্নত করার সমস্ত উপায়গুলিই উৎপাদকের উপর আধিপত্য করার এবং তাদের শোষণ করার উপায়ে পরিণত হয়ে পড়ে; ঐগুলো শ্রমিকের মানবসত্বাকে এমনভাবে খণ্ডিত করে যে, সে নামেমাত্র মানুষ থাকে, সে যন্ত্রের দাসের পর্যায়ে অবনত হয়ে পড়ে ও তাঁর কাজের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে এমন সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায় এবং খাটুনি তার কাছে ঘৃণ্য জিনিস হয়ে পড়ে। শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানকে একটি স্বাধীন ক্ষমতা হিসাবে যত যুক্ত করা হয় সেই অনুপাতে শ্রমিকের পক্ষে শ্রমপ্রক্রিয়ায় তাঁর বুদ্ধিগত সম্ভাবনাসমূহের প্রয়োগকে বাহুল্য করে তোলে; ঐগুলি যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিক কাজ করেন তাকে বিকৃত করে শ্রমপ্রক্রিয়ায় সময় শ্রমিককে এমন একজন স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের অধীনস্থ করে দেয়, সে কর্তৃত্ব আর নীচতার দরুন আরও বেশি ঘৃণ্য হয়; শ্রমিকের সমগ্র জীবনকালই তার পক্ষে কাজের সময় হয়ে পড়ে, তাঁর স্ত্রী, পুত্রকেও পুঁজির চাকার তলায় টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু বাড়তি মূল্য উৎপাদনের সমস্ত পদ্ধতি হচ্ছে একই সঙ্গে সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনেরও পদ্ধতি এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের উপায়। যা বলা হলো তা থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতেই শ্রমিকের ভাগ্য— তা তার পারিশ্রমিক বেশি হোক, বা, কম হোক না কেন—অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়বেই। শেষ কথা, সে নিয়মানুযায়ী, আপেক্ষিকভাবে বাড়তি জনসংখ্যা কিংবা শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদবাহিনী, সব সময়ে সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সম-অনুপাতিক হারেই সেই নিয়ম দিয়ে গেঁথে রাখার

মতো শ্রমিককে দৃঢ়ভাবে পুঁজির সঙ্গে গেঁথে রাখে ; এই বাঁধন হয় ভলক্যান কীলক প্রোমিথিউসকে পাহাড়ের সঙ্গে যত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে রেখেছিল তার থেকেও দৃঢ়তর। ইহা পুঁজির সম্প্রসারণশীল পুনঃ-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশারও সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদন প্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজির সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্তদেশে সম্পদ ক্রমাগত বর্ধিত পরিমাণে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়তে থাকে এবং সেইজন্যই, সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্তদেশে দুর্দশা, অত্যন্ত যন্ত্রণাবহুল খাটুনি, দাসত্ব, জ্ঞানহীনতা, পশুবৎ জীবন, মানসিক অধঃপতন, ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে ; এই প্রান্ত দেশে অবস্থান করে সেই উৎপাদক শ্রেণী যাদের উৎপন্ন দ্রব্য পুঁজির আকার গ্রহণ করে থাকে।" [কার্ল মার্কস : কেপিটাল পৃঃ ৬৪৫]

বক্তব্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার। এখানে দুই অর্থ করার কোনো সুযোগ নেই। শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধি হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সাধারণ অমোঘ নিয়ম। অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এই নিয়মটিরও, কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রকারান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে করে নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

যে যে কারণে এই সাধারণ নিয়মটির প্রকারান্তর ঘটতে পারে তার মধ্যে একটি মূল কারণ হলো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সম্প্রসারণ। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো দেশে আর্থিক মজুরি কিছুটা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। ভারত সমেত সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের আর্থিক আয় কিছুটা বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত আয় হ্রাস ও ফলে দুস্থতার সামগ্রিক বৃদ্ধি—ভারতবর্ষেরও এটাই হচ্ছে সাধারণ ঝোঁক।

ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীনন্দাকে, ১৯৬০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লোকসভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বীকার্য করতে হয়েছিল :

"১৯৩৯ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৫১ সালে তাঁরা তাঁদের হৃতস্থান পুনরুদ্ধার

করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৬ সালে প্রকৃত মজুরি শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সাল, যখন থেকে আবার মূল্যবৃদ্ধি শুরু হলো, তখন থেকে শ্রমিকদের লাভ বেশ কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল" (লোকসভার কার্যবিবরণী—১১ এপ্রিল, ১৯৬০)।

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাবে যে, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির সূচী শতকরা দু ভাগ মাত্র ওপরে ছিল এবং ১৯৫৫ সালের পর থেকে তা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে হ্রাস পেয়ে গেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত মজুরির সূচী ভিত্তি

[১৯৪৭=১০০]

১৯৫৫—১৪৪.৯

১৯৫৬—১৩৪.৬

১৯৫৭—১৩৩.৫

১৯৫৮—১২৫.৬

১৯৫৯—১২৩.৯

[সূত্র—ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত "ভারতের শ্রম পরিসংখ্যান, ১৯৬১"]।

পরবর্তী দু বছরের কোনো সরকারী হিসেব নেই। কিন্তু এটা স্বীকৃত যে ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালেও প্রকৃত মজুরির হ্রাসের গতি অব্যাহত আছে।

আমার বিশ্বাস, মার্কসীয় অর্থনীতির বিশেষ সূত্রটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং আজিকার পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ—এই দু-এর ওপর ভিত্তি করলে লেখক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতেন যে, একশো বছর আগে মার্কস যা লিখে গিয়েছিলেন তা আজকের পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণ প্রচলিত আছে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতার সামগ্রিক বৃদ্ধির কথাই শুধু মার্কস বলেন নি, তিনি আপেক্ষিক (রিলেটিভ) বৃদ্ধির কথাও বলে গিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রকৃত আয় একই রকম থাকতে পারে অথবা কিছুটা বাড়তেও পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপেক্ষিক আয় কমে যেতে পারে এবং ফলে দুস্থতা বেড়ে যেতে পারে। 'মজুরি, শ্রম ও পুঁজি' নামক পুস্তকে মার্কস লিখেছেন :

"প্রকৃত মজুরি একই রকম থাকতে পারে, এমন কি বাড়তেও পারে, কিন্তু তথাপি আপেক্ষিক মজুরি হ্রাস পেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরে নেওয়া যাক, জীবনধারণের সমস্ত উপাদানের দর তিন ভাগের দু ভাগ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু মজুরি হ্রাস পেয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র, অর্থাৎ বলা যেতে পারে তিন মার্ক থেকে দু মার্ক হয়েছে। পূর্বে তিন মার্ক দিয়ে একজন শ্রমিক যে পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হতেন এখন এই দু মার্ক দিয়ে তার চাইতে বেশি পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারবেন বটে কিন্তু তথাপি পুঁজিপতিদের মুনাফার তুলনায় তাঁর মজুরি হ্রাস পেয়েছে।

পুঁজিপতির (কারখানার মালিক) মুনাফা এক মার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ সে শ্রমিককে যে ক্ষুদ্রতর বিনিময় মূল্য দিচ্ছে তার বিনিময়ে অবশ্যই শ্রমিককে পূর্বের চাইতে বৃহত্তর বিনিময় মূল্য উৎপাদন করতে হবে। শ্রমের অংশের তুলনায় পুঁজির অংশ বেড়েছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক সম্পদ বণ্টন আরও বেশি অসম হয়েছে। সমপরিমাণের পুঁজির সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রমের উপর বেশি পরিমাণে আধিপত্য করতে পারছে। শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, শ্রমিকদের সামাজিক সংস্থিতির (social position) অবনতি ঘটেছে, তাঁদের সংস্থিতি পুঁজিপতিদের আরও এক ধাপ নিচে নেমে গেছে" (মার্কস-এঙ্গেলস—সীলেকটেড ওয়ার্কস, ১ম ভল্যুম, পৃষ্ঠা ২১৭।)

মার্কস কর্তৃক বর্ণিত এই নিয়মটি কি অপ্রচলিত হয়ে গেছে? না হয় নি। ভারত সমেত সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্ষেত্রে এটা আজও সম্পূর্ণ প্রচলিত আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি সম্পর্কে মার্কস-এর এই কথাগুলি শ্রীরুদ্র উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

দুঃস্থতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে। দেখা যাবে, শিল্পোৎপাদনের মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারীর প্রাপ্য অংশ কমছে এবং সেই অনুপাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রাপ্য অংশ বাড়ছে; ফলে, শ্রমিক-কর্মচারীর আর্থিক অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি ঘটছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঝোঁকটি খুবই স্পষ্ট।

ভারতের কারখানা শিল্পের উৎপাদনের নীট মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারী ও পুঁজিপতিদের অংশ।

মোট মূল্যের শতাংশ হিসাবে

	শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ	পুঁজিপতির অংশ
১৯৫০	৬০'৬	৩৯'৪
১৯৫৫	৫৫'১	৪৪'৯
১৯৫৮	৫৪'২	৪৫'৮

[সূত্র—ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৯টি কারখানা শিল্পের সেন্সাস]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০-৫৮ সালের মধ্যে উৎপাদনের নীট মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ শতকরা ৬০'৬ ভাগ থেকে কমে শতকরা ৫৪'২ ভাগ হয়েছিল; একই সময় পুঁজিপতিদের অংশ শতকরা ৩৯'৪ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৪৫'৮ ভাগ হয়েছিল।

তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে কমে গেছে। দু-এক বছর এর নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু সাধারণ ঝোঁকটি হচ্ছে, শ্রমিকদের অংশ হ্রাস এবং পুঁজিপতিদের অংশ বৃদ্ধির দিকে।

শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন এবং সাথে সাথে প্রকৃত মজুরিও বাড়ছে; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তার চাইতে অনেক কম হারে প্রকৃত মজুরি বাড়ছে; ফলে, প্রকৃত মজুরির আপেক্ষিক হ্রাস ঘটছে।

শ্রমিকদের মজুরি না বাড়িয়ে, তাঁদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি করে প্রভূত উদ্‌বৃত্ত মূল্য উৎপাদিত হচ্ছে; কিন্তু এই উদ্‌বৃত্তমূল্যের খুবই সামান্য অংশ শ্রমিকরা পাচ্ছেন। এই ভাবে বছরের পর বছর শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এটাও মার্কস কর্তৃক নির্দেশিত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার একটি সাধারণ নিয়ম যা প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের শ্রীদাতার সাম্প্রতিক এক নোটে (এই নোটের পূর্ণ বয়ান বোম্বাই-এর 'ইকনমিক উইকলি, বিশেষ সংখ্যা ১৯৬১'-এ প্রকাশিত হয়েছে) বলেছেন যে, "১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে শ্রমিকদের মাথা গ্রস উৎপাদন যেখানে বেড়েছে শতকরা ৫৩ ভাগ, তাঁদের প্রকৃত মজুরি সেখানে শতকরা ২৭ ভাগ মাত্র বেড়েছে।

শোষণের মাত্রা যে কি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুঁজিপতিরা, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় নিচের দিকে রেখে যে কি বিপুল পরিমাণে মুনাফা অর্জন করেছে তা শ্রীদাতার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য থেকে কিছুটা বোঝা যায়।

শ্রীরুদ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন :

"প্রশ্নটা এখানে উঠছে pauperisation-এর দরুন জনসাধারণের যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষের আশা মার্কস করেছিলেন, pauperisation-এর অনুপস্থিতিতে তা কি উপায়ে সাধিত হবে" [পরিচয়—বৈশাখ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১০৩৫]।

আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমি এতক্ষণ চেষ্টা করেছি। সুতরাং এখানে নূতন করে উত্তর দেবার কিছু নেই। এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হচ্ছে—মার্কসবাদীরা "অনাহারের মাধ্যমে বিপ্লব"-এর তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। মার্কসবাদীরা মনে করেন না যে ভিখারীদের নিয়ে বিপ্লব হতে পারে।

পাঠক গোষ্ঠী

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু,

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৯ 'পরিচয়'-এ শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাঙলা-ফাউস্ত সম্পর্কে আলোচনাটি পাঠ করে যে দু' একটি কথা মনে হলো তা প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। অনুগ্রহ করে এই পত্রটি আপনাদের পত্রিকাস্থ করলে সবিশেষ আনন্দিত হব।

শ্রীরায় তাঁর আলোচনার সূত্রপাতে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সম্পর্কে বলেছেন: "বাংলা দেশের বাহিরে না গিয়া ও জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবেও ওদুদ সাহেব গ্যেটে-অনুরক্তির যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর।" "জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়" বলতে শ্রীরায় কি বোঝাতে চেয়েছেন, সঠিক বুঝলাম না। তবে, ওদুদ সাহেবের মুখে আমি যতদূর শুনেছি তাতে জানি, তিনি দীর্ঘ কুড়ি-পঁচিশ বছর জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে রত ছিলেন। আর সেই অধীত বিদ্যা ও উপলব্ধির নিদর্শন তাঁর—"কবিগুরু গ্যেটে।" সুতরাং এ-ধরনের কোনও ব্যক্তিগত উক্তির পূর্বে সম্যক্ বিষয়জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না কি? হাইপথেসিসের অসঙ্গত মাত্রাধিক্য বিশেষ কোনও একটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয় বলে শুনেছি।

বাঙলা-ফাউস্তের অনুবাদক শ্রীযুত কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের সম্পর্কে শ্রীরায় মন্তব্য করেছেন: "...ফাউস্ত-অনুবাদের যে দুরূহ সাধনায় কানাইবাবু প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সিদ্ধির জন্য কেবল জার্মান ভাষাতে দক্ষতা যথেষ্ট নয়, আপন মাতৃভাষার মাধ্যমেও তাহার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন ছিল।" শ্রীরায়ের এই আর একটি বোধহয় রোমহর্ষক আবিষ্কার যে, শ্রীগাঙ্গুলী আপন মাতৃভাষায় একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী নন। "প্রথম শ্রেণীর শিল্পী" বলতে শ্রীরায় যথার্থ কি বোঝাতে চেয়েছেন তা সত্যিই বুঝতে পারলাম না।

অতঃপর শ্রীরায় বলেছেন, টেলরসাহেব ফাউস্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুবাদক এবং তিনিই ফাউস্তকে অবিকলভাবে ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু আমি সবিনয়ে শ্রীরায়ের কাছে ইংরেজী ভাষায় 'ফাউস্ত'এর সার্থক অনুবাদক কয়েকজনের নাম পেশ করতে চাই—Anster, Hayward, Macneice ও Shawcross সাহেব। এঁদের মধ্যে কবি Macneice-র অনুবাদটি শ্রীরায়কে পড়তে অনুরোধ করি, অবশ্য যদি পড়া না থাকে। তবে, 'অবিকলভাবে' অনুবাদ কখনও হয় নি, হচ্ছে না ও হবে না। ছন্দ মাত্রা বজায় রাখলেও নয়, ভাবের কথা ছেড়ে দিলেও ধ্বনির প্রশ্ন থেকে যায়। traduttori, traditori.

কোনো মহৎ সৃষ্টিরই যথার্থ ভাষান্তর হয় না। তবু, শ্রীরায়ের উক্তিকে সমর্থন করেই বলছি, অনুবাদ মূল নয়। অনুবাদ "স্বীয় শক্তির প্রয়োগে অন্য ভাষার কাব্যসম্পদের সমীপবর্তী হওয়াই যথেষ্ট প্রয়াসযোগ্য আদর্শ।" অনুবাদকর্মে আমাদের প্রধানত ভাবগ্রাহিতার পৃষ্ঠপোষক হওয়াই উচিত। উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ সম্পর্কে শ্রীগাঙ্গুলী 'ফাউস্তের ভূমিকায়' যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন (এবং শ্রীরায়ও যার উল্লেখ করেছেন) আমি তার সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত। অনুবাদকার্যটি যথাযথ ভাবানুগ হলো কিনা সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres (Horace, De Arte Poetica, 133) শব্দানুক্রমে অনুবাদে যদি মূল রচনার ভাব যথোচিত প্রকাশ না পায়, সেখানে শব্দের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অসঙ্গত নয়। সুতরাং, শ্রীরায় 'স্বর্গে প্রোলোগ'-এ রাফাএলের ঈশ্বরস্তুতির বাংলা তর্জমা সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন তা এক্ষেত্রে নিরর্থক। প্রসঙ্গত, শ্রীরায় বোধহয় বাঙলা-ফাউস্তের 'পরিশিষ্ট'টি লক্ষ্য করেন নি। শ্রীগাঙ্গুলী রাফাএলের ভাষাকে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করেছেন :

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ !
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান !

বর্ণনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান !

এবার আমি শ্রীগাঙ্গুলীর অনূদিত অসংখ্য সার্থক পংক্তির কতিপয় উদ্ধৃতির মারফৎ দেখাতে চেষ্টা করব যে, জার্মান এবং বাঙলা—এই উভয় ভাষারই বিভিন্ন স্তরে শ্রীগাঙ্গুলীর বৈদগ্ধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য মনকে আপ্লুত করে।

Vierter
Nach Burgdorf Kommt herauf : Gewiss dort findet ihr
Die Schoensten Maedchen und das beste Bier,
Und Haendel von der ersten Sorte !

মরে যাই ! ঐ দেখ,
হাঁটছে ডবকা ছুঁড়ী দেখ,, হাঁটে কিবা ঠাটে ভাই !
ওরে আয়, জোরে আয় উহাদের সাথে মোরা যাই,
তামাকটা কড়া হবে মদ হবে জোরালো বিয়ার,
মেয়ে এক সাজাগোজা পছন্দ এই তো আমার !

(পৃ. ৫১)

Wagner.·· ··· ··· ···
Doch gehen wir ! Ergraut ist schon die welt,
Die Luft gekuehlt, der Nebel faellt !
Am Abend Schaetzt man erst das Haus.—

··· ··· ··· ··· ···

ভাগনার :··· ··· ··· ··· ··· ···
চলুন এবার,
সন্ধ্যা এলায়েছে তার ধূসর আঁচল,
পবন শীতল,
নামে ঘন কুহেলিকা,
হেনকালে সর্বলোক ভালবাসে গৃহদীপখানি।

(পৃ. ৬৮)

Anster সাহেবের "Towards night we first have the true feel of home" বা, Shawcross সাহেবের 'when evening comes the charms

of home grow double" বা Taylor সাহেবের "At night, one learns his house to prize" এমনকি কবি MacNeice-র "It's in the evening one really values home"-এর চেয়ে শ্রীগাঙ্গুলীর "হেনকালে সর্বলোক ভালবাসে গৃহদীপখানি" বোধহয় অনেক সঙ্গত ও সার্থক পর্যায়ের অনুবাদের দাবি রাখে। প্রসঙ্গক্রমে Taylor সাহেবের পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করেই সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, জার্মান 'Abend' শব্দটির পরিবর্তে 'Night' শব্দটির প্রয়োগ কি যথাযথ হয়েছে? এবং মূলের ঝোঁক এক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে কিনা তা বিদগ্ধ পাঠকরাই লক্ষ্য করবেন।

Mephestopheles
Wie's wieder siedet, wieder glueht !
Geh ein und troeste sie du Tor !

মেফিস্তো :
টগ্‌বগিয়ে ফুটল পিরিত, উঠল জ্বলে আবার,—
ওরে পাগল! চল এখন, জুড়াও হিয়া পিয়ার।
(পৃ. ২১১)

'পিরিত' ও 'পিয়ার' শব্দ দু'টির ব্যঞ্জনা চমৎকারিত্বের দাবি রাখে। অনুবাদে মূল রস ও স্বভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে।

সর্বশেষে শ্রীরায়ের নিজস্ব অনুবাদকাণ্ডের ওপর কয়েকটি কথা বলতে চাই।

Meine Ruh ist hin, ...
Mein Herz ist Schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr

Taylor সাহেব :

My peace is gone,
My heart is sore :
I never find it,
Ah nevermore !

শ্রীগাঙ্গুলী :

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হোল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর !

শ্রীরায় :

শান্তি আমার ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

শ্রীগাঙ্গুলীর "বিদায় নিল" এবং শ্রীরায়ের "ছেড়ে গেছে"-র ঝোঁক এক নয়। শ্রীগাঙ্গুলীর "বিদায় নিল"-র প্রয়োগ এখানে মূলানুগ এবং যথাযথ। প্রসঙ্গত, শ্রীরায় বোধহয় Taylor সাহেব অনুসরণে উপরি উক্ত গানটির শেষ আট পংক্তি দু'টি পৃথক স্তবকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু, শ্রীগাঙ্গুলী শ্রীরায়ের পংক্তি-বিন্যাস মানেন নি। একটি প্রামাণ্য সংস্করণে উক্ত স্তবক দু-টি একত্রেই পাওয়া যায় :

Mein Busen draengt
Sich nach ihm hin,
Ach duerft' ich fassen
Und halten ihn !
Und kuessen ihn
So wie ich wollt',
An Seinen Kuessen
Vergehen sollt' !

(Goethe. Faust, P. 111)

Bearbeiter Des Bandes
Ernst Grumach
1954
Academic—Verlag Berlin)

তাছাড়া, আলোচ্য স্তবকদ্বয় 'উর্‌ফাউস্তে'ও পৃথকীকৃত হয় নি।

Mein schoos ! Gott ! draengt
Sich nach ihm hin
Ach duerft' ich fassen
Und halten ihn
Und kuessen ihn
So wie ich wollt
An seinen kussen
Vergehen sollt.

Urfaust, P. 45
Gesamtausgabe
Im Insel-Verlag
1958)

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু,

পরিচয় পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট" প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগ-নির্ভরতা সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণে লেখক রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন এবং অসংযমী গায়কের স্বরচিত অলংকার প্রয়োগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বকীয়তাহানি সম্পর্কে হীরেনবাবুর বক্তব্যে আমার সাধারণ সমর্থন আছে। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে তিনি এমন একজন শিল্পী সম্পর্কে অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কদলে যাঁর স্থান প্রথম সারিতে। শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমি উল্লেখ করছিনে (তার কণ্ঠে ধ্রুপদ ও বাংলা খেয়াল শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাই তাঁর সম্পর্কে হীরেনবাবুর অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক ইঙ্গিত আমার অত্যন্ত অশোভন মনে হয়েছে), কিন্তু শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত সম্পর্কে তার অভিযোগগুলি আদৌ তথ্যসমর্থিত নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপায়নে তিনি রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করে আত্মম্ভরিতার ছাপ রাখেন—এ কথায় তাঁর গানের মনোযোগী শ্রোতা

কখনই সায় দেবে না। 'কিছুই ত হলনা', 'এরা পরকে আপন করে', 'এ মোহ আবরণ'—এ-সব গানে শ্রীমতী দত্ত সুপরিমিত বোলতান এবং বিস্তার প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে প্রয়োগ তার অসামান্য দক্ষতা বা সংযমের জন্যই প্রশংসনীয় নয়, আমার নিশ্চিত ধারণা এ-জাতীয় ভাঙা গানে সামান্য, বিস্তার ও বোলতান গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিল। হীরেনবাবু কি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীমতী নীলিমা সেনের কণ্ঠে 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' বা 'কে বসিলে আজি' টপ্পা অঙ্গের গানে বিস্তার শোনেন নি? হীরেনবাবু শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা খেয়ালাঙ্গ গান 'বিমল আনন্দে জাগোরে' উল্লেখ করেছেন—সেখানে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সুদীর্ঘ তানটির কথা কি তিনি ভুলে গেছেন? এসব প্রয়োগ তো দূষণীয় নয়! তবে শ্রীমতী দত্তকেই দোষী করা হবে কেন? রমেশবাবুর কাছে সাঙ্গীতিক উপদেশ নেন বলে?

ঐ সব গানের রূপায়ণ প্রসঙ্গে রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে আর সকলের পার্থক্য, শ্রীমতী দত্ত ঐ গানগুলি স্বরলিপি নির্দেশানুযায়ী তাল রেখে গেয়েছেন—যা অন্য কেউ পারেন না (এটা আমার স্বকপোল কল্পনাও নয়, বিদ্বেষপ্রসূত উক্তিও নয়—শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপাপ্ত জনৈক শিল্পী স্বয়ং একথা আমায় বলেছেন)। এ গানগুলি তাল রেখে অথচ বিশেষ মেজাজ (mood)-টি নষ্ট না করে গাওয়া সাধনা সাপেক্ষ—রাজেশ্বরী দত্ত সে সাধনায় সফল হয়েছেন বলে তাকে হেয় করা সমীচীন কি? তাছাড়া তালের সম্পর্কে রাজেশ্বরী দত্ত অনাবশ্যক ব্যস্ততাকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। যে সব গান আলাপের ঢঙে তালের নিয়মিত বাঁধন না মেনেই গেয়, সে-সব গানে তিনি তো আলাপের ঢঙই রক্ষা করেছেন। কই, 'বন্ধু রহো রহো সাথে' কিংবা 'হে বিরহী হায়' রেকর্ডে রাজেশ্বরী দত্ত কোনো percursion যন্ত্র ব্যবহারই করতে দেন নি। 'বাজে করুণ সুরে' তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গেয়েছেন, দিল্লী কেন্দ্র থেকে গত শতবার্ষিকী উৎসবে তার কণ্ঠে 'কখন দিলে পরায়ে' শোনা গেছে, বর্তমানে তিনি ভারতের বাইরে থাকেন, কিন্তু কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রায়ই স্টুডিও রেকর্ডে তার গান শোনানো হয়—'কখন বসন্ত গেল' 'কেহ কারো মন বোঝেনা', 'সকল জনম ভরে',—এসব গানে তবলাবাদ্যের নামগন্ধও শোনা যায় না। এমন কি বিখ্যাত উচ্চাঙ্গের গান 'এ পরবাসে রবে কে' গানে মালতী ঘোষালের রেকর্ডে তবলার ব্যবহার আছে,

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস তবলা সহযোগে তাল রেখে গানটি সর্বত্র পরিবেশন করেন, কিন্তু ঐ গানে রাজেশ্বরী দত্ত তবলার ঠেকার আশ্রয় নেন নি। তবে তাঁর দোষটা কোথায় ?

রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীর তৃতীয় "পার্থক্য" হয়তো তার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। কিন্তু এ পার্থক্য যে কোনো দুজন শিল্পীর গায়ন পদ্ধতিতে লক্ষণীয়—কেননা গায়কেরা তো যন্ত্র নন। এটা খুবই ঠিক কথা যে রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কদের দায়িত্ব 'creative' নয়, 'representational' বা 'interpretive'—কিন্তু representation-এর ক্ষেত্রেও পরিবেশনকারীর ব্যক্তিগত মানসকে চেপে মারা বা ছাঁচে ঢালাই করার অভিলাষ খুব শ্রদ্ধেয় নয়, সবক্ষেত্রে তা সম্ভবও হয় না। সুচিত্রা মিত্র এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁদের গায়ন পদ্ধতিতে রাবীন্দ্রিকতা অক্ষুণ্ণ থেকেও ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষণীয়, সেই পার্থক্য লক্ষণীয় সুবিনয় রায় এবং শান্তিদেব ঘোষের গায়ন পদ্ধতিতে, এমনকি সুবিনয় রায় এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও। পক্ষাবলম্বনকারীরা হয়তো একজনকে সমর্থন করে আরেকজনকে নিন্দাবাদ করে গায়ের ঝাল মেটান, আমার এঁদের প্রায় সকলকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রদ্ধেয় শিল্পী বলে মনে হয়। রাজেশ্বরী দত্ত যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আন্তরিক চরিত্রকে বিনষ্ট না করেন তবে তাঁকেই বা কেন সন্দেহবানে বিক্ষত করব ? হীরেনবাবুর কুসংস্কারকে খুব ভয় করেন—এটাও এক-জাতীয় কুসংস্কার নয় কি ?

পার্থক্যের কথায় মনে পড়ল একটি বিশেষ গানের কথা—'মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।' শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন এ গানটি টপ্পার ঢঙে তাল ছেড়ে গান, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র এবং শ্রীমতী গীতা সেনের রেকর্ড করা এ গানটিতে আড়-খেম্‌টা ছন্দে কীর্তনের রূপ নিয়েছে। খুব সম্ভবত দু-টি রূপই অভ্রান্ত, রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান আছে—যার দুটি তিন-টি করে রূপ লভ্য। এখানেও হয়তো পক্ষসমর্থনকারীরা চরম উৎসাহে একে অন্যকে চোখ রাঙান কিন্তু যেহেতু দুটো রূপই রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এবং খোদ্ শান্তিনিকেতন থেকেই প্রচারিত—অতএব আমাদের কাছে দুটোই গ্রাহ্য—যেমন গ্রাহ্য 'তবু মনে রেখো' গানের দুটো রূপ (দুটো স্বরলিপি আছে)। 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানে ঐ রকম কিছু হয় নি জোর করে বলা যায় কি ?

যেহেতু শিল্পীরা দৈবী মহিমাসম্পন্ন নন, বরঞ্চ মানবিক গুণেরই অধিকারী তাই তাদের মধ্যে সাময়িক দোষের দেখা পাওয়াও অসম্ভব নয়। কোনো একদিন কোনো এক গানে রাজেশ্বরী দত্তের মুদ্রাদোষ প্রাপ্য হতে পারে, কিন্তু সে আকস্মিক দোষ থেকে কোনো শিল্পীই মুক্ত নন—সে ব্যাপারে একজনকে বেছে নিয়ে কটুকাটব্য করা সঙ্গত নয়। চরম অবিদ্যার বশে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিকৃত করেন তাদের ধিক্কার দেওয়া সঙ্গীত সমালোচকের কর্তব্যের অন্তর্গত হতে পারে—কিন্তু সেই ধিক্কারের আবর্তে একজন দক্ষ ও তন্নিষ্ঠ শিল্পীকে টেনে নামানো স্ববিচারের পরিচায়ক নয়।

ধ্রুব গুপ্ত

আমি ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত। ১৩৬৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘পরিচয়’ মাসিক পত্রিকায় শ্রীহীরেন চক্রবর্তীর লেখা ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট’ প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। প্রবন্ধের প্রথমার্ধের বক্তব্য সুচিন্তিত এবং চিত্তাকর্ষক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ পড়ে শুধু একটি কথাই মনে হলো যে “রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট” শিরোনামা দিয়ে সম্ভবত ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশ থেকে সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অশিষ্ট সমালোচনাই লেখকের মূল বক্তব্য।

সম্পাদক মহাশয় লেখকের সিদ্ধান্তের বিশদ আলোচনা আহ্বান জানিয়েছেন। তাই পাঠক হিসেবে এবং শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ গুণের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত আছি বলেই আমি এ আলোচনায় যোগ দিতে অগ্রসর হয়েছি।

শ্রীচক্রবর্তী প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই আক্রমণ করেছেন তানসেন ঘরানার বাহাদুর খাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের—গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার বর্তমান প্রসিদ্ধ ধারক ও বাহক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য এবং পুত্র সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

লেখক প্রথমেই একটি হাস্যকর ভুল করেছেন। (১২২০) পৃঃ “অবশ্য এঁর কণ্ঠে পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শোনার খুব বেশি সুযোগ ঘটে নি। রমেশবাবু বেশির ভাগ (এমন কি বেতারেও) ধ্রুপদাঙ্গ এবং খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতই

করে থাকেন"। লেখকের এই মন্তব্যে এটুকু ভালো ভাবেই বুঝেছি যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ গান শোনার সৌভাগ্য লেখকের কখনও হয় নি। আমি হীরেনবাবুকে অনুরোধ জানাচ্ছি—পুরনো বেতার জগৎ সংগ্রহ করলে উনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে সঙ্গীতাচার্য শুধু উচ্চাঙ্গের রবীন্দ্র-সঙ্গীতই নয়—ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন গান উনি বেতার মারফত পরিবেশন করেছেন।

'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' গানটি আমি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বহুবার শুনেছি এবং বেশির ভাগই গানটি তাঁকে গাইতে হয়েছে শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে। এ ব্যাপারটা শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও লক্ষ্য করেছি; শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে বহুবার উনি এ গানটি গেয়েছেন সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বিস্তার করে। আমি যা শুনেছি তাতে তানের ব্যবহার খুব অল্প এবং তা গানের সৌন্দর্য এবং মর্যাদা বাড়িয়েছে।

(১২২১ পৃঃ) 'ঝর ঝর বরিষে······হায় গৃহহারা কথাটার শেষ অক্ষরে প্রত্যেক······বোলতান আছে'—গানের বন্দেজ আর বোলতান কি এক? তাহলে 'এ পরবাসে' গানের প্রথমাংশ বা 'সুধা সাগর তীরে' গানের 'হে' কথাটির স্বরকে বোলতান বলব? এ রকম আরো বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, লিখে শেষ করা যাবে না।

(১২১৭ পৃঃ) লেখকের একটি মন্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি—"রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি সহজ ভাগে বিভক্ত করা মস্ত বড় একটা ভ্রান্তি"—আমার ধারণা যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই হল ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পা অঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ ইত্যাদি নানা অঙ্গের গান হয়েও তা রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

(১২২৫ পৃঃ) হীরেনবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর্দর্শ সম্বন্ধে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"রবীন্দ্র সঙ্গীতের আদর্শ" সম্বন্ধে আর একটু লিখলে বিস্তারিত জানা যেত "আদর্শ"টা কি?

লেখক শুধু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন নি, রাধিকাবাবু এবং গোপেশ্বরবাবুর মত গুণী ব্যক্তিকেও কলমের খোঁচায় জর্জরিত করেছেন।

(১২২৭ পৃঃ) শ্রীচক্রবর্তী শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে আক্রমণ করেছেন। লেখক 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটিকে তালবিহীন বলেছেন। কিন্তু সত্যি তা নয়, গানটি একতালে নিবদ্ধ। শ্রীমতী দত্ত অধিকাংশ গানই কঠিন তালে অথচ

সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন—যা কোনো শিল্পীই কখনও গান না। আজকাল অবিশ্যি মাঝে মাঝে এক আধজনকে কঠিন তালে গাইতে দেখা যায়—তবে তা হাতে গোনা যায়। কতকগুলি তালে—যথা যৎ, আড়া ঠেকা, মধ্যমান ইত্যাদি—গান গাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, তবে নিয়মিত অভ্যাসে তা অত্যন্ত সহজ ভাবে গানকে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। একটু কষ্ট স্বীকার করে অভ্যাস করে নিলে তখন আর তালবিহীন গানের কথা মনেই আসবে না—এটা অবিশ্যি আমার ব্যক্তিগত মত। সুর বজায় রেখে তালের সঙ্গে গাইলে গানের বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট করতে হলে শিল্পীর যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে। যোগ্য শিল্পী তাঁর মর্যাদা নিশ্চয়ই রাখবেন। রাজেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে একটি মাত্র মন্তব্যই আমি করব—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা শিষ্যা রাজেশ্বরী দেবীর মতো সুরে, তালে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আর কোনো পুরুষ অথবা মহিলা শিল্পী গাইতে পারেন বলে আমার মনে হয় না—কেন না আজ পর্যন্ত শুনিনি। রাজেশ্বরী দেবী শুধু বাংলা বা ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

গীতাঞ্জলি দেবী

"রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট"

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'পরিচয় পত্রিকায়' শ্রীযুত হীরেন চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট" শীর্ষক প্রবন্ধখানি বেশ শ্রদ্ধা নিয়ে পড়লাম। কিন্তু হীরেনবাবুর লেখায় কোথাও আক্রমণ এবং অভদ্রতা ছাড়া অন্য কিছুই পেলাম না। হীরেনবাবু শ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিদের উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতসমাজকেই আঘাত করতে চেয়েছেন। রমেশবাবুর অপরাধ, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান বাঁট ব্যবহার করেছেন। কথাটা কি সত্যি? বোধহয় না। কারণ রমেশবাবু যে গানগুলো গেয়ে থাকেন, সেগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়—রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান সেইগুলোই, যেগুলোর বাণী রবীন্দ্রনাথের কিন্তু সুর হিন্দুস্তানী খেয়াল ধ্রুপদের। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্ধভক্তরা

যদি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ খেয়াল ধ্রুপদের সুর গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তান বাঁট বর্জন করেছেন—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তান বাঁট প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন, তাহলে যে, 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছো বাঁধি বিশ্ব তানে, মিলাবো তাই জীবন গানে' গানখানি তিনি ভুল করে লিখেছেন। না, তিনি ভুল করে লেখেন নি। মনের সম্মতি ছিল বলেই তিনি লিখেছেন। আর একটি কথা হলো কোনো কোনো হিন্দুস্তানী খেয়াল ধ্রুপদের সুর যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের উপযোগী হয় তাহলে সেই সব খেয়াল ধ্রুপদের তান বাঁট এবং লয়ের কাজও রবীন্দ্রনাথের গানের অঙ্গীভূত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তানের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। তার একটি প্রমাণ হিসেবে বলছি, 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' গানখানির শুরু থেকেই বেশ বড় তান রয়েছে। হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। তার অতিরিক্ত তিনি বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের রাজ্যে এই প্রয়োজন শব্দটির ওজন সবার কাছে এক নয়। যদি তাই হতো তাহলে শার্ঙ্গদেব, অহোবল, ভরত, দত্তিল, মোজার্ট, ষ্ট্রাভেন্সকী, বিথোভেন এবং র‍্যাভেল সব বিষয়ে একই কথা বলে যেতেন; আর বিলাবল ঠাট ডায়াটোনিক উপাধি নিয়ে নিজের চলনভঙ্গিটা সাহেবী করে ফেলতো না, এদেশের 'সা রে গা পা ধা' চীনাদের ঘরে যেয়ে কুঙ, সাঙ, কিয়ো, চী, উ, নাম নিয়ে ভোল পালটে ফেলত না এবং এদেশের বাইশ শ্রুতি আরবের জেক, ডু, সি, সের, পেনি, স্কেস, হেপ্‌, পর্দার দাপটে খতের শ্রুতি হয়ে পড়ত না। কিন্তু দেশের সঙ্গে দেশের এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই পার্থক্য চিরদিন থাকবে। কারণ অনুভূতি এবং রুচি সব মানুষের এবং সব দেশের এক নয়। হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির ওপরে রমেশবাবুর অনুভূতিকে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বলবো, এটা ওপর নিচের কথা নয়—অনুভূতি এবং রুচির পার্থক্যের কথা। আর বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক আরন কপলাণ্ড (Aaron Copland) তাঁর *What to listen for in music* বইখানিতে লিখেছেন—"Don't get the idea that the value of music is commensurate with its sensuous appeal or that the loveliest sounding music is made by the greatest composers. If that were so, *Ravel* would be a greater creator than *Beethoven*." হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের নবগীত-

ধারার ব্যাকরণে তান বাঁটের স্থান নেই। কিন্তু স্থান আছে কি নেই সে তো 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানের স্বর, ছন্দ এবং বাণীর দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়। গানখানির বাণী বিদ্যাপতির এবং স্বর রবীন্দ্রনাথের। আর এই গানখানিতে হিন্দুস্তানী গায়কী ছাড়া অন্য কোনোও গায়কী পাওয়া যায় না। অথচ এটাকে বেমালুম রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চালানো হয়। আর এই গানেও যদি রমেশবাবু দুন চৌদুন করেন তাহলে হীরেনবাবু নিশ্চয়ই ছেড়ে কথাটি কইবেন না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ গানকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলবেন না, বোস-আইনস্টাইন থিয়োরীর মতো বিদ্যারবী সঙ্গীতই বলবেন। রবীন্দ্রনাথের এরকম অনেক হিন্দুস্তানী ঢং-এর গান রয়েছে যেগুলোর মধ্যে তান বাঁট এবং দুন চৌদুন অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়—একটুও খারাপ লাগবে না। হীরেনবাবু অনেকবার কাব্যসঙ্গীতের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে তান বাঁট করার অপরাধে শ্রদ্ধেয় ৺রাধিকামোহন গোস্বামী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন দত্ত প্রমুখ শিল্পীদের বেশ কয়েক হাত নিয়েছেন। কিন্তু ওঁরা কি হীরেনবাবুর 'তোমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর' ওপর তান বাঁট চাপিয়ে দিয়েছেন? হীরেনবাবুর জানা উচিত, যে গানের বাণী এবং স্বর তান বাঁটের উপযোগী নয় সে গানে জোর করে তান বাঁট করা যায় না। তিনি হয়তো আবার পুরনো কথা বলবেন—রমেশবাবু জোর করেই তান বাঁট করেছেন। তাহলে আমিও বলবো, কান যদি ফুটো করলেন তো ঝুমকো পরবেন না কেন? স্বরটা যদি একটি খেয়াল গানের কার্বন কপি হয়, তা হলে তান বাঁটগুলোর ওপর বিরক্তি কেন? হীরেনবাবু যুক্তি দেখাবেন হিন্দীভাষার মতো বাংলা ভাষা হিন্দুস্তানী তান বাঁটের ধকল সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তাহলে শ্রদ্ধেয় ৺জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের বাংলা গান এত জনপ্রিয় হলো কি করে? আসল কথা হলো একটি কেত্‌লি যেমন শিশুর কাছে খেলনা, প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে চা তৈরির অপরিহার্য পাত্র এবং বৈজ্ঞানিকের কাছে বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের যন্ত্র, তেমনি রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তান বাঁট ইত্যাদি স্বর লয়ের কাজ অবোধ, অর্ধজ্ঞানী এবং মহাজ্ঞানী সঙ্গীতানুরাগীর কাছে যথাক্রমে হাসি উৎপাদক, বিরক্তিকর এবং আনন্দদায়ক ক্রিয়া। হীরেনবাবু নিশ্চয়ই বলবেন, রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়েও তান বাঁটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্যতম গুরু ৺রাধিকামোহন গোস্বামীর সম্বন্ধে

নীরব ছিলেন কেন? অপরের বেলায় ষ্টিম রোলার চালাতে বারণ করেছেন, অথচ শ্রদ্ধেয় গোস্বামী ষ্টিম, ডিজেল এবং ইলেট্রিক সবরকম রোলার চালিয়েও প্রতিবাদের সম্মুখীন হলেন না! আশ্চর্য! তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি পক্ষপাত-দুষ্ট ছিলেন?

হীরেনবাবু একজায়গায় "হলক" তানের উল্লেখ করেছেন। শব্দটা "হলক" নয়—"হলকা"। যে তানের প্রতি দুই স্বরের পর তৃতীয় স্বর দু-বার ব্যবহৃত হয় তাকেই "হলকা তান" বলে। শাস্ত্রে আছে—গান্ধার স্বর শান্তরস উৎপাদক; অতএব রমেশবাবু যদি "স্বারে গাগা" তান করেন তাহলে আগুনের হলকা ছুটবে কেন? শ্রীচক্রবর্তী হয়তো বলবেন, ওগুলো পুরনো কথা। তাহলে আমিও বলব, ডক্টর স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—Rabindranath Tagore, the greatest Indian poet of the present age, was also in the old tradition when he composed a song and set it to tune and sang it himself.

হীরেনবাবু আর একজায়গায় সমের ওপর রমেশবাবুর গোঁত্তা মারার কথা লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামকেলী রাগে 'দুখ দূর করিলে' গানের সমে গোঁত্তা মেরেছেন সেটা বোধহয় হীরেনবাবু স্বরবিতানের পাতা খুলে দেখেন নি। আর এমন অনেক রাগ আছে, যাদের সব স্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ঐ সব স্বর নিজেদের প্রকাশ করতে অন্যস্বরের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে,—যেমন দরবারী কানাড়া রাগে গান্ধার স্বর মধ্যমের সাহায্য ছাড়া দরবারীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কাজেই গান্ধারের ওপর 'সম' থাকলে গোঁত্তা একটা মারতেই হবে। এতে যদি হীরেনবাবুর আপত্তি থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর থেকে রাগ-রাগিনীর নাম মুছে ফেলতে হবে। রামকেলিতে কোমল নিষাদ গৌণস্বর এবং ওটা কেবল গোঁত্তা মারার কাজেই লাগে। রবীন্দ্রনাথও উল্লিখিত গানে সেই গোঁত্তাই মেরেছেন।

পরিশেষে বলব যে শিল্পী নিপুণ হলে তাঁর তান বাঁট রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ গানে ভালোই লাগবে; আর অনিপুণ শিল্পীর তান বাঁট হিন্দুস্তানী খেয়াল গানেও ভালো লাগবে না। হীরেনবাবু কি রমেশবাবুকে নিপুণ শিল্পী বলে স্বীকার করেন না?

অজিতকুমার সেন

পুস্তক পরিচয়

মিলক গ্রহে মানুষ ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্ ॥ টা. ৩.০০

মানুষের মন ডানা মেলতে চায় কল্পনার কল্পলোকে। তার এই কল্পলোক সৃষ্টি করার জন্যই উদ্ভব হয়েছে রূপকথার। রূপকথার রাজ্যে দ্রুতগামী ঘোড়া তাই পরিণত হয় পক্ষীরাজে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, মাটির টান কাটিয়ে, উধাও হয় আকাশ পথে, গরু গাছে চড়ে, পশুপাখি, গাছপালা মানুষী ভাষায় কথা বলে, কেউ-ই তাতে আপত্তি করে না কারণ রূপকথার কল্পনায় এইটাই স্বাভাবিক। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল সব কিছুরই সঙ্গে কল্পনার মাধ্যমে মানুষ এক হয়ে যেতে চায় রূপকথার জগতে। এই হিসাবে রূপকথার জগৎ হল চিন্ময়, তার আহ্বান হলো বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্মবোধের আহ্বান। প্রাকৃতিক রহস্য সম্পর্কে মানুষের অজানা বিস্ময়কে আশ্রয় করেই প্রথমত রূপকথার জগৎ গড়ে উঠেছিল। তারপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক রহস্যের মানসিক অনুধাবনের মাত্রা যতই বেড়ে চলেছে ততই সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে রূপকথার জগৎ। এই কালান্তরের ফলে বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্মবোধের উন্মাদনা, কল্পলোকে মন-বিহঙ্গের উধাও হবার বাসনা কিন্তু বিন্দুমাত্রও কমেনি। এই উন্মাদনা, এই বাসনাই রূপকথাকে আজ রূপান্তরিত করেছে বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীতে। বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মানুষের মন আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে উধাও হয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে, পক্ষীরাজ রূপান্তরিত হয়ে গেছে রকেটবাহিত মহাকাশ যানে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর জায়গা নিয়েছে 'ইলেকট্রনিক ব্রেন' আর 'মেমারি মেশিন' দৈত্য, দানব, রাক্ষস, খোক্কস রূপান্তরিত হয়েছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে, রেডিও চালিত রবটে। সাধারণত বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্পকথার ভিত্তিভূমি হয় এমন-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্য যাদের ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে এই সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ন আপাত অকল্পনীয়, অভাবনীয় হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এদের বাস্তব রূপপরিগ্রহণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসম্ভব নয়,

উদ্ভট নয়। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীতে তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ কল্পনার স্থান আছে তা সে এই কল্পনা যতই অসম্ভব হোক না কেন। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কথা কাহিনীতে কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা অবাস্তবতার কোনো ঠাঁই নেই। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকথা আর আদিম যুগের রূপকথার মধ্যে তফাৎটা বোধকরি এইখানে। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের, সত্যের বর্তমান বাস্তবতাকে আশ্রয় করে যত নিপুণভাবে বিজ্ঞানগ্রাহ্য কল্পনার জাল বুনতে পারবেন, আপাত বাস্তবতার পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারবেন ততই তাঁর রচনা সার্থক হয়ে উঠবে, রসোত্তীর্ণ হবে। সাধারণত বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর মুখ্য উপাদান হলো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তথ্য সত্য আর এই যন্ত্রপাতি, তথ্য, সত্যকে আশ্রয় করে পৃথিবীর মানুষ, গ্রহান্তরের মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু গাছপালা নিয়ে মূল কাহিনীটি গড়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য, সত্যকে আশ্রয় করে দেশবিদেশের সাহিত্যে বিজ্ঞানাশ্রয়ী কথা কাহিনীর প্রচলনও তত বাড়ছে। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্রধানত বিদেশী ভাষায় লিখিত বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম এই বিভাগে মৌলিক রচনা বড় একটা চোখে পড়ে না, প্রায় নেই বলাই ভাল। বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞানাশ্রয়ী আখ্যায়িকা-সম্ভারে আধুনিকতম সংযোজন হলো অদ্রীশ বর্ধনের লেখা "মিলক গ্রহের মানুষ"। বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বইটি লেখকের মৌলিক রচনা, অন্য কোনো বিদেশী বইয়ের অনুবাদ নয়।

মিলক হলো একটি কাল্পনিক গ্রহ। প্রায় পৃথিবীর মতোই এর ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, গাছপালা পশুপাখি। এর অধিবাসীরা প্রায় মানুষের মতো। পৃথিবী থেকে মিলক গ্রহের দূরত্ব হলো কয়েক আলো বছর। মিলক গ্রহের অধিবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক একসময় আকস্মিকভাবে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত-জনিত বিকীরণের বলি হয়েছিল এবং এই বিকীরণের প্রভাবে তাদের বংশগতিধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে তাদের বংশধরেরা পরিণত হয় একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে। লেখক এই বিশেষ

শ্রেণীটির নাম রেখেছেন "মিউপা"। মিউপাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের হার অত্যন্ত দ্রুত, পাঁচ বছর বয়সের একজন মিউপা বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশ বছরের যুবকের মতো। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও মিউপারা সাধারণ মিলকবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত। মিউপাদের শ্রেণীগত পেশা হলো রাজনীতি। মিলক গ্রহের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়, সাধারণ মিলকবাসীদের জীবনমরণ নিয়ন্ত্রণে মিউপাদের নিব্যূঢ় স্বত্ব। শ্রেণীগত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের চরম রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক অপব্যবহার করতে মিউপাদের দ্বিধা নেই বিন্দুমাত্রও। সাধারণ মিলকবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বয়ঃপ্রাপ্তির সমানুপাতে যাতে না ঘটে হরমোন নির্যাসের সাহায্যে মিউপারা তার ব্যবস্থা করতে ভোলে না এর ফলে মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক বালকে, সাদা কথায় 'বুড়ো-খোকায়', যৌবনেই অকাল-বার্ধক্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীরা মিউপাদের শোষণ-শাসন, রাজনৈতিক পীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলি যাতে নির্বিবাদে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে সেই উদ্দেশ্যে মিউপারা তৈরি করে বিদ্যুৎচালিত বিরাট এক যান্ত্রিক মগজ আর এই যান্ত্রিক মগজের প্রতিভূ হিসাবে চালিয়ে যায় তাদের শাসন-শোষণ। যান্ত্রিক মগজের মারফৎ তারা জারি করে তাদের যত পীড়নমূলক বিধিনির্দেশ। মিলকের সব রাজনীতিবিদই হলো মিউপা। মিউপাদের রাজনৈতিক শিখণ্ডীবৃত্তি, যান্ত্রিক মগজের বুজরুকি মিলকের অবোধ জনসাধারণ ধরতে পারে না। বালকোচিত সারল্যে মিলকের সাধারণ অধিবাসীরা যান্ত্রিক মগজ যা বলে অন্ধভাবে তাই মেনে চলে। যান্ত্রিক মগজই হলো মিলকের ঈশ্বর, জনগণনায়ক বিধাতা। মিলকবাসীদের সব সমস্যার সমাধান করে দেয় যান্ত্রিক মগজ। মগজের সামনে শুধু প্রশ্নটা বললেই হলো, তার পরে মগজের যন্ত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে নির্ভুল উত্তর। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, অবস্থা বিশেষে আইনকানুনের পরিবর্তন, কখন কোন মিলকবাসীকে পরলোকে পাঠানো দরকার সবই বলে দেয় মগজ অর্থাৎ মিউপারা যা চায়, মগজ সেই নির্দেশই দেয়। মগজের পিছনে বসে মাইক্রোফোনের মারফৎ মিউপা রাজনীতিবিদেরা মগজের নির্দেশ দেয়। এ মেশিন ছাড়া মিউপাদের এক পাও এগোবার ক্ষমতা নেই মিলক গ্রহের মানুষদের। মগজ কি করে চলে এবং মগজের নির্দেশের নির্ভুলতা সম্পর্কে মগজের সামনে প্রশ্ন করা বা তোলা মিলকগ্রহে মারাত্মকভাবে

নিষিদ্ধ। মগজ যা বলে অন্ধভাবে তাই মেনে না চললে মিলক গ্রহের আইনে বাঁচা যায় না। অবধারিত মগজ কিভাবে চলে বা মগজের নির্দেশ নিভুর্ল কি না এই প্রশ্ন যারা তোলে মিলক গ্রহে তাদের কাউকে বাঁচতে দেওয়া হয় না। মিউপারা যান্ত্রিক মগজের সাহয্যে মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীদের এইভাবে অধীনে রেখে ছিল বংশ পরম্পরাক্রমে। তারপর একদিন পৃথিবী থেকে রকেট চালিত মহাকাশ যানে করে একজন রাশিয়ান, একজন ভারতীয় এবং একজন মাকিন মহিলা নিয়ে গঠিত মহাকাশ অভিযাত্রীর একটি আন্তর্জাতিক দল উপস্থিত হ'ল মিলক গ্রহে। মিউপারা এই অভিযাত্রী দলটিকে বন্দী করে। পৃথিবীর মানুষের তৈরী রকেট বাহিত মহাকাশযান দেখে মিউপারা যেমনভাবে কারো সন্দেহ না জাগিয়ে মিলক গ্রহের অধিবাসীদের শাসনে শোষণে রেখেছে ঠিক তেমনি ভাবে বিরাট এক রকেট বাহিনী তৈরী করে তার সাহায্যে অন্যান্য গ্রহে আধিপত্য বিস্তার করবার, অন্যান্য গ্রহবাসীদের পদানত করবার এক পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে মিউপারা পৃথিবী থেকে আসা অভিযাত্রী দলের কাছ থেকে শিখে নিতে চায় রকেট বাহিত মহাকাশযান নির্মাণের কৌশল, মহাকাশ যান চালনার পদ্ধতি। মহাকাশ যান নির্মাণ ও চালনার পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর অভিযাত্রী দলটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্তও মিউপারা নেয়। মিউপাদের এই যড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। জীবন, স্বাধীনতা আর রকেট বিমানের বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বনাশ করতে, পৃথিবীকে বিকিয়ে দিতে অভিযাত্রী দলটি কিছুতেই রাজি হয় না। যান্ত্রিক মগজের মারফৎ মিউপারা অভিযাত্রী দলটিকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে। কূটনীতি আর বুদ্ধি কৌশলে অভিযাত্রী দলটি অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা তো করলেনই উপরন্তু যান্ত্রিক মগজটিকে বিস্ফোরক আর রেডিও চালিত ফিউজের সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন, সাধারণ মিলকবাসীদের কাছে মিউপাদের শ্রেণীস্বার্থে প্রণোদিত রাজনৈতিক পীড়নের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদের সাহায্যে সবংশে মিউপাদের বিলুপ্ত করে দিলেন, অভিযাত্রীদের সাহায্যে হরমোন নির্যাসের প্রয়োগে মিলক গ্রহের সাধারণ মানুষেরা তাদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ জানতে পারল এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সংক্ষেপে এই হ'ল 'মিলক গ্রহের মানুষে'র মূল আখ্যায়িকা।

মিউপাদের কাহিনী কল্পনায়, মিউপাদের সঙ্গে পৃথিবী থেকে আসা মহাকাশ অভিযাত্রী দলের সংঘর্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বহুল প্রচলিত রোমাঞ্চ লেখার

রীতি অবলম্বন করেছেন. ফলে বইটি সুখপাঠ্য হলেও রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। বইটিতে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘটিত অসংগতি এবং অসম্পূর্ণতা আছে। লেখকের কল্পিত মিলক গ্রহটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে অনেক আলোকবর্ষই যদি হয়, তাহলে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চললে (পৃ ১৩) পৃথিবী ছাড়ার দুমাসের মধ্যে মিলক গ্রহে পৌছন যায় কি ভাবে ? কারণ:ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চললে এক আলোক বর্ষ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশো কোটি মাইল (পৃ ৩০) অতিক্রম করতেই তো দুশো সত্তোর বছর কেটে যাবে। বিজ্ঞান ইথারের অস্তিত্ব আজকাল স্বীকার করে না অথচ লেখক চিন্তার তরঙ্গের মাধ্যম হিসাবে ইথারের উল্লেখ করেছেন! এই ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘটিত অসঙ্গতির আরও দু একটি নিদর্শন বইটিতে পাওয়া যাবে। অল্প কয়েকটি ছাপার ভুলও আছে।

বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল মানব কল্যাণ। স্বার্থান্বেষীদের হাতে পড়ে শাসন, শোষণ, নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পাঠকদের লেখক সচেতন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। "মিলক গ্রহের মানুষ"-এর মতো মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আরও সুখপাঠ্য, আরও সার্থক ও রসোত্তীর্ণ বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী ভবিষ্য লেখকের কাছ থেকে আশা করি। বইটির ভাষা সাবলীল, ছাপা, বাঁধাই, এবং কাগজ ভাল, প্রচ্ছদাবরণীটিও সুন্দর।

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

•

সুরের সানাই বাজুক॥ কাহিনী : কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশক : শ্রীঅধীর রায়চৌধুরী। দাম : দু' টাকা।

তেলেগু ভাষায় রচিত এই উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি পতিতা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামকে আশ্রয় করে। জীবনের বিচিত্রতর পরিবেশে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে নায়িকা শান্তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপন্যাসটিতে পাওয়া যাবে। ভাস্কর রাও, বিশ্বম প্রভৃতি চরিত্রগুলির কাহিনীগত মূল্য কতখানি তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, এরা যে শান্তার জীবনের কতকগুলি বিশেষ দিকের যথার্থ প্রক্ষেপণে সাহায্য করেছে একথা অনস্বীকার্য।

কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও অন্ধ্রের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কিন্তু

বর্তমান কাহিনীর উপজীব্য যে সমস্যা তাকে আজ নয়, অন্ততঃ তিন দশক আগে বোধকরি আধুনিক বলা চলতো।

অনুবাদ মন্দ নয়। প্রচ্ছদপট গ্রন্থটির ব্যবসায়িক মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াতে পারে মাত্র।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

একটি প্রেমের কাহিনী॥ গুড়িপাটি ভেঙ্কট্চলম্। অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশ: মণ্ডল বুক হাউস। দাম: দু' টাকা।

অন্ধ্রদেশের প্রবীণ সাহিত্যিকগণের অন্যতম ভেঙ্কটচলনের তেলেগু ভাষায় রচিত উপন্যাস 'ময়দানম্' এর বাংলা অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থটি। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের একটি মেয়ে ও 'আমীর' নামক জনৈক মুসলমান যুবকের প্রেম এই উপন্যাসের উপজীব্য। দয়িতের জন্যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে আত্মীয় স্বজন সংসার, সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এই মহান ত্যাগের আকস্মিক পরিণতি বিয়োগান্ত। কারণ, ইতোমধ্যে আমীরের প্রতি নায়িকার প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে নবাগত সুলেমানের তরুণ দেহশ্রীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণে। অবশেষে আমীর এই ত্রিমুখী প্রেমের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিদায় নিলো আত্মহত্যা করে।

অনূদিত এই উপন্যাসটির মূল আকর্ষণ কাহিনীর অভিনবত্ব নয়, এর অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষা ব্যবহার।

প্রচ্ছদ ও ছাপা দেখে মনে হয় বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উপহারদাতাদের কাছে এ জাতীয় গ্রন্থ যোগ্য সমাদর পাবে।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

পরিচয়

অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

য়

গল্পগুজব
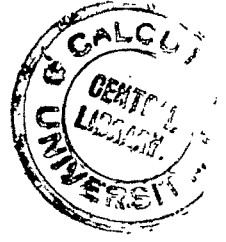
শিল্পী: বিমল কর

আর্য ও অনার্য

নৃপেন গোস্বামী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রাত্য

ভারতীয় জনশ্রুতি অনুসারে অনার্য গোষ্ঠীও ব্রাত্য-রূপে বিবেচিত হয়েছে। শুধুমাত্র অবৈদিক আর্যরাই ব্রাত্য একথা বলা অযৌক্তিক।

বৈখানস-ধর্ম-প্রশ্ন অনুসারে :

(ক) উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের নারীর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় অনুলোম-বর্ণ ;

(খ) নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারী থেকে সৃষ্ট হয় প্রতিলোম-বর্ণ ;

(গ) প্রতিলোম বর্ণের পুরুষ ও নারীর সঙ্গমের ফলে উদ্ভূত হয় ব্রাত্য বর্গ।

[৩।১১।২]

এই কল্পিত উৎপত্তি-বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন মনুর বচন। তিনি বলছেন :

দ্বিজগণের সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তান যদি গায়ত্রী-বিহীন হয়, তাহলে সেই হচ্ছে ব্রাত্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্য ও বৈশ্যার সন্তান সদাচার-ভ্রষ্ট হলে ব্রাত্য হয়। [১০।২০]

মনুর আর একটি বচন অনুসারে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হতে উৎপন্ন হয়েছে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি (লিচ্ছিবি), খস, দ্রাবিড় প্রভৃতি। এগুলি যে কৌমের নাম এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। [১০।২২]

মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থে মল্ল একটি গণ বা ট্রাইব-রূপে বর্ণিত হয়েছে।

[p. 231, I. 4. 5. (35)]

মল্লক ও লিচ্ছিবিক এই দুটি নামকে কৌটিল্য সঙ্ঘের তালিকা-ভুক্ত করেছেন। [অর্থশাস্ত্র ১১।১]

এস্থলে অনার্য কৌমও ব্রাত্য-রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে।

অবৈদিক গোষ্ঠীকে ব্রাত্যবর্গ হিসেবে বিচার কিংবা ক্ষত্রিয়বর্গে সংস্থাপন বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত, যার সঙ্গে আর্যীকরণকে সংযুক্ত করা চলে। যে কোনো অবৈদিক অথবা আর্যেতর গোষ্ঠীকে বর্ণপরিকল্পনায় সন্নিবেশের অর্থ হচ্ছে আর্যমূলকতা প্রতিপাদন। যারা যজ্ঞীয় আচার অনুসরণ করে না তাদের উৎপত্তিও আর্যমূলক এবং তারাও কোনো না কোনো প্রকারে আর্যসমাজের অঙ্গীভূত এই ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি অহেতুক নয়, এর প্রেরণা এসেছে আর্যীকরণের প্রয়োজন থেকে।

শঙ্কর-বর্ণের উপন্যাস

বর্ণ-শঙ্করের কিংবদন্তীর মূলে অন্তত আংশিক পরিমাণে রয়েছে আর্যীকরণের সামাজিক কৌশল। অনুলোম-রীতিতে পূর্বকালে তিন দ্বিজ-বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত, সুতরাং সঙ্কর ঘটত সামাজিক স্বীকৃতির ভিতর দিয়েই। কিন্তু সঙ্করের ফলে নিত্য নূতন উপবর্ণ গজাত এই স্মার্ত প্রকল্পটি ভিত্তিহীন। সঙ্কর-বর্ণের তালিকায় অনুপ্রবিষ্ট কিছু কিছু নাম যে কৌমনাম তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়।

ব্রাত্য কৌমগুলিকে সঙ্করবর্ণ হিসেবে বিবেচনার মধ্যে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নেই, কিন্তু এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বিবিধ বৃত্তিমূলক গোষ্ঠী কিংবা কৌমীয় গোষ্ঠী অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপবর্ণ-রূপে কল্পিত হয়েছে। সঙ্করের বিবরণগুলিতে কিছু কিছু মিল আছে, আবার অমিলও রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে চারি বর্ণের ছকের মধ্যে সর্বপ্রকার জন-গোষ্ঠীর সন্নিবেশ দ্বারা কৃত্রিম সামাজিক ঐক্য প্রতিপাদন।

কিছু কিছু নমুনা বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে যে উপবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনীগুলি অলীক কল্পনা-প্রসূত।

নিষাদ ও কৈবর্ত অনার্য কৌমরূপে প্রতিভাত হয়, অথচ মনুর বিবরণে সঙ্কর-জাত বর্ণ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। [মনু ১০।৮, ৩৪]

নিষাদ খাদ্য সংগ্রহের পর্যায় অতিক্রম করে নি। তার বৃত্তি পশু বা মৎস্য শিকার। দাশ-কৈবর্ত নৌকর্মজীবী, অর্থাৎ, মাঝি।

মনু বলছেন যে নিষাদ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার অনুলোম মিলন-জাত সন্তান। প্রায় একথাই বলছেন বৈখানস। তাঁর বিবেচনায় ব্রাহ্মণ জারের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিষাদের উৎপত্তি হয়েছে। [মনু ১০।৮ ; ধর্ম প্রশ্ন ৩।১৩।২]

বাজসনেয়ি-সংহিতায় দাশ, কৈবর্ত ও কিরাত একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে এবং এদের কৌমীয় লক্ষণ সুপরিস্ফুট। [৩০।১৬]

বৈখানসের বিচারে আয়োগব হচ্ছে তন্তুবায়, তার জন্ম হয়েছে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া থেকে। [ধর্মপ্রশ্ন ৩।১৪।১]

মনু-স্মৃতিতে আয়োগব হচ্ছে ছুতার এবং শূদ্র ও বৈশ্যার সন্তান। [১০।১২]

এক্ষেত্রে দুটি উৎপত্তি-বিবরণ পরস্পর-বিরোধী। পৌল্কস বা পুল্কস প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবরণগুলিতে অনুরূপ অনৈক্য লক্ষিত হয়। পুল্কস বোধ হয় কৌমী লক্ষণ-যুক্ত বীভৎস-বৃত্তিজীবী একটি কৌম, কিন্তু কল্পিত হয়েছে শূদ্র-ক্ষত্রিয়ার কিংবা বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ার কিংবা নিষাদ-শূদ্রার মিলন-জাত সন্তান-রূপে। [বা সং ৩০।১৭ ; গৌতম, ৪র্থ অ ; বিষ্ণুস্মৃতি ১৬।৫ ; মনু ১০।১৮]

বর্ণ-শঙ্করের কাহিনীর সবটুকুই হয়তো অবিশ্বাস্য নয়। সাধারণ সামাজিক ঘটনা হিসেবে যৌন সংমিশ্রণ সর্বকালীন সত্য আলেখ্য। কিন্তু বিভিন্ন উপবর্ণের উৎপত্তির একমাত্র কারণরূপে সঙ্কর কল্পিত হতে পারে না। উৎপত্তি-মূলক বিবরণগুলি যে অনেকাংশে পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এরূপ ধারণাই হয়, যখন আমরা সম্পূর্ণ বর্ণের ছকটিকে বিশ্লেষণ করতে বসি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় প্রাণধান-যোগ্য। প্রথমত, স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণগুলি আদতে বৃত্তি-মূলক কিংবা কৌমীয় গোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত বর্ণের সমকালীন অস্তিত্ব সন্দেহ করা যায় না এবং সেইজন্যই এক বর্ণ থেকে অপরবর্ণের উৎপত্তি সম্ভাব্য ঘটনা হতে পারে না। তৃতীয়ত, আর্যীকরণের একটি পর্যায়ে সমগ্র সমাজের একটা সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিপাদন আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কোনো যথার্থ ঐক্যসূত্র সম্মুখে ছিল না। বিভিন্ন বৃত্তির উপর নির্ভরশীল অসংখ্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি ছিল গিল্ড্-এর (guild-এর) আকার-প্রাপ্ত। এগুলির পাশাপাশি বিরাজ করছিল কৌমীয় গোষ্ঠী-সমূহ এবং তাদের সংখ্যাও কম নয়। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে একটি সূত্রে গ্রথিত করার উপযোগী উপকরণ সমাজ-জীবনে ছিল না। কৃত্রিম ও কাল্পনিক ঐক্য-সূত্রের সন্ধান মিলল গোত্র ও বর্ণ-সংক্রান্ত অলীক বিশ্বাস কিংবা Social myth-এর মধ্যে। গোত্র-পরিচয়ের মূল কথা হচ্ছে আটজন বৈদিক ঋষির সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে বিশ্বাস। মিশ্র বর্ণ-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে সকলেরই উৎপত্তি-রহস্য নিহিত মূল চারিবর্ণের অনুলোম বা প্রতিলোম মিশ্রণে। এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি না থাক,

কার্যকরিতা (function) আছে। এর সহায়তায় ঐক্যের ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি নির্মিত হয়েছে। ব্রাত্য বা অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্য-মূলকতা প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ্য কৌশল সহজেই অনুমেয় এবং এর ফলে সামাজিক অখণ্ডতা-বোধ ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে, যার অন্তত একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই দার্শনিক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

আর্যীকরণ-প্রক্রিয়ায় সামাজিক ক্ষেত্রে দুইটি ব্যাপার প্রাধান্য পেয়েছে—গোত্রে অন্তর্ভুক্তি এবং সঙ্করজ বর্ণ-রূপে পরিচয় দান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভিল্ল, হড্ডি, ডম—অর্থাৎ, আমাদের পরিচিত ভিল, হাড়ি ও ডোম—কল্পিত হয়েছে মিশ্র বর্ণ-রূপে। হাড়ি ও ডোমের কাশ্যপ গোত্রও জুটেছে। এধরনের নিদর্শনে স্ফুট হচ্ছে সমাজের নিম্নতম স্তরেও আর্যীকরণের প্রসার। [ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৭; ১০৫]

কৃত্রিম গোত্র ও বংশ-পরিচয়

বর্ণ-সঙ্করকে ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতির কল্পিত উপন্যাস-রূপে বর্ণনা করেছেন লুই রেনো। বহুস্থলে গোত্র-পরিচয়ও কৃত্রিম বন্ধন-সূত্র-রূপে প্রতীত হয়। যে সকল গোষ্ঠীর আর্যত্ব প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাদের ভিতরেও প্রবেশ করেছে বৈদিক গোত্রের জনশ্রুতি। একদিকে উপবর্ণের (sub-caste-এর) ক্রমবর্ধমান তালিকা, আর এক দিকে গোত্র-পরিচিতির ক্রমিক প্রসার—এই দুটি ব্যাপারের মধ্য দিয়েই সমর্থিত হয় আর্যীকরণের প্রকল্প। কিছু কিছু উপবর্ণ স্পষ্টতই কৌমের চেহারা-যুক্ত। বেশ বোঝা যায় হিন্দু সমাজে এদের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত হয়েছে চারি বর্ণের সংগঠনে বিশেষ একটা স্থান এদের জন্য নিরূপণের দ্বারা। অর্থাৎ, হিন্দু সমাজে নবাগতেরা কোনো বৈদিক গোত্রের ঐতিহ্য গ্রহণ করেছে এবং উপবর্ণ-রূপে গণ্য হয়েছে। [pp. 49, 66, *The civilization in ancient India,* Louis Renou, 1954]

একটি কৃত্রিম বিশ্বাসের ফলে নাম্বুদ্রী পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ-তালিকা-ভুক্ত হয়েছে, এদের সঙ্গে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের আচার-গত মিল হয়তো সামান্য। অন্ধ্রের তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণরা পরিচয় দিচ্ছেন সামবেদী-রূপে, আবার, গৌতম, ভারদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের ঐতিহ্যেও বিশ্বাসী। সারা ভারত জুড়ে একই দৃশ্য বিদ্যমান, অথচ সামাজিক রীতিনীতিতে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের প্রচুর বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে।

গোত্র-পরিচয়ের অর্থ যদি হয় একরক্তের ধারা, তাহলে বহুক্ষেত্রে কৃত্রিম গোত্রের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করবার সূত্র কোথায়? Clan-Kinship বা গোত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন বৈদিক আমলে আংশিকভাবে সত্য হলেও পরবর্তীকালে কৃত্রিম গোত্রের দ্বারা পরিচয়-রীতি সর্বত্র সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই গোত্রের ক্ল্যান-তাৎপর্যকে অবিশ্বাস করা হয়েছে। ললিতবিস্তর-এর একস্থলে শুদ্ধোদন বলছেন:

ন হি কুমারঃ কুলার্থিকঃ ন গোত্রার্থিকঃ গুণার্থিক এব কুমারঃ। [অ ১২, পৃঃ ১৩৯]

এক্ষেত্রে কুল ও গোত্রের মধ্যে তফাৎ করা হচ্ছে। কুল রক্তের সম্পর্ক বোঝায়, কিন্তু গোত্রের অর্থ অন্যপ্রকার। গোত্র বোধ হয় শুধু বৈদিক ঐতিহ্যের ক্ষীণ সূত্রটি রক্ষা করে।

বৌধায়ন বলছেন যে সগোত্রা রমণীর সঙ্গ করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত পালনীয়, এরূপ সহবাসের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তার গোত্র হচ্ছে কাশ্যপ। [প্রবর প্রশ্ন ১০।৫৪]

সংস্কার-ময়ূখ-এর মতে গোত্র বিস্মৃত হলে কাশ্যপ গোত্রের দ্বারা পরিচয় বিধেয়। [p. 95, vol. I]

অভিনব-মাধবাচার্য সগোত্রা-জাত সন্তানকে কাশ্যপ বা ভারদ্বাজ গোত্রে স্থান দিয়েছেন। [পৃঃ ৩৫২, গোত্র-প্রবর-নিবন্ধ-কদম্বলম্]

গোত্র-বিহীনদের উপরে কাশ্যপ গোত্র আরোপের রীতিটি চলে এসেছে এখনকার কাল পর্যন্ত।

রিজলী-বর্ণিত বাংলার নব-শায়ক বর্ণগুলি,—মালী, তাম্‌লী, তাঁতী, কামার, কুমোর, নাপিত, গোয়ালা, কাঁসারী, শাঁখারী—কাশ্যপ বা আলম্যান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আলম্যান হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের আলম্বায়ন।

ডোম, মৎস্যজীবী বাগ্‌দী প্রভৃতির মধ্যেও এই দুইটি গোত্র প্রচলিত। হাটনের (J. H. Hutton-এর) মতে ডোম হচ্ছে একটি কৌম। বাগদীও সম্ভবত একটি কৌম।

এ-জাতীয় নিদর্শন গোত্র-পরিচয়ের অলীকতাই প্রতিপাদন করে। গোত্রের তাৎপর্য একেবারে প্রথমে ছিল গোশালা, তারপর রক্ত-সম্পর্কিত ক্ল্যানকে নির্দেশ করত। এর সর্বশেষ তাৎপর্য হচ্ছে আর্য ঐতিহ্যের স্মারক-সূত্র, যদিও অনেক স্থলে কুলের অর্থে গোত্র-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাম্রলেখ প্রভৃতিতে।

কৃত্রিম গোত্রের ব্যাখ্যা মিলছে একমাত্র আর্যীকরণের পটভূমিকে বিবেচনা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋষি-গোত্র ছাড়াও অন্য নামের গোত্রের দ্বারাও আর্যীকরণের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছে। কতকগুলি গোত্রের হদিশ মেলে না বৌধায়ন-প্রদত্ত তালিকায় কিংবা পি চেন্তসাল রাও-এর প্রদত্ত তালিকায়। যথা,

> উড়িষ্যার কৃষিজীবী লৌকিক ব্রাহ্মণদের মস্তানী, পনিয়ারী গোত্র; উড়িষ্যার করণদের নাগ গোত্র; বাংলাদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বাজিশ্লেথ গোত্র, সেন কায়স্থদের বাস্থকি গোত্র, গুহ-উপাধি-ধারী কায়স্থের কল্কী গোত্র, ঘোষ কায়স্থের সৌকালিন গোত্র, নাথযোগীর শিব গোত্র ইত্যাদি।

এই গোত্রগুলির আঞ্চলিক উদ্ভব ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থকালিন্ পিতৃগণের সঙ্গে সৌকালিনের সম্বন্ধ থাকতে পারে।

কৃত্রিম বংশ-পরিচয়ের নমুনা লক্ষ্য করছি বৈদিক সাহিত্যেই।

শুনঃশেপের প্রসিদ্ধ কাহিনীর একস্থলে বর্ণিত হয়েছে যে বিশ্বামিত্রের একশত ছেলের মধ্যে পঞ্চাশজন তাঁর অবাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদেরই বংশধর অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি যে অনার্য কৌম এ বিষয়ে সংশয় নেই। একজন আর্য আদি পিতা থেকে উৎপত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্য ও অনার্যের ভেদ-গণ্ডীর অপসারণ। [ঐ ব্রা ৭।৩।৬]

আর্য অনার্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হওয়ায় অনার্য কৌমগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কষ্টকর। আবার একথাও সত্য যে আর্যীকরণের ব্যাপারটা কোনো এক যুগে সমাপ্ত হয়ে যায় নি, বরঞ্চ যুগ যুগ ধরে চলেছে। এককালে যাঁরা অনার্য ছিলেন তাঁরা আর্যসমাজে গৃহীত হয়ে পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছেন। বর্ণ ও গোত্রের তালিকায় বহু কৌমের নাম প্রবেশ করেছে এবং এগুলির অনার্য ঐতিহ্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। বংশ-বিবরণে আদি পিতার স্থানটিতে কোনো আর্য ঋষি বা রাজা বা দেবতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং কৌমের উপর আরোপিত হয়েছে কৃত্রিম বর্ণ ও গোত্র-পরিচয়।

কৃত্রিম বংশ-পরিচয়ের কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হতে পারে। যথা:

বায়ুপুরাণের মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই কয়টি কৌমের আদি পিতা হচ্ছেন ঋগ্বেদীয় ঋষি দীর্ঘতমা। [৯৯।৮৫-৮৭]

পরমার রাজপুতেরা বিশ্বাস করে যে তারা অগ্নি-কুল-সম্ভূত। চন্দেল

রাজপুতেরা চন্দ্রবংশী। মিবার, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজপুতেরা সূর্যবংশী। মিবারের রাণাগণ হচ্ছেন লব-বংশীয় এবং মরবারের রাজপুতেরা কুশ-বংশীয়। নাগপুরের রাজপুতেরা রঘুবংশীয়। যোধপুরের রাঠোরেরা সূর্যবংশীয়। কদম্ব রাজাগণের গোত্র মানব্য। পল্লবগণের গোত্র ভরদ্বাজ। চালুক্যেরা সোম (চন্দ্র) থেকে বংশধারা গণনা করেছেন। বাকাটকদের গোত্র বিষ্ণু বৃদ্ধ।

[B. O. R. Ehrenfels, James Tod, S. K. Aiyangar-এর এবং বিভিন্ন তাম্রশাসনের বিবরণ থেকে উক্ত নজীরগুলি গৃহীত হয়েছে।]

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে পৌরাণিক জনশ্রুতিতে আর্য রাজবংশ হচ্ছে প্রধানত তুইটি—সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ—আরও একধাপ নীচে নামলে মনুর ধারা এবং ঐলের ধারা। পার্জিটার এই তুই ধারার সঙ্গে আরও একটি ধারাকে জুড়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রাজবংশগুলিকে কৃত্রিমভাবে এই তুই ধারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ঈদৃশ সম্পর্ক স্থাপনকে বলা চলে Social myth বা সামাজিক উপন্যাস। সার হেনরী মেইনের বিখ্যাত গ্রন্থে ক্ল্যানের একরক্ত-মূলক বিশ্বাসেও অনুরূপ মিথ্যা কল্পনার প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে [pp 76-77, *Ancient law*]

আরও একটা মজার ব্যাপার লক্ষণীয়। যে কৌম-নামগুলি বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয় সেগুলি পৌরাণিক বংশধারায় ক্রমিক রীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। পুরাণের কালক্রম অনুসারে ঐলের ধারায় এসেছেন পুরু ও যদু, পুরুর ধারায় এসেছেন ভরত। ঋগ্বেদীয় বর্ণনার ধরনে মনে হয়ে যে ভরত, পুরু ও যদু কৌম-নাম এবং এই কৌমগুলির সমসাময়িক অস্তিত্ব সম্ভবত সন্দেহের বিষয় হতে পারে না। কৌমের নাম কি করে রাজার নাম হতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন কৌম-নামকে একটিমাত্র ধারায় সন্নিবেশের সূত্র কোথায়? বৈদিক কৌমতন্ত্রীয় প্রথায় একজন আদিপিতা বা কৌম-প্রতিষ্ঠাতার নামই হচ্ছে কৌমের নাম, আবার কৌম-নাম আরোপিত হয় ব্যক্তির উপর। যদু-কৌমের আদিপিতা একজন রাজা, তিনিও যদু, আবার তাঁর ধারায় যে কোনো রাজাও যদু-নামের উত্তরাধিকারী, তাঁর কৌমের যে কোনো লোক যদু-নামে পরিচিত হতে থাকবেন। কৌমীয় সংগঠনেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন লাভ করেছে, কাজেই পৌরাণিক বিবরণের সত্যতা আংশিকভাবে স্বীকার্য। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌমের সংমিশ্রণ ঘটেছে এরূপ অনুমান করেছেন এন. কে. দত্ত, রঙ্গাচার্য প্রভৃতি। যদু, পুরু, ভরত, কুরু, প্রভৃতি কৌমের একীকরণ

একটি দীর্ঘকালীন ব্যাপার, এর ফলে পূরুর ধারায় ভরতের, ভরতের ধারায় কুরুর সংস্থাপন কৃত্রিম কল্পনার সাহায্যে রাজবংশীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এস্থলে পৌর্বাপর্যের খসড়াটি অনেকাংশেই অনির্ভরযোগ্য। আবার আর্যীকরণের আমলে নিতান্ত কৃত্রিমভাবেই বিভিন্ন রাজবংশ পৌরাণিক বংশধারায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আর্যীকরণের সহযোগী শূদ্রীকরণ

আর্যীকরণের উদ্দেশ্যে অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্যমূলকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা শুরু হয়েছে বৈদিক আমল থেকেই। এর ফলে আর্য ও অনার্যের শোণিতগত পার্থক্য ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধরনের গোষ্ঠীগত চেতনা দেখা দিয়েছে। পূর্বেকার কৌমীয় চেতনার মধ্যে ছিল একরক্তের বোধ। বিভিন্ন আর্যকৌমের সংমিশ্রণ যে সময়ে ঘটেছে, তখন আর্যসমাজে অনার্যগোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্তিও চলছে, এর দরুণ সমাজের পরিধি স্ফীত হয়েছে অপরিমিতভাবে এবং সেখানে ফুটে উঠেছে নূতন একটি দৃশ্য, যার সঙ্গে কৌমী দৃষ্টিকোণের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। বৃত্তি অনুসারে যে সকল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, সেগুলিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গিল্ড্-এর লক্ষণ স্ফুট হয়েছে, সেই সঙ্গে জন্মগত বর্ণ বা caste-এর একরক্ত-মূলক চেতনা বিকশিত হয়েছে প্রায় কৌমীয় রীতিতে। ট্রাইবের সঙ্গে তুলনীয় জাত্-এর শোণিত-সচেতন সঙ্কীর্ণতা। আর্যীকরণের ফলে সামাজিক প্রসারণ সহজেই বুদ্ধিগম্য, কিন্তু যুগপৎভাবে জাত্-এর দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব বিস্ময়কর। দুটি ঘটনাই সমাজ-সংগঠনের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। জাত্-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রীকরণের দিকে একটা ক্রমবর্ধমান প্রবৃত্তিও ভারতীয় সমাজের রূপায়ণে সহায়তা করেছে।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক সংগঠনে শূদ্রীকরণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন জাত্ বা গোষ্ঠীকে সাধারণভাবে দুই থাকে সাজাবার আগ্রহ এখানে প্রবল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাইরে কোনো বর্ণ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবত সরলীকরণের প্রবৃত্তি-জাত। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য, করণ-কায়স্থ প্রভৃতি উপবর্ণের উপর শূদ্রত্ব আরোপের মূলে এই প্রবৃত্তি হয়তো ছিল। সঙ্কর-বর্ণ-রূপে যে সকল বৃত্তি-গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা কল্পিত হয়েছে, নৃবিজ্ঞানের ভাষায় তারা হচ্ছে এক একটি closed status group বা বদ্ধ গোষ্ঠীমাত্র।

তাদের ভিতরে আবার উত্তম সঙ্কর, মধ্য সঙ্কর ও অন্ত্যজ এই তিন পর্যায় স্থাপিত হয়েছে। অন্য দিক দিয়ে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র-রূপে মর্যাদা-বিভাগ সমর্থন পেয়েছে। সমস্ত সমাজের অঙ্গনটি যেন মর্যাদার প্রতিযোগিতার দৃশ্য। ব্রাহ্মণের দাবী—"পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই, ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই";—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক না দেখাতে পারলে ব্রাত্য ঐতিহ্য ধরা পড়ে। করণ-অম্বষ্ঠ-নাপিত-মোদকেরা রজক-স্বর্ণকারকে স্বীয় পংক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, সর্বনিম্ন পংক্তিতে বিরাজ করছেন মলেগ্রহি বা মেথর, চর্মকার প্রভৃতি। ঈদৃশ সামাজিক পংক্তিবোধের মাঝখানে একটা জিনিস আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তা হচ্ছে শূদ্রের গোত্র-পরিচয়। রঘুনন্দন বলছেন উদ্বাহতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে :

দ্বিজাতিগ্রহণং সগোত্রা বর্জনে
শূদ্রব্যাবৃত্ত্যর্থম্।

অর্থাৎ, তিন দ্বিজ বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু শূদ্রের বেলায় এই নিয়ম বর্তায় না। এস্থলে পরোক্ষভাবে শূদ্রবর্ণের সগোত্রা-বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে এবং তার গোত্র-পরিচয় না থাকলে উক্তিটি হয় নিরর্থক।

আর্যীকরণের দৌলতে গোত্র-বিহীন কোনো জাত্ আমাদের চোখে পড়ে না। [ব্রহ্ম বৈবর্ত, ব্রহ্ম খণ্ড ১০।১৮; পৃ ৫৭২, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, ১৮৮০; *The history of Bengal,* Vol. I, XV]

সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে অনার্য প্রভাব

আর্য ও অনার্যের পারস্পরিক প্র-ভাবের ফলে গড়ে উঠেছে হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু নামটি ইরাণীদের দেওয়া। বেদোক্ত সিন্ধু মিহির-যস্তে হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে, আবেস্তার অন্যতম গবেষক মার্টিন হগ একথা বলেন। হিন্দু নামের আদি অর্থ সিন্ধুতীরবাসী, পরবর্তী তাৎপর্য ভারতীয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে আমরা বুঝি একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কোনো নৃবংশ বুঝি না। আর্য ও দ্রাবিড়ের মতোই হিন্দু-শব্দ কোনো নৃবংশের দ্যোতক নয়।

আর্যপ্রভাবমুক্ত অনার্য সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে সিন্ধু উপত্যকার নজীর উপস্থাপিত হতে পারে। ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতিতে সামান্য অনার্য প্রভাব থাকাই সম্ভব। প্রথমটিতে শহরে বাস, পাকা দালানে বাস, লিপিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার

উপযোগী বিষয়গুলি বর্তমান ; কিন্তু শেষোক্ত সংস্কৃতিতে গ্রামীন জীবন, কাঠের ঘরে বাস, নিরক্ষরতা আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের আরও কিছু নমুনা উল্লেখযোগ্য। যথা :

(ক) সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শীলমোহরগুলিতে ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখা যায় না, কিন্তু ঋগ্বেদে অশ্বের প্রাধান্য রণতান্ত্রিকতার পরিচায়ক।

(খ) সিন্ধুতীরবাসীদের নিকটে উট ও বিড়াল অপরিচিত নয়, কিন্তু ঋগ্বেদে উল্লিখিত উষ্ট্র পণ্ডিতদের দ্বারা মহিষ-রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঋগ্বেদে, এমনকি বৈদিক সাহিত্যেই বিড়ালের বাচক শব্দ আছে কিনা সন্দেহ।

শুক্ল যজুর্বেদের বৃষদংশ উবট ও মহীধরের ভাষ্যে বিড়াল-রূপে গণ্য হয়েছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা সন্দেহের উদ্রেক করে। [বা সং ২৪।৩১]

ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে উট ও বিড়াল অজ্ঞাত।

উটের বাচক সংস্কৃত ক্রমেলক ও ইংরেজী ক্যামেল-এর মূলে রয়েছে হিব্রু গামাল (gamal) শব্দ।

(গ) সিন্ধু সভ্যতায় কার্পাসের প্রচলন এবং ঋগ্বেদে কার্পাস-বাচক শব্দের অনুল্লেখ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কৌতুহল জাগ্রত করে। ঋগ্বেদীয় উর্ণা হচ্ছে পশম, এর অনুরূপ গ্রীক এরিয়ন (erion) পশমের অর্থই বোঝায়। পশমের বস্ত্র ঋগ্বেদীয় আর্যদের একমাত্র পোশাক এবং হিন্দো-ইউরোপীয় উত্তরাধিকার।

সংস্কৃত ভাষায় কার্পাস বোধ হয় উর্ণার চেয়ে অর্বাচীন শব্দ, যদিও এর অনুরূপ গ্রীক কর্পাসস, (Karpasas) আভিধানিকদের নজরে পড়েছে। এই শব্দ-গত মিলের অর্থ হতে পারে ভারতবর্ষ থেকে মধ্য প্রাচ্যের ভিতর দিয়ে কার্পাসের ইউরোপ-যাত্রা। এই কারণেই হয়তো ইংরেজী কটন-শব্দটিও আরবী-মূলক।

আর একটি অনুমানও সম্ভাবনার সীমা লঙ্ঘন করে না। আর্যসমাজে কার্পাসের প্রচলন অনার্য প্রভাবে হয়েছিল একথাই বলতে সাহসী হচ্ছি।

(ঘ) বৈদিক সমাজে তিল, কলাই ও গমের প্রচলনে হরপ্পার প্রভাব অনুমেয়, কেন না ঋগ্বেদে উল্লিখিত একমাত্র খাদ্যশস্য হচ্ছে যব।

ঋগ্বেদে চাউলের বাচক ব্রীহি-শব্দের অনুপস্থিতি যদি অমূলক না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে চাউলের প্রচলনেও অনার্যের হাত রয়েছে।

সুনীতিবাবু তিল, তণ্ডুল ও ব্রীহিকে অনার্য শব্দ-রূপেই গণ্য করেছেন। তাঁর মতে চাউল হচ্ছে অষ্ট্রিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু চাউলের ব্যাপারটা বোধ হয় কিছু গোলমেলে।

তারাপোরওয়ালা জানিয়েছেন যে চাউল-বোধক তামিল শব্দ হচ্ছে অরিসা। এই শব্দটি সেমিটিক অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গ্রীসদেশে পদার্পণ করে। এর গ্রীক রূপ ওরুজা, (Oruza), ইংরেজী রাইস্-এর আদি জনক।

আর একটি সমস্যা সৃষ্টি করছে ওরাওঁ-ইংরেজী অভিধানে প্রাপ্ত তিনটি শব্দ। এই তিনটির সঙ্গেই চাউলের সম্পর্ক প্রতিভাত হচ্ছে। যথা :

বিহিনী—বীজশস্য
বিহিরী—সংগ্রহ
বীরা—ধানের অঙ্কুর।

ওরাওঁরা আদি-অস্ট্রেলীয় হলেও কথা বলে দ্রাবিড় ভাষায়।

উক্ত শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ব্রীহির আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্য প্রকৃত কিনা ভাষাবিদরা বিচার করবেন। চাউলের প্রচলনে দ্রাবিড় প্রভাব থাকতে পারে।

ঋগ্বেদে অনার্য শব্দের প্রবেশ সত্য হলে অনার্য প্রভাবের প্রাচীনতা সূচিত হয়। কিছু কিছু ঋগ্বেদীয় শব্দের দ্রাবিড় মূলকতা আন্দাজ করেছেন সুনীতিবাবু। যথা, কপি, কর্মার, কাল, পুষ্কর (পদ্মফুল), পুষ্প, বীজ, কিতব (অক্ষক্রীড়ক) ইত্যাদি। আবার, প্শিলুস্কির মত উদ্ধৃত করে লাঙ্গল-শব্দের অষ্ট্রিক উৎপত্তি প্রতিপাদন করেছেন। অথর্ববেদীয় কম্বল-শব্দের অর্থ পশমের বস্ত্র। এটিও নাকি অষ্ট্রিক-মূলক। [পৃ ৭৬, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ; p. 42, *The origin and development of the Bengali language*, part I, 1926 ; অথর্ব ১৪।২।৬৬]

মাছের ব্যাপারটিতে ইদানীং সংশয় জেগেছে। কেউ কেউ বৈদিক আর্যদের মৎস্য ভক্ষণকে স্বীকার করছেন। হরপ্পায় খনিত Cemetary H-রূপে নির্দিষ্ট কবর-স্থানে ভৃঙ্গার-চিত্রে মাছ আবিষ্কৃত হয়েছে। মাছের অর্থেই মৎস্য-শব্দের প্রয়োগ ঋক্‌মন্ত্রে লক্ষিত হয়। উক্ত কবরখানাকে ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা যায় কিনা এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব হলে ঋগ্বেদীয় খাদ্য তালিকায় মাছের প্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমরা নূতনতর আলোকপাতের অপেক্ষায় আছি। [ঋ ১০।৬৮।৮]

এবারে পুষ্প ও পূজার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দুটি শব্দকে দ্রাবিড় মূলক

প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা অনেকদিন ধরে চলছে। ফুল-বাচক দ্রাবিড় পু-শব্দের সঙ্গে নাকি পূজার সম্বন্ধ রয়েছে। একথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে যজ্ঞীয় চর্যা (cult) ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হলেও পূজা-চর্যার প্রতিপাদক ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করা যায় না, অপরপক্ষে সিন্ধু সংস্কৃতিতে পূজা-চর্যার উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। পূজার আর্যত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত পুষ্প-যজন থেকে পূজা-শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পিত। কীথ বলেছেন যে, মূর্তি-পূজার বৈশিষ্ট্য-বর্জিত ধর্মীয় বিশ্বাসে আদি জার্মান, আদি ইরাণীয় ও বৈদিক আর্যদের মিল রয়েছে। ঋগ্বেদে দু জায়গায় শিশ্নদেব বা লিঙ্গপূজক, অর্থাৎ, মূর্তিপূজক নিন্দিত হয়েছেন। শুধু পূজন-শব্দটির প্রয়োগ একস্থলে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শাচি-পূজন। সায়ণ-ভাষ্য অনুযায়ী অর্থ টা হচ্ছে—ইন্দ্রের পূজন প্রখ্যাত। পূজনের সূত্র ধরে মূর্তি-পূজা প্রতিপাদন করা যায় না। কিন্তু যজন-ব্যাপারটি ইন্দো-ইউরোপীয় আমল পর্যন্ত প্রসারিত। বৈদিক আর্য, ইরাণীয় ঐর্য এবং গ্রীকরাও যজনাচারী ছিলেন। এ বিষয়ে ভাষা-গত নজীরও রক্ষিত হয়েছে। যথা :

বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে তুলনীয় ইরাণীয় যস্ন। যস্নের অর্থ যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় প্রার্থনা। সংস্কৃত যজামি-পদের সদৃশ গ্রীক হজোমৈ, (hazomai) পদটি। [গ্রে এবং তারাপোরওয়ালার উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য ; শাচিপূজন—ঋ ৮।১৭।১২]

হিন্দু পূজায় কিছু কিছু যজ্ঞীয় আচারের অন্তর্ভুক্তিতে ধরা পড়ে সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী।

শিব-সম্বন্ধীয় চর্যায় অনার্য প্রভাব থাকা সম্ভব। যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়-রূপে খ্যাত হোম-মন্ত্রগুলিতে শিব-দেবতার কল্পনার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। এমনকি ভব, শর্ব, শিব, শংকর প্রভৃতি শিবের নামের উল্লেখ দেখছি। এই শিব ঠিক ঋগ্বেদীয় রুদ্র নন। এঁর সঙ্গে সিন্ধু-সংস্কৃতির অন্তর্গত শীলমোহরে অঙ্কিত শিব বা যোগী-মূর্তির সম্পর্ক থাকতে পারে। (শীলমোহরের মূর্তিকে শিব-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন মার্শাল, পিগট প্রভৃতি।) সিন্ধু উপত্যকার কিছু কিছু উপকরণে লিঙ্গ ও মাতৃকা-চর্যার প্রমাণ পেয়েছেন অনেকেই। ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজা বা মাতৃকা-চর্যার সমর্থক উক্তি মেলে-না, যদিও মাতা পৃথিবী-কল্পনায় উর্বরতা-অনুষ্ঠানের আভাস পাই। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে উর্বরতা-সংক্রান্ত বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ চোখে না পড়ে পারে না এবং এই ব্যাপারে, বিশেষত অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় কার্য-কলাপে অনার্য প্রভাব কেউ কেউ অনুমান করেছেন। যজ্ঞস্থলে যথার্থ মৈথুন

কিংবা মৈথুনাভিনয় উর্বরতা-অনুষ্ঠানের স্থূল রূপ মাত্র। মহাব্রত অনুষ্ঠানে পুংশ্চলু বা বেশ্যার আমদানি এবং তার সঙ্গে মাগধের যৌন মিলন, গোসব যজ্ঞে মাতা-ভগ্নীর সঙ্গে গোজাতির অনুকরণে মৈথুনাভিনয় হচ্ছে উর্বরতা-চর্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে অনার্য প্রভাব আছে কিনা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয় এবং যৌন আচরণ-সমন্বিত চর্যামাত্রই অনার্য-প্রভাবিত একথা মনে করাও অশোভন। যজ্ঞ ও পূজায় স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে উর্বরতা-চর্যার সংস্পর্শ থাকবেই, কেননা উভয়েরই লক্ষ্য সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ। উভয়ের মধ্যে তফাৎ নিছক আকৃতিগত, প্রকৃতি-গত নয়। উভয়েই ম্যাজিকের লক্ষণযুক্ত, যদি প্রকৃত ম্যাজিক নয়।

লিঙ্গ পূজার অনার্যত্ব স্বীকার্য হলেও বৈদিক মানসে হল-কর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা-প্রবৃত্তি কেন দেখা দিয়েছে এই প্রশ্নের জবাব মেলে উর্বরতা-চর্যার মধ্যেই। একটি ঋক্‌মন্ত্রে পুংলিঙ্গকে খনিত্ররূপে উপস্থাপনা তাৎপর্যহীন নয়। [ঋ ১০।৮৫।৩৭ ; ১।১৭৯।৬]

লিঙ্গ পূজায় হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত সাদৃশ্য দেখে লিঙ্গ-সংক্রান্ত চর্যাকে আর্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করবার লোভ জাগে। সুরা-দেবতা ডাইওনিসাস-এর উৎসবে লিঙ্গমূর্তি ব্যবহার এবং হিন্দুদের লিঙ্গার্চনা পরস্পরের সজাতীয়। কিন্তু গ্রীকদের ক্ষেত্রে সেমিটিক প্রভাব অনুমানের অবকাশ রয়েছে, ঠিক যেমন লিঙ্গ-চর্যার ভারতীয় সংস্করণে হরপ্পার প্রভাব অনুমেয়। য়িহুদীদের দ্বারা অর্চিত বাল (Baal) দেবতার প্রস্তরে নির্মিত প্রতীক-মূর্তি শিবলিঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [pp. 111-113, *Sexual life in ancient Greeee,* Hans Licht, 1949 ; pp. 184-185, *New light on the most ancient East,* Gordon Childe.]

ঋগ্বেদীয় দৃষ্টিতে মুনির মর্যাদা খুব উচ্চ নয়। বাতরশন, অর্থাৎ বায়ুর মতো দ্রুতবক্তা, পিলঙ্গ, মলিন-বসন-ধারী মুনি সম্ভবত ঐহিকতা-বাদী, ভোগবাদী ও সুখবাদী ঋগ্বেদীয় আর্যদের প্রিয়পাত্র নন। অথর্বমন্ত্রে মুনির দীর্ঘকেশ গর্ভ-বিনাশক রক্ষস্‌-এর বিকট মূর্তি কল্পনা করতে সাহায্য করে। বৈদিক আমলের মুনি যদি বৌদ্ধ আমলের শ্রমণের সঙ্গে তুলনীয় হন, সে ক্ষেত্রে মুনির প্রতি অবজ্ঞার অর্থ হতে পারে বেদাচারের বহির্ভূত ছিল মুনির আচরিত ধর্ম-চর্যা। মুনির চর্যাকে প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করেছেন গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডে। যোগ-চর্যা ও দেহতত্ত্বকেও ইদানীং হরপ্পার উত্তরাধিকার-

রূপে গণ্য করা হচ্ছে। নূতনতর গবেষণার ফলে কোন্ ঘাটের জল কোথায় গড়াবে জানি না। যেখানেই আমরা হালে পানি পাই না সেখানেই diffusion বা বহিঃপ্রভাবের সূত্রকে টেনে আনি, আবার উল্টো দিক দিয়ে বেদ থেকে ভাগবত পর্যন্ত একটানা বিবর্তনের প্রমাণ খুঁজি। সহজতর বিবেচনায় হিন্দুধর্মের সবকিছুই আর্য-প্রতিভার অবদান নয়, আবার আর্যদের মধ্যে যজনাচার ছাড়া অন্য আচার ছিল না এমন ধরনের অনুমানও একপেশে। ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে, প্রথম ও দশম মণ্ডলে, এবং অপরাংশেও রহস্যবাদের সূচক মন্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে। অথর্ব-মন্ত্রে দেহতত্ত্বের প্রাথমিক বিবৃতি দেখতে পাই। অথর্ববেদীয় উক্তি অনুসারে দেহ হচ্ছে দেবাধ্যুষিত, অষ্টচক্র যুক্ত এবং নবদ্বার বিশিষ্ট, এর ভিতরে জ্যোতির দ্বারা আবৃত হিরন্ময় কোষের অভ্যন্তরে বিরাজ করছেন আত্মার অধিকারী যক্ষ। এই উক্তি অবলম্বনে রহস্যবাদ চরমে পৌঁছেছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। বৈদিক মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বোধ হয় রহস্যবাদ, বৈদিক রূপক-বিশ্লেষণে বহুস্থলে রহস্য-চেতনা (Sense of mystery) প্রকটিত হয়। রহস্যবাদ ও দেহতত্ত্ব পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও দুটি এক জিনিস নয়, দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগ-চর্যার সম্পর্ক নিবিড়তর। ঋক্‌মন্ত্রে নিন্দিত মুনি দেহতত্ত্বের সাধক কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু মুনির আচারে যোগ-সাধনার কিছু কিছু লক্ষণ হয়তো ছিল এবং এ বিষয়ে পৌরাণিক জনশ্রুতি-গত নজীরও রয়েছে। যজনাচারের বিরুদ্ধ ছিল মুনির আচার, এই কারণে মুনি-চর্যার অনার্যত্ব প্রমাণিত হয় না, কেন না আর্যদের একাংশে যজনাচারের সমর্থন মিলত না, বৈদিক দৃষ্টিতে তারাও ছিল বিদূষণের পাত্র। পুরুষ সূক্তে পুরুষের দেহ হচ্ছে সৃষ্টির উৎস—এ ধরনের দার্শনিক কল্পনায় দেহতত্ত্বের ভাবধারার ইঙ্গিত থাকতে পারে। আবার, আর একটা বিষয়ও সমস্যার জটিলতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হোকার্ট বলেছেন যে পুরুষসূক্তের অনুরূপ সৃষ্টি-কল্পনা স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ায় এবং গিলবার্ট দ্বীপেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং যোগ-চর্যা বা দেহতত্ত্বের ব্যাপারে হরপ্পার যোগী-চিত্র চরম সমাধান-রূপে বিবেচ্য হতে পারে না। [ঋ ১০।১৩৬।২ ; pp. 257-261, *Studies in the origin of Buddhism,* Pande ; অথর্ব ১০।২।৩১, ৩২ ; তৈ আ ১।২৭।২, ৩ ; p. 22, *Social Origins,* A. M. Hocart, 1954]

জন্মান্তরবাদের ক্ষেত্রেও অনার্য উৎসের সম্ভাবনা থাকলেও প্রচুর জটিলতা রয়েছে। জন্মান্তর বিশ্বাসের একটি পর্যায় হচ্ছে অবতার-বাদ, যার সূচনা

দেখা যায় প্রজাপতির বরাহ-রূপ ধারণ-সম্বন্ধীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার উপাখ্যানে। আদি ইরাণীয় বিশ্বাসে বেরেথ্রঘ্নের দশ অবতার কল্পিত হয়েছে এবং তাদের একটি হচ্ছে শূকর। বার্হাম যস্তের বিবরণ বিষ্ণুর দশাবতার-কাহিনীর সগোত্রীয়। গ্রীক মেটেম-সাইকোসিস-এর (metempsychosis-এর) ধারণাও পুনর্জন্মবাদের একটি সংস্করণ মাত্র এবং অর্ফিক (orphic) সম্প্রদায়ও পীথ্যাগোরীয় গুপ্ত সমিতিতে বরাবর অনুশীলিত হয়েছে। এই বিশ্বাসের পরিপোষক হিসেবে এম্পিডোক্লিস, পীথ্যাগোরাস, প্লেটো, ফিলো, প্লোটিনাস এবং একালের জার্মান দার্শনিক লেসিং আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মাশ্রিত ম্যানিপন্থী (Manichaeans) এবং য়িহুদী ক্যাবালাবাদী (Cabbalist) গোপনে জন্মান্তর-রহস্যে বিশ্বাস করতেন এমন প্রবাদ আছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাবের কথা বলেছেন অনেকে। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ কিংবা বিভিন্ন রূপে অবস্থিতি বিষয়ে বিশ্বাস আবিষ্কৃত হয়েছে ইংলণ্ড ও জার্মানির লৌকিক ধর্মে, ড্রুইডদের ধর্মীয় জনশ্রুতিতে। সুতরাং জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের সহজ উত্তর সম্ভব নয়। অনার্য উৎসের প্রকল্প নিশ্চয়তার দাবী করতে পারে না। [তৈ সং ৭।১।৫ ; pp. 226-234, *The Aryan trail in Iran and India* Nagendranath Ghosh, 1937 ; pp. 99-108, *Sanskrit and Culture*, Goldstucker, 1955]

(সমাপ্ত)

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অধ্যাপক রসময় গুপ্তর ড্রইংরুম-এর একাংশ। ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে স্ত্রী সুহাস-এর সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাশের সেণ্টার টেবিলে স্তূপীকৃত বই-এর ধারে ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে খোলা বই-এর ওপর। ছায়াচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশে মনই যেন জোরে কথা কইছে মানুষের চেয়ে। সুহাস অবাক হয়ে শুনছেন রসময়ের কথা।

রসময় :...তারপর বহু বহু তপস্যার পর দেবতা যখন প্রসন্ন হলেন, কল্যাণহস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন বরদান নিয়ে, জপতপে দ্বিধাগ্রস্থ বিশীর্ণ ব্রাহ্মণ তখন দূর ছাই বলে হন্ হন্ করে ফিরে চল্লেন এই ভাবতে ভাবতে যে, আমার এতদিনকার জপতপ আচার অনুষ্ঠান সব মিথ্যে, সব পণ্ডশ্রম মাত্র; কেউ নেই কিচ্ছু নেই। ভগবানই যখন নেই তখন আর ভগবৎ কৃপা হবে কোত্থেকে, বোঝ ব্যাপার! তা আমাদেরও হলো খানিকটা ঐ অবস্থা। আমাদের তবু ছাখো নেই সুকৃতি, নেই কর্মগুণ, নেই সেই নিষ্ঠা, তবু বলা যায়—অনায়াস লব্ধ সেই বরদান, অর্থাৎ স্বাধীনতা যখন আমরা পেলাম, তখন তার সত্যশিব স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম না। স্বপ্ন যদি বা সার্থক হলো কমলাকান্ত-র তবু আমরা মড়াকান্ত তখনও ঘুমিয়ে রইলাম। নিষ্ঠার অভাবে দশহাতে সেই জাগ্রত বিগ্রহকে আমরা সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারলাম না দেশের বেদীতে। শঙ্কাহত মন, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র— কি করে কি হবে? দলগত মত ও পথের অমিল সব জানি, সব মানি; কিন্তু আমার রঙ-এ রং মিলিয়ে ঠাকুর এলো না বলে

তো আর ঠাকুর মিথ্যে হয়ে যায় না। অতএব প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে। যাগযজ্ঞ পুজোপাঠ পুরোদমে শুরু করে দিতে হবে। বিঘ্ন হবে, বিঘ্ন যাবে। তা বলে ভয় করলে চলবে না, বীতস্পৃহ হলে হবে না। তবেই সেই রূপ সাধকের কাছে প্রতিভাত হবে—সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃমূর্তি।

সুহাস : সত্যিই তো! সর্বদেশে সর্বকালে তাই তো হয়ে এসেছে। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

রসময় : না না, তর্ক থেকেও বিশ্বাসটা রাখতে পারা যায়। যে বিশ্বাসের জোরে পাঁচ ঢং-এর পাঁচটা ছেলে মা-কে দেখে গদগদ হয়, আনন্দ করে একসাথে।

সুহাস : সে তো আমার ক-টির দিকে তাকালেই আমি বুঝতে পারি, তারা যাই বলুক।

রসময় : আহা সে তুমি বুঝতে পারো। তারা ঠিক ঠিক পারে কি? আছে সে বোধ?···এক একজন তো দিকপাল হয়েছে। বল, কি করলে কংশ, কি করলে বীরু, অমলই বা কী করছে!

সুহাস : সে আর বলে কি হবে! অদৃষ্ট, কপাল!

রসময় : এতটা অদৃষ্টবাদী তুমি ছিলে না বলেই আমি জানতাম।···যাগগে!

সুহাস : যাই দেখি আবার সংসার সামলাইগে।

রসময় : বীরু একজন কি কাণ্ডটা করলে শেষটায় ভাবতে পার?

সুহাস : ও তো বলে কণ্ট্রাকটরের দোষ। ভেতরকার ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ ও জানত না।

রসময় : ও কি বলে সেটা তো বড় কথা নয়, লোকে কি বলছে?—খবরের কাগজ?

সুহাস : কাগজওয়ালারা সব টাকা খেয়ে তিলকে তাল করে লিখছে।

রসময় : গবর্নমেণ্ট. কাগজওলাদের সব ঘুষ দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেমন? কী যে সব বোধ তোমাদের!

সুহাস : আমার ছেলে চোর, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

রসময় : তোমার ছেলে যে সাধু নয় সে কথা তো কংশই কোর্টে প্রতিপন্ন করেছে।···লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না; মাথা হেঁট করে হাঁটি।···কে!—কে!···

নেপথ্য কণ্ঠ : আমি বীরু।

…থাক এ সব কথা এখন। ভেতরে আসতে বল বীরুকে।

সুহাস : কই, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয়।…

[বীরুর প্রবেশ]

…কি খবর বল।

বীরেশ : খবর মোটামুটি ভালোই। তুমি কেমন আছ?

সুহাস : আমি আবার খারাপ কবে থাকি! বোস, চা নিয়ে আসি।

[সুহাস-এর প্রস্থান]

রসময় : তারপর…

বীরেশ : তারপর আর কি!—এখন inquiry বসবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

রসময় : বাঘটা কে শুনি?

বীরেশ : বাঘ…

রসময় : হ্যাঁ কে সে বাঘ?…বাঁধতে গিয়ে বাঁধ ধ্বসে গেল, এটাও তো কোনো কাজের কথা হলো না।…গোটা জলস্রোতটাই তো রক্ত! মানুষের রক্তজল করা পয়সার রক্ত। গবর্নমেণ্টের টাকা মানে কি বলতে পার?…যাগগে, অনর্থক মাথা খারাপ করে কোনো লাভ নেই!…তেজেশবাবুর কাছে গিছলে?

বীরেশ : গিছলাম।

রসময় : কি বল্লেন তেজেশ?

বীরেশ : বললেন, তুমি তোমার তরফ থেকে কাগজপত্তরগুলো সব দাখিল করো, আমি একবার দেখবো গোটা ব্যাপারটা।

রসময় : তাই দাও। Assembly-তে ব্যাপারটা ওঠবার আগেই দাও তাড়াতাড়ি করে। তৈরি আছে সব কাগজপত্তর?

বীরেশ : তৈরি হয়ে যাবে।

রসময় : চটপট করে দাও। সামনেই আবার সেশন।

বীরেশ : না তার আগেই হয়ে যাবে।

রসময় : আর, পরামর্শ-ই বা কি দেব, কেন দেব বুঝতে পারি না, কাগজপত্তরগুলো দাখিল করবার আগে আশু-কে একবার দেখিয়ে

নিও। আশুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার খানিকটা কথা হয়েছে। ·· কোর্টে নয়, বাড়িতে যেও।

বীরেশ : আচ্ছা। কবে যেতে হবে।

রসময় : সে আমি তোমায় বলবখন। তদ্বির তদারক—জীবনে এ সব কাজ কোনোদিন করিও নি,—আজ তোমাদের জন্যে···। সোমবার নাগাদ খবর নিও।

বীরেশ : আচ্ছা। আমি তাহলে চলি।

রসময় : এসো।

(রসময় বই পড়তে থাকেন)

[সুহাস-এর পুনঃপ্রবেশ]

সুহাস : বীরু কি চলে গেল নাকি ?

রসময় : বোধ হয় চলেই গেল।

সুহাস : আর আমি চা নিয়ে এলাম পড়ি কি মরি করে।

রসময় : ভুলে গেছে আর কি! আমাকেই দাও তবে।

সুহাস : ছোট বৌমার কাছে বেয়াই মশাই-এর খবর শুনলুম।

রসময় : কি বলছিলেন ?

সুহাস : সে নাকি সব সাংঘাতিক কাণ্ডবাণ্ড করছেন বাড়িতে। কখনও গলায় ক্ষুর দিচ্ছেন, কখনও ছাত থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছেন, বাড়ির লোকজন সব সময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে ওঁকে নিয়ে।

রসময় : ছাব্বিশ লাখ টাকা ঘাটতি; নাড়ীর-ও তো একটা হিসেব আছে রক্তচাপ সইবার। Every action has its reaction. শুরু হয়ে গেছে প্রতিক্রিয়া আর কি! শিরা উপশিরা সব বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।···খালি গরল উঠছে, খালি গরল উঠছে।···সবটুকু অমৃত এবার মনে হচ্ছে দানবেই খেয়ে ফেলেছে। দেবতাদের ভাগ্যে ছিঁটেফোঁটা জোটে নি।

সুহাস : সত্যি কি হবে বল তো ?

রসময় : সেই হিসেবই তো করছি রোজ। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কি জান সুহাস, সবটা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। Sometime, someday, myth will come true. Books

on brooks—sermons on stones. Can atom split an idea, an ideal ?

(সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুর পতনের শব্দে সচকিত হন রসময়। সেই দিকে তাকান। যুগপৎ নিভে যায় আলো। পাশের সংলগ্ন সেট-এ আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় অমল তার স্ত্রী লতার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করছে। উন্মত্তের মতো সব কিছু টেনে টুনে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে আর চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে লতা—ফুঁসছে, গজরাচ্ছে, সর্পিনীর মতো)

অমল : you lie—তুমি আমাকে কক্ষনও সে কথা বল নি। This is all but a conspiracy. তোমার বাবা আর দশটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না ?

লতা : না, একদিন দেরি হলে তাঁর হাতে হাতকড়া পড়তো। Public money—তুমি বুঝতে চাইছো না কেন ?

অমল : কিন্তু রঞ্জনকে আমি কথা দিয়েছি যে by 12th আমি তার টাকা দেব।

লতা : কথা দিয়েছো দেবে সে টাকা তুমি যেখান থেকে হোক। আমার বাবা তোমার ব্যক্তিগত দেনা মেটাতে বাধ্য নন। বিপদে পড়ে তিনি আমার কাছে তাঁর টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন মাত্র। এ টাকায় তোমার কোনো অধিকার থাকতে পারে না।

অমল : যদি অনধিকার চর্চা করি।

লতা : মুশকিলে পড়বে। তাঁর ভুল হয়েছিল তিনি বিশ্বাস করে তোমার মতো একজন ঠগ-এর কাছে···

অমল : লতা !

লতা : তুমি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো। কিন্তু আমি মেয়ে হয়ে কক্ষনও তাঁকে প্রতারণা করতে পারবো না। তুমি সে টাকা, সোনা, সব ফেরৎ দেবে।

অমল : তাল তাল সোনা আর বুলিয়ন টাকা গচ্ছিত হলেও তার ঝক্কি আমার ছিল। সুতরাং কিছু পাবে, কিছু যাবে। তোমার বাবাকে বলো···

লতা : অসম্ভব, তার একটি পয়সাও তুমি তাঁকে প্রতারণা করতে পার না।

অমল : প্রতারণা নয়, আমার নেয্য প্রাপ্য।…

[আলমারি খুলে টাকার থলে বার করে আনে]

…এই আছে, নিয়ে যাও। নাও। ক্ষুদ্র স্বার্থের মহত্তর ব্যাখ্যা দিয়ে আজ তুমি তোমার বাবাকে তৈরি করছো সাধুপুরুষ, আর আমাকে বানাচ্ছ চোর, ছিঃ।

লতা : তা যদি করতাম তো ভিক্ষে করে রঞ্জন রায়ের কাছ থেকে টাকা এনে তোমার পৈতৃক মর্টগেজী সম্পত্তির খানদান রাখতাম না। সব ধুয়ে মুছে যেত এতদিনে। তুমি নেমকহারাম, তাই নুন খেয়েও গুণ গাইতে পারছ না।

অমল : যাও, কীর্তন বার কর গিয়ে এবার রঞ্জন রায়ের নাম করে। আমি কোনোদিন তোমাকে রঞ্জন রায়ের কাছে আমার জন্যে হাত পাততে বলি নি।

লতা : রঞ্জন রায়ের কাছে হয়তো হাত পাততে বল নি, কিন্তু কুঞ্জলালের বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দিতে বলেছিলে।…

(অমল বাইরে যাবে বলে কোট পরে তৈরি হয়ে নেয়)

…কোথাও যাচ্ছ! টাকা দিয়ে যাও।

অমল : টাকা নেই, টাকা আমি দিতে পারব না।

লতা : শোন, যেও না, টাকা দিয়ে যাও!

(অমল দৃকপাত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে লতা ঘরের আসবাবপত্র ভাঙতে থাকে। হাতের কাছে যা কিছু সব টান মেরে ফেলে দেয়। ছুটে যায় বন্ধ আলমারির কাছে। ভাঙতে থাকে লাথি মেরে মেরে। চাঁড় দিয়ে আলমারি খুলে ফেলে। তারপর সমস্ত অলঙ্কার ও গহনাপত্র সব কিছু ব্যাগে পুরে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নেপথ্যে কণ্ঠ : বৌমা! অমল! অমল! দরজা খোল,—অমল!

[বেগে রসময় ও সুহাসের প্রবেশ]

রসময় : অমল!

(ভাঙাচোরা আসবাব আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসামগ্রী দেখে হতবাক হন রসময়। স্ত্রী সুহাসের দিকে তাকান বিমূঢ় বিস্ময়ে)

দেখছো! অমল!…অমল বড় বুদ্ধিমান ছেলে! অমল! বৌমাই বা গেলেন কোথায়?

সুহাস : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রসময় : না বুঝতে আমি ঠিকই পারছি—অমল! শেষটায় অমলও···

সুহাস : কি করেছে অমল!

রসময় : করেছে, একটা কিছু করেছে। একটা কিছু নির্ঘাত করেছে···

(টুকিটাকি ভাঙাচোরা জিনিস কুড়িয়ে বেড়ান খেদ করে)

···আমার সেই ঘড়িটা।

সুহাস : নাঃ, আর রক্ষে হলো না। কংশ গেল, বীরু গেল, বাকি ছিল এক অমল···

রসময় : ছ্যাখো, অমলের ঘর, চেয়ে ছ্যাখো। যে কেউ এসে এখন শুধু একটা দেশলাই-এর কাঠি ঠুকে দিলেই আর কি দাউ দাউ করে জ্বলে যেতে পারে।

সুহাস : (কেঁদে ওঠেন) আমি আর এ বাড়িতে তিষ্ঠুতে পারি না···।

[বেগে প্রস্থান]

সুহাসের আর্তকণ্ঠ শুনতে পান রসময়। স্ত্রীকে অনুসরণ করেন ব্যস্তভাবে। রসময়ের নেপথ্য কণ্ঠ শোনা যায় : অমল!—অমল!

[অমলের প্রবেশ]

(বিভ্রান্ত অমল ঘরের ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। মহাঅনর্থের দিকে চেয়ে দেখে। জ্বলতে থাকে তার চোখ। ছুটে যায় আলমারির কাছে। উন্মত্তের মতো ড্রয়ার ধরে টান মারতেই ছিটকে পড়ে ড্রয়ার জিনিসপত্রসমেত মেজেতে। তারপর জামা কাপড়ের গাদা টান মেরে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতে থাকে।)

অমল : আমার এটাচি! আমার এটাচি কোথায় গেল! আমার এটাচি কেস। কোথায় গেল এটাচি! এটাচি!

(রসময়ের নেপথ্য ডাক—অমল! অমল!—তখনও শোনা যাচ্ছে দূরে, কাছে)

(পর্দা)

(ক্রমশ)

ফুল আমার ময়না

রণজিৎ দাশগুপ্ত

উঠোন বরাবর যেতেই
　　　　এক ঝাঁক আধোবুলি
　　　　হুড়মুড় করে জড়িয়ে ধরল।
　　　　　　　　লোকটিকে।

নড়তে চড়তে পারে না
পায়ের পাতা দুটো
　　　　দিব্যি মাটি কামড়ে
　　　　　　　　নিঃসাড়।

চোখের তারা নড়ে না
চোখের পলক পড়ে না
মনটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়
যেখানে অজস্র গিঁট দেওয়া সাধ-আহ্লাদের
　　　　　　　　　　　　গলায়
মোটা রশির ফাঁস পরানো।

তারপর ঝিম্ ঝিম্—তাই-তাই
আধোবুলি খই ছিটোয় :
ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-পা, ধানের ছড়া গোছা গোছা।

আড়ষ্ট হাত
ফুল খুঁজে
ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ চুলে
আড় হয়ে আসে ঃ

ফুল আমার ময়না !
ফুল আমার ময়না !!
ফিসফিস স্বর হাওয়ায় হাওয়ায়
টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ছটফট করতে করতে
কান্না হোল
চোখ

জোকার পড়ল পাড়া কাঁপিয়ে।

সমবেত ইচ্ছার প্রতি

গোবিন্দ গোস্বামী

উৎসে ফিরে যাবো বলে জীবনের শেষ অভিসার
অমৃত উদ্যান হতে অভিষিক্ত প্রেমের দর্পণে
কতো পরিচিত মুখে উচ্ছ্বসিত বসন্ত বাহার
নিপুণ আলাপে শুনি। হৃদয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে

সময়কে ভালোবেসে ভুলে গিয়ে সংলগ্ন প্রবাস
দিয়েছি প্রদীপে আলো। কে যাবে, কে যায় নি এখনো
সম্মুখের পথে যদি আমাদের অভিযান শোনো
তবে এসো, মুছে দিয়ে নেপথ্যের মৃত পরিহাস।

অন্ধকারে পড়ে আছে ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়ের মুখ,
ভুলে যাবো শোকাবহ কাহিনীর নাটকীয় স্মৃতি
কঠিন প্রত্যয়ে দীপ্ত ইস্পাতের মর্যাদা উৎসুক
অন্তরের ইতিকথা, মুছে দেবে নির্বীর্য উদ্ধৃতি।

অমল রক্তের স্রোতে ধমনীর উষ্ণ প্রস্রবণ
জানিনা কী উৎসে যাবে, বেঁচে আছি দৃপ্ত যতোক্ষণ॥

জন্মের মুহূর্ত থেকে

তাপস বর্ধন

জন্মের মুহূর্তে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি।
বিবেকের আশ্চর্য আঘাতে
আর—
এক মুহূর্ত স্থির থেকে
ঈশ্বরের অসংখ্য সংজ্ঞা লেখা কাব্যের পাতা ছিঁড়ে
শুধুই ভেবেছি।

সেই থেকে
আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রতিটি ধ্বনিই প্রতিধ্বনি,
আমার চোখের আশ্চর্য দৃষ্টি সেই থেকে
নিষ্পলক।

আমি সেই থেকে স্নান করি নি।
বুকের উষ্ণতায় নিষ্ঠুরতা চঞ্চল।
আপাততঃ প্রতিটি সুন্দর ফুল তীর-বিদ্ধ।

অনেক অশান্তি, আগুন ও অরণ্য পার হয়ে
সেই স্নিগ্ধ নির্ঝরে স্নান করে
চোখের পলক ফেলবো।

আবার পবিত্র হব

প্রদীপ চৌধুরী

আবার পবিত্র হব তার আগে
অই সিক্ত কালো চুলে মুখের ব্রণের দাগ মুছে
দিতে হবে
আবার পবিত্র হব পাপের কিংখাবে বসে
প্রতিশ্রুত হলাম।

আবার পূর্ণ হব। নিয়তির নির্মম কুসুমে
মন্দিরের জলে ধোয়া দুহাত রাখব
তার আগে অন্ধের অভিজ্ঞা হতে একটি উজ্জ্বল
দিন দেবে
প্রতিশ্রুতি দাও।

নীল হ্রদ

রতন ভট্টাচার্য

এদিকটা সন্ধের পর থেকেই খুব নির্জন হয়ে পড়ে। লোকজন চলাচল থাকে না। বাসট্রামগুলো কোথাও দাঁড়াতে হয় না বলে চকিতে বেরিয়ে যায়। খুব দৈব বলতে হবে যে এত রাস্তার পর ঘুমটা এখানেই এসেছিল। বরাবরই, কোন্নগর বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়েই, একটা তন্দ্রার মতো ভাব ছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বোঝাই লরিগুলো ছুটছিল। বাস ছুটছিল, তাই তন্দ্রার ভাবটা তেমন গাঢ় হয়ে উঠতে পারে নি। মেজবাবু টের পান নি যে জীবনটা যার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে গা এলিয়ে দিয়েছেন তার সমস্ত শরীর ক্লান্ত হয়ে ঘুম চাইছে।

অবশ্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হাওড়া, হাওড়া ব্রিজ পার হওয়া পর্যন্ত অনিলও বুঝতে পারে নি যে এই তন্দ্রার ভাবটা কোনো নির্জন শান্ত রাস্তা পেলেই গাঢ় হতে চাইবে। সে ঘুমিয়ে পড়বে। গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোড ছেড়ে বাঁ দিকে কয়লাঘাটা স্ট্রিটে ঢোকা পর্যন্ত অনিলের মনে আছে। এই রাস্তায় গাড়ির মুখটা ঘুরলেই তার মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন সে একটা প্রকাণ্ড রানওয়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রকাণ্ড, বিস্তৃত সমুদ্রের মতো এই রানওয়ে তার ক্লান্ত শরীর থেকে ভুলিয়ে মনটাকে বাইরে বার করে এনেছিল। রানওয়ের কোথাও কেউ ছিল না। অনেক দূরে ধু ধু এরোড্রমের কোয়ার্টারগুলো দেখেছিল সে। আর কিছু মনে নেই তার। শেষে সে বুঝতে পারছিল কেউ তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। প্রবল বেগে তার পরিশ্রান্ত শরীরটা ঝাঁকি লেগে জেগে উঠলে সে দেখেছিল তার গাড়ি বড় পোষ্টঅফিসের উঁচু উঁচু প্রাচীন থামগুলোর দিকে মুখ করে ছুটছে। মেজবাবু তার নাম ধরে, তার জামা, শরীর ধরে তাকে ডাকছেন। সেই পেছন থেকেই তার শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে মেজবাবু একহাতে স্টিয়ারিংটা ঘোরাতে চাইছিলেন। তখন আর তার চোখের সামনে কোনো রানওয়ে ছিল না। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে নৌকোডুবি হওয়া মানুষের মতো সে আঁকুপাঁকু করে জেগে উঠেছিল। জেগে উঠে

শক্ত অভ্যস্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিয়েছিল। গাড়ির দুটো চাকা ফুটপাতের ওপর উঠে গিয়ে, ঘুরে, পাক খেয়ে গাড়ি আবার রাস্তায় নেমে এসেছিল। খুবই দৈব বলতে হবে যে আশেপাশে তখন কোনো গাড়ি ছিল না, পথচারী ছিল না। থাকলে…।

অবশ্য অনিল যে খুব একটা ভয় পেয়েছে তা নয়। বস্তুত প্রায় ঘুম আর জাগরণের মধ্যেই সব ব্যাপারটা ঘটে গেল। তার মনের মধ্যে কোনো অনুভূতিই ছিল না। কোনো ভয় বা সদ্য ভয় পাওয়ার পরের কোনো গ্লানি অনিলের ছিল না। গাড়ি ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামবার পর কিছুটা ঘোর, কিছু তন্ময়তার মধ্য দিয়ে এগোলে মেজবাবু বললেন, আর একটু হলেই মেরে ফেলেছিলে হে।

মাথা কাত করে অনিল কাঁচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল, তার কোনো বোধ ছিল না কিন্তু শরীরটা কে জানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ায় এবং ঘুম ভাঙায় কিনা খুব কাঁপছিল।

আমি তো একটু আগেও চোখ বুজে পড়েছিলাম, মেজবাবু বললেন। তারপর গাড়ি আরও এগিয়ে এলে, কার্জন পার্কের কাছে, মেজবাবু আবার বললেন, এটখানে গাড়িটা একটু রাখো। রেখে বাইরে বেরিয়ে একটু পা-টা-গুলো ছাড়িয়ে এসো দিকিন।

গাড়ি কার্জন পার্কের কাছে রেখে অনিল বাইরে এলো। বাইরে হাওয়া নেই। কার্জন পার্কের এদিকটা অন্ধকার। ডান দিকে রাজভবনের উদ্যান। একটু পেছন দিকে সরে গিয়ে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে অনিল ধরায়। বিড়িতে শেষ টান দেওয়ায় শরীরের জড়তা হঠাৎ ঝাঁকি লেগে শরীরের শিথিলরক্ত হাত-পা সব চনচন করে উঠল। তার হাতের ঘড়িতে নটা বেজে গেছে। রাত চারটে থেকে এখন রাত নটা। কর গুনে গুনে অনিল হিসেব করে দেখল, চারটে থেকে চারটে, বারো ঘণ্টা আর পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় মোট পাঁচ আর বারো সতেরো ঘণ্টা সে জেগে আছে। চান এবং খাওয়ার এক ঘণ্টা বাদ দিলে মোট ষোল ঘণ্টা সে তার এই লম্বা দেহটা ভাঁজ করে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। কোনো অবকাশ তার ছিল না। কার্জন পার্কের পাশে নির্জন ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে এখন তার শরীরটা কি রকম ভেঙে আসতে চাইল। বিড়ি টানা সত্ত্বেও দু বার খুব হাই উঠল। কেন আজ ক-মাস ধরে তার এ রকম হচ্ছে কে জানে? সে

দশ বছর ধরে ড্রাইভারি করছে। এর আগে কোনোদিন তার এমন হয় নি। তার মনে পড়ে না গাড়ি চালাতে চালাতে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সে আর কোনোদিন ঘুমিয়েছে কিনা। গাড়িটা সোজা বড় পোস্টাপিসের সিঁড়িতে ধাক্কা লেগে কাত হয়ে উল্টে পড়লে এখন সে কোথায় থাকত। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় কোনো হাসপাতালে। মরে গেলে···? হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙার পর চোখ মেলে দেখা একটু আগের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ায় অনিলের সমস্ত শরীরে একটা মৃদু শিহরণ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। দেহ অবশ করে হাই উঠল তার।

কিহে, মেজবাবু গাড়ি থেকে মুখ বার করে ডাকলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

অনিল বিড় বিড় করে মৃদু জড়ানো গলায় কিছু বলল। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠল সে। গাড়িতে স্টার্ট দিতে তার মনে হলো গাড়ি আর আপনি যাবে না। যেন এই গাড়ি এখন তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। ঘুম পাবার জন্যে বা সারাদিন বসে আছে বলে, যে জন্যেই হোক, তার কোমড় আর ঘাড়ের কাছে একটা ব্যথা মাঝে মাঝে খুব ঠেলা মেরে উঠছিল।

ঘুম গেল, কিহে ? গাড়ি চললে মেজবাবু সিগারেটে সুখ টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হুঁ।

একটু আগে মেজবাবু যে প্রায় একটা গুরুতর এ্যাকসিডেণ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, এখন আর তাকে দেখে সে কথা অনুমান করবার উপায় নেই। পেছনের গদিতে শরীর ছেড়ে দিয়ে মেজবাবু এলিয়ে বসে আছেন। হাওয়ায় তাঁর পাঞ্জাবি, চুল উড়ছে।

শরীর-টরীর খারাপ করেনি তো···? মেজবাবু জানতে চাইলেন।

অনিলের কথা বলতে ভালো লাগছিল না। সে প্রথমে মাথা ঝেঁকে না করল। তারপর হয় তো তার মাথা ঝাঁকা মেজবাবু দেখতে পেলেন না মনে করে শেষে বলল, না।

তবে, হঠাৎ ঘুম পেল যে ?

কথা বলতে অনিলের সত্যি খারাপ লাগছিল। তার কপালের দু-পাশের রগ দুটো ফুলে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে খুব রেগে গেলে তার এ রকম হয়। তার বুঝতে বাকি নেই মেজবাবু বাড়ি পর্যন্ত এই রাস্তা তার সঙ্গে এভাবে

কথা বলে তাকে জাগিয়ে রাখবে। অনিলের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল হঠাৎ গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে গাড়িটাকে অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। দিয়ে পেছনে বসে থাকা এই লোকটাকে দু-হাতে গলা টিপে মেরে ফেলে। তারপর কাজ শেষ হলে মাঠের নরম ঘাসে, চারপাশ খোলা হু হু শীতল হাওয়ায় দেহ বিছিয়ে দিয়ে সারারাত সে শুয়ে থাকবে।

কি ব্যাপার হে? আবার ঘুমুলে নাকি?

অনিল কথা না বলে তার বিরক্ত মুখটা মেজবাবুকে দেখাল। প্রথমে মুখ ঘোরাবার সময় ভেবেছিল একটু হাসবে, কিন্তু হাসতে ভালো লাগলোনা। শেষে তার কথা না বলা এবং বিরক্ত হওয়াকে গ্রাহ্য করার কোনো উপযুক্ত কারণ মেজবাবুর নেই এবং তাই মেজবাবু রেগে যেতে পারেন ভেবে অনিল দু বার হাই তোলার ভাব দেখিয়ে বলল, সেই রাত চারটেয় গাড়ি বার করেছি। বিশ্রাম নেই···।

রাত চারটেয়! মেজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, রাত চারটেয় কেন গাড়ি বার করেছিলে?

কত্তা-মা গঙ্গায় যান না?

ও হ্যাঁ। মেজবাবু একটু থেমে বললেন, কিন্তু সে তো তোমার রোজই যেতে হয়।

হুঁ, রোজ যাই। অনিলের জিভ শুকিয়ে গলা বুজে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল তার দু চোখ কেউ ভেতর দিকে টানছে। কথাবার্তা তার ভালো লাগছিল না। এই কথাবার্তা শেষ করে দিতে চেয়ে তাই সে বললে, ক-মাস ধরে এ রকম হয়েছে। সব সময় ঘুম পায়। কথা বলতে বলতে, বসে বসে, গাড়ি চালাতে চালাতে চোখ বুজে যায়। ঘুম পায়।

মেজবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ঘুম তোমার পুরো হচ্ছে না হে।

অনিল অন্ধকারে ভেংচি কেটে মনে মনে বললে, ঘুম তোমার পুরো হচ্ছে না হে।

গাড়ি জনহীন মাঠের ধার ছেড়ে জনবসতির ভেতর দিয়ে ছুটছিল। এলগিন রোড পার হয়ে গাড়ি এখন একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। এই গলি-রাস্তার শেষে বড় ছড়ানো তিনতলা বাড়ি, বাগান, ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, বড় গেট, বাগানের মধ্যে আধা হাউস, একসারি পামগাছ, গাড়ি সেখানে এসে গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। গাড়ি ঝাঁকি খেয়ে থামলে

অনিলের মনে হলো গাড়ি থেকে নেমে বাইরে বেরোবার শক্তি তার শরীরে নেই। যেন আজ সমস্ত দিন সে একটা দীর্ঘ মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এই মাত্র এখানে এসেছে। মরুভূমির নিষ্ঠুর উত্তাপ তার শরীর থেকে সব রক্ত শুষে নিয়েছে। হাত পা কোনো রকমে টানটুন করে ষ্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে সে যদি এখন চিৎকার করে বলতে পারত, আমি আর বেরুব না। বেরুব না। এই সব ভাবতে ভাবতে সে গাড়ি থেকে নেমে মেজবাবুর জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। মেজবাবু একদিকে সরে আসতে গাড়িটা একদিকে কাত হয়ে গেল। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। দু-হাত মাথার ওপর উঁচু করে রেখে আলস্য ত্যাগ করলেন। ভেতরের আলোকিত হল, সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন দুর্গা···। দুর্গাবুড়ো যেন তৈরি হয়েই কোথাও এদিকে ছিল। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো সে সামনে এসে দাঁড়াতে মেজবাবু তাকে বললেন, গাড়ি থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে আন রে···। বলে পেটের কাছে কোঁচাটাকে শক্ত করে চেপে ধরে ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরের হলে শেষে সিঁড়িতে তাঁর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণে অনিল গাড়িতে উঠে ষ্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে চোখ বুজেছে। দুর্গা বুড়ো মাল-পত্তর গাড়ি থেকে নামালে সে গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে······ খাওয়ার কথা তার মাথায় ছিল না, দুর্গাবুড়ো যখন হোক তাকে ডেকে তুলে খাওয়াবে···গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে কোনো রকমে ঘরে গিয়ে সে টান হয়ে পড়ে যাবে। মেজবাবু ভেতরে ঢুকে যেতে দুর্গাবুড়ো গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, ড্রাইভারদা···।

অনিল তার রক্তবর্ণ, নিস্পৃহ দুচোখ তুলে দুর্গাবুড়োর দিকে তাকাল।

ছোটবাবু টং···। দুর্গাবুড়ো হাত নেড়ে চোখমুখের একটা ঈশারা করল। মেজবাবু গাড়ি নিয়ে কোন্নগর চলে যেতে···। কথা সে শেষ করল না। না করে বললে, গাড়ি এখন তুলো না যেন। ছোটবাবু, ছোটমা বালিগঞ্জ যাবে গুরুদেবের বাড়ি।

এই এখন! অনিল অবাক।

হ্যাঁ।

অনিলের সর্বশরীর বেয়ে একটি তীব্র শীতল শীহরণ নামল। তার গা হাত পা সব ভোরের ঝাউগাছের মতো ঝিরঝির শব্দ করে কাঁপছিল। সে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারছিল না। কথা বলতে গিয়ে সে দেখল তার

তালু শুকনো, গলা দিয়ে ফাঁপা নিঃশব্দ একটা হাওয়া বেরিয়ে আসছে। পারব না, যেন নিজেকে শোনাচ্ছে এমনি করে সে বলল, আমি পারব না। বালির ওপর জোরে হাওয়া বইলে যেমন হয় তার গলার স্বর সে রকম শব্দ করে বেজে উঠল। গাড়ি থেকে চারটে লাউ, কিছু চ্যাঁড়স, কোন্নগর বাগান বাড়ি থেকে আনা তরকারী, ফুল নামাতে নামাতে দুর্গাবুড়ো ফিরে চাইল। কি বলছ ড্রাইভারদা ?

অনিল দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এলো। ঘুমে আমি চোখ খুলতে পারছি না বুড়ো।

তরকারী নামতে নামাতে দুর্গাবুড়ো থেমে, দাঁড়িয়ে পড়ে অনিলকে দেখল। ড্রাইভারদা একটা ডাক্তার দেখাও। এ তোমার অসুখের ঘুম।

অসুখ !

হ্যাঁ। কই আগে তোমার এমন ছিল না তো ?

ঠিক। আগে তার এমন ঘুম ছিল না। আগেও সে রাত চারটেয় উঠেছে। কত্তা-মাকে নিয়ে গঙ্গায় গেছে। আবার এদিকে কেউ সন্ধে-বেলাতেই তাকে শুতে পাঠায় নি। শুতে শুতে প্রায় বারোটা। কিন্তু আগে কই কোনোদিন ঘুমে এমন হয়েছে মনে পড়ে না তো। দেড়-দুমাস হলো এই ঘুম তাকে পেয়েছে। যখন তখন, যেখানে সেখানে তার ঘুম পাচ্ছে। মেজবাবুই ঠিক বলেছেন, ঘুম পুরো হচ্ছে না।

আজ কোনো হুজ্জোত করো না ড্রাইভারদা। ঘুরে এসো। দুর্গাবুড়ো ফুল, তরকারী নামিয়ে বলল, সন্ধেবেলা কত্তা-মার ঘরে বড় বাবু, ছোটবাবু সবাই মিলে খুব মিটিং হয়ে গেছে। গাড়ি কোন্নগর নিয়ে আটকে রাখায় মেজবাবুর ওপর খুব চটেছে সকলে। বলতে বলতে দুর্গাবুড়ো আলোকিত হলে প্রায় ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তিকে চেঁচিয়ে ডাকল, কানাইয়ের মা···।

ছায়াটা একটু নড়েচড়ে এগিয়ে এলে দুর্গাবুড়ো বলল, ধরতো বাছা এই লাউদুটো, নিয়ে এসো আমার সঙ্গে, হ্যাঁ। তারপর কোঁচড়ে চ্যাঁড়স, দু'বগলে দুটো মোচা, দুহাতে লাউ, কানাইয়ের মায়ের দুহাতে লাউ, ফুল এসব নিয়ে দুর্গাবুড়ো আর কানাইয়ের মা চলে যেতে অনিল গাড়িবারান্দার নিচে একলা প্যান্টের পকেটে হাত রেখে একটি মৃতবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সেই রাত চারটেয় উঠেছে সে। আর এখন পৌনেদশটা। প্রায় আঠারো

ঘণ্টা জেগে আছে। চারটেয় উঠে সে কত্তা-মাকে নিয়ে গঙ্গায় গেছে। ফিরে এসে বড়বাবুর মেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে। তারপর সাড়ে আটটার সময় বড়বাবুকে নিয়ে কারখানা। বড়বাবুকে কারখানায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে বড়বাবুর বড়মেয়ে বিমলা দিদিমণিকে নিয়ে কলেজ। বিমলা দিদিমণিকে কলেজ পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে ছোটমা শ্যামবাজার তার বাপের বাড়ি গেছেন। তারপর ছোটবাবুকে নিয়ে কারখানা। ছোটবাবু কারখানায় গেলে, বড়বাবু ফিরে এসেছেন। তখন চান খাওয়ার জন্যে সে একঘণ্টার ছুটি পেয়েছে। খেয়ে উঠেই বড়মাকে নিয়ে বেরোতে হয়েছে। বড়মা বাজার করে ফিরে এসেছেন তিনটেয়। তারপর মেজবাবু, মেজবাবু প্রথমে কারখানার সব পার্টিদের বাড়ি ঘুরেছেন। পাঁচটা নাগাদ কোন্নগর। সেখানে বাগানের মালীর সঙ্গে তাকে তরকারী ফুল তুলতে হয়েছে। ভাবতে ভাবতে অনিলের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠলো। সারাদিন সে একটা চরকির মতো ঘুরেছে। রোজ ঘোরে। এখন আবার তাকে যেতে হবে বালিগঞ্জ। ছোটবাবু ছোটমার গুরুদেবের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে রাত কত হবে কে জানে? সাড়ে এগারো, বারো, বেশিও হতে পারে। তারপর সে শোবে। শেষে রাত চারটের সময় এসে দুর্গাবুড়ো তাকে ডাকবে, ড্রাইভারদা ওঠো। উঠে পড়ো। চারটে বেজে গেছে। কখনও কখনও তার মনে হয়···। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হলো। শব্দটা নিচে নেমে আসছে। হঠাৎ কোনোদিন ঘর্মাক্ত দেহে এক ঝলক হাওয়া লাগলে যেমন হয় অনিলের সমস্ত দেহ তেমনি শীত করে কেঁপে উঠল। এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করছিল সামনের গাড়িটাকে সে একটা খেলনার মতো উঁচু করে তুলে আছড়ে ভেঙে ফেলে। চুরমার করে দেয়।

সিঁড়ির পদশব্দে আলোকিত হল পেরিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে অনিল গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রথমে ছোটবাবু তারপর ছোটমা গাড়িতে উঠলেন। ছোটমার টুকটুকে শরীর থেকে নানারকম উগ্র জটিল গন্ধ গাড়ি বারান্দার চত্বর ছাড়িয়ে বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে অনিলের মনে হলো তার একটা বমি বমির ভাব হচ্ছে। আর যেন মাথাটা ঘাড় থেকে এখুনি ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

গাড়ি বাগান পেরিয়ে গেট দিয়ে বাইরের গলি-রাস্তায় এলো। যদিও

জানা ছিল তবু কোথায় যেতে হবে একবার জিজ্ঞেস করবে কিনা অনিল ভাবল। অথচ তার কথা বলতে একদম ভালো লাগছে না। গাড়ি বড় রাস্তায় পড়তে ছোটবাবু বললেন, বালিগঞ্জ, গুরুদেবের বাড়ি। এদিকের রাস্তাও এখন বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে। ট্রাম বাস চলছে কম। লোকজন কম, কোথাও মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে। শীতল হাওয়ায় অনিলের দু-চোখ আঠার মতো জুড়ে আসছিল। তার মাথার ভেতরটা শূন্য, যেন সে ক্রমশই একটা গভীর কুয়াশার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যেখানে সে নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে না। অনেক দূরে গির্জার ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনির মতো ছোটবাবু আর ছোটমার কথোপকথনের শব্দ ভাসছিল। এবারে মেজদা খুব জব্দ হবে। ছোটমা হাসতে হাসতে বলছিলেন।

মেজকর্তাকে জব্দ করা সোজা নয়। ছোটবাবু একটু থেমে বললেন, মেজ বৌঠান খুব চালাক।

ছোটমা হঠাৎ বললেন, মেজদির আর ছেলেপুলে হবে না।

কি করে বলছ?

না। মনে হয়, আবার ছোটমার হাসির শব্দ শোনা গেল।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। অনিলের খুব খারাপ লাগছিল। সে চাইছিল সর্বক্ষণ এমন চুপচাপ থাকুক। শুধু গাড়ির একটানা মৃদু ক্লান্তিকর শব্দ। তারপর ছোটমার খুব চাপা প্রায় ফিসফিস গলা শুনতে পেল অনিল, আমাদের কি হবে?

এবারে ছোটবাবু হাসলেন, সে তুমি ভালো জানো।

বারে, আমি কি জানি। সুখে ছোটমার গলা বুজে আসছে অনিলের মনে হলো।

কে জানে?

কেউ জানে না। বলে হাসেন ছোটমা। একটু চুপ করে থেকে বলেন, যদি মেয়ে হয়ে যায়।

তবেই হয়ে গেল। ছোটবাবুর স্পষ্ট নিশ্বাস পড়ল। মা ফিরেও চাইবে না আমাদের দিকে। বড়কর্তার অবস্থা হবে।

ছোটমা গাঢ় স্বরে বললে, ভয়ে আমার ঘুম হয় না। সারারাত বিছানায় ছটফট করি। ঘুমুতে পারি না।

উত্তরে ছোটবাবু কি বললেন অনিল শুনতে পেল না। আমার ঘুম হয় না—

ছোটমার এই কথা তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। তার বুকটা তিরতির করে কাঁপছিল।

গাড়ি তীরের মতো ছুটছিল। বাঁদিকে বেঁকে গাড়ি রাসবিহারীতে ঢুকল। অনিলের মনে হচ্ছিল যে কোনো পাহাড়ী চা-ক্ষেতের ঢালু আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশ স্তব্ধ। কেউ যেন রাত্রির আলো ছড়িয়ে রেখেছে। মাথার ওপর কোথাও তীব্র শব্দ করে একটা এরোপ্লেন উড়ছে। অথচ নির্মল, নির্মেঘ আকাশে কোনো এরোপ্লেন ছিল না। শুধু শব্দ। ভীষণ তীব্র শব্দ।

এই রাস্তা নির্জন। দু-পাশের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বল্পালোকে রাসবিহারী এভিন্যুকে কোনো স্বপ্নের রাজপথ মনে হচ্ছিল। দেশপ্রিয় পার্ক, প্রিয়া সিনেমা ছাড়িয়ে গুরুদেবের দোতলা ফ্ল্যাট। গুরুদেবের বাড়ির মধ্যে গাড়ি যায় না। গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড় করাতে ছোটবাবু ছোটমা গাড়ি থেকে নামলেন। নেমে ভেতরে চলে গেলেন।

অনিল গাড়ি ব্যাক করে পাশের গলি রাস্তায় গাড়িটাকে ঢোকাল। তারপর সারাদিন পর পা টান করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার সমস্ত দেহটা গাড়িতে ধরল না। পা টান করতে চেয়ে তাকে পা গদি থেকে নামিয়ে দিতে হলো। আজ দশ বছর সে ড্রাইভারি করছে। শুয়ে চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সারাজীবন তাকে এই কাজ করে যেতে হবে। এই ড্রাইভারি। তার মনে হলো যেন কোনো গভীর অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের হাত তাকে ড্রাইভার করে দিয়েছে। শরীরের যন্ত্রণাবোধ এখন আর তার ছিল না। কোথাও কোনো যন্ত্রণা আছে কিনা সে বুঝতে পারছিল না। ঘুম ঘুম। তীব্র, গাঢ় ঘুমের একটা ছায়া তার চোখ মুখ শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন ছোটবাবু আর ছোটমা ফিরে এলেন। ছোটমা গাড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন, অনিল।

অনিল চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তার মাথায় কিছু ছিল না। কে তাকে ডাকছে সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ছোটমা আবার ডাকলেন, অনিল।

খুব শান্ত, খুব ধীর স্থির হয়ে সে উঠে বসল। এখনও তার চারপাশে একটা গভীর কুয়াশা।

ছোটবাবু গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, ড্রাইভারদের এই স্বভাব। একটু ফাঁক পেয়েছে কি শোয়া চাই মাঘু!

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি হবে? ছোটমা গাড়িতে উঠে আদুরে গলায় বললেন, আমার ঘুম আসে না।

কি করবে তাহলে?

চলো একটু ঘুরে যাই। হাওয়া খেতে খেতে। অনিলের মনে হলো ছোটমা তার একটা হাত দিয়ে ছোটবাবুর গলা পেঁচিয়ে ধরেছেন।

অনিল গাড়িতে স্টার্ট দিল। তার সব স্বপ্নের মতো লাগছিল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে ছোটমা ডাকলেন, অনিল, সোজা চালাও। একটু ঘুরে হাওয়া খেয়ে যাব। যাদবপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জ হয়ে··· ।

অনিলের বুক হঠাৎ ফেটে যাবার মতো হলো। সে কোনো কথা বলতে পারল না। কোনো প্রতিবাদ জানাল না। তার একবার মনে হয়েছিল সে এখুনি ছোটমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কাঁদে। পরক্ষণেই মনে হলো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সোজা গাড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোনো দূরে চলে যায়।

কতক্ষণ তার কোনো জ্ঞান ছিল না। সে কোথায়, গাড়ি ছুটছে কি দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারেনি সে। তারপর সে যেন ছোটমার আর্তনাদ শুনল। আর্তস্বরে ছোটমা যেন বললেন, গাড়ি এত জোরে ছুটছে কেন? ছোটবাবু তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিলেন। অনিল অবাক হয়ে দেখল গাড়ি উল্কার মতো ছুটছে। রাস্তার দুপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। একি! এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? কোথায়? তার মনে পড়ল যে একটা নীল হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিল। একটা স্তব্ধ পৃথিবী, নীল হ্রদ। অধিবাসীরা হ্রদের জলে কাঠের ঘরে বাস করে। ঘুমোয়, খায়, ঘুমোয়।

গাড়ি নয় যেন একটা ঝড় ছুটছে। হঠাৎ হঠাৎ ছিটকে আসা আলোকিত মোড়গুলো পলকের মধ্যে দূরে সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এলো অনিলের। তার নিজেরও ভয় করছিল। গাড়ির গতি কমাবার জন্যে সে ব্রেক্ খুঁজল। গাড়িতে কোথাও ব্রেক নেই। এক্সিলেটারের ওপর থেকে তার পা-টাকে সে সরাতে চাইল। পারল না। তার পা থামের মতো শক্ত হয়ে বসে গেছে। তার মনে হলো এই পা সরাবার কি গতি কমাবার সাধ্য তার নেই। কোনো নীল হ্রদের ধারে গিয়ে একদিন এই গাড়ি আপনি থেমে যাবে।

'রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান এবং বাঁট' প্রসঙ্গে

শৈলেন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কলকাতা তথা বাংলাদেশে নানাকারণে রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা আশানুরূপ বিস্তারলাভ করে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগের অভাব। সে সময় সাধারণভাবে সঙ্গীতশিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যে কটি ছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত ছিল না বললেই চলে। যে কজন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বা গায়ক ছিলেন তাঁরা সহজলভ্য ছিলেন না। এ হেন সময় ১৯৩৫।৩৬ সাল থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্র মারফত শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মরুভূমিতে বৃষ্টির মতো স্বাগত হয়েছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে সৃষ্টি হলো কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চাকামী শিল্পীগোষ্ঠী, যেমন, গীতবিতান, বৈতানিক, দক্ষিণী প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলির আগে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর তত্ত্বাবধানে গীতালি নামে একটি স্বল্পায়ু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন কলকাতার প্রায় অলিতেগলিতে সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং প্রায় সব ক-টিতেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

সকল ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রেও কিছু লোক সস্তায় নাম করার লোভে উপযুক্ত শিক্ষা বা চর্চা না করেই, কয়েকটি মাত্র গান সম্বল করে শিল্পী সেজে বসলেন। ফলে তাঁদের গায়নভঙ্গীর মধ্যে বহুক্ষেত্রেই বিকৃতি প্রকট হয়ে উঠল। তাঁরা অবশ্যই নিন্দার্হ।

আজ ১৯৬২ সালে—৫৮খণ্ড স্বরবিতানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধিকাংশের সুরের লিখিতরূপ স্বরলিপি প্রকাশ হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চাকারীদের সুরসংগ্রহের কোনো সমস্যাই নেই। কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংগ্রহ করতে চর্চাকারীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো আজ তা ঠিকমত বোঝানো সম্ভব নয়। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, গীতলিপি বহুদিন অপ্রাপ্য। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত স্বরলিপির বই গীতলেখা, বসন্ত, বৈতালিক, মায়ার

খেলা, কাব্যগীতি, - গীতিবীথিকা, গীতপঞ্চাশিকা, কেতকী, বাল্মীকিপ্রতিভা, নবগীতিকা, গীতমালিকা, পাঁচখণ্ড স্বরবিতান প্রভৃতি পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিঃশেষিত। কিছু স্বরলিপি ছড়িয়ে ছিল পুরাতন সাময়িক পত্রিকা যথা—বালক, বীণাবাদিনী, সঙ্গীত প্রকাশিকা, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রবাসী প্রভৃতির মধ্যে। প্রয়োজনের তাগিদে তৎকালীন চর্চাকারীরা বহু পরিশ্রম স্বীকার করে প্রয়োজনীয় স্বরলিপিগুলি সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

১৯৫৭ সাল থেকে বিশ্বভারতী বর্তমান পর্যায়ের স্বরবিতান গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রণ শুরু করলেন। এই সময় থেকেই প্রকৃত আগ্রহী চর্চাকারীদের এক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে—যার প্রতিকার সুদূর পরাহত।

নূতন সংস্করণ স্বরবিতানে সাময়িক পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে পূর্বপ্রকাশিত পুরাতন স্বরলিপির অনেকগুলি ভিন্নরূপে প্রকাশ করায় যে মতান্তরের সৃষ্টি হলো—তার জনক আশ্চর্যভাবে তাঁরাই—যাঁরা নিজেদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারক-বাহক বলে দাবি করেন। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমীদের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ শুরু হলো। সভায় আলোচিত প্রতিবাদ বিশ্বভারতী না শোনার ভান করে রইলেন। সরাসরি বিশ্বভারতীতে চিঠি পাঠিয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব পাওয়া গেল না। এরপর শুরু হলো পত্র পত্রিকায় লেখা—কিন্তু বিশ্বভারতী রহস্যজনক কারণে এ সমস্যার সমাধান করতে নারাজ।

১৩৬২ ভাদ্র সংখ্যার 'সমকালীন' পত্রিকায় শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্বরদলন' প্রবন্ধে বললেন, "বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে স্বরলিপি প্রকাশিত তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাত যদি তাঁদের আত্মপ্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করত।··· রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এরা দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজি নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের

দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুন্‌তি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকে সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়াভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকেদের দ্বারা।"

এইরূপ সরাসরি অভিযোগে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয়ে পড়লেন কিন্তু সন্তোষজনক জবাবের অভাবে তাঁরা নীরব হয়ে রইলেন। পক্ষান্তরে সমালোচনাকারীদের বিভ্রান্ত করার প্রয়োজনে বিশ্বভারতীর কেউ কেউ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপন্ন' রব তুললেন। কেউ অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে প্রকারান্তরে সুরদলন সমর্থন করলেন। "দরদ দিয়ে ঢংটি বজায় রেখে গাইলে সারেগামা একটু ইতরবিশেষ হলেও হয়তো কিছু আসে যায় না" (রবীন্দ্রসঙ্গীত—গীতবিতান ১৩৬৮ বৈশাখ)। যুক্তিটি ঠিক বোধগম্য নয়। সুর হচ্ছে গানের মূল কাঠামো—মানবদেহে হাড়ের মতো। বক্তব্যটি উপমায় এইরকম দাঁড়ায় যে, 'হাড়ের গড়ন বিকৃত হলেও ক্ষতি নেই ত্বকের লাবণ্য বজায় থাকলেই হলো'।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি কলকাতার চর্চাকারীদের হাতে পড়ে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। তাকে আবার ঠিক রাস্তায় আনতে গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের খবরদারী দরকার। এজন্য আবার কেউ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন'-এর প্রস্তাব করলেন। বলা বাহুল্য এঁরা কেউই সৌম্যেন্দ্রনাথ বর্ণিত সুরদলনের ব্যাপারে অভিযোগমুক্ত নন।

দেশ পত্রিকায় শিক্ষক সম্মেলন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। ৫ই চৈত্র ১৩৬৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরদলনের বিস্তারিত উদাহরণ সহযোগে সঙ্গীতভবনের কর্তাদের বিভ্রান্তিকর মনোভাব এবং যথেচ্ছাচারের সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে, সুর সম্বন্ধে মতান্তরগুলি নিরসন করার দায়িত্ব বিশ্বভারতীর। সে বিষয়ে কোনো যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা অবধি শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব একান্তই অবাস্তব। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমগ্র আলোচনাটি সংগ্রহ করে দেখে নেবেন। এই সময়ে শ্রীহীরেন চক্রবর্তী কতকগুলি অবান্তর যুক্তি দিয়ে শিক্ষক সম্মেলন তথা একটি দলগত মনোভাবকে সমর্থন করে সুরদলনের ব্যাপারটিকে 'স্বরলিপি বিভ্রাটের ফিরিস্তি' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চাকারী সেই অসার যুক্তির পিছনের মনোভাবকে চিনতে

ভুল করেন নি। বলা বাহুল্য, শিক্ষক সম্মেলনের ধুয়ো তখনকার মত ঝিমিয়ে গেল।

যাঁরা নিজেদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের একমাত্র ধারক বলে মনে করেন, তাঁরা দেখলেন, যে, তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা সন্তোষজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাঁদের গোষ্ঠীভূত না হয়েও কেউ কেউ স্বদেশে তো বটেই বিদেশেও সম্মান অর্জন করছেন—এটা তাঁদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। তখন তাঁরা অন্যভাবে শান্তিনিকেতন-গোষ্ঠী বহির্ভূত শিল্পীদের তুচ্ছ প্রমাণে মন দিলেন।

২৩শে বৈশাখ ১৩৬৯ তারিখের যুগান্তর পত্রিকায় 'জনকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রবন্ধে উক্ত মনোভাবের প্রতিফলন দেখি। লেখক বলেছেন, "শান্তিনিকেতনে আজও তাঁর গানগুলির বিশুদ্ধ গীতরীতি বজায় রাখা হয়েছে। এখনও সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা কবির গানগুলি···শুদ্ধভাবে শেখে ও শুদ্ধভাবে গায়।" সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাইরে কি কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুদ্ধভাবে শেখা ও গাওয়া হচ্ছে না? যে প্রবন্ধে শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্য নিষ্ঠা সাধনা ইত্যাদির কথা বলা হলো সেখানে একই সঙ্গে— "অপরিণত শিশুকণ্ঠেও শ্রুত রবীন্দ্রনাথের গানের ছেঁড়া কলি হঠাৎ শুনলে মন রুদ্ধশ্বাসে উন্মুখ হয়ে থাকে। আকস্মিক গানের যাদু হরণ করে নিয়ে যায় মন থেকে সকল পার্থিব ভাবনা।"—বলার সার্থকতা বোঝা গেল না। প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকণ্ঠে যে কোনো সুরের কাকলীই মনকে আবিষ্ট করে—তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিশেষ পরিবেশ বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুপস্থিতি কোনো বাধার কারণ হয় না।

একই লেখক গীতবিতান পত্রিকা বৈশাখ ১৩৬৮ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঐতিহ্য' প্রবন্ধে বললেন, "শান্তিনিকেতনের গায়কী ও ঐতিহ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত রূপদান করে······রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান হচ্ছে সেই মান—যা শান্তি-নিকেতনের গায়কী ও ঐতিহ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।" আর একজায়গায় বললেন, "যে শিল্পী শান্তিনিকেতনে দীক্ষিত হন নি···সেই শিল্পীর প্রকৃত মান রক্ষা করা কষ্টকর।" তিনি আরো বললেন, "গুরুদেবের গান গুরুদেবের নিজস্ব ভঙ্গীতেই গাইতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের গান কি রকম ছিল তা আজ শুনে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। শেষ বয়সের কয়েকটি গান ও আবৃত্তি রেকর্ডে স্বরবদ্ধ করা

আছে। শান্তিনিকেতনের কোনো শিল্পীকেই ঠিক সে ধরনে গাইতে শোনা যায় না। গাওয়া নানা কারণে সম্ভবও নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কথায়, "গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে—অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে—যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে—গায়ক তো গ্রামোফোন নয়।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, "গুরুদেবের নিজকণ্ঠের গাওয়া রেকর্ডের গানগুলি আদর্শরূপে খাড়া করে এ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচার করতে গেলে দেখতে পাব যে গুরুদেবের পথে তাঁরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। কারণ গলার স্বরের হুবহু সমতা কখনো ঘটে না। ভাব প্রকাশের বেলায় গুরুদেবের গীতপদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করাও সম্ভব নয়।" (রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাতিবচার—রম্যবীণা ১ম সংখ্যা)

গীতকার রবীন্দ্রনাথকে গায়করূপে আদর্শ করে তাঁর গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করা আরো নানা কারণে উচিত নয়। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'The great masters I have heard' প্রবন্ধে বলেছেন, "He sang the famous song, 'Tumi Kamon kore gan koro re guni', which he composed on the spur of the moment. His voice was exquisite, its lack of depth most adequately compensated by its sweetness and range. He only faltered once, the major third of the higher octave. There were many defects in his voice, his sense of rhythm was not perfect, and he had not had much training. yet......" (১৩৫৫ সালে রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে)।

কলকাতায় বহু নিষ্ঠাবান শিল্পী আছেন যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চর্চা ও শিক্ষাদান করে থাকেন। যেহেতু তাঁরা শান্তিনিকেতনের নন অতএব তাঁরা অপাংক্তেয় এমন মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়।

সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত বলেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয় গায়কী পদ্ধতির দোষে। এ বিষয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী সেই শান্তিনিকেতনের গায়ক-গায়িকাদের সম্বন্ধে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। ···রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যদিও প্রশংসাযোগ্য, তথাপি এই প্রচেষ্টার আতিশয্যের ফলে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের

প্রাণবস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন, শুধু প্রাণহীন বাইরের কাঠামোটির উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের গায়কী অত্যন্ত নীরস মনে হয়।··· আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহোৎসবে যোগ দিতে অগণিত সাধারণ ভিড় করে এসেছে। তাদের বিমুখ না করে সাদরে দ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয় কি?" (রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈচিত্র্য—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০)

হিমাংশুবাবুর বক্তব্যের জের টেনে বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার সম্বন্ধে আমাদের একটি বিষয়ে মনস্থির করা আশু প্রয়োজন। বিষয়টি এই যে গুরুদেবের সঙ্গীত প্রচার ব্যাপারে আমরা Quality চাই না Quantity চাই। বৈশিষ্ট্য, গায়নরীতি ইত্যাদি ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি থাকলে হয়তো Quality রক্ষা হয় কিন্তু তাতে ব্যাপ্তিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বলা বাহুল্য বহুল প্রচার ও ব্যাপ্তি আমাদের কাম্য হলে সেক্ষেত্রে সর্বস্তরে নিখুঁত রূপের অভিব্যক্তি আশা করা উচিত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের শুদ্ধরূপের জন্য হয়তো ব্যাকুল ছিলেন। আবার তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তি, "শহরে গ্রামে যখন যেখানে যাও আমার একটি গান কারো গলায় দিয়ে এসো," "বাঙ্গালীর শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবে"—থেকে জানতে পারা যায় তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গানের বহুল প্রচার হোক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচিত গানের সুর ও তানের (কিছুটা বিষয়বস্তুর) গুরুত্বের জন্য সহজ প্রসার সম্ভব নয়—এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে সহজ সুরে তালে গান রচনা করতে লাগলেন যাতে সহজেই লোকে সে গান শিখতে পারে। ফলে স্পষ্টতই রবীন্দ্র-সঙ্গীত দুটি স্থূল ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। একটি ভাঙাগান (বিশেষত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভাঙা), অন্যটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মিশ্রসুর-ভঙ্গিমা ও সহজ কাব্য-সঙ্গীত। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচকদের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর ওপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন·· এই জন্যই পুরাতনীরা রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচিত গানের অত ভক্ত" (কথা ও সুর)। "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে তিন চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে কিংবা স্তরে তিনি ভালো ভালো খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন।"

Arnold Bake বলেন, "Tagore stands at the meeting place

of three different influences: that of European music, that of classical Hindu music (an extremely sophisticated one bound by strict rules) and thirdly that of the popular religious music of Bengal...Later, however, Tagore's powerful personality asserted itself, and he threw off both the western influences of his childhood and youth, and that of Indian classical music."

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রথম প্রথম শুদ্ধ বা প্রাচীন রাগ-রাগিনীর মোহে তিনিও পড়েছিলেন এবং ফল ভালোই হয়েছিল। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর অনেক গানের স্বরে আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সঙ্গীতের পূর্ণ অনুকরণ দেখতে পাই।" (ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০)

নারায়ণ চৌধুরী বলেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অগণন ব্রহ্মসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠরূপ ধ্রুপদের আদর্শ সজ্ঞানত গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কাঠামোর মধ্যে সহজিয়া আদর্শটিকে গ্রথিত এবং সঙ্গীতকে আত্যন্তিক মাত্রায় লোকপ্রিয় করতে গিয়ে ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ও কৌলিন্যের আদর্শ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিলেন।" (প্রসঙ্গকথা ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত—শনিবারের চিঠি, ১৩৬১ চৈত্র)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত, "প্রথমদিকের গান লিখেছেন আপন তাগিদে শেষের দিকে তাগিদ এসেছে বাইরে থেকে। শান্তিনিকেতনের জীবনের তথা বাঙালি জীবনের বহু দাবি গানের মাধ্যমে তাঁকে মেটাতে হয়েছে।" (রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামাজিক মূল্য—গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৬৮ বৈশাখ)।

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী ভাঙাগানগুলিকে 'অর্ধরবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন। তিনি বলেন, "মায়ার খেলাতেই রবিকা সত্যি রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠলেন।" বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত সবচেয়ে অরাবীন্দ্রিক যেমন সবটাই রাবীন্দ্রিক তাঁর ঋতুসঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগের গানগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিনীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাকবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও এ সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে; সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।" অন্যত্র তিনি বলছেন, "প্রথম

বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।"

ইদানীং অনেকের অন্ধভক্তি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের আদিতম গান থেকে শেষতম গান অবধি বিভিন্ন ধরনের নানান পর্যায়ের গানগুলির অনেকে কোনো প্রভেদ দেখতে পাচ্ছেন না। সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। তাঁদের মতে, "গাঠনিক বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বাউল, কীর্তন ইত্যাদির মধ্যে কোনো ভেদ নেই···পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তনের আস্বাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুর্লভ।" এই ভ্রান্তির জবাব পাওয়া যাবে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে।

অনেকে বলেন যে সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাকি এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য যে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেই সেটিকে নির্ভুলভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চিনতে পারা যাবে। শ্রীপ্রফুল্ল দাসের মতে, "রবীন্দ্ররচনায়, এমনকি তথাকথিত ভাঙাগানেও সর্বদা এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং থাকবার কথা যা তাকে প্রাচীন ও প্রচলিত সব গান থেকে বিশিষ্ট করেছে ; যা সঙ্গীত সম্পর্কে বিচার-বুদ্ধিহীন অথচ Sensitive বালকেও বুঝতে পারে।" (রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ, পৃ ১৩০) এমন সঙ্কুচিত ও একদেশদর্শী মন্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ নয়।

যাঁরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা বা চর্চা না করেছেন, তাঁদের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ রচিত গানগুলিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় বলে চিনতে পারা খুবই কষ্টকর। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' ও 'আমি কোথায় পাব তারে' এ-দুটি গানের মধ্যে কোনটি রবীন্দ্রনাথের সেটা বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কারো নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার, রবীন্দ্রনাথের রচিত 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা,' 'ওহে জীবন বল্লভ', 'এরা পরকে আপন করে', 'আমায় ছ জনায় মিলে', হে দে গো নন্দরাণী', 'আজ আসবে শ্যাম' প্রভৃতি অজস্র গানকে তার গান নয় এমন ভুল করা খুবই স্বাভাবিক।

ঠিক এই কারণেই বহুদিন অন্যজনের কিছু রচনাকে খোদ বিশ্বভারতীর তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের বলে প্রচার করা হয়েছে, যেমন, 'বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে'। এমনকি ১৩৫৭ আশ্বিনে প্রকাশিত গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে 'প্রভু দয়াময়' গানটি রবীন্দ্রনাথের গান হিসেবে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য

শুদ্ধিপত্রে এটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বলে স্বীকার করা হয়েছে। স্বরবিতান অষ্টমখণ্ডে 'অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' পুস্তকে 'ডাকি তোমারে কাতরে' গানদুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে প্রচারিত হলে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকার জন্য এখনও গীতবিতানে সে দুটিকে স্থান দেওয়া হয়নি।

আবার রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা বহুদিন তাঁর রচনা বলে গৃহীত হয় নি, যেমন, 'এ হরি সুন্দর' 'গগনের থালে রবিচন্দ্র' ইত্যাদি (গীতবিতান—গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)।

অন্যের কথা থাক, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গান চিনতে পারতেন না। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "কবে কোন গান করেছি, কি সুর বসিয়েছি তাতে, তা কি আমার নিজেরই স্মরণ আছে? দিনু ছিল আমার সুরের ভাণ্ডারী—তার কাছ থেকে যে যতটা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়েছে। সবই যে অবিকৃত নেই, এত বুঝতেই পারো। হঠাৎ চলতি পথে কানে লাগে এক একটা রেশ; কান পেতে শুনি—নিজেরাই অচেনা লাগে যেন। পরিমাণের আধিক্যই এর কারণ হয়ত। কত মুকুল ঝরে যায়, কতগুলো ফলের মধ্যে মুক্তি পায়, আমগাছ কি খবর রাখে তার কোন কালে?"

Arnold Bake এই বিস্মৃতির একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন, "Tagore knows his memory to be poor and sometimes he even wishes to forget previous works so as to be free to create fresh ones; therefore when he had composed a new song he used to sing it to his nephew Dinendranath, thanks to whose excellent memory the song was saved from oblivion. Sometimes, the Poet had to learn his own songs afresh from Dinendranath. As he said with a smile to the writer 'I have to submit to this injury'."

যাই হোক, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নেই। ভাব, সুর, তাল সবদিক থেকেই সহজ হওয়ায় এগুলি শেখাও সহজ—পরিবেশন করতেও সচেতন সঙ্গীত-শিক্ষিত শিল্পীর ঐকান্তিক নিষ্ঠাই যথেষ্ট। বিশেষ কোনো ভঙ্গী দ্বারা আচ্ছন্ন না হলে যে রবীন্দ্রনাথকে সবিশেষ ভক্তি করা হবে না এমন মনোভাব অন্ধভক্তির পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ

একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভয় হয় পাছে ওর (হাসি বা উমা দেবী) নিজের গলার স্বাভাবিক দরদ কোনও শিক্ষিত ভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।"

বর্তমানে কোনো কোনো মহলে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীভাঙা গানগুলির পরিবেশন-পদ্ধতি সম্বন্ধে মতান্তর তুমুল হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো প্রখ্যাত গায়ক গায়িকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামোয় হস্তক্ষেপ না করে বিশেষ পরিমিতভাবে ধ্রুপদাঙ্গ গানে আলাপ ও দুন, খেয়ালভাঙা গানে তান ও টপ্পা বা ঠুংরী ধরনের গানগুলি তাল সহযোগে পরিবেশন করছেন। কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্ত এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন—এতে নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে। বিষয়টি নানাদিক থেকে বিচার্য।

সেক্‌স্‌পীয়র ইংলণ্ডের জাতীয় কবি। ইংলণ্ডের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি সেক্‌স্‌পীয়র-চর্চা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। নাটকগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে তার মর্মোদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেন। এমন বহু বই পাওয়া যায় যাতে সেক্‌স্‌পীয়রের কোনো নাটকের বিশেষ কোনো মুহূর্তটিকে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা বিভিন্ন সাজে ও ভঙ্গীতে অভিনয়ের ছবিগুলি একই সঙ্গে গ্রন্থিত হয়েছে—তুলনামূলক বিচারের জন্য। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেক্‌স্‌পীয়রকে অসম্মান করা হয় এমন কথা কেউ বলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের গুরুমহাশয় চরিত্রটিকে 'হরবোলা' গোষ্ঠী ঈষৎ জড়বুদ্ধি নিষ্প্রভচক্ষু স্থবিররূপে রূপায়িত করেছিলেন। আবার শ্রীতরুণ রায়ের গোষ্ঠী সেটিকে চতুর চঞ্চল ও চাটুকার রূপে উপস্থাপিত করেন। যতদূর মনে পড়ে শ্রীরায় নিজে এই চরিত্রটির রূপদান করেন। উভয় রূপায়নই রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামোকে অবিকৃত রেখে ঈষৎ ভিন্ন পদ্ধতিতে ও মেজাজে পরিবেশন করেন তাহলে তাঁকে কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করা উচিত মনে হয় না এবং সে কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এ যুক্তিও অচল। যদি এই পরিবেশন-পদ্ধতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেই ধরা যায় তাহলে পদ্ধতিটি রসোত্তীর্ণ না হলে—সমজদার শিক্ষিত শ্রোতা সেটিকে গ্রহণ না করলে সেটি আপনা হতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য অকারণ উদ্বিগ্ন হয়ে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপন্ন' রব তোলা নিরর্থক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একাধিক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরসন্ধি বা harmonise করে প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী বলেন,

"আর একটি বিলেতী স্বরবৈশিষ্ট্য, যাকে বলে হার্মনি বা স্বরসন্ধি, সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর বংশের কেউ কেউ এদিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু বিশেষজ্ঞানের অভাবে সে চেষ্টা ছেলেখেলাতেই পর্যবসিত হয়েছে। তিনি তাদের এ খেলায় যোগ না দিলেও তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। যদি কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, কবি বর্তমান থাকলে সর্বাগ্রেই তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য দিতেন, এটুকু বলতে পারি।" (ত্রিবেণী সঙ্গম—পৃ ১০) এই প্রচেষ্টার কয়েকটি সাক্ষর আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হলো—

গান	স্বরসন্ধি ও স্বরলিপিকার	পত্রিকার সংখ্যা
আমি চিনি গো	ইন্দিরা দেবী	ভাদ্র ১৩২১
বড় আশা করে	অশোকা দেবী	মাঘ ১৩২১
আজি শুভদিনে	প্রতিভা দেবী	চৈত্র ১৩২১

পরবর্তীকালে শ্রীমধু বসুর এ বিষয়ে পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি কবির 'দালিয়া' গল্পটির নাট্যরূপ ১৯৩৩ সালে কবির উপস্থিতিতে নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করার সময় 'গ্রামছাড়া ঐ', 'আমি চঞ্চল হে', 'আবার এসেছে আষাঢ়' গানগুলি হার্মনি সহকারে পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় শেষে শ্রীবসুকে বলেন, "গানগুলো তো বেশ শ্রুতিমধুর হয়েছে, মধু।" এতে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশন পদ্ধতিতে অখুশি হওয়া তো দূরের কথা—প্রসন্নই হয়েছিলেন।

হার্মনিকে দেশী ছাঁচে ঢেলে বাংলাগানে প্রয়োগকে তিনি 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে স্বাগত করেছেন। যিনি নিজের গানে একটি বিলাতি প্রয়োগ-রীতিকে সমর্থন করলেন তিনি তাঁর গানে দেশী আঙ্গিকের পরিমিত প্রয়োগকে বিরূপ চক্ষে দেখবেন এ কথা বলার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি সঙ্গীতের মুক্তির জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবেশন-রীতিটি সমর্থন করা চলে। বহু শিক্ষিত সঙ্গীতপ্রেমী আছেন যাঁরা উচ্চাঙ্গ-সুরভঙ্গিম-বাংলাগান শুনতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি বর্তমানে অধিকতর প্রচারিত হয়। সহজ সুর-তালের নিরাবরণ সঙ্গীতগুলি তাঁদের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে না। তাঁদের অধিকাংশের ধারণা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানই বুঝি এইরকম। ফলে, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের

গান সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩৬১ চৈত্র সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'প্রসঙ্গকথা॥ রবীন্দ্র-সঙ্গীত' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (যদিও প্রবন্ধটির সমস্ত মতামতগুলি বিতর্কাতীত নয়)। এই মহলে আলোচ্য রীতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের পরিধি বিস্তৃত করা যায় তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে ?

বিভিন্ন সমালোচক রবীন্দ্রসঙ্গীতে আলাপ তান বাঁট সংযোগের বিপক্ষে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য জোরালো করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু খণ্ড বক্তব্যও তাঁরা উদ্ধৃত করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের উক্তি করেছেন। পরিণত বয়সে তিনি পূর্বের বহু মত পরিবর্তনও করেছেন।

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত ৬।২।১৯৩৮ তারিখের একটি চিঠিতে কবিগুরু বলছেন, "মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্য নূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্প প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহ-মাত্র নেই যে কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গীতের, সাহিত্যের কিম্বা কোনো ললিতকলার চরম গতি নয়।··· খাঁচার পাখীর মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবী করি, তা' হলে এই নকলনবিশী বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে।···মত বদলিয়েছি। কতবার বদ্‌লিয়েছি তার ঠিক নেই···শেষদিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি।"

রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো পূর্বতন বক্তব্যকে (যথা, সুর ও সঙ্গতি গ্রন্থান্তর্গত ১৯৩৫ সালে লেখা চিঠি) যেমন তাঁর গানে তানালাপ সংযোগের বিরুদ্ধ প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়, তেমনি ১৯৩৮ সালে লেখা উপরোক্ত চিঠি এবং নিম্নবর্ণিত কিছু কিছু খণ্ড বক্তব্য তানালাপের পক্ষেও হাজির করানো যেতে পারে।

"যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা

হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সংগম। যে গান গাওয়া হচ্ছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, সে যে তখনি-তখনি জীবন উৎস হতে তাজা উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল।"

"আলাপের উপাদানরূপে আছে বিশেষ রাগ-রাগিনী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এস্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য।"

"গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে।...গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।...যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

"বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে।"

উপরোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে একটি সত্য স্পষ্ট যে, প্রকৃষ্ট রূপ সৃষ্টির জন্য দরকার উপযুক্ত শিল্পীর। সেই সব শিল্পীই যথার্থ রসিক শিল্পী যাঁরা যথাসময়ে থামতে জানেন। কবি বলেন, "প্রত্যেক রসসৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে—ধ্রুপদে আছে, বাংলা গানে আছে, যদুভট্টের, গোঁসাই-এর গলায় ছিল।" "আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি।" এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ থাকবার কথা নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান বাঁটের প্রসঙ্গে অনাদিবাবু বলেন, "আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর প্রয়োজন দেখি না। তেমন শিক্ষা বা যোগ্যতাই বা কজনের আছে।" (গীতবিতান পত্রিকা—বৈশাখ ১৩৬৮) এখানেও সেই যোগ্যতার কথা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিমিত পরিমাণে তানালাপ ও দুন-

এর পক্ষে ছিলেন। ১৯৪৮ সালে জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনে অবস্থানের সময় এক ঘরোয়া আলোচনায় উক্ত মত প্রকাশ কালে বর্তমান লেখক, প্রসাদ সেন (বৈতানিক) প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তান বাঁটের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু ইন্দিরা দেবীর এই মত সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

তান বাঁট প্রয়োগের বিপক্ষে অনেকের লেখা নজরে পড়ে; কিন্তু কেউই বিশেষ কোনো শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেন নি। এই নরম সুর কোনো কোনো উগ্রপন্থীর পছন্দ হলো না। তাঁরা ভাবলেন রবীন্দ্রভক্তি প্রদর্শন ও সুরদলন সম্বন্ধে বিভ্রম সৃষ্টির পক্ষে এই পন্থা পর্যাপ্ত নয়। তখন তাঁরা অসৌজন্যের অশালীন তরবারী নিয়ে আসরে নেমে পড়লেন শিল্পী বিশেষের উদ্দেশ্যে।

এঁদেরই একজন শ্রীহীরেন চক্রবর্তী (এঁকে আমরা আগেও দেখেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে এঁর ব্যক্তিগত চর্চা বা অবদান সম্বন্ধে আমরা এখনও অন্ধকারে।) ১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পরিচয় পত্রিকায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং বাঁট' প্রবন্ধে অত্যন্ত অশিষ্টভাবে শ্রদ্ধেয় শিল্পীদ্বয় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে আক্রমণ করেছেন। এঁরা দুজনেই সঙ্গীতজগতে বিশিষ্ট শিল্পী। শুধু বাংলা দেশে নয়—সমগ্র ভারতে এবং বহির্বিশ্বেও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারে এঁদের বিশেষ অবদান আছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রাগপ্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে পরিবেশন করে গতানুগতিক এক-ঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় চালু একটি রীতির পুনঃ প্রচলন করলেন।

বহু ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীত যৎ, আড়াঠেকা প্রভৃতি দুরূহ আয়াসসাধ্য তালে নিবদ্ধ। দেখা যায় বহু গায়ক গায়িকা উক্ত তালের গানগুলি তালহীন গান বলে বেমালুম বিনাতালে গেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'কখন দিলে পরায়ে অশ্রুভরা বেদনা', 'কোথা যে উধাও', 'বাজাও রে মোহন বাঁশী' প্রভৃতি যে কটি বিনা তালের গান আছে তার বহুগুণ গানকে বিনা তালের বলে চালিয়ে দেওয়া হয় স্রেফ শিল্পীর নিজের অক্ষমতা ঢাকবার প্রয়োজনে। একটি উদাহরণ দিই। 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানটি ৪।২ ছন্দ প্রয়োগের একমাত্র উদাহরণ। এটি প্রায়শ বিনা তালে গাওয়া হয়ে থাকে। এটি বিনা তালের হলে শান্তিদেববাবু প্রমুখ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞগণ এটিকে ৪।২ তালের বলে উল্লেখ করতেন না। শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের কাছে প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিকরা কৃতজ্ঞ যে তিনি দুরূহ তালের গানগুলিকে স্বকীয় রসে পরিবেশন করছেন।

শ্রীহীরেন চক্রবর্তী গুরুমহাশয় ভঙ্গীতে এই দুই বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদকে উপদেশ দিতে গিয়ে শুধু যে সঙ্গীত সম্বন্ধে 'অল্পবিত্যার' পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়— তাঁর নিজের দলীয় মনোভাবটি অপ্রকট রাখতে পারেন নি। অন্যথায় তিনি দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী বলে 'একজন' মাত্রের নাম বলতেন না—অন্তত অনাদি দস্তিদার ও শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করে সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতেন। তা ছাড়া, 'আনন্দধারা' গানটি শুদ্ধ মালকোষে গাওয়ার জন্য কেবলমাত্র রমেশবাবুকে অভিযুক্ত না করে একই সঙ্গে একই (তথাকথিত) অপরাধে অপরাধী শান্তিনিকেতনের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর নামও উল্লেখ করতেন। বর্তমান পর্যায়ের স্বরবিতানের স্বরলিপি যদি একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে তিনি শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের কণ্ঠে 'বাজাও আমারে বাজাও' গান শুদ্ধ মালকোষে বা 'মারের সাগর পাড়ি দেব' গানটি দাদরা তালে বা 'বাজে করুণ সুরে' গানটির 'দুরে' কথাটির সুর সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন করলেন না—"এই সুরটা এল কোথা থেকে ?"

এই সূত্রে বলা যায় 'রবীন্দ্রনাথ' জীবনীচিত্রে শ্রীসত্যজিৎ রায় 'কালি কালি বলো রে আজ' গানটির বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত স্বরলিপি অনুযায়ী সুর গ্রহণ না করে পুরনো সুরেই গাইয়েছেন।

তান বাঁট প্রয়োগের অসমর্থন করতে গিয়ে শ্রীচক্রবর্তী বহু অসংলগ্ন ও অবান্তর যুক্তি ও বক্তব্যের অকারণ অবতারণা করেছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি খণ্ডনের প্রয়োজন দেখি না, স্থানাভাবও বটে। এগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করা যেত যদি না এগুলি ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে প্রযুক্ত হত। সঙ্গীত সমালোচক হীরেন চক্রবর্তী মহাশয়ের সাঙ্গীতিক জ্ঞানের গভীরতা দেখাবার জন্য দুয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধ্রুপদ সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, "আলাপই হলো ধ্রুপদের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ···আলাপের পরে ধ্রুপদের আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না, চারতুকের কাব্যাংশটি হলো একপ্রকারের কনসোলেশন প্রাইজ যার অভিপ্রেত প্রাপক হলেন স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী" (পৃ ১২১০)। ধ্রুপদের কোনো ঘরানায় আলাপ আছে কোনো ঘরানায় নেই। বিষ্ণুপুরের ঘরানায় আলাপ প্রচলিত আছে। আলাবন্দে খাঁ, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় এঁরা আলাপিয়া ঘর। আবার মেহেদী হোসেন, গোপালবাবু, অঘোরবাবু, বিশ্বনাথ রাও, কাশীনাথ শুক্ল, আলিবক্স খাঁ, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য—এঁদের ধ্রুপদ আলাপ

বর্জিত। শ্রীচক্রবর্তী কি এঁদের ধ্রুপদী বলে স্বীকার করেন না? এঁরা কি সারাজীবন কেবলমাত্র অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জন করেই ভারতজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন?

শ্রীচক্রবর্তী একজায়গায় বলছেন (পৃ ১২১৪), "সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরে রবীন্দ্রনাথ আর দুই তুকের গান রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না"—এটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে স্তুতি না ব্যাজস্তুতি বোঝা গেল না। এই আজব ফরমুলা অনুযায়ী বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সাঙ্গীতিক সাবালকত্ব অর্জন করেন নি। কারণ ১৯৪১ সালে রচিত গান 'ঐ মহামানব আসে' প্রকৃত পক্ষে দুই তুকের গান। আর, চারতুকি নয় এরকম গান তিনি শেষ দশ বৎসরেও প্রচুর রচনা করেছেন।

বাংলা গীতি কবিতায় চারতুকি রচনাপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের আগেও আমরা প্রচুর দেখেছি। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার প্রবাহে রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতির উত্তরসূরী বলা চলে—বাংলা গানে তিনি এর প্রবর্তক নন। কয়েকজন রচয়িতার নাম রচনাসহ উদ্ধৃত করা হল—

রামমোহন রায়	—	মনে কর শেষের সে দিন
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	—	এতদিনে পোহাইল
যদুভট্ট	—	বিপদভয় বারণ
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	জাগো সকল অমৃতের
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	থেকো না থেকো না দূরে
জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	—	তুমি হে ভরসা মম
হেমেন্দ্রনাথ	—	নাথ তুমি ব্রহ্ম
গজেন্দ্রনাথ	—	গাও হে তাঁহারি নাম
সৌদামিনী দেবী	—	প্রভু পূজিব তোমারে

শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, "ঠুংরীর ক্ষেত্রে 'ভাও বাৎলানো'—নির্দিষ্ট রীতির অপরিহার্য অঙ্গ।" বক্তব্যটি যথার্থ নয়। কেন না 'ভাও বাৎলানো' ব্যাপারটি audio-visual, কেবলমাত্র শ্রবণের ব্যাপার নয়। পূর্বে বাইজীরা গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করে একই পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। কোনো কোনো ঘরানার নৃত্যশিল্পী এই 'ভাও বাৎলানো' প্রদর্শন করে থাকেন। বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী শম্ভু মহারাজের ভাও বাৎলানো বর্তমান লেখকের 'ঝংকারের' কোনো বৈঠকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র কণ্ঠে

তাও বাংলানো মোটেই সম্ভব নয়। এটির ঠুংরী চালের অপরিহার্য অঙ্গ কী করে বলা যায় তা বোধগম্য নয়।

হীরেনবাবু "বাংলাগানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্র সঙ্গীতের পক্ষপাতী, শুদ্ধ সঙ্গীতের নয়" (পৃ ১২১২)—এ কথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। মিশ্র সঙ্গীত বা শুদ্ধ সঙ্গীত বলতে তিনি কী মনে করেন? শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলতে কি তিনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর কথা বলেছেন? আজ আমরা অসংখ্য রাগ-রাগিণী সমন্বিত রাগসঙ্গীতের যে রূপ দেখছি তা বহু মিশ্রণ, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। সঙ্গীতের কাব্যরূপে বহুক্ষেত্রে রাগের ধ্যানরূপ বজায় থাকে নি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ভৈঁরোর ধ্যান রূপ—

গঙ্গাধর শশিকলা তিলস্থি নেত্রঃ
সর্পৈ বিভূষিত তনু গজকৃত্তিবাসা
ভাস্ব ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ড ধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি আদি রাগঃ

এই রাগেই রচিত গান, 'প্যালা মুঝে ভর দেরে' সম্পূর্ণ ভিন্নরস বহন করে। এই মিশ্রণ কার্যে বা রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ যুগ যুগান্তের পতাকাটি নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটিতে ইমনকল্যাণে (ইমন নয়—শ্রীচক্রবর্তী সম্ভবত শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগ লক্ষ্য করেন নি) কোমল-ঋষভ প্রয়োগ তারই উত্তরসাধনা। তিনি বহুক্ষেত্রে বেহাগ সুরে কোমল নিষাদ প্রয়োগ করেছেন—সেটি যে বেহাগড়া রাগের প্রভাব নয় এটি স্থির প্রত্যয়ে বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুদ্ধরাগের ব্যবহার যেমন দেখা যায়—মিশ্রণের প্রচুর উদাহরণও আছে। দুটির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করাই শ্রেয়। তাঁর মিশ্রণের উদাহরণ দেখিয়ে শুদ্ধ রাগপন্থীদের প্রতি তাল ঠোকা সুস্থ মনোভাবের পরিচয় নয়। আজকের তথাকথিত শুদ্ধরাগ (যেমন মিঁয়াকী তোড়ি, হোসেনী মল্লার প্রভৃতি) বিগত দিনের অশুদ্ধরাগ। আকবরের সময়ে ধ্রুপদকে শাস্ত্রীয় বলে গণ্য করা হত না—এর প্রমাণ আছে।

একমাত্রায় একাধিক স্বরবিন্যাস হলেই সর্বক্ষেত্রে সেটিকে তান বলা চলে না। 'হায় গৃহহারা'র যে সুরাংশটিকে শ্রীচক্রবর্তী 'বোলতান' বলে আখ্যা দিয়েছেন, সেটি বোলতান তো নয়ই—যথার্থ তানও নয়, এটি গানের বন্দেজ।

শ্রীচক্রবর্তী সুযোগ করে ইমন সুরে 'হে গণরাজ মহারাজ' গানটি শুনলে দেখতে পাবেন যে, 'হে' অক্ষরটির উপর ৭ মাত্রায় সরা গন্ধা পধা নর্সা নধা পন্ধা গরা এই স্বর বিন্যাসটি আছে। যে কোনো রাগসঙ্গীত বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে ওটিকে তান বলা হয় না—ওটি গানের বন্দেজ।

একটি ব্যাপার আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করেছে। যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের দরদী সেজে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদদের উপদেশামৃত বিতরণ করতে দ্বিধা করেন নি—তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মোটামুটি সংখ্যাও জানেন না। শ্রীচক্রবর্তী (১২২৯ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, তিনি নাকি "তিন হাজার গানের স্বরলিপি" দেখেছেন। যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন তাঁরা কিন্তু ৫৮ খণ্ড স্বরবিতানে (২।৩ লাইন গানের স্বরলিপি সমেত) অনধিক ১৮৭০টি এবং ইতস্তত পত্রিকাদিতে ছড়িয়ে থাকা স্বরলিপি ধরে মোটামুটি ১৯০০-র বেশি স্বরলিপির সন্ধান পান নি। শ্রীচক্রবর্তী বাকি ১১০০ স্বপ্নলব্ধ স্বরলিপির সন্ধান তাঁদের জানালে তাঁরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। গীতবিতানে এ পর্যন্ত অনধিক ২১৭০টি গান এ যাবত সঙ্কলিত হয়েছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গানগুলি ধরে মোট সংখ্যা মোটামুটি ২৩০০ ধরা যেতে পারে। বাকি ৭০০ গান সম্পর্কেও একই কথা। এমন কি, গানগুলিকে কে বা কারা স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা পরিষ্কার নয়। তিনি (১২১৯ পৃঃ) বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ…প্রত্যেকটি গানের সুর স্বরলিপির বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন।" বর্তমান সংস্করণ স্বরবিতানে বহু ৬ মাত্রা ৮ মাত্রার গান পূর্বে ১২ মাত্রা ১৬ মাত্রায় ভাগ করা ছিল। ১৩৪৩ সালে মুদ্রিত নবগীতিকা দ্বিতীয় খণ্ডে (তখন এগুলি স্বরবিতান ভুক্ত হয় নি) 'প্রখর তপন তাপে' গানটি তিনি ১২ মাত্রার ভাগে দেখতে পাবেন। এটিকে ত্রিমাত্রিক একতাল বলাই সঙ্গত। সম্ভবত এ তথ্য শ্রীচক্রবর্তীর জানা নেই। তিনি 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি শুনে অবাক হয়েছেন—এর গায়ন ভঙ্গিমা দেখে। বর্তমান ৪০শ খণ্ড স্বরবিতানে প্রকাশিত উক্ত গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির সঙ্গে ১৩২১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা আনন্দসঙ্গীত পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী কৃত স্বরলিপিটির সুরে তালে মিল নেই জানলে নিশ্চয় আরো অবাক হতেন।

সম্প্রতি মুদ্রিত স্বরবিতান সম্বল করেই তিনি বিতর্কে নেমেছেন এবং স্বরলিপি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাঁর জানা নেই এটি তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট। অন্যথায় তিনি বহু বিতর্কিত 'আনন্দধারা' গানটির সুর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতেন

না। তিনি বলেছেন, "গানটির রাগ পরিচয় মিশ্র মালকোশ। রমেশবাবু যে গান গেয়েছিলেন তার সুর মালকোশ।...এই সুরটা এল কোথা থেকে? এ কার রচনা?" যদি তাঁকে প্রতিপ্রশ্ন করা যায় যে, ১৩০৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যার বীণাবাদিনী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপিটির কী গতি হলো—তা হলে তিনি কি কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবেন? স্বরলিপি চিহ্নদৃষ্টে সেটিকে সহজেই বীণাবাদিনী সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে চেনা যায়। সেটিতে কোমল ঋষভ, কড়িমধ্যম ছাড়াও একাধিকবার পঞ্চমের ব্যবহার আছে বটে—কিন্তু এর রাগ পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'মালকোষ'। আবার ৩৩।৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের টিপ্পনীতে বলা হয়েছে যে, "যে সকল গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই মূল হিন্দুস্থানী গান হইতে ভাঙা...দ্বিতীয় গানটি (আনন্দধারা) মালকোষ রাগের। ইহা অতি গম্ভীর রাগ—যেমন খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদে অধিক প্রশস্ত...কোনো কোনো গানে কোমল রিখাবও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কখন কখন অলঙ্কারের হিসাবে একটু আধটু কড়িমধ্যমও লাগে।"

গানটি মিশ্র সুরের হলে তিনি এভাবে উল্লেখ করতেন না। কারণ, 'কী রাগিনী' গানটি প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন, "এই গানের সুরটি মিশ্র ধরণের। ইহাতে কানেড়া, সিন্ধু, পিলু প্রভৃতির অংশ আছে। এই সুরটি রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত।" (বীণাবাদিনী ১৩০৪ পৃঃ ৫৪)। শেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানে শুদ্ধ রাগের সুরপ্রয়োগকে তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত বলে মনে করতেন না। 'সম্পাদকের টিপ্পনী' থেকে মনে হয় যে সেই সময় কোনো কোনো ঘরাণায় শুদ্ধ মালকোষ রাগে মূর্ছনা হিসাবে কোমল রিখব ও কড়িমধ্যমের প্রয়োগ হত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপিটিতে নানা কারণে কিছুটা বৈষম্য দেখা দিলেও স্বরলিপিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এটিকে শুদ্ধ মালকোষই বলতে চেয়েছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকেই গানটি অনেকে শুদ্ধ মালকোষে গেয়ে আসছেন। সম্প্রতি লোকান্তরিত শান্তিনিকেতনের আদি ছাত্র সুধীরকুমার নাথ মহাশয়ের নিকট এই সুরের সমর্থন পেয়েছি।

শ্রীচক্রবর্তী কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বীণাবাদিনী পত্রিকাটি দেখে নিতে পারেন। বইটির সংখ্যা 182 QC 894.4-5। বিশ্বভারতী স্বরলিপি প্রকাশন বিভাগে বইটি আমি পূর্বে দেখেছি। কিন্তু শ্রীচক্রবর্তীকে সেখানে যেতে

বলি না এই কারণে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের যথেচ্চাচার (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অক্ষমতা)-এর প্রমাণ লোপ করার জন্য, বইটি নাকি বর্তমানে নেই, এই অজুহাতে কাউকে দেখতে দিচ্ছেন না। আরো একটি কারণ—স্বরলিপি প্রকাশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীপ্রফুল্ল দাসের 'আনন্দধারা' গানে মালকোষ রাগে কোমল ঋষভ ও কড়িমধ্যম প্রয়োগ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাটি মাঠে মারা যায়।

সুর সম্বন্ধে মতান্তরের কথা বাদ দিলে শ্রীচক্রবর্তীর লেখা থেকেই প্রকাশ যে, রমেশবাবু মূল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ক্ষুণ্ণ না করে তার যথাযথ রূপটি বহাল রেখে তান প্রয়োগ করেছেন। শ্রীচক্রবর্তী 'হলক তান' সম্বন্ধে যথার্থ ওয়াকিবহাল নন কারণ বাংলা গানে মোটেই হলকতান লাগে না। খেয়ালেও বর্তমানে হলকতানের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। বর্তমান লেখক কোনো দিনই রমেশ-বাবুকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'হলকতান' লাগাতে শোনেন নি।

শ্রীচক্রবর্তীর রমেশবাবুর পরিবেশন পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে ভালো না লাগতে পারে, সে সম্বন্ধে কারো কিছু বলবার নেই; কিন্তু সমালোচনার ভান করে তিনি যে ভাবে বিদ্বেষের বিষ উদ্‌গীরণ করেছেন সেটি অত্যন্ত আপত্তিজনক। রমেশবাবুকে নিন্দা করা—চাঁদে থুতু দেওয়ার সামিল। তাঁর প্রকৃত মূল্য দেশবাসী জানেন বলেই বারে বারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত তাঁকে সম্বর্ধনা করেছেন। সেদিন ১৮।৮।৬২ তারিখেও কংগ্রেসের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে তাঁকে সম্মানপ্রদর্শন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনে রমেশচন্দ্র কবির সামনে তাঁরই গান গেয়ে প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। কবি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, "Sreeman Banerjee is moreover fortunate in having a voice, which is at once sweet and expressive. I hope his talent will meet with proper recognition." বলা বাহুল্য কবির আশা বিফল হয় নি।

তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও শ্রীচক্রবর্তীর সমালোচনা তর্কের অপেক্ষা রাখে। শ্রীচক্রবর্তী রাধিকাবাবুর সুরের প্রভাব কয়েকজনের কণ্ঠে খুঁজে পাননি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ, স্বকীয় শিল্পকুশলতার অধিকারী হওয়া সহজ ছিল না। রাধিকাবাবুর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিকে সমগ্র রসিকজন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলেই উপভোগ করেছেন। কতযুগ পরে জনৈক হীরেন চক্রবর্তী মহাশয় সেগুলিকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে স্বীকার করতে যদি কুণ্ঠা বোধ করে

থাকেন—সেটি একান্তভাবে তাঁরই মত। গোঁসাইজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উচ্চধারণার সাক্ষ্য আছে 'সুর ও সঙ্গতি' পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায়।

প্রকাশিত স্বরলিপিতে গোঁসাইজি প্রযুক্ত তানের স্বরলিপি না থাকায় হীরনবাবু সেটিকে নঙর্থক সমর্থনের প্রমাণ মনে করে উল্লসিত হয়েছেন। তাঁর মতো সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্ভবত ভুলে গেছেন যে আলাপ বা তানের কোনো গ্রন্থিত স্বরলিপি স্থায়ী অন্তরা ইত্যাদির স্বরলিপির সঙ্গে কোনো সময়েই দেওয়া থাকে না। সেটি শিল্পীর দক্ষতা মেজাজ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বহু প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগেও রবীন্দ্রনাথের রাগপ্রধান ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বহুল ক্ষেত্রে বৈঠকী রীতিতে পরিবেশন করা হত। কালাতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়নরীতি ক্রমশ বদলে বদলে আজকের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে—এই সত্যটিকে শ্রীচক্রবর্তী এবং আরো অনেকের মেনে নিতে কেন বাধছে। রাধিকাবাবুর সমসাময়িক কোনো শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের (রেকর্ড) গায়নভঙ্গী আজ ১৯৬২ সালের পরিবেশন-রীতির সঙ্গে হুবহু মেলে কি ?

শ্রীচক্রবর্তী একটি অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন, "গান শোনানোর পর রবীন্দ্রনাথ যদি রাধিকাবাবু অথবা গোপেশ্বরবাবুদের তারিফ করে থাকেন তবে সেটি সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই গ্রহণীয়, অনুমোদনের লক্ষণ হিসেবে নয়। আর রাধিকাবাবুর গানের প্রশংসা করেছেন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গান হিসেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে নয়।"

আর যেই হোক অন্তত রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে বা চালাতে চাননি। যে রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্পর্কে গান্ধিজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি—যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতী বস্ত্র বয়কট করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নি—যাঁর ইংরাজ অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধিত্যাগ ইতিহাসের ঘটনা—যিনি লিখেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তবে ক্রোধ তারে যেন তৃণ সম দহে"—তাঁর সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তি কতটা শ্রদ্ধা বহন করে সেটা সুধীজনের বিচার্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে যদি ইন্দিরা দেবীর থেকে বেশি করে দেখতে যাই, তাহলে নিজেদের 'মার চেয়ে বেশী দরদ' যার তাকে যা বলা হয়—তাই প্রমাণ করা হবে। তান আলাপ দুন করা সম্পর্কে তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। "যাকে আমি 'অর্ধরবীন্দ্রসঙ্গীত' বলি সেই টপ্পাভাঙা

গানে বরাবর মূল হিন্দীগান অনুযায়ী তান দেওয়া হয়ে আসছে সকলেই জানে ও মানে। এমন কি যাঁর-গলায়-কুলোয় তিনি নতুন নতুন অজস্র তানে গান অলঙ্কৃত করেছেন, যথা, 'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে'তে রাধিকা গোঁসাইজী। ধ্রুপদে বাঁট চলবে না তবে দুন চৌদুনও এখনই আরম্ভ হয়েছে তাতে দোষ নেই। আমার মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান দেবার সময়ে দুটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে।

(১) ধর্মসঙ্গীতে অতিরিক্ত তানে যেন ভক্তিভাবকে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়।

(২) কবির কথাই গানের প্রাণ, সেগুলি যেন কোন রকমে বিকৃত না করা হয়।

মোটকথা খুব সাবধানে সন্তর্পণে এগোতে হবে, যাতে অপব্যবহার না হয়। সইয়ে সইয়ে নতুন অলঙ্কার দেবার চেষ্টার আমিও পক্ষপাতী।" (মূল পত্রের সন্ধান বর্তমান প্রবন্ধলেখকের কাছে পাওয়া যাবে)

তাছাড়া তাঁর গানে তান প্রয়োগের যৌক্তিকতার চরম উদাহরণ হিসেবে, রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি তুলে দেওয়া হল, "আমি তো কখন একথা বলিনি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলাগান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলঙ্কারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।"

আমি লেখার মধ্যে মোটাহরফ বা আণ্ডারলাইনের পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি এড়িয়ে যাবে না।

পরিমিত মাত্রায় তান আলাপ প্রভৃতি প্রয়োগের জন্য রমেশবাবুর পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'রমেশী সঙ্গীত' বলে ব্যঙ্গ করতে হীরেনবাবুর সৌজন্যে বাধে নি। কিন্তু তথাকথিত জাতীয় সংহতির নামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ভাষাটিকে (যেটি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব) পাল্টে অন্য ভাষায় তথাকথিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' পরিবেশন সম্পর্কে তিনি নীরব কেন? স্বনামে প্রতিবাদ করলে 'জাতীয় সংহতির শত্রু' বলে অভিহিত হবার ভয়ে নাকি?

যে কোন বিষয়ে যে কোনো লোকের সমালোচনা করার অধিকার আছে। এটি সবক্ষেত্রেই স্বীকৃত সত্য যে আলোচ্য বিষয় সমালোচকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকা চাই, অন্যথায় সমালোচনা ছেলেখেলায় পর্যবসিত হয়। আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সত্যই দুর্দিন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুঁটিনাটি ও সাধারণভাবে সঙ্গীতের টেক্‌নিক্যাল বিষয় না জেনেই কিছুলোক রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুভানুধ্যায়ী সেজে সত্যকারের কৃতী শিল্পীর অবমাননা করতে শুরু করেছেন।

যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

অরুণা হালদার

বারোই জানুয়ারি সকাল সাতটা নাগাদ বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে মনে হলো—গতকাল এমন সময়ে আমরা দিল্লীর এয়ারপোর্টে এসে গিয়েছি। আজ মস্কোতে আমার প্রথম দিন। আকাশ কুয়াশার মতো আবরণে ঢাকা। অল্প একটুখানি আলোর মধ্যে দিনের আভাস পেলাম। ভারতবর্ষের সময় অনুসারে এখানকার সময় আড়াই ঘণ্টা পিছনে, অর্থাৎ এখন তবে ভারতবর্ষে বেলা সাড়ে নয়টা হয়ে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে সামনের দৃশ্যপট দেখতে লাগলাম। দিকটা ঠিক করতে কষ্ট হলো না। কুয়াশা সত্ত্বেও পূর্ব দিক অরুণাভ। এই হোটেলের জানলা বড় রাস্তার উপর। সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে আলোকপাত হচ্ছিল। এই আলো যে-দেশ আরও আড়াই ঘণ্টা আগে ছুঁয়ে এসেছে তারও উপর তো এই আদিগন্ত আকাশের প্রসার রয়েছে। অকস্মাৎ আকাশটাকেই মনে হলো অত্যন্ত আপনার।

ইতিমধ্যে মস্কো নগরীর চলাফেরা অফিসের গতায়াতও শুরু হয়ে যাচ্ছে। দোকান এক-আধটি খুলেছে বা খুলছে। শুভ্রকান্তি ঋজু দেহ নরনারীর চলাচল বাড়ছে, বাস থেকে ওঠানামা দেখে মনে হচ্ছিল কলকাতার অফিস-যাত্রার আয়োজন। আনন্দের সঙ্গে দেখছিলাম এখানে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও তার সঙ্গে শক্তির সমন্বয়। আমাদের দেশে কোথায় বা খাদ্য আর কোথায় বা প্রাণ। তবুও মন বলে—শক্তির অভাব আমাদের দেশেও নেই। কারণ, এত বিপর্যয়ে, দারিদ্র্যে, রোগেও যে প্রাণশক্তি নিজেকে টিকিয়ে রাখে, আর 'কালচারের' নামে মেতে ওঠে, তাকে শক্তিহীন অন্তত বলা চলে না। সে জাতি শক্তির ওভারড্রাফ্‌ট্‌ কেটেই চলেছে প্রতিকূলতার ধার শোধ করতে।

বিধাতা আমায় দেননি অনেক কিছুই। যা তিনি দিয়েছেন বোধ হয় তার কয়েকটি ক্ষতিপূরণের জন্য না দিয়ে পারেন নি। তার মধ্যে একটা হলো ভাবনা-চিন্তা অকারণ না করা। মূর্খমাত্রেরই ঐ প্রবৃত্তি আছে। রাজ্যের

ভাবনা মাথায় আসবার আগেই আমারও তাই মনে পড়ল আটটার সময় শ্রীমতী এইফ্‌গেকিয়া বীকভা এসে আমাকে নিচের খাবারঘরে নিয়ে যাবেন। আমার ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মর্ম এখানে কেউ বুঝবে না; সুতরাং ভাষাহীন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আর মানুষ সে যতোই সহানুভূতিশীল হোক নির্বাক লক্ষণে কেউ অভ্যস্ত নয়। বীকভা বা অন্য কেউ দোভাষাণী না হলে প্রাতরাশেও নিরাশ হয়ে থাকতে হবে। শুধু কি তাই? নিচের খাবার-ঘরে যাওয়াও তো আমার পক্ষে শক্ত। গতরাত্রে যে কোথা দিয়ে কেমন করে এ ঘরে এসেছিলাম তা আমার কিছু মনে নেই। এমনিই আমার space perception ভীষণ কম। 'দিগ্‌বোধ'-এর এবম্বিধ অভাবের জন্য বাড়িতে ওঁর কাছে কম বকুনি খাইনি। কিন্তু সে বকুনিতে এমন ফল হয়নি যে এই গোলকধাঁধায় রাস্তা বার করব। আর ভাষা না বলতে পারলে তো জেনে পুঁছে নিতে ওঁরাও পারতেন না। অথচ কাল রাতে এক পেয়ালা কফি শুধু খেয়েছিলাম—মনটা ভোর থেকেই চায়ের চাতক হয়ে আছে। আটটার পূর্বে তা মিলবে না। বৃথা ভাবনা না করে বাইরে যাবার পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম। তাও তো এতদ্দেশে সামান্য পর্ব নয়। আটটা পনেরো মিনিটে শ্রীযুক্তা বীকভা এসে গেলেন। শুনেছি তাঁর বাড়ি মস্কো শহরের তুলনায় এ পাড়ার কাছাকাছি। হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় হলো। তারপর তাঁর সঙ্গে নিচেকার রেস্তোরাঁতে গেলাম। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, আমার আসার পর দুটি তার করে দেওয়া হয়েছে। একটি দিল্লীতে আমার স্বামীকে; অন্যটি কলকাতায় আমার ভাইকে। তাই তাঁরা আমার মস্কো পৌছানোর খবর ঘণ্টা চারেক পূর্বেই পেয়ে গিয়েছেন।

প্রাতরাশ খাবার জন্য আমরা ছোট রেস্তোরাঁতে এলাম। বীকভা জানেন আমি সম্পূর্ণ শাকাহারী প্রাণী। দেশে থাকতেও মাছ-মাংস আমি নিয়মিত খাই না। তবে কখনও সখনও খাই। দীর্ঘকাল নিরামিষ খাদ্যই আমার অভ্যাস ছিল। এখানে আমার খাদ্য নির্বাচন করা একটু কঠিন। এদেশে 'ডিম' নিরামিষ, আমারও তা গ্রাহ্য। আর একটা জিনিস নতুন খেলাম লেমন-চা ও রুটি-চীজের সঙ্গে, তা হলো 'কেফির' বা টক্ দুধ। অনেকটা ঘোলের মতো খেতে। খাবারঘরেই যাই বা যেখানেই যাই লোকের কৌতুহলী দৃষ্টি অপ্রকট থাকে না। কৌতুহলটা অবশ্য আমার শাড়ি নিয়ে। আহার্য নিয়েও হয়তো তারা কৌতুক বোধ করত, কিন্তু ব্যবহার্যটা আরও স্পষ্ট

কৌতূহলোদ্দীপক। পরেও দেখেছি শাড়ি দেখলে এদেশের লোকের মুখ-চোখ বিস্ময়ে কেমনতরো হয়ে যায়। সে বিস্ময় অকপট, শিশুর অবাক হবার মতোই অকৃত্রিম। শুনেছি অন্য অনেক দেশেও শাড়ি সমাদৃতা। কোনো রকমে নিরামিষ খাদ্যে প্রাতরাশ সেরে দু'জনায় ঘরে এলাম। আমি প্রতীক্ষা করছিলাম শ্রীযুক্তা তীমফিয়েফের কাছ থেকে টেলিফোন পাব বলে। তাতে করে জানতে পারব যে, আমাকে কবে বা কখন লেনিনগ্রাদ যেতে হবে। কথা ছিল তিনি আমার যাত্রার ব্যবস্থা (বুক) করে খবর দেবেন। বীকভা কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। তিনিও প্রতীক্ষমাণা, কারণ, উপস্থিত তিনিই আমার দোভাষী। কিছুক্ষণ বাদে জানা গেল যে পরদিন (১৩ তারিখে) সকাল সাড়ে দশটা বা এগারোটাতে যে প্লেন ছাড়বে তাতেই আমার লেনিনগ্রাদ যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখন তা হলে বীকভা যান কাজে—আমি থাকি ঘরে। একা আর কি করি? জানলা দিয়ে শহর দেখতে লাগলাম। আর বীকভাও দুটোর সময় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন; তারজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বুদ্ধি করে হোটেলের এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হোটেলের চারদিকেই বড় বড় সড়ক—অনেকদূর খোলা। সামনের দিকে বাইরে তো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—একটা স্কোয়ার বা চত্বর, তার শেষে মস্কো নদী। কিন্তু বেশি ঘুরে দেখবার মতো বুদ্ধি থাকলেও দিগ্‌বোধ আমার নেই।

দ্বিপ্রহরের পরেই এখানকার লোকে আবার ভোজনে রত হয়। সেটা 'লাঞ্চ' নয়। কারণ, এই সময়কার খাওয়াটাকেই 'ডিনার' বা বড় খানা বলা চলে। দ্বিপ্রহরের সেই খানার সময়ে বীকভা এসে আমাকে আবার নিচেকার বড় ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। শাড়ির ওপর 'দৃষ্টি' দেওয়া সইতে সইতে একটি টেব্‌ল অধিকার করে বসলাম। কিছুদূরে অন্য এক টেব্‌লে বসেছিলেন একটি আফ্রিকেয় যুবা ও তার বান্ধবী। তৃতীয় টেব্‌লে একটি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে আমার ভারতীয় বলেই মনে হলো। সম্ভবত পার্শী হবেন। একটা জিনিস বুঝলাম এখানে শাদাকালোর বর্ণভেদ নেই, আহারে-বিহারে সর্বত্রই সর্ব বর্ণের স্বচ্ছন্দগতি। আমাদের সঙ্গে যেসব শ্বেতাঙ্গ জাতিদের বেশি পরিচয় তারা তো কালোমানুষ দেখলে নিজেদের ভদ্রতা-সভ্যতা কেন, সময়ে-সময়ে মনুষ্যত্বও ভুলে যান। তাই এ দৃশ্যটা একটু নতুন।

বীকভা আমার সঙ্গে খাচ্ছেন বলে নিরামিষই খাবেন। তাঁকে আমিষ

খাওয়ানো গেল না। পুলি পিঠার মতো একরকম ভাপে সিদ্ধ করা দইয়ের মধ্যে ভেজানো বস্তু (আরিনিজ্) আমরা খেলাম। এলো এক ধরনের স্যুপ্। কিছু সব্জি সিদ্ধ। আর শেষে কমলালেবু—এটা অসময়ের ফল। এই বরফের রাজ্যে এ সময়ে সবুজের চিহ্নও নেই। শাক-সব্জি-ফল-মূল যা জীইয়ে রাখা হয় তাই মাত্র পাওয়া যায়। সত্যই তা দুর্ঘট। নিরামিষ খাওয়া জীবদের সাহচর্য রক্ষাও তাই সুবিধার নয়। আহারান্তে বাইরে যাব ঠিক করলাম। এখানে সর্বত্রই গৃহমধ্যে প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি গরম কোট জমা দেবার জন্য একটি স্থান থাকে গাদোরোব বা বহির্বাসিক কক্ষ। যিনি সেসব দেখাশোনা করেন, আমায় অনভ্যস্ত দেখে অগ্রসর হয়ে কোট পরতে তিনি সাহায্য করলেন। বাইরে এসে আমরা একটি ট্যাক্সি ধরে চললাম মস্কোর সুবিখ্যাত চিত্র সংগ্রহালয় 'ত্রেচিয়াকভ্ আর্ট গ্যালারি'তে।

'ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারি' বলতেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কথা। ১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। এই ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারির অধ্যক্ষ প্রফেসর ক্রিস্টি সেই সংগ্রহ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তাঁর উদ্বোধন ভাষণে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের কৃতি ও পদ্ধতি তাঁদের রুশদেশের লোকের শিক্ষার বিষয় হবে—এই মর্মের কথা। তখনো কবির ওঁরা সমাদর করেছিলেন। এখন তো রবীন্দ্রনাথ ওঁদের সকল লোকের পূজ্য।

ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারি শুধু মস্কো বা সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর মধ্যেই একটি বৃহৎ চিত্রপ্রদর্শনীশালা। শুনেছি লেনিনগ্রাদের 'হারমিটেজ' ও প্যারিসে 'ল্যুভ' পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। কিন্তু মস্কোর এ চিত্রশালাও বিরাট ব্যাপার। একদিনে, তা পুরো দেখা ছেড়ে অংশতও ভালভাবে দেখা হয় না। দেশ-বিদেশের কত ধারার চিত্রই না আছে। ছবির সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি আমার জানা নেই, তবে ছবি দেখতে আমার ভালো লাগে। রং ও রেখার বিন্যাসে, এক-একটা উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—চোখে আর মনেও। চোখের মধ্য দিয়ে মন যেন আরও-একটা জগতের স্পর্শ লাভ করে। সুতরাং, মানস-ভোজের এই বিপুল সমারোহ দেখে আমার মন লুব্ধ হয়ে উঠল। আমার মতো উদ্ভিদ্-প্রকৃতির স্থাবর মানুষও যতটা জঙ্গম হতে পারে, সে চেষ্টা জুড়ে দিল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আমরা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে চিত্র ও মূর্তি শিল্পের নিদর্শন দেখলাম। পথযাত্রীর শ্রান্তি তখনো আমার দেহে,

নিরামিষাশী হলেও ক্ষুৎপিপাসা সামান্য নয়। দুদিন ধরেই সেদিকে ঘাটতিও পড়েছে। এতটা যে পদবল আছে তা মনে করি না। তবু পারলাম—মনের খুশির জোরেই বোধ হয়। ছবি দেখতে-দেখতে দেহে ক্লান্তি এলেও মন খুশি হয়ে উঠছিল। নানাদেশের চিত্রই আছে, কিন্তু বেশির ভাগ চিত্রই রুশ চিত্রকরের অবদান। অন্তত আমি সেদিন সেগুলোই দেখছিলাম—অন্য চিত্রকলার সংগ্রহকক্ষে পদার্পণের অবসর অন্যত্রও পাওয়া যাবে। রুশিয়ায় এসে রুশ শিল্পকলাই প্রথম দর্শনীয়—রুশিয়াকে জানার জন্য। তবে এই রুশ চিত্রকলাও কম বিচিত্র নয়। চিত্রকলার জগতে রুশের স্থান কোথায় তা আমি জানি না।, নিশ্চয়ই চীন বা জাপান, ইতালি বা ফরাসীর সমকক্ষ নয়। তবু এদের ছবি যা দেখলাম তাও নানা আকারের নানা ধরনের, নানা পদ্ধতির ও নানা যুগের। সাজানো হয়েছে সাল তারিখ ধরে পুরাতন থেকে নতুনের দিকে—নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে। শুনেছি—শিল্পে ওরা বাস্তবতার পক্ষে, আর জন-জীবনই ওদের শিল্পের উপাদান। নতুন যুগের এই ছাপ চিত্রের পদ্ধতির মধ্যেও স্পষ্ট, চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যেও লক্ষণীয়। তেলের রং-এর ছবিতেও বর্ণপ্রাচুর্যের ঘনঘটা লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের ছবিতে। তার পূর্বেকার ছবিও অনেক, তাতে ঝলমলে নীল ও সোনালি রং-এর ঐশ্বর্য। আর, আধুনিকতর ছবিতে রং-এর ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও হালকা। দেখছি, ফরাসী-আধুনিকতার প্রকাশও ঘটেছিল এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদের চিত্রকলায়, কিন্তু এযুগে রুশদের তাতে আপত্তি। তবু শুনেছি তার চর্চা হয়। অবশ্য বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের উপহার দেখছি কম। মোটের উপর অজস্র আছে বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপ এবং বেশির ভাগই পোরট্রেট, সেই পোরট্রেটের বিষয়বস্তুও কালক্রমে বদল হয়েছে। এককালে ধর্মের ও রাজার সেবাই ছিল শিল্পীর কাজ। সেই আইকন, বা বিগ্রহ-পট শিল্পে রুবেলভ অদ্বিতীয় শিল্পী। এসব ধর্মবিষয়ক চিত্র রুশ সংস্কৃতির গৌরব। সমগ্র আঠারো শতক ও উনিশ শতকের ছবির মধ্যে জেগে আছেন সামন্ত প্রভুরা—রাজারাজড়া, শিকারী বা যোদ্ধবেশী, রাজপুত্র-রাজকন্যা এবং সম্রাজ্ঞীরা। সম্রাজ্ঞী জারিনা ইকাট্রিনা বা ক্যাথারিনের নানা বয়সের নানা পোরট্রেট রয়েছে। এই সব রাজতন্ত্রীদের প্রশস্তিসূচক শিল্পসম্পদও সযত্নে পরিষ্কার করে রাখা। ইতিহাসের বিষয়কে মান্য করতেই হবে। ক্রমশ দিন যত বদলেছে ততই রাজরানীদের স্থান গ্রহণ করেছেন সাধারণ লোকেরা—কারিগর, বৃদ্ধ চাষী, চাষীর মেয়ে, এবং

ওরূপ শত শত জীবনযাত্রার সাহসী মানুষ। জীবনযুদ্ধের তারাই তো আসল যোদ্ধা—প্রাণ হননের যুদ্ধ নয়, প্রাণ প্রকাশের যুদ্ধ তাদের।

ছবি সম্বন্ধে আমার কোনও বিশেষজ্ঞতা নেই। তবু রং-এর ও রসের সেই দরবারে আমিও হারিয়ে যেতে লাগলাম। রেপিন্ (মৃত্যু ১৯৩০) ওদের বাস্তবশিল্পের গুরু। তাঁকে আমার ভালোই লাগে। তাছাড়া, উনিশ শতকে ওঁদের ভেরেশেচেগিন প্রভৃতি জন কয় বড়ো বাস্তবপন্থী শিল্পী এ-পথটা প্রশস্ত করেন। এটাই এখন রুশ শিল্পের সরকারী পথ। আমি কিন্তু তার চেয়ে ফরাসী ধারার মডার্ন শিল্পই বেশি ভালোবাসি। তবু এ চিত্রশালার অনেক ছবি আমার ভালো লেগেছে। যে ছবিটি এখন আমার সবচেয়ে ভালো লাগল তার কথা বলেই তাই এই চিত্রশালার কথা এবারের মতো শেষ করি—উপায়ান্তর দেখছি না। সে চিত্রটির বিষয় হলো খ্রীষ্টের আবির্ভাব।

একটা প্রকাণ্ড ঘরের একটা পুরো দেওয়াল জোড়া এই ছবি। তাতে কত শত মানুষ যে স্থান লাভ করেছে তা বলা শক্ত। আমি এত বড় ক্যানভাস আর দেখি নি। অবশ্য এ চিত্রের খ্যাতি শুধু সেজন্য নয়। চিত্রকর (ইভানভ্?) উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি নাকি জীবনে একখানা ছবিই এঁকেছিলেন—সেই 'একখানা' এই ছবি। এরই পরিকল্পনায় অংশ-চিত্ররূপে তিনি যে অজস্র চিত্র এঁকেছেন, এই বৃহৎ কক্ষের অন্য কয়টি দেওয়াল ভরে পৃথক পৃথক ভাবে সে-সব সাজানো রয়েছে। মুখ মূর্তি জন্ দি ব্যাপটিস্ট, হাত উঠিয়ে তিনি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করছেন। বাইবেলের বর্ণনা মতোই দীক্ষাগুরু জনের পরিধানে উটের লোমের কাপড়। যীশুর পরিধানে দুগ্ধধবল দীর্ঘ পরিচ্ছদ। গ্যালিলিও সাগরের বন্ধুর তটপ্রদেশের একটু উপর থেকে তিনি নামছেন। সাধারণ মানুষ চারদিক থেকে তাঁকে দেখছে, উৎকণ্ঠায়, সংশয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে—এই কি সেই মেসায় বা পরিত্রাতা? কেমনতর এই মেসায়া? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, দুঃস্থ পীড়িত, রোমের পদানত ইস্রায়েল জাতি নিবিষ্ট আশায় এই ছবিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। শাস্ত্রোক্তি মতে তিনিই য়িহুদীদের 'রাজা'—কিন্তু কি অর্থে তিনি 'রাজা?' প্রতিটি মানুষের আশার স্বপ্ন এই পরিত্রাতা বা মেসায়া? প্রতিটি ব্যক্তিচিত্র পূর্ণাবয়ব, আর প্রতিচিত্রের এক-একটি বিশেষ ভঙ্গী ও রস তার নিজস্ব অপূর্ব সম্পদ। যে বৃদ্ধ জীবনযাত্রায় নানাভাবে ক্লেশ পেয়েছেন তিনি তাকিয়ে আছেন একটা প্রশান্ত প্রত্যাশা নিয়ে। তাঁর হাতের কাছে যে বালিকাটি

দাঁড়ানো তার মুখে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি কোনও 'অপূর্বে'র আভাস—যা সে ক্রমাগত বড়দের কাছে শুনেছে—তার নিপীড়িত শৈশবের মুক্তিস্বরূপ বলে কল্পনা করছে। এরূপে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবনস্বপ্নের পূর্ণোপলব্ধির প্রয়াস খ্রীষ্টের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই চিত্রটি এজন্য এমনভাবে আমার মনে গাথা হয়ে আছে। বহু সময়ই আমার মন স্মৃতিতে এই ছবির রস রোমন্থন করে। এমন সত্য কী আছে যাতে মানুষের বিচিত্র জীবন-লীলার ধারা চরিতার্থতায় সম্পূর্ণ? আমার স্মৃতিতে এই শিল্পীর নাম কতদিন ধরে রাখতে পারব জানি না, কিন্তু চিত্রটি টিঁকে থাকবে। শুনেছি লেনিনগ্রাদের চিত্র সংগ্রহশালাতেও এই ছবি আছে। সেইটিই সম্ভবত মূল—তবে কোন-টি প্রতিলিপি ও কোন-টি আসল তা আমার জানা নেই।

এই ছবি দেখতে আমার অনেকটা সময় গেল। আর বেশি ছবি দেখা সম্ভব হল না। কয়েকটি বালক-বালিকা স্কুল থেকে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে এসেছে। এমন প্রতিদিনই অনেক দল আসে। অনেকে নোট নিচ্ছে। কেউ বা কিছু কিছু অনুকৃতিও করছে। দু' চারটি ফুলের মতো সুন্দর মুখ কাছে এগিয়েও এল। বিদেশীকে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। অবশ্য আমি বুঝলাম—বিদেশী মানুষটির থেকে বিদেশীয় শাড়িটিই তাদের প্রথম কৌতূহলের সামগ্রী—হয়তো বা প্রধানও। শিষ্টাচার জানাতে হলে এরা বলে 'দ্রাস্তভুইচে' অর্থাৎ নমস্কার। আর বিদায়কালে বলে 'দোঃস্বিদানিয়া'—অর্থাৎ 'পুনর্দর্শনায় চ'। এই কয় ঘণ্টায় পুরনো শেখা শব্দ দুটি আমারও প্রায় রপ্ত হয়ে আসছে। শিরস্ত্রাণ ও কবচ কুণ্ডল পরে আমরা যখন বাইরে এলাম তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। রাত্রি বোধহয় ঘণ্টা দু'তিন আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

শীতের সন্ধ্যা জমে আসছে। দিনের কুয়াশা-ঘেরা সূর্যহীন সূর্যালোক থেকে রাতের কুয়াশা-ঘেরা বিজলী আলোয় মস্কোর পথঘাট বোধহয় বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু শীতটা বিভীষিকা—তাতে সাধ করে পথে ঘাটে কেউ বেড়ায় না। দিনের বেলা বরফের উপর খেলা করে বটে, আর বরফে ওদের পরম আনন্দ।

বীকভা আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁরই গৃহে আমার রাত্রিতে আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। শুনলাম তাঁদের বাড়ি মস্কোর একটা নূতন অঞ্চলে—ঠিকানা থেকে নাম জানি চেরামুষকিন্স্কায়া। নূতনতর অঞ্চলেরও নাকি

পত্তন হয়েছে। আমার পক্ষে নূতন বা পুরাতন সবই অচেনা। কেবল প্রশস্ততর পথ ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অট্টালিকামালা দেখে, বুঝছিলাম—এটা নতুন মহল্লা। বীকভার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড ফটক পেরিয়ে এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছালাম—৭।৮ তলা চকমিলান অট্টালিকা। বীকভাদের গৃহ তিন তলায়। তিনখানি ঘর এবং রান্নাঘর স্নানঘর সমেত একটি কাবচিরা বা ফ্ল্যাট। এরূপ তিন, দুই বা এক কামরা যুক্ত নানাধরনের ফ্ল্যাট সকল লোকের জন্য সোভিয়েত সরকার ব্যবস্থা করতে প্রয়াসী। একটি কো-অপরাটেব সমিতির সদস্য হিসাবে এরা সমিতির তৈরী এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। আর কিনে ফ্ল্যাটটির মালিক হয়েছেন। বীকভার গৃহে আছেন তিনি ও তাঁর স্বামী ঈগর (শেপ্তুনভ্), তাঁদের দুটি কিশোরী কন্যা আর বৃদ্ধা শাশুড়ী। আরও একজন আছেন। ঘরের অন্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সেও বার হয়ে এসে যথারীতি আমায় পর্যবেক্ষণ করল। সে এক ইরানী রূপসী—বীকভার 'পার্সিয়ান ক্যাট' বা ফার্সী মার্জারী। এদেশের লোকে বিড়াল অনেকেই পোষেন। শীতের দেশ বলেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক—বিড়ালের দেহ রোমশ এবং খুব হৃষ্টপুষ্ট। লেনিনগ্রাদে শুনেছি ব্লকাডের (যুদ্ধাবরোধের) সময় লোকে কুকুর বিড়াল ইঁদুর পায়রা ও কাছাকাছি পাবার মতো সর্বপ্রকার পশুপক্ষী খেয়েই প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আর সহস্রে সহস্রে তাও পারে নি। বীকভার বিড়ালী তো রীতিমত সুন্দরী। আমরা বসবার ঘরে এসে বসতেই সেও লাফ দিয়ে একটি চেয়ারে বসল। কোনও অজ্ঞাত কারণেই হবে হয় তো—বিড়াল আমার ভালো লাগে না। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে, মিলুক। তবে এই বিড়ালটি দেখে আপাতত আমার দেশে রেখে আসা কুকুরটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। কুকুরটি 'কুলীন' নয়, বংশজ। তিব্বতী ও নেপালী পিতামাতার সন্তান, ম্লেচ্ছ পাহাড়ীয়াও বলা যায়। ঐ সারমেয়েটির নাম ভুতো। তার বহুবিধ ভৌতিক উপদ্রবের মধ্যে একটা এই যে; আমাদের বসবার ঘরে লোক এলে তাকে ভিতরে কিছুতেই রাখা যেত না। খুলতেই হতো, এবং খোলামাত্র সে এসে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে পড়ত। কমিউনিস্টের বাড়ি হলেও এতটা সাম্যবাদ আমার সহ্য হয় না। তাই সে তাড়না খেয়েছে অনেক। কিন্তু ভুতোর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয় নি। অযথা আমাকেই শুনতে হয় আমি 'নাই' দিই বলেই নাকি সে উচ্চতর স্থানেও চড়ে বসছে। আপাতত বীকভার

বিড়ালটির জন্য দুঃখবোধ করলাম। বীকভা, অর্থাৎ তার মনিব, সেদিন দ্বিপ্রহরে আমার জন্য পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য খেয়েছেন—এখন এবেলাও সপরিবারে তো বটেই, স-পোষ্য অর্থাৎ এই বিড়ালটি শুদ্ধ আমার দায়ে শাকাহারে থাকতে হবে। দেশে থাকতে নিজেকে খুব এডাপটিবল বা খাপ খাওয়াতে সক্ষম বলেই ধারণা করতাম। এদেশে যাত্রা করে মাটি ছোঁবার আগে আকাশে বসেই বুঝেছি—কত ভুল ধারণাই মানুষের নিজের সম্বন্ধে থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস জিনিসটা খাদ্য ব্যাপারে কতটা বদ্ধমূল। মানুষে-মানুষে জানা-বোঝাও বোধহয় তার চেয়ে সহজ। আমরাই কি ভাবতে পারি—জোর করে কোনো মিষ্টিতে অনভ্যস্ত মানুষকে আমাদের রসগোল্লা খাওয়াতে গেলে তার দশা হয় আমাদের জোর করে আরসোলা-ব্যাং খাবার মতো ?

বীকভার বাড়িতে এসে রুশ সমাজের একটি স্বচ্ছন্দ পারিবারিক রূপ দেখতে পেলাম। এরা বুদ্ধিজীবী পরিবার। ঈগর তাঁর মায়ের একমাত্র ছেলে। পুত্রবধূ শাশুড়ীকে নিয়ে সংসার করেন—এদেশে তা স্বাভাবিক, ওদেশেও একেবারে অদ্ভুত নয় এখনো। বৃদ্ধা মা দু হাত বাড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করে আমার কপাল চুম্বন করলেন। করমর্দনের থেকে তা বেশি ভালো লাগল। পায়ে বাতের ব্যথায় বৃদ্ধা লাঠি ধরে চলেন। নাতনী দুটিকে নিয়ে তিনি এক ঘরে থাকেন। বুঝলাম তাতে ঈগর দম্পতিরও কতকটা ভাবনা লাঘব হয়েছে। পুত্র-পুত্রবধূ তো এতক্ষণ নিজ নিজ কর্মস্থলে ছিল—ঈগর স্লাব-সাহিত্যের ইনস্টিটিউটের বিদ্বান কর্মী, এইফগেনিয়া প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ভারতশাখার কর্মী। নাতনীদেরও স্কুল কলেজ ছিল। বৃদ্ধাই স্বহস্তে আমার জন্য রান্নাবান্না করেছেন।

তাঁর স্বামীর জীবনকালে তিনি ককেশস অঞ্চলে ছিলেন। সেই ককেশস প্রীতি এখনও জেগে আছে গৃহসজ্জায়, আর খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীতে। টেবলের উপর হলদে রং-এর বাবলা ফুলের মতো ফুলসুদ্ধ মিমোসার ডাল। শীতে ফুল দুষ্প্রাপ্য, ককেশাস থেকে এটি নববর্ষ উপলক্ষে তাঁরা সংগ্রহ করিয়ে এনেছেন। নববর্ষের কিছু কিছু বেশভূষা তখনও ঘরে রয়েছে। জানালার উপর দেখলাম কয়েকটি গাছের টব—বীকভার ভাষায় "আমাদের বাগান"। সেই টবের একটি লেবুগাছে একটা কমলালেবু জাতীয় মাঝারী সাইজের ফলও ফলে আছে। পাতাগুলি সবুজ; কেন্দ্রিক আতপ-ব্যবস্থায় ঘরের মধ্যে তাপ পায়; জানলা দিয়ে পায় সূর্য থাকলে সূর্যের আলো। অন্য কোনোও গাছে এ নিদারুণ

শীতের সময়ে পাতা থাকে না। ঘরে বেশ কয়েক আলমিরা বই—স্বামীর বই আমার দুর্বোধ্য, কিন্তু বীকভাব বাঙলা বই আমাকে কম আশ্বাস দিল না।

বীকভার কন্যা দুটি কাছে এলো। দুজনাই ইংরাজী বলে। ঈরিনা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাটি ভালোই বলে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজির ছাত্রী। ললিতকলায় তার আকর্ষণ। নানা পুরাতন মসজিদ ও চার্চের ডিজাইন ও 'মোঝিকে'-এর আলোকচিত্র তার কাছে আছে। সেগুলি তাদের শিক্ষালয়ের এক্‌স্‌কার্সান বা পরিভ্রমণযোগে সংগ্রহ করা। মায়ের মতনই সে স্নিগ্ধপ্রকৃতি; তার কৃশতনুর মধ্যে মায়ের মতোই একটি কারুণ্য ও মাধুর্য। ছোটটির নাম ওল্‌গা, একটি ফোটা ফুলের মতন নিটোল পঞ্চদশী সুষম কিশোরী। চোখ মুখ কি বাপের মতো (তখনো তাকে দেখি নি)। পরে বুঝেছি অন্তত সেই রকমই ওল্‌গার স্বাস্থ্যের সতেজ প্রাচুর্য। বীকৃভাই বলেছেন, গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে কিছুকাল অবরুদ্ধ অঞ্চলে যাপন করতে হয়েছে। ইরিনা তখন কোলের শিশু। শত্রু-পরিবৃত অঞ্চলে বাস করার ফলে মাতা ও শিশু দুজনারই স্বাস্থ্য তখন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধ গিয়েছে, কিন্তু এত বৎসরেও সেই ক্ষতি পূরণ হয় নি স্বাস্থ্যের দিক থেকে। বুঝতে পারি কেন এরা শান্তি চায়—যুদ্ধ চাইতে পারে না।

রাত প্রায় ৯টায় গৃহস্বামী ঈগর শেপ্তুনভ্ মহাশয় কাজ সেরে গৃহে ফিরলেন। দীর্ঘ দোহারা গড়নের মানুষ, বয়স চল্লিশের থেকে কিছু বেশি হতে পারে, চোখে মুখে বুদ্ধির সঙ্গে কিন্তু প্রাণবন্ত সতেজতা। ঈগর স্লাবগোষ্ঠীর বুলগেরীয় ভাষায় বিশারদ—এফগেনিয়া যেমন আধুনিক ভারতীয় ভাষার বাঙলা শাখার বিশেষজ্ঞ। বীকভা আমাদের দেশের অনেকের পরিচিতা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে শুনেছি—চট্টোজায়াকে শুনেছি তাঁর স্বভাবের প্রশংসা করতে। ইতিপূর্বে রুশ-বাংলা অভিধান তিনি সংকলন করেছেন। বাংলা ব্যাকরণে, বিশেষ করে উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়েও তাঁর কাজ আছে। চর্যাপদের ব্যাকরণ সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা দেখেছি। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য এই মহিলাকে এমন একটি সৌন্দর্য দান করেছে যা সচরাচর দেখা যায় না, সেই আবেদন-সম্পদ সর্বদেশে সকল মানুষের কাছেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধা আত্মীয়তা তাঁর সোভিয়েত সহকর্মীদেরও জ্ঞাপন করতে শুনেছি। অথচ তিনি কথায় মুখর বা বাক্যে প্রখর নন; বরং একটু কোমলস্বভাবা

ও সস্নেহভাষিণী। আমার কুনো স্বভাব খুব সহজেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। বেশ সহজ হৃদ্যতার সঙ্গেই আমরা এই কয় ঘণ্টার সাক্ষাতে পরস্পরকে গ্রহণ করলাম। ঈগর মহাশয় একটি বেগবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ; যাকে বলে dynamic personality; তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার রসবোধ বা সেন্স অব্ হিউমার। সাহিত্যের লোক তিনি রসবোধ থাকবে সেকথা আশ্চর্য নয়। তবুও বিশেষ করে বলার মতো কথা এই যে, স্ত্রীর মতন স্বামীটিও ভদ্র রুচিশালী এবং হৃদয়বান। আর মুগ্ধ হয়েছি তাঁর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে witticism ও humour—রসিকতা ও কৌতুক—করার ক্ষমতায়। মস্কোতে তো আমার সেদিন প্রথম দিন, দ্বিতীয় রাত্রি—ভাষা কিছুই জানি না। তবু মনে হলো ভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও কোনোরূপ ভাব গ্রহণ করতে পারলে হিউমার সর্বজনবোধ্য এবং সর্বচিত্তহারী। তবে একথা মানতেই হবে যে, ঈগরের হিউমারের নিজস্ব শক্তি এইফ্‌গোনিয়ার অনূদিত বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আমার কানে ও বুদ্ধিতে প্রবেশ করেছে। কিছু নিশ্চয়ই তাতে খোয়া গিয়েছে, তবে তা তবু স্বচ্ছন্দ। বন্ধুর স্বামীদের সঙ্গে দেশে যে ভাবে শিষ্টাচার বজায় রেখেও পরিহাসসংকুল সম্পর্ক লাভ করে থাকি, এক্ষেত্রেও তা পেতে লাগলাম। ঠাট্টা-তামাশায় ঈগর সবাইকে হাসিয়ে আমায় বিপর্যস্ত করতে থাকলেন।

এই হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই আমাদের আহারও শুরু হলো। পাশ্চাত্ত্য দেশে সর্বত্রই খাবার পূর্বে পানে বিধি আছে। একেই তো আমি খাওয়া ব্যাপারে সংরক্ষণশীল, তার ওপরে বাঙালী মেয়ে, পান সম্বন্ধে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' বলা যায়। জীবন কাটছে সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চা করে, মাঝে সাধুসঙ্গও কম করি নি। কমিউনিস্ট মোগলের হাতে পড়েও খানা খাওয়ায় অভ্যস্ত নই—পানীয় তো দূরের কথা। সুতরাং, এ দেশের আচার ব্যবহার বুঝে জেনেও, সামাজিক আসরে পদে পদে রসভঙ্গ ঘটানো আমার বিধিলিপি। ত্রুটি বুঝতে পারি, তার জন্য ক্ষমাও চাই, কিন্তু তা সংশোধন করি না, আমার পক্ষে তা অসম্ভব বলে। এ ক্ষেত্রেও শ্রীযুত ঈগর আমার 'জাত যাওয়ার' ভয় দেখিয়ে হাস্য-পরিহাসে আমাকে কম নাকাল করলেন না। আমার জন্য পানীয় ছিল টেবলে তাঁর মার হাতে প্রস্তুত বেরির রস—তা সুরা নয়। লাল টুক্‌টুকে সেই রসই পানপাত্রে পরিবেশিত হলো। আমরা পরস্পরের গ্লাস ছুঁইয়ে এই সরস উপায়ে পরস্পরের প্রীতিবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য কামনা করে তা

পান করলাম। এ ছাড়া অবশ্য অন্য পানীয় ছিল 'লিমোনাদ'। আহার্য ছিল নিরামিষ—যথা, গাজর, বাঁধা কপি, বরবটি সিদ্ধ, নিরামিষ সালাদ, গরম আলুর বড়া। আলুর বড়া এরা 'স্মিতানা' বা টক্ মালাই মিশিয়ে খান—এটা তাই খাদ্য হলেও লেহ্যও। এরপর ছিল মিষ্টান্ন—কেক বা তর্ত ও চকোলেট। শেষে লেমন চা সেই সঙ্গে পেয়। অবশ্য আমিষের ব্যবস্থাও ছিল। টেবলে সবাই আমার সঙ্গে নিরামিষাশী। আজ আর কেউ আমিষাহার না করলেও মহামান্য আমিষাহারীকে অসম্মান করা হয় নি। বিড়ালটির মাংসের ব্যবস্থা আছে। রান্না হয়েছিল প্রাচ্য ধরনে—অর্থাৎ ককেশীয় প্রণালীতে মসলা ও ঝাল তাতে প্রযোজ্য। তার ফলে সে খাদ্য খেতে আমার বেশ মুখরোচক লাগছিল। দু দিন খাদ্যে এ গুণ পাই নি। এ রান্নায় কতকটা আমাদের দেশের খাদ্যের বা তরকারির স্বাদগন্ধ পাচ্ছিলাম যেন। বুলগেরিয়া থেকে প্রাপ্ত বড় ও মিষ্টি লংকার একরকম সংরক্ষিত আচারও খেলাম। এরকম লংকা আমাদের দেশেও শিলং, রাঁচী ও সিমলা শৈলে পাওয়া যায়। আমিও তা খেয়ে শ্রীযুক্ত ঈগরকে জানালাম—'বুলগার ভাষার পণ্ডিত যখন তখন যে বুলগারিয়ান সব্জীও তাঁর বাড়িতে মিলবে এ আর আশ্চর্য কি!' খাওয়ার শেষে এলো ফল। কলা ও আপেল। এ দিনে যে-কোনো ফল মহার্ঘ। শুনলাম সেই কলা এসেছে কিউবা থেকে এবং আপেল সম্ভবত চীন থেকে। কলার চেহারা দেখে প্রথমত খেতে রুচি হচ্ছিল না। আমরা 'কলা-কুশল' দেশের লোক। দেখতে কিউবার কলাও সবুজ সিঙ্গাপুরী কলার মতো—খেতেও অনেকটা তদ্রূপ। 'লেমন-চা' আমার বাড়িতে আমার স্বামীকে এবং কখনো কখনো বিদেশী অতিথিদের পান করতে দেখেছি। নিজের তখন ভালো লাগত না। এখানে দু'দিনেই ঐ পানীয় আমার গ্রাহ্য হয়েছে। কে বলে আমি অভ্যাস পাল্টাতে অক্ষম? যে ধরনের চা আমি চিরদিন খেতে অভ্যস্ত নিজের হাতে তৈরি না করলে এখানে তা পাব কি করে? এ বুঝেই লেমন-চাও ভালো লাগে।

আহারান্তে বিশ্রান্তালাপের পালা দীর্ঘ করা সম্ভব নয়। হোটেলে ফিরতে হবে। কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা প্রভৃতি বিনিময় করে ফিরবার জন্য তৈরি হলাম। বীকভার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা আমাদের দেশের মায়ের মতনই স্নেহপরায়ণা। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ওভারকোট গায়ে দিলাম। তখনো আমার নিজস্ব ওভারকোট কেনা হয় নি। ও বস্তুটি আমার নয়। আমি এর নাম দিয়েছিলাম:

'কলেকটিব্' কোট্। রাশিয়ায় আমার আগে বাংলা দেশ থেকে দু' একজন মহিলা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই এই শীতকালীন ওভারকোট্ ব্যবহার করেছেন। তারপর দেশের পথে তা যথারীতি জমা দিতেন নয়াদিল্লীতে রেণুদির বাড়িতে। পার্লেমেণ্টারি দায়িত্বের সঙ্গে শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তীর অন্যতর দায়িত্ব এই কোটটির পরিচর্যা—তা ঝেড়ে ধুইয়ে তুলে রাখা—এরূপ অন্য যাত্রীদের জন্য। আমিও অবস্থাগতিকে সেই কোটটি গায়ে চাপিয়ে এসেছি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আমার মাপটা বোধহয় এই কোটের তুলনায় প্রমাণসই নয়। নিজেকে কোটের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেব, এমন ক্ষমতাও আমার নেই। অন্য কেউ তা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও শ্রীযুক্ত ঈগর রঙ্গ-তামাসার সুযোগ ছাড়লেন না। সহজভাবে বেশ খানিকটা হাসালেন ও হাসলেন। যথার্থ হিউমার মানুষকে বিব্রত না করে স্বচ্ছন্দ করে দেয়। শ্রীমতী বীকভার সঙ্গে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। আমায় পৌঁছিয়ে রাত এগারোটার সময় তিনি ঐ প্রচণ্ড শীতে বাড়ি ফিরলেন। ধন্যবাদের ভাষা নেই। আমার জন্য আজ তাঁর সমস্ত দিনটিই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে; এতক্ষণে তার নিজস্ব বিশ্রামের সময় পাবেন।

সারা দিনের পর বিশ্রাম আমারও চাই। সেই বিশ্রাম করতে করতে আমিও আমার চব্বিশ ঘণ্টার বাসস্থান এই বিরাট উক্রেইনা হোটেলের এই ঘরখানিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম। একজনের মতো শয্যা, টেবল, আয়না লাগানো আলমারি; ঘরটির সামনে ছোট একটি কক্ষ (ante-room) যেখানে আমার মালপত্র রয়েছে, তা চোখে পড়ল। পার্শ্বেই গরম জলের জলের কল-লাগানো আধুনিক বাথ। ত্রুটি কিছুর নেই। তবু আমার মনে হলো যে, বোধ হয় ইংরাজ শাসনের সময়কার স্পেন্সেস্ বা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ছিমছাম পারিপাট্য ছিল এর চেয়ে বেশি। এখানেও অবশ্য আছে সবই। বরঞ্চ প্রাচুর্যই আছে। কিন্তু সৌন্দর্য পারিপাট্য পরিচর্যা কিছু কম। দিল্লীর সোভিয়েত দূতাবাসের রাজকীয় কক্ষে বসেও এ কথা আমার মনে হয়েছে। কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের সোভিয়েত ট্রেড ব্যুরোর বসবার ঘর, ওদের কন্সুলেট্ দেখেও মনে হতো। এই হোটেলের খাবারঘরের ব্যবস্থাতেও সেই ধারণাই জন্মায়। শ্রীযুক্তা বীকভার বাড়িতে অবশ্য একদিকে সহজ বোধ করেছি—স্বচ্ছন্দ পরিবেশ পেয়ে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সকাল সন্ধ্যা ব্যস্ত, এজন্য ঘরবাড়ির পারিপাট্যের বাঁধনে অতটা উৎসাহী হতে তাঁরা

পারেন না। পশ্চিম ইউরোপের জীবনযাত্রায় যে একটা বাঁধা-ধরা ছাঁদ ও কঠিন পারিপাট্যের রীতি আছে, যতোটা জানি, অন্তত ইংরেজ-জীবনে তার নড়-চড় হবার উপায় নেই। কিন্তু আহার-বিহারে ভোজন-শয়নে সেই সযত্ন চর্যা এখানে কোথাও তেমন অনমনীয় নয়। গৃহেও নেই, হোটেলেও নেই। মনে হয়েছে হয়তো সমাজবাদী সমাজে দৈনন্দিন জীবনে কন্‌ভেন্‌শন্, বাঁধাবাঁধি, সাজানো-গোছানো অপ্রয়োজন বোধে লোকে যত্ন করে তা চর্চা করে না। হয়তো বুর্জোয়া ভ্যালুর এ-দিকটা এখানে ক্ষীণায়ু হয়ে পড়েছে অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো। প্রাণ দিয়ে এরা এখনো সমাজ গড়ছে, যত্ন করে তা সাজাতে মন দিতে পারছে না। সমাজটাকে ঢেলে সাজাতেই ব্যস্ত, সাজাতে-গুছাতে পালিশ লাগাতে সময় পায় নি। অল্প সময়ের মধ্যেও যা চোখে না পড়ে পারে নি তা হলো রুশ জীবনের আনকন্‌ভেন্‌শেনাল, ঢিলে-ঢালা শিথিল-গতি ভাবটা। আমাদের দেশেও আমরা তার সঙ্গে পরিচিত—যতোই তাতে আরাম পাই তাতে আমি একটু হতাশও হই। এ হোটেলের বাসন-পত্র, টেবল-সজ্জা, পরিবেশন-রীতি সব কিছুতেই একটু অবহেলার ভাব। সেবক-সেবিকাদের গতায়াতে, পরিবেশনে যাকে বলে প্রোম্‌ট্‌নেস ও স্মার্টনেস্—তৎপরতা ও চট্‌পটে ভাব, তা ততো নেই। অথচ এদেশের লোক কঠিন পরিশ্রমী; জীবিকায়, কাজকর্মে, বিজ্ঞানে, কারুবিদ্যায় তো অসতর্কতা ও শিথিলতার অবকাশ নেই। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে হলো হয়তো বা এখানে এরা মনে করে প্রয়োজনটা মিটলেই যথেষ্ট। প্রয়োজনের অতিরিক্তও যে পারিপাট্য তার দিকে দৃষ্টি লোকে আগে দিতে পারত না, সেই অভ্যাসে এখনও দৃষ্টি দেয় না। এ কথায় সত্য যে কিছু আছে তার প্রমাণ পরেও পেয়েছি, দেখেছি। আমরা নিজেরাও তো এ বিষয়ে নিষ্পাপ নই—স্পুৎনিকের দেশে ঢিলেমি তবু অপ্রত্যাশিত।

একটি পরিপূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা কাটল মস্কো মহানগরীতে। বৈজ্ঞানিকের চোখ একটি সামান্য cross-section থেকে একটা সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পায়—বিচিত্র মানবজীবন ও মানবজগত সম্পর্কে। কিন্তু অনেক দিন বসে সেই চোখকে শিখতে হয় সে ভাবে দেখতে। এক দিনের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার কেন, বৈজ্ঞানিকেরও কিছু বলা শক্ত। এগারোই জানুয়ারির রাত থেকে বারোই জানুয়ারির সমস্ত দিনরাত পর্যন্ত আমার কেটেছে একে-একে টাশকেণ্টের যাত্রীশালায়, মস্কোর এয়ারপোর্টে, উক্রেইনা হোটেলে, মস্কোর

পথে পথে, একটি মহাসংগ্রহশালায়, এবং শেষে একটি পরিবারের সঙ্গে একত্র সন্ধ্যাযাপনে। কিছুটা সাধারণ জীবনযাত্রা দেখেছি, কিছুটা গৃহজীবনও। মনে হয় এই শীতের দেশের মানুষ পরিশ্রমী ও সহৃদয়। তবে convention (আচরণের বাঁধাবাঁধি) বা sophistication (সভ্যতার রুচিসূক্ষ্মতার) ধার বড়ো ধারে না। সেজন্য বরং প্রথম দর্শনে একটু অ-মসৃণ বা roughও মনে হতে পারে। ভূগোলে ইতিহাসে মিলে এসব অভ্যাসে পাকা হয়ে গিয়েছে—ঝেড়ে ফেলা যায় নি। পোশাক-পরিচ্ছদেও এই শিথিলতা আছে। থাকবেই বা না কেন? দুর্দান্ত শীতে সকল পরিচ্ছদই তো ঢাকা পড়বে ওভারকোটের তলায়, আলুর বস্তার মতো দেখাবে পল্লবিনী লতাটিও। দু'দিনের অ-কামানো-দাড়ি পুরুষকেও তাই লজ্জাবোধ করতে হয় না। 'জল ছুঁইতে ভয়'। আপাতত শত শত আকাশচুম্বী প্রাসাদের মধ্যে ছোট ছোট ফ্ল্যাটের সহস্র-সহস্র অধিবাসীরা দৈনন্দিন কাজ ও বিশ্রামের একটা সুস্থ ছন্দে নিজেদের ঢেলে দিয়েছে। এর ওপরেও যে ঢেলে সাজা যেতে পারে সে ধারণা থাকলেও সে ধারণাকে এখনো এরা মহামূল্য মনে করে না। আমার তো এই একদিনের দেখায় মনে হলো—একটা যুগের ট্রাডিশন শেষ হয়েছে, জার আমলের উৎকট জাঁক-জমক, আরেকটা যুগের প্রারম্ভ হয়েছে—শ্রমিক যুগের আয়োজন, ট্রাডিশন এখনো গড়ে ওঠে নি। তার জন্য আবার কতটা দায়ী এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, কতটা জাতীয় চরিত্র, তা বুঝি না।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—আমার প্রথম দিনের মস্কো জীবনও তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে গেল।

হামলা

জন স্টাইনবেক

কালিফোর্নিয়ার এই ছোট্ট শহরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। খাবার-গাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকদুটি বড়ো বড়ো পা ফেলে উদ্ধত ভঙ্গিতে অলিগলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। বাতাসে গাজিয়ে-ওঠা ফলের মিষ্টি গন্ধ, গন্ধটা আসছে আশেপাশের চালানী কারখানা থেকে। রাস্তার কোণে কোণে অনেক উঁচুতে নীল আর্কবাতি হাওয়ায় দুলছে। নিচে মাটির ওপর টেলিফোন-তারের ছায়াগুলো নড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। পুরনো কাঠের বাড়িগুলো শান্ত, নিস্তব্ধ। নোংরা জানলা থেকে রাস্তার আলো ম্লান হয়ে ঠিকরে পড়ছে।

লোকদুটি আকারে প্রায় সমান, কিন্তু একজনের বয়স অনেক বেশি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে নীল জীনের পাতলুন। বয়স্ক লোকটির গায়ে জ্যাকেট, অপরজন পরেছে গলাবন্ধ সোয়েটার। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তাদের পায়ের শব্দ কাঠের বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। অল্পবয়স্ক লোকটি হঠাৎ শিস দিতে লাগল—'ছিঁচকাদুনে খোকা আমার, আয়রে, আয়।' শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'দূর ছাই, এই সুরটা সারাদিন মাথার ভেতর ঘুরছে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আর গানটাও অনেক পুরনো।'

তার সঙ্গীটি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছে রুট। সত্যি বল, দারুণ ভয় পেয়েছ!'

একটা নীল বাতির তলা দিয়ে তারা যাচ্ছিল। রুটের মুখটা কেমন কঠিন দেখাল, আড় চোখের দৃষ্টি, বিরক্ত ও বিকৃত মুখের ভঙ্গি। বলল, 'না ভয় পাই নি।' আলোটা পার হয়ে যেতেই তার মুখের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল।—'এ সব বিষয়ে আমি যদি আর একটু পাকা হতাম! তোমার আর কি ডিক্, তুমি তো গা-সওয়া। তুমি আগে থেকেই বুঝতে পারছ কি হবে না হবে। কিন্তু আমি যে একেবারেই আনাড়ী।'

'কাজের ভেতর দিয়েই তোমাকে শিখতে হবে।' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ডিক্ বলল, 'শুধু বই পড়ে সত্যি সত্যিই কিছু শেখা যায় না।'

একটা রেলের লাইন তারা পার হয়ে গেল। একটু দূরে লাইনের ধারে একটা গম্বুজ। ছোট ছোট সবুজ আলো গম্বুজটার গায়ে তারার মতো ছিটিয়ে রয়েছে। রূট বলল, 'কী ভয়ানক অন্ধকার। চাঁদ বোধ হয় দেরিতে উঠবে। এই রকম অন্ধকার রাত্রিতে সাধারণত তাই ওঠে। আচ্ছা ডিক্, প্রথমে কি তুমি বক্তৃতা দেবে?'

'না, তুমি দাও। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। তুমি যখন বক্তৃতা দেবে আমি ওদের লক্ষ্য করব। তাহলে পরে আমার বক্তৃতায় জায়গা বুঝে ঘা দিতে পারব ঠিকমতো। তোমার বক্তৃতাটা তৈরি আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। আগাগোড়া আমার মুখস্থ আছে, প্রত্যেকটি কথা। কাগজে লিখে এটা আমি তৈরি করেছি। অনেকের মুখে শুনেছি যে তারা বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে কী বলবে ভেবে পায় না। তারপর হঠাৎ তারা শুরু করে যেন অন্য কেউ কথা বলছে আর তখন কথা বেরিয়ে আসে রাস্তার হাইড্রেণ্টের জলের মতো হু হু করে। বড়ো মাইক্ শিরেনের মুখে শুনেছি ওর এ-রকম হয়। কিন্তু আমি অনিশ্চিতের ওপর ভরসা রাখি নি, বক্তৃতাটা আমি লিখে তৈরি করেছি।'

একটা ট্রেন আসবার শব্দ পাওয়া গেল। কেমন মরা কান্নার মতো বিশ্রী একটা শব্দ। পর মুহূর্তে বাঁকটা ঘুরতেই ট্রেনের ভয়ংকর আলোটা সোজা এসে পড়ল লাইনের ওপর। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে আলোকোজ্জ্বল কামরাগুলো পার হয়ে গেল একে একে। ডিক্ তাকিয়ে ছিল, ট্রেনটা চলে যেতে খুশিভরা গলায় বলে উঠল, 'না, ট্রেনটায় বেশি লোক নেই। আচ্ছা তুমি না বলেছিলে তোমার বাবা রেলে কাজ করে?'

গলার স্বরে তিক্ততা প্রকাশ না করবার চেষ্টা করে রূট বলল, 'হ্যাঁ রেলেই কাজ করে। ব্রেকম্যান্। জান, আমি এসব কাজ করি টের পেয়ে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে। বাবার ভয় যে চাকরি যাবে। কিছু বোঝে না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বাবা একেবারেই অবুঝ। একেবারে দূর করে দিল!' রূটের গলার স্বরে যেমন একটা নিঃসঙ্গতার সুর। হঠাৎ সে বুঝতে পারল সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার গলার স্বরেই প্রকাশ বাড়ির জন্যে সে কতখানি কাতর। কর্কশ স্বরে সে বলে চলল, 'ওদের মতো

লোকদের নিয়ে এই বিপদ। চাকরি ছাড়া ওরা আর কিছু জানে না। নিজেদের অবস্থা বুঝে দেখবার ক্ষমতাও ওদের নেই। পায়ের শেকলকেই ওরা আঁকড়ে ধরে আছে।'

ডিক্‌ বলল, 'কথাগুলো মনে করে রেখে দাও। চমৎকার বলেছ। এটা তোমার বক্তৃতার একটা অংশ নাকি ?'

'না। কিন্তু তুমি যদি ভালো মনে কর তো ঢুকিয়ে দিই।'

এখানে রাস্তার আলোগুলো অনেক দূরে দূরে। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি লোকাস্ট গাছ দেখে বোঝা যায় যে শহর পাতলা হয়ে এসেছে। এবার গ্রামাঞ্চলের আধিপত্য শুরু হবে। কাঁচা রাস্তার আশেপাশে দু-একটা ছোট ছোট বাড়ি, বাড়িগুলোর সামনে অযত্নরক্ষিত বাগান। 'হা ভগবান!' রুট আবার কথা বলল, 'বেশ অন্ধকার দেখছি। কপালে কি দুর্ভোগ আছে কে জানে। যদি কিছু হয়তো পালাবার পক্ষে ভারি চমৎকার রাত কিন্তু।' জ্যাকেটের কলারের ভেতর থেকে ডিকের নিঃশ্বাস পতনের একটা ভারি আওয়াজ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে হেঁটে চলল দুজনে।

'আচ্ছা, ডিক্‌, তোমার কি মনে হয়—তুমি পালাবার চেষ্টা করবে না তো ?'

'না, বলছ কি ! পালাবার হুকুম নেই। যদি কিছু হয় তো সহ্য করতে হবে। তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। তোমাকে দেখছি ধরে রাখতে হবে, নইলে পালিয়েও যেতে পার।'

রুট রীতিমতো আস্ফালন করে উঠল, 'দু-একবার বাইরে এসেছ বলেই একেবারে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছ, না ? ভাবছ, খুব ভারিক্কী চালে কথা বলা যাচ্ছে।'

ডিক্‌ বলল, 'যাই বল না কেন, কানের পর্দা কিন্তু আমার নেই।'

মাথা নিচু করে রুট হাঁটছিল। নরম গলায় শুধলো, 'ডিক্‌ তুমি ঠিক জান যে তুমি পালাবে না ? জোর করে বলতে পার যে ওখান থেকে এক পাও না নড়ে তুমি মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারি। আগেও আমি এ কাজ করেছি। আর আমাদের ওপর হুকুমও তাই, নয় কি ? এতে যে খানিকটা প্রচারের কাজ হয় তা তো ঠিক।' অন্ধকারে রুটের মুখটা ঠাহর করে সে আবার বলল, 'বল তো একথা কেন

তুমি জিজ্ঞেস করছ? তোমার বুঝি ভয় হচ্ছে যে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে? তা যদি হয় তো ফিরে যাও। তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না।'

ক্লট কেঁপে উঠল, 'শোন ডিক্, তুমি ভালো লোক বলেই বলছি। কাউকে বোলো না কিন্তু। বলবে না তো? এ ধরনের পরীক্ষা আমার ওপর আগে আর হয় নি। ধরো কেউ যদি লাঠি মেরে আমার মুখটা ফাটিয়ে দেয়—তখন আমি কী করব তা আগে থেকে জানব কি করে? জোর করে কেউ বলতে পারে কি তেমন অবস্থায় সে কী করবে? আমার মনে হয় না আমি পালাব। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টাই করব।'

'ঠিক আছে। এসব কথা থাক এখন। কিন্তু জেনে রাখ, তুমি যদি পালাবার কিছুমাত্র চেষ্টা করো তো তোমার নাম আমি উড়িয়ে দেব। ভীরু কাপুরুষদের জায়গা এটা নয়। কথাটা তোমার মনে থাকবে তো?'

'হয়েছে, হয়েছে, তোমার সর্দারি থামাও তো। কথাটা বলে বলে যে একেবারে তেতো করে ফেললে।'

লোকাস্ট গাছের সারি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। বাতাসে গাছের পাতার খস্ খস্ শব্দ। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ওপাশের একটা উঠোন থেকে কুকুর ডাকছে। পাতলা একটা কুয়াশার স্তর নেমে আসছে বাতাসের ভেতর দিয়ে। আকাশের তারাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ডিক জিজ্ঞেসা করল, 'সব ঠিকঠাক করে এনেছ তো? আলো? বই? তোমার ওপরেই সব ভার ছিল কিন্তু।'

ক্লট বলল, 'সারা বিকেল ধরে এই সমস্ত কাজ করেছি। শুধু পোস্টারগুলো এখনো মারা হয় নি। ওখানে একটা বাকসের ভেতর ওগুলো আছে।'

'বাতিতে তেল আছে তো?'

'অনেক তেল তো ভরা ছিল। আচ্ছা ডিক আমার মনে হচ্ছে কোনো হতভাগা নিশ্চয়ই খবরটা ফাঁস করে দিয়েছে। কী মনে হয়?'

'দিয়েছে বৈকি। এসব খবর সব সময়েই কেউ না কেউ ফাঁস করে।'

'আচ্ছা, আমাদের ওপর হামলা হতে পারে এমন কোনো খবর তুমি শোন নি?'

'কী আপদ! আমি কোত্থেকে শুনব বলতে পার? তুমি কি মনে কর যে ওরা আমাকে এসে বলবে যে আমার মাথার খুলিটা ওরা উড়িয়ে দিতে

চায় ? সাবধান স্কট। ভয়ে জামাকাপড় খুলে পড়বার মতো অবস্থা হয়েছে তোমার। তুমি দেখছি আমাকে সুদ্ধু ভয় পাইয়ে দেবে।'

দুই

একটা নিচু চতুষ্কোণ বাড়ির কাছাকাছি ওরা এল। বাড়িটা কালো আর জমাট বলে মনে হচ্ছে। পাশের গলিপথটা কাঠের, চলবার সময় শব্দ উঠল ভীষণভাবে। ডিক বলল, 'এখনো কেউ আসে নি দেখছি। চল ঘরদোর খুলে আলো জ্বালিয়ে বসা যাক।' বাড়িটায় আগে একটা দোকান ঘর ছিল। শো-কেসের কাঁচগুলো ধুলোতে ঢেকে গেছে। কাঁচের একপাশে লাগানো একটা লাকিস্ট্রাইক পোস্টার, অন্য পাশে কার্ডবোর্ডের তৈরী প্রকাণ্ড কোকা-কোলা মহিলা-মূর্তিটি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। দুই-পাল্লা দরজাটা ঠেলে ডিক্ ভেতরে ঢুকল। দেশলাই বার করে কেরাসিনের বাতিটা জ্বালাল তারপর ঠিকভাবে বসিয়ে বাতিটা একটা উলটানো আপেলের বাক্সের ওপর রেখে বলল, 'এস স্কট, জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক করে রাখি।'

ঘরের দেওয়ালগুলো এবড়োখেবড়ো, চুনকামের কাজটা ঠিকভাবে করা হয় নি। এক কোণে ধুলোপড়া স্তূপীকৃত খবরের কাগজ ঠেলে রাখা হয়েছে। পেছনের জানলাদুটোয় মাকড়সার জাল। তিনটা আপেলের বাক্স ছাড়া দোকানঘরটার ভেতর আর কিছু নেই।

একটা বাক্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্কট প্রকাণ্ড একটা পোস্টার টেনে বার করল—চড়া লাল আর কালো কালিতে আঁকা একটা মানুষের মূর্তি। পিন মেরে পোস্টারটা সে আটকাল আলোর পেছনে দেওয়ালের গায়ে। তারপর ঠিক পাশেই আর একটা পোস্টার আটকাল—সাদা পটভূমির ওপর লাল প্রতীক-চিহ্ন। সবশেষে আর একটা আপেলের বাক্স উলটিয়ে এক গাদা ইস্তাহার আর কাগজের মলাট দেওয়া বই জড়ো করে রাখল। চলাফেরা করবার সময় অনাবৃত কাঠের মেঝের ওপর জোরে শব্দ হচ্ছে। স্কট বলল, 'অন্য আলোটাও জ্বালিয়ে দাও না ডিক্ ! কী বিশ্রী অন্ধকার।'

'অন্ধকারকেও ভয় করতে শুরু করেছ নাকি ?'

'না। এক্ষুনি লোকজন এসে পড়বে। তখন তো আলো চাই। কটা বেজেছে বল তো ?'

ডিক্ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'পৌনে আটটা। অন্তত দু-একজনের তো এবার এসে পড়া উচিত।'

জ্যাকেটের বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইস্তাহার জড়ো করা বাক্সটার পাশে সে গা এলিয়ে দাঁড়াল, বসবার মতো কিছু ঘরের ভেতর ছিল না। কালো আর লাল কালিতে আঁকা মূর্তিটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। আর রুট ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের গায়ে।

হঠাৎ একটা বাতির আলো হলদে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কমতে লাগল। এগিয়ে এসে বাতিটার ওপর ঝুঁকে ডিক্‌ বলল, 'তুমি না বলেছিলে যথেষ্ট তেল আছে। এটা তো দেখছি খালি।'

রুট বলল, 'আমি ভেবেছিলাম যথেষ্ট আছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না। ওই বাতিটায় প্রায় ভর্তি তেল আছে। খানিকটা তেল এই বাতিটায় ঢেলে নিয়েই তো হয়।'

'সেটা কী ভাবে করা যায় বল তো? তেল ঢালতে হলে দুটো বাতিই নিবিয়ে ফেলা দরকার। তোমার কাছে দেশলাইয়ের কাঠি আছে?'

পকেট হাতড়ে রুট বলল, 'মাত্র দুটো।'

'তবেই দেখ। ওই একটা বাতিতেই সভার কাজ চালাতে হবে। আমার উচিত ছিল বিকেলের দিকে একবার ঠিকঠাক করে দেখে নেওয়া। অবিশ্যি তখন আমি শহরে ব্যস্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম এ কাজটুকু তোমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'আচ্ছা, এই বাতিটা থেকে খুব তাড়াতাড়ি খানিকটা তেল পাত্রতে ঢেলে নিয়ে তারপর সেই তেলটা ওই বাতিতে ঢাললেই হয় তো।'

'হ্যাঁ, তারপর আগুন লাগিয়ে একটা কাণ্ড বাধাও আর কি। তোমার মতো লোকের সাহায্য নিতে হলেই হয়েছে!'

রুট আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'এবার ওরা এসে পড়লেই তো হয়! কটা বেজেছে ডিক্‌?'

'আটটা বেজে পাঁচ মিনিট।'

'তবে কী হলো ওদের? দেরি করছে কেন? আটটার সময় আসতে বলেছিলে তো?

'বাবারে বাবা, থামো তো একটু। জ্বালিয়ে মারবে দেখছি। ওদের কী হয়েছে সেটা আমার জানবার কথা নয়। হয়তো ওদের আসবার ইচ্ছে নেই। খানিকক্ষণ একটু চুপ করে থাকো তো দেখি।' তারপর জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট আছে রুট?'

'না'।

চারদিক নিস্তব্ধ। শহরের যে দিকটা কেন্দ্রস্থল সেখানে মোটর যাতায়াত করছে। ইঞ্জিনের গোঙানি আর মাঝে মাঝে হর্নের শব্দ। কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে একটা কুকুর একঘেয়ে ডেকে চলেছে। বাতাসে লোকাস্ট গাছের পাতায় ঝর ঝর শব্দ।

'শোন ডিক্! গলার স্বর শুনতে পাচ্ছ? বোধ হয় ওরা আসছে।'

দুজনে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল।

'কই, কিছু শুনছি না তো। ওটা তোমার শোনার ভুল।'

একটা নোংরা জানলার কাছে গিয়ে রুট বাইরের দিকে তাকাল। ফিরে এসে একবার দাঁড়াল ইস্তাহারগুলোর সামনে। তারপর আবার সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল সেগুলো।

'কটা বেজেছে ডিক্?'

'থামো তো। পাগল করে ছাড়বে দেখছি। এসব কাজে খানিকটা সাহস দরকার। দোহাই তোমার, একটু সাহসের পরিচয় দাও।'

'তুমি তো জান ডিক্, আমি এর আগে আর কখনো বেরোইনি।'

'একথা তো যে কেউ বলতে পারে। অবিশ্যি তুমি অনেকবারই বলেছ কথাটা।'

দমকা বাতাসে ঝর ঝর শব্দ করে উঠল লোকাস্ট গাছের পাতাগুলো। সামনের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়ে একটা কবাট খুলে গেল আস্তে আস্তে। ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটু। খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকে কোণের স্তূপীকৃত নোংরা খবরের কাগজগুলো ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল, দেওয়ালে আঁটা পোস্টার দুটোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল পর্দার মতো।

'দরজাটা বন্ধ কর রুট···আচ্ছা খোলাই থাক। তাহলে ওদের আসার শব্দটা আরও ভালোভাবে শোনা যাবে।' তারপর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।'

'ওরা আসবে তো? যদি না আসে তো কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করব?'

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বয়স্ক লোকটি বলল, 'অন্তত সাড়ে নটার আগে এই জায়গা ছেড়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। মিটিং করবার জন্যে আমরা এসেছি।'

খোলা জানলা দিয়ে রাত্রির শব্দ আরও স্পষ্টভাবে ভেসে আসছে—

শুকনো পাতার খসখসানি, কুকুরটার একঘেয়ে ডাক। দেওয়ালে আঁটা লাল আর কালো কালিতে আঁকা মূর্তিটা অস্পষ্ট আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে, আর তলার দিকটা খুলে গিয়ে দুলছে বাতাসে। ডিক্ তাকিয়ে রইল সেদিকে। শান্ত স্বরে বলল, 'শোন রুট, আমি জানি তুমি ভয় পেয়েছ। যখনই ভয় হবে ওর দিকে তাকিয়ে দেখো।' আঙুল দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে আবার সে বলল, 'ও কিন্তু ভয় পায় নি। ওর কথাটা মনে রেখো।'

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে রুট বলল, 'তুমি কি মনে কর যে ও কোনোকালেই ভয় পায় নি?'

তীব্র ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ডিক্ ফুঁসে উঠল, 'যদি পেয়েও থাকে তো সেটা কেউ জানতে পারে নি। ওর কাছ থেকে অন্তত এই শিক্ষাটুকু তুমি নিও। এ ভাবে সবার কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করলেও চলবে।'

'তুমি সত্যিই ভারি ভালো লোক, ডিক্। আমাকে যখন একা বেরোতে হবে তখন যে কী করব জানি না।'

'কিচ্ছু ভেব না, তুমি ঠিক পারবে। আমি বলছি পারবে, সে যোগ্যতা আছে তোমার, এখন শুধু দরকার খানিকটা অভিজ্ঞতা।' দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে রুট বলল, 'ওই কে যেন আসছে, শুনতে পাচ্ছ না?'

'আবার সেই কথা! আসবার হলে ঠিকই আসবে।'

'আচ্ছা, দরজাটা বন্ধ করে দিই না। জায়গাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ওই শোন! নিশ্চয়ই কেউ আসছে।'

রাস্তায় দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ক্রমে শব্দটা দ্রুততর হলো, কে যেন দৌড়ে আসছে। লম্বা কোট গায়ে, মাথায় চিত্রকরের টুপি, একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভেতর ঢুকে বলল, 'ভাল চাও তো লম্বা দাও। একদল লোক আসছে হামলা করতে। মিটিংএ কেউ আসছে না। ওরা তো তোমাদের কথা মোটেই ভাবছে না! কিন্তু আমি তা পারলাম না। তাড়াতাড়ি! জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। দলবল এসে পড়ল বলে।'

রুটের মুখটা বিবর্ণ আর কঠিন দেখাল। সন্ত্রস্ত হয়ে সে তাকাল ডিকের দিকে। অন্তজন কেঁপে উঠল, হাত দুটো ঢোকাল বুক-পকেটের ভেতর, কাঁধ ঝুলে পড়ল।

'ধন্যবাদ', সে বলল, 'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি যাও, আমরা ঠিক আছি।

লোকটা বলল, 'ওরা তো তোমাদের কথা মোটেই ভাবছে না।' মাথা নেড়ে ডিক্ বলল, 'তা তো বটেই। তবে কী জান, ওরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। ওরা অন্ধ। আচ্ছা এবার তুমি পালাও, নইলে ধরা পড়বে।'

'তার মানে তোমরা আসছ না? তোমাদের জিনিসপত্র আমিও কিছু কিছু নিয়ে যেতে পারি।'

শুকনো গলায় ডিক্ বলল, 'আমরা এখানেই থাকব। সেই হুকুমই আছে আমাদের ওপর। হামলা সহ্য করতেই হবে।' লোকটি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বল তো আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি।'

'নাঃ দরকার নেই। হয়ত অন্য কোনো সময়ে তোমার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।'

'আচ্ছা বেশ, আমার যা সাধ্যি আমি করলাম।'

তিন

ডিক্ এবং রুট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল লোকটির পায়ের শব্দ কাঠের গলিটা পার হয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই রাত্রির শব্দ—শুকনো পাতার খসখসানি, দূরে শহরের কেন্দ্রস্থলে মোটরের যাতায়াত।

ডিকের দিকে তাকাল রুট। বুক-পকেটের ভেতরে লোকটির দুই হাত যে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে। মুখের মাংসপেশী টান হয়ে উঠেছে কিন্তু তবুও সে হাসল রুটের দিকে তাকিয়ে। হাওয়ায় পোস্টার দুটো একবার নড়ে উঠে আবার লেগে রইল দেওয়ালের গায়ে।

'ভয় হচ্ছে, না?'

প্রথমে রুট চেষ্টা করল ভয়ানকভাবে প্রতিবাদ করতে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে, শোনো ডিক্, আমি বোধহয় এ কাজের উপযুক্ত নই।'

হিংস্রভাবে ডিক্ বলল, 'সাবধান রুট! নিজেকে সামলাও!' তারপর ডিক্ কয়েক লাইন উদ্ধৃতি শোনাল: 'যারা সহজেই ভেঙে পড়ে তাদের সামনে দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। অন্যায়কে প্রকাশ করতে হবে.

সাধারণ মানুষের কাছে। মনে আছে তো রুট, এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ।' কথাটা বলে আবার সে চুপ করল। কুকুরটা হঠাৎ জোরে চিৎকার করে ওঠে।

রুট বলল, 'বোধ হয় ওরা আসছে। আচ্ছা ডিক্, ওরা কি আমাদের খুন করে ফেলবে?'

'না, সাধারণত ওরা খুন করে না।'

'কিন্তু ওরা আমাদের ওপর লাথিঘুষি চালাবে তো। লাঠির বাড়ি মারবে মুখের ওপর, নাক ভেঙে দেবে। বড় মাইককে জানি, ওর চোয়াল তিন জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল।'

'সাবধান রুট! নিজেকে সামলাও! আর একটা কথা মনে রেখো। যখন কেউ তোমাকে আঘাত করে, সে আঘাত আসলে সেই লোকটি করছে না, করছে এই সমাজব্যবস্থা। আর আঘাতটা তোমার ওপর নয়, আমাদের আদর্শের ওপর। কথাটা মনে থাকবে তো?'

'ডিক্, পালাতে আমি চাই না। দিব্যি গেলে বলছি। যদি আমি পালাবার চেষ্টা করি, আমাকে ধরে রেখো। রাখবে তো?'

কাছে এগিয়ে এসে রুটের কাঁধে হাত রেখে ডিক বলল, 'আমি বলছি তুমি ঠিক থাকবে। মানুষ চিনি আমি।'

'আচ্ছা, ওই বইগুলো লুকিয়ে ফেললে হয় না? এখানে থাকলে তো ওরা পুড়িয়ে ফেলবে।'

'না—হয় তো ওদেরই মধ্যে কেউ একজন একটা বই পকেটে নিয়ে গিয়ে পরে পড়বে। তাতেও খানিকটা কাজ হবে। বইগুলো ওখানেই থাকুক। আর কথা বলাটা এবার বন্ধ কর। এ সময়ে কথা বলে কোনো লাভ হয় না!'

কুকুরটা আবার সেই আগের মতো একঘেয়ে ডাকছে। একটা দমকা বাতাসে কতকগুলো শুকনো পাতা খোলা দরজাটার সামনে এসে পড়ল। ছবিটা উড়ছে, একটা কোণ খুলে গেছে দেওয়াল থেকে। রুট এগিয়ে এসে আবার ঠিকমতো লাগিয়ে দিল ছবিটা। শহরের দিকে কোথায় যেন একটা মোটর ব্রেক কষেছে। 'কিছু শুনতে পাচ্ছ ডিক? কী মনে হয়, ওরা আসছে?'

'না।'

'জান ডিক্, বড় মাইক ভাঙা চোয়াল নিয়ে দু-দিন পড়েছিল, তারপরে লোকজন ওকে তুলে নিয়ে আসে।'

বয়স্ক লোকটি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল। একটা মুষ্টিবদ্ধ হাত বেরিয়ে এল জ্যাকেটের পকেট থেকে। রুটের দিকে তাকিয়ে ঘোঁচ হয়ে গেল চোখ দুটো। তারপর হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'মন দিয়ে শোন, একটা কথা বলি। আমি নিজেও বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু এ ধরনের পরীক্ষা আমার ওপর আগেও হয়েছে। একটা কথা আমি খুব জোর গলায় বলতে পারি, সত্যিই যখন আঘাত আসে তখন তা কাবু করতে পারে না। কেন পারে না আমি জানি না, কিন্তু পারে না। যদি ওরা তোমাকে খুন করেও ফেলে তাহলেও টের পাবে না।' কথাটা বলে সে সামনের দরজায় দিকে এগিয়ে গেল, এদিক ওদিক তাকিয়ে কান পেতে শুনল, তারপর আবার ফিরে এল ঘরের ভেতর।

'কিছু শুনতে পেলে ?'

'না, কিছু না।'

'কেন ওরা আসছে না বলতে পার ?'

'আমি কি করে জানব বল ?'

একবার ঢোঁক গিলে রুট বলল, 'হয় তো ওরা আসবে না। হয় তো ওই লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে, এমনি একটু ঠাট্টা করে গেল আর কি।'

'হতেও পারে।'

'আচ্ছা, আমরা সারারাত অপেক্ষা করব নাকি যাতে ওরা এখানে এসে আমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে !'

ডিক্ ভেংচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, সারারাত অপেক্ষা করব যাতে ওরা এসে আমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে।'

একটা দমকা হাওয়া হিংস্রভাবে আছড়ে পড়ল, তারপরেই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কুকুরটার চিৎকার থেমে গেছে। ক্রশিং-এর মুখে একটা ট্রেনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে ট্রেন চলে যেতেই রাত্রিটা আগের চেয়েও নিস্তব্ধ মনে হলো। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে ঘড়ির এ্যালার্ম বাজছে। ডিক্ বলল, 'কাকে যেন এর মধ্যেই কাজে বেরোতে হবে। বোধ হয় রাতের পাহারাওলা।'

'কটা বেজেছে ডিক ?'

'সোয়া নটা।'

'কী কাণ্ড ! মাত্র সোয়া নটা। আমি ভেবেছিলাম ভোর হতে চলেছে।

ওরা এসে যা করবার করে গেলেই তো পারে, কি বল ডিক্ ? ওই. শোন! পায়ের শব্দ, না ?'

দুজনে কান পেতে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেরই মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'গলার স্বর শুনতে পাচ্ছ ডিক্ ?'

'তাই মনে হচ্ছে। খুব চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে বোধ হয়।'

কুকুরটা আবার ডেকে উঠল। এবারের ডাকটা খুবই হিংস্র। অনেক লোকের কথাবার্তার অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। রুট বলল, 'দেখ ডিক্, পেছনকার ওই জানলার ওপাশে কাকে যেন দেখলাম বলে মনে হলো।'

বয়স্ক লোকটি অস্বস্তিভরা মুখভঙ্গি করে বলল, 'তাহলে আর আমাদের পালাবার উপায় নেই। জায়গাটা ওরা ঘেরাও করেছে। নিজেকে সামলাও রুট। এবার ওরা আসছে। মনে রেখো, ওরা নয়, সমাজব্যবস্থা।'

তারপরেই অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। সশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকল একদল লোক—অগোছাল বেশভূষা, মাথায় কালো টুপি, হাতে ডাণ্ডা আর লাঠি। ডিক এবং রুট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—উদ্ধত চিবুক ; চোখের দৃষ্টি নামানো, প্রায় বোজা। ভেতরে ঢুকে এসে হামলা-কারীরা অস্বস্তি বোধ করছে। দুজনের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সকলে, ভুরু কোঁচকানো, সকলেই অপেক্ষা করছে কেউ কিছু একটা করুক।

ডিকের দিকে আড়চোখে তাকালো রুট। ডিক তাকিয়ে আছে তার দিকে, মুখে কোনো রকম ভাবের প্রকাশ নেই, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কম্পিত হাত-দুটো পকেটের আড়ালে রেখে একরকম জোর করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল রুট। ভয়ে গলাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, চিৎকার করে সে বলে চলল, 'কমরেড্স্, আমাদের মতোই মানুষ তোমরা। আমরা ভাই ভাই'—ভারি শব্দ তুলে একটা ডাণ্ডার বাড়ি এসে পড়ল তার মাথার একপাশে। হাঁটু চেপে বসে পড়ল রুট ; তারপর হাতের ওপর ভর দিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল লোকগুলো।

আস্তে আস্তে দুই পায়ে রুট আবার উঠে দাঁড়াল। কানের পাশটা ফেটে গেছে, রক্তের স্রোত ফিনকি দিয়ে নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে। মুখের একদিক লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আবার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল—চোখে

মুখে আবেগ ফুটে উঠেছে, হাত দুটো আর কাঁপছে না, গলার স্বর জোরালো ও প্রখর, দুই চোখে দারুন এক উত্তেজনা।

চিৎকার করে সে বলল, 'তোমরা কি দেখতে পাওনা? এ সব তোমাদের জন্যেই, তোমাদের জন্যেই একাজে আমরা নেমেছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা কী করছ, তা তোমরা জান না!'

'খতম করো এই লাল ইঁদুরগুলোকে।'

কে যেন পাগলের মতো অনর্গল হেসে উঠল। আর তারপর এল সেই ঢেউ। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে রুটের চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে ডিকের মুখটা ভেসে উঠল। চাপা আর কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠেছে ডিকের মুখে।

চার

কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে সে নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করল। ডিকের গলা ভেসে এল পাশ থেকে।

'জেগেছ নাকি?'

কথা বলবার চেষ্টা করে রুট বুঝতে পারল, গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে আসছে। বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওরা কিন্তু তোমার মাথাটা তাক করেছিল বেশ ভালোভাবেই। আমি তো তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তখন নাক সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলে সেটা মিথ্যে হয় নি, ওটা আর কোনোদিন ভালো হবে না।'

'আচ্ছা ডিক তোমাকে কী করেছিল ওরা?'

'ও, একটা হাত আর পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙে দিয়েছে। শোনো, একটা জিনিস তোমাকে শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে কিভাবে মাটিতে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। ওতে চোখদুটো বাঁচে।' একটু থেমে খুব সাবধানে একবার নিশ্বাস নিয়ে আবার বলল, 'পাঁজরার হাড় ভেঙে গেলে নিশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হয়। আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে। পুলিশ আমাদের তুলে নিয়ে এসেছে।'

'তা হলে ডিক্ আমরা কি এখন জেলের ভেতরে আছি নাকি?'

'হ্যাঁ। জেল হাসপাতালে।'

'আমাদের নামে কী লিখেছে ওরা?'

রুট শুনতে পেল হেসে উঠতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে ডিক্ টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছে। ডিক্ বলল, 'দাঙ্গার উত্তেজনা সৃষ্টি। মাস ছয়েক জেল হবে বোধ হয়। সেই বইগুলো পুলিশের হাতে পড়েছে।'

'শোন ডিক, তুমি ওদের বোলো না কিন্তু যে আমি এখনো নাবালক।'

'না বলব না। তুমি বরং কথা বলা বন্ধ কর। তোমার গলার স্বরটা কেমন মিইয়ে গেছে। ভয় পেও না, ব্যাপারটা সহজভাবে নাও।'

রুট চুপ করে রইল। কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার সে কথা বলল, 'জান ডিক্, আমার একটুও ব্যথা লাগেনি। ভারি অদ্ভুত। আগাগোড়া আমি দাঁড়িয়েছিলাম—কিছু বুঝতে পারি নি।'

'শোন রুট, তুমি চমৎকার কাজ করেছ। আমি যতো লোককে দেখেছি তাদের কারও চেয়ে কম নয়। কমিটিতে আমি তোমার নাম করব। সত্যি চমৎকার কাজ করেছ তুমি।'

রুট প্রাণপণে চেষ্টা করল একটা কিছু মনে করতে, তারপর বলল, 'ওরা যখন আমাকে মারছিল, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমি গ্রাহ্য করি না।'

'ঠিকই তো। তোমাকে আমি এই কথাই বলেছিলাম। আসলে ওরা কিছু নয়, আমাদের দেখতে হবে সমাজব্যবস্থাকে। ওদের ওপর কোনো ঘৃণা আমাদের নেই—ওরা এখনো কিছু জানে না।'

জড়ানো গলায় রুট কথা বলল—যন্ত্রণাটা আচ্ছন্ন করেছে তাকে—'তোমার মনে আছে ডিক্, বাইবেলে এক জায়গায় আছে ওদের ক্ষমা কোরো, ওরা জানে না ওরা কী করছে।'

কঠোর স্বরে ডিক্ জবাব দিল, 'ও সব ধর্মের বুলি ছেড়ে দাও রুট।' তারপর সে উদ্ধৃতি দিল, 'জনসাধারণকে নেশাচ্ছন্ন করবার আফিম হচ্ছে ধর্ম।'

রুট বলল, 'নিশ্চয়ই, আমি জানি। কিন্তু আমি তো ধর্মের কথা বলি নি। ঠিক এই কথাটা আমার তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। তখন ঠিক এই রকমই মনের ভাব হয়েছিল আমার।'

প্রবীণদের কর্তব্য

গালিনা উলানোভা

আমাদের তরুণরা তাঁদের ক্ষমতা প্রকাশের অবাধ সুযোগ ও অধিকার উপভোগ করে থাকেন। নতুন গুণীদের উদ্ভবে পার্টি আজ আগের চেয়েও বেশি যত্নশীল।

অভিজ্ঞতা ও কাজ সত্ত্বেও যদি প্রবীণেরা পিছিয়ে পড়েন, নতুনের চেতনা হারিয়ে ফেলে তাঁরা যদি আমাদের যুগোপযোগী উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পারেন তবে তাঁদের উচিত হবে নবীনদের পথ ছেড়ে দেওয়া—প্রবীণ ও তরুণদের মিলিত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ক্রুশভের এই উক্তি খুবই যথার্থ।

তরুণদের স্মরণ রাখতে হবে যে অধিকারের সঙ্গে সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্বও তাঁদের আছে। কর্তব্যের সচেতনতা, বিবেকের নির্দেশ তাঁদের জীবনে যেন গৌণ না হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ আমি প্রবীণদের কর্তব্যের বিষয়েই কিছু বলা দরকার মনে করছি। একথা বলা প্রয়োজন যে তরুণদের সৃজনশীল কাজের প্রগতিমূলক তাৎপর্য আমরা সর্বদা দেখি না।

তাদের কাজে অন্বেষণ, অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি এবং প্রাপ্তি সমেত বিকাশের যে প্রক্রিয়াটি রূপ নেয় আমরা অনেক সময়ই তার প্রতি অন্ধ থাকি।

ভ্রান্তিটা ততো বড় কথা নয়, প্রাপ্তিটা কিন্তু ফলপ্রসূ। মহান ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যখন আসে তখন শিল্পকে তারা এগিয়েই নিয়ে যায়।

বাহান্ন বছর বয়স্কা প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী গালিনা উলানোভার এই লেখাটি বেরোয় এ বছরের জুন মাসে ইজভেস্তিয়া পত্রিকায়। অনুবাদের সময় কয়েকটি পংক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে—তাতে প্রধানত কয়েকজন ব্যালেশিল্পীর নাম, কয়েকটি ব্যালে ও সঙ্গীতের কথা ছিল। মূল বক্তব্য ও বিষয়ের কোনোই বদল তাতে হয় নি।

উলানোভা তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত ব্যালের কথা বললেও তাঁর মত সাহিত্য, শিল্প, নাট্য ও সঙ্গীতের জগতেও সাড়া তুলেছে।

একেক সময় আমরা তাড়াহুড়ো করে বলে বসি—নতুন শিল্পী ভুল পথ নিয়েছেন। আসলে কিন্তু শিল্পী তখনো তাঁর পথে পা ফেলেন নি। তিনি তখন কেবল প্রচেষ্টায় রত। কেবলমাত্র শুরু করেছেন। আর তাঁর পথটি, মোটেই সুগম নয়।

আমাদের কর্তব্য, তাঁর পথে সৃজন-বিমুখ কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি নয়, তার উল্টোটা। শিল্পে যারা নবাগত তাদের জন্য সবচেয়ে অনুকূল অবস্থাই আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

তা বলে হট-হাউসের পরিবেশ নয়। সহজ স্বাভাবিক অনুকূল কার্যোপযোগী পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেকেরই গুণ প্রকাশ পাবে এবং তা স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পাবে।

আমাদের সব প্রয়াস এই কাজেই যুক্ত হওয়া চাই। আসলে আমাদের সবার অন্বেষণের লক্ষ্য এক। "দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব" (antagonism of generations) আমাদের নেই। তা থাকতেও পারে না।

কিন্তু তবু কখনো কখনো তরুণদের পথে গুরুতর বাধা দেখতে পাই। কেন?

হয়তো প্রবীণরা যথেষ্ট সহনশীল নন। নিজেদের সাফল্যের মোহে—সে সাফল্য কখনো প্রকৃত, কখনো কল্পিত—আমরা নিজেদের ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে বলে মনে করি।

কিন্তু আমরা এখন জেনেছি কেউই ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাছাড়া তরুণরা যদি তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চায়, আমাদের ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, জীবনে যে নতুন স্বতঃস্পষ্ট অথচ শিল্পে যাকে ধরা কঠিন তাকেই ধরতে যায়—তবে আমাদের দুঃখ না করে আনন্দ করাই চাই।

একথা মানতেই হবে যে নতুনের চেতনা, নতুনকে জানার বিশেষ ক্ষমতা প্রায়ই আমাদের তুলনায় তরুণদের মধ্যেই বেশি প্রতীয়মান।

শিল্পে তরুণ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ও প্রকাশে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আসলে তারাই হলো আমাদের উত্তরসূরী, তারাই তো সোভিয়েত-যৌবন।

তরুণরা তাদের কাজের দ্বারা আমাদের জীবনধারা ও তার ভিতটিকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

নবাগত যে সে তার তরুণবয়সবশত সোভিয়েত পরিবেশেই শিল্পী হয়ে

উঠেছে। এই পরিবেশটিতে সে অবশ্যই অনুরক্ত। আমাদের মর্মের (spirit) বিপরীত বা আমাদের মহান উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু সে কখনো সৃষ্টি করতে পারে না।

সেইজন্যই যারা অনুসন্ধানী, অন্বেষী—হয়তো তারা মাঝে মাঝে ভুল করে, কিন্তু তবু যৌবনের প্রশংসনীয় জেদ নিয়ে সোভিয়েত শিল্পে তারা নিজেদের পথ খুঁজে নিতে চায়—তাদের বিরুদ্ধে নালিশ আমার কাছে, খুব কম করেই বলছি, অদ্ভুত ঠেকে।

তাদের এই পথ এখনো সম্পূর্ণ রূপ নেয় নি। কিন্তু সে পথ যে নিয়েছে সে কখনোই মনে করে না যে তারটাই একমাত্র ঠিক পথ, সে যা আবিষ্কার করেছে সেটাই 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' এবং সবার পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য।

সেটা খুবই ভালো। কারণ তার ফলে অনেক নতুন আবিষ্কার, অনেক কৌতূহলজনক সুতরাং তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

লেবেল আঁটার কাজটা খুবই সহজ। যেমন ইগর বেল্‌স্কি এবস্ট্রাক্টবাদে ভুগছেন, ইউরি গ্রিগরোভিচ মডার্নিস্ট কথাটা বলে দিলেই হলো।

যে ক্ষেত্রটি আমার সুপরিচিত সেই ব্যালের নিদর্শনই দিচ্ছি। বলছি কোরিয়োগ্রাফারদের কথা যাঁরা সবে এ কাজে হাত দিয়েছেন।

একথাও বলি বেল্‌স্কি আর গ্রিগরোভিচ আজ আর একা নন। এবং আমার মতে সেটা সৌভাগ্যের কথা।

তাঁরা একা নন কারণ আমাদের দেশে কেউই, বিশেষ করে যিনি গুণী, কখনোই একা পড়ে থাকতে পারেন না। যৌথতা (collectivism) এবং কমরেডশিপ হলো সোভিয়েত চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁরা একা নন। আমাদের কোরিয়োগ্রাফির ক্ষেত্রে এখন দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ক্ষমতার বহু শিল্পী, বহু নতুন নাম।

'মডার্ন' কথাটা ভালো। তার আক্ষরিক মানে হলো—সবচেয়ে হালের, সমসাময়িক, আজকের।

কেবল পরোক্ষ অর্থেই তা নেতিবাচক, এমন কি অপবাদের মতো শোনায়—যখন তার দ্বারা অত্যধিক পরিশীলিত অস্বাভাবিক বুর্জোয়া শিল্পের কথা বোঝানো হয়।

আমাদের কোরিয়োগ্রাফারদের বেলায় এই অর্থ প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কথাটার আক্ষরিক অর্থেরই নিকটবর্তী।

"মডার্ননিজম"[১] ব্যালের ঐতিহ্যগত সাজের অভাবে নেই, রয়েছে অর্থ, আইডিয়া এবং অনুভূতির অভাবে।

বাইরের 'পোশাকের' লক্ষণে কিছুই প্রকাশ পায় না।

প্রকাশ পায় আইডিয়ায়, বিষয়ে (content), প্রকাশ পায় নাচে। আবেগ ও চিন্তার অন্তস্থ গুণটি ফোটানোয় কোরিয়োগ্রাফারের ক্ষমতা।

বেল্‌স্কির "সুখের তীর" বা শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত সুরকারদের সিমফনিক সঙ্গীতকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা আমার মোটেই এব্‌স্ট্রাকশনিজম বলে মনে হয় নি। এ হলো সমসাময়িক মানুষের অনুভূতিকে অত্যন্ত সাধারণীকৃত (generalised) কিন্তু সম্পূর্ণ সুতরাং প্রত্যয়যোগ্য ভাবে প্রকাশের প্রয়াস। বেল্‌স্কি চাইছেন নৃত্যের প্রচলিত রীতিতে অনুভূতির বাস্তবতা ফোটাতে। তাতে সফলও হচ্ছেন, যদিও সব সময় নয়।

গ্রিগরোভিচের 'পাথরের ফুল' এবং 'প্রেমের কাহিনী' ব্যালে দুটির "বিষয় আধুনিক নয়।" কিন্তু তারা রচিত হয়েছে আধুনিক মানুষের দ্বারা এবং হাল-আমলের সঙ্গীতের সাহায্যে।

'মডার্ন' কথাটির সব অর্থই তাতে রূপ পেয়েছে। সেটা ভালো কি মন্দ? আমার মতে ভালো। তার কারণ কোরিয়োগ্রাফার যা খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকটাই চিন্তাসমৃদ্ধ, তাতে প্রাণ আছে।

অবশ্যই যে অন্বেষণে স্নব্‌পনা (snobbishness) নেই, যা শুধু নতুন কিছু করার উদ্দেশেই কিছু একটা খুঁজে বের করা নয়—তাকেই আমরা সমর্থন করি।

সেইজন্যই আমি ফলপ্রসূ পরীক্ষার পক্ষে, তরুণদের পুরোপুরি প্রকাশের সুযোগ দেবার পক্ষে। যদি তারা তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে না করে, যদি তাদের 'ছোঁয়াচ'[২] লাগে, তবুও।

কারণ সেটাও যৌবনের পক্ষে স্বাভাবিক। তরুণদের সব কিছুর মধ্যে দিয়েই যেতে দেওয়া হোক। আমাদের প্রবীণ কমরেডরা এবং আমরাও যেমন গিয়েছি ক্লাসিকসকে নস্যাৎকারী বিদ্রোহ এবং এক্রোবেটিক্‌স্‌-এ উৎসাহের মধ্যে দিয়ে। কালের গতিতে, জীবন ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই আমরা আতিশয্যকে বাদ দিয়েছি। এই সব আতিশয্যও অবশ্য কিছু ফল দেয়। যেমন দ্বৈতনাচের[৩] ঘটায় অসাধারণ ব্যাপ্তি। সৃষ্টি করেছে নতুন জাতের নাচিয়ে, নতুন ধরনের ব্যালে-নায়ক।

তার উদ্ভব জীবন থেকেই। নতুন কাল জীবনে ও মঞ্চে মেয়েলী স্বভাবের ভীরু তরুণদের বাতিল করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত করে বলিষ্ঠপ্রকৃতি বিপ্লবী মানুষের সাহস, স্বচ্ছতা আর সৌন্দর্য।

রঙ্গমঞ্চে তার প্রতিমূর্তি গড়ে ওঠে। দেখা দেয় নতুন ব্যালে। তা হলো নাট্য ও নৃত্যের সমন্বয়।

নাট্যের প্রতি অতি উৎসাহবশে ব্যালের প্রধান প্রকাশমাধ্যম যে নাচ তাকেই ত্যাগ করার বিপদও তখন দেখা দেয়।

বাস্তবতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলে ঠিক উল্টো ফলই আমরা তখন পাই। কখনো কখনো আবশ্যিক এবং মনোহারী রীতি, ব্যালেশিল্পের সাধারণ প্রকৃতিকেই বিসর্জন দেওয়া হয় নেচারালিজমের কাছে।

সেটা খারাপই হয়েছিল। এবং তার প্রতিবাদও দেখা দেয়।

তরুণরা চায় তাদের কালের ছন্দ ও ভঙ্গি ধরতে: উত্তেজিত ছন্দ, কখনো কখনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কৌণিক ভঙ্গি।

সে সময়ে ভালো যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং এখন যা খুঁজে বের করা হচ্ছে—তারা লুপ্ত হবে না, বিকাশ পাবে। যা অতিরিক্ত, মূল ছাড়া, তা খসে পড়বে, বিস্মৃত হবে।

সব মহা শিল্পীই নতুনের সন্ধানে দুর্গম কিন্তু নিজস্ব পথ বেয়ে এগোন জ্ঞানের দিকে। এই উপলব্ধির দিকে যে প্রকৃত শিল্প সর্বদাই সরল, সহজ এবং গভীর মানবিকতায় ভরা। আর তা সর্বদাই আধুনিক।

সেটাই আমাদের কালের প্রয়োজন, আমাদের যুগের মর্মের উপযোগী।

তাই যা কিছু নতুন ও প্রগতিশীল তাদের সমর্থন করাটা দরকার।

সেই কারণেই আমাদের রয়েছে বিরাট দায়িত্ব, সোভিয়েত শিল্পের ভবিষ্যৎ যে তরুণরা তাদের ভাগ্যের প্রতি প্রবীণদের দায়িত্ব।

প্রশংসা ও নিন্দার প্রথম কথাটা তরুণরা আমাদের কাছ থেকেই শুনতে চায়।

প্রকৃত গুণী যাঁরা তাঁরা সৃজনশীল জীবনে নিজেদের স্থান পাবেন কিনা, আত্মিক মূল্য সৃজনে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁরা সক্ষম হবেন কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর।

প্রবীণদের কর্তব্য হলো তরুণদের সঙ্গে মিলে ক্লাসিকাল নৃত্যরীতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে বাঁচিয়ে রাখা, তা না হলে নাচের বিশুদ্ধ রূপ লোপ পাবে। সেই

সঙ্গে, যে নৃত্যধারা সংরক্ষণযোগ্য ভবিষ্যতের জন্য তাকে রক্ষা করা, তার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটানো। যাতে ক্লাসিসিজমের সমৃদ্ধ ভূমিতে নতুন কিছু গড়ে উঠতে পারে।

প্রবীণদের কর্তব্য হলো তরুণদের সাহায্য করা। তাদের সঙ্গে মিশে নতুন বিষয় খোঁজা। নতুন রূপ ও নতুন ভাবের অন্বেষণে তরুণদের নির্ভয়ে সমর্থন করা।

তরুণদের গুণের সহায়তা করলে পরই আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য সাধন করতে পারব—আমাদের কালের নায়কদের নিয়ে ব্যালে রচনা।

অনুবাদ : শুভময় ঘোষ

১। "নিন্দার্থে"—অনুবাদক

২। বিদেশের প্রভাবের কথাই বোধহয় বলা হচ্ছে—অনুবাদক

৩। Pas de deux

বাংলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

নীরেনবাবু তাঁর ২৫শে জুন তারিখের চিঠিতে আমার অনুবাদপদ্ধতির উপরই অন্যায় রূপে আক্রমণ করেছেন, তাই উত্তর দিতে বাধ্য হলুম। আমি আমার ১৫ই জুন তারিখের চিঠিতে পরিষ্কার দেখিয়েছি, কবিবর শেলীর ও আমার অনুবাদপদ্ধতি এক। আমার এই উক্তি উনি খণ্ডন করেন নি, কিন্তু শেলীকে আক্রমণ করার সাহস ওঁর হলো না, করলেন আমাকে।

তবে উনি একটি কথা ঠিকই লিখেছেন যে আমি জার্মান্ প্রায় মাতৃভাষার সমানই জানি। তাই সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই 'রাফায়েলে'র উক্তিটির মূল উদ্ধৃত করে, তার অন্বয় ও অবিকল অনুবাদ গদ্যে দিচ্ছি :

মূল

Die Sonne toent nach alter Weise
In Brudersphaeren Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Staerke,
Wenn keiner sie ergruenden mag ;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.

অন্বয়

১। Die Sonne [সূর্য] toent ['ধ্বনি করছে,' 'গান করছে'-ও হয়, ফাউস্তের উপর জার্মান্ টিকা ও সাহিত্যের অনুসারে 'ধ্বনি করছে' এখানে প্রযোজ্য]

nach alter Weise [পূর্বের মতন]

২। In Brudersphaeren [ভ্রাতাদের মণ্ডলে]

Wettgesang [গানের দ্বন্দ্ব],

৩। Und [এবং] ihre [তাহার অর্থাৎ সূর্যের]
Vorgeschriebne [পূর্ববিহিত] Reise [ভ্রমণ, এখানে বিশ্বভ্রমণ]

৪। Vollendet [সমাপ্ত করছে] sie [সে অর্থাৎ সূর্য]
mit [সহিত] Donnergang. [বজ্রের গতি]।

৫। Ihr [ইহার] Anblick [দর্শন] gibt [দেয়]
den Engeln [দেবদূতদিগকে] Staerke [বল বা শক্তি],

৬। Wenn ['যখন' এখানে 'যদিও'] keiner [কেহই নয়] sie
ergruenden [ইহার রহস্য বা তত্ত্ব বুঝতে বা তার অন্তরে প্রবেশ করতে] mag ; [পারে] ;

৭। Die unbegreiflich [কল্পনাতীত] hohen [উচ্চ বা মহান]
Werke ['কর্মসমূহ' এখানে 'সৃষ্টিসমূহ']

৮। Sind [হয়] herrlich [অপূর্ব বা বিস্ময়কর] wie [যেমন]
am ersten Tag. [প্রথম দিনে]।

গদ্যে অনুবাদ

সূর্য পূর্বেরই মতন ভ্রাতাদের মণ্ডলে গানের দ্বন্দ্বে ধ্বনি করছে আর বজ্রের গতিতে তার পূর্ববিহিত বিশ্বভ্রমণ সমাপ্ত করছে। এই দৃশ্য দেখে দেবদূতগণ বলবান হচ্চে যদিও কেহই ইহার তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তোমার কল্পনাতীত মহান সৃষ্টিসমূহ আজও তেমনি অপূর্ব বা বিস্ময়কর যেমন প্রথম দিনে ছিল।

আমার অনুবাদের প্রথম ছত্রটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম শব্দে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনলে সেটা দাঁড়ায় এই :

ভ্রাতৃমণ্ডলে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনিগতিতে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান।
কল্পনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান।

ইহা অবিকল ও প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ, যদিও আমি দাবি করি না যে আমি আক্ষরিক অনুবাদ করি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে আশা করছি, প্রথম ছত্রটাও থাকবে, কাজেই তাতে প্রথম দুই ছত্র হবে এই :

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ—
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন

প্রথম ছত্রটি লিখলুম কেন? কারণ শুধু "ভ্রাতৃমণ্ডলে" লিখলে অনেক বাঙালীর ধারণা হতে পারে এর অর্থ বুঝি, সূর্য ধ্বনি করতে করতে গ্রহমণ্ডলেই ঘুরছে, কারণ আমাদের কাছে সূর্য নবগ্রহের একটি গ্রহ, "ভ্রাতৃসম মহা-জ্যোতিষ্কগণ" বলায় তৎক্ষণাৎ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ও অসংখ্য জ্যোতিষ্ক তারাগুলির সুবিশাল দৃশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ও তার সুসংগতির শান্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অথচ "তারা" বা "তারাদল" শব্দটা ব্যবহার করতে হলো না, যা মহাকবি গ্যোতে স্বয়ং ব্যবহার করেন নি। তাঁর বিশ্বপ্রেমিক হৃদয় পশু, পক্ষী, মৎস্যকেও মনুষ্যের এবং মহাকাশের সকল তারাকে সহধর্মী সূর্যের ভ্রাতা জ্ঞান করত। এই বিরাট কল্পনার শান্তভাবের রসটা নষ্ট হয়ে যায় যদি শুধু "তারা" কথাটা ব্যবহার করি, যা প্রথমে করেছিলাম। তাই সে কবিতা বর্জন করে এই কবিতা রচনা করেছি, কিন্তু নীরেনবাবু এই দুই রচনার প্রভেদ বুঝতে পারলেন না, উনি শুধু আমার প্রতি শ্লেষবাক্য নিক্ষেপ করলেন।

আমার সমস্ত অনুবাদকাব্যই এইরূপে মূলতঃ আক্ষরিক অনুবাদ। শুধু যেখানে যেখানে বাঙালীর জন্যে অন্তর্নিহিত ভাব রস ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন বোধ করেছি সেই সেই স্থলে অতিরিক্ত যথাযথ শব্দ ব্যবহার করে এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়েছি বা পদটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছি, কিন্তু মূলের ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে যেমন উপরে করেছি। এর ফলে বাংলা ফাউস্ত সকল শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সহজবোধ্য হয়ে গেছে। নীরেনবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ফাউস্ত' কঠিন নাট্যকাব্য আর ইহাও অবিদিত নয় যে গ্যোতের ফাউস্ত ভালো করে বোঝা এমন কি সাধারণ জার্মানের পক্ষেও কঠিন। বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি, তাঁরা 'ফাউস্তে'র ইংরাজি অনুবাদ পড়ে ভালো বুঝতে পারেন নি। আমি এই কঠিন জার্মান নাট্যকাব্য, যা বিশ্বসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন, সহজ, সরল,

সরল বাঙলা ছন্দে সর্বপ্রথম বাঙালীকে পরিবেশন করেছি। ইতিমধ্যেই বাঙলার বহু সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলির আলোচনায় ও বহু সুধীজনের মন্তব্যে বুঝেছি এর ছন্দ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অনেকের মতে ইহা বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পদ হয়েছে, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মহাশয়, যিনি জার্মান ভালো জানেন, মূলের সঙ্গে তুলনা করে এটি অধ্যয়ন করে অযাচিতভাবে আমাকে একপত্রে এর উচ্চপ্রশংসা করেছেন ও বলেছেন বঙ্গভাষীমাত্রেরই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে আমি সর্বপ্রথম 'গ্যোতে'র শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসাস্বাদন করা বাঙালীর পক্ষে সম্ভব করেছি। আর নীরেনবাবু এই বহুজন-প্রশংসিত প্রায় তিনশত পাতার নাট্যকাব্যের মাত্র দুটি ক্ষুদ্র কবিতা (তার মধ্যে মাত্র একটি গীতিকবিতা, অপরটি নয়) বেছে নিয়ে, তার শুধু "গ্রন্থনমিল" ঠিক গ্যোতের মতন হয় নি বলে আমার অনুবাদপদ্ধতিই আক্রমণ করে এর মুণ্ডপাত করতে উদ্যত হয়েছেন। এরই নাম সমালোচনা?

আমি ভূমিকাতেই স্পষ্ট লিখেছি, যা নীরেনবাবু স্বীকার করেছেন, আমি 'গ্যোতে'র ছন্দও অনুকরণ করার চেষ্টা করি নি, কারণ আমি জানতুম তাতে করে আমার ছন্দ তো আড়ষ্ট হতোই, সেটা না হতো গ্যোতের ছন্দ, না বাঙলা ছন্দ। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ভাষার মহাকবির ছন্দও অনুকরণ করার চেষ্টার লোভ সম্বরণ করেছি বলেই আমার ছন্দ সরল, সরস, স্বচ্ছন্দপ্রবাহ ও অনুবাদগন্ধশূন্য হয়েছে। কিন্তু মূলের ধ্বনি আমার কানে সব সময়ে ছিল বলে বহুস্থানে ধ্বনির আশ্চর্য মিল হয়েছে, যে কথার উল্লেখ তাঁর উপক্রমণিকায় সুনীতিবাবু করেছেন, আর গীতিকবিতাগুলির শুধু ধ্বনিতে মিল হয় নি, ছন্দ গঠনেও বহুলাংশে স্বতঃই মিল হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল কোনো বাহাদুরী বা নামযশ কেনা নয়, বাঙালীর চিরাভ্যস্ত ছন্দে মূল ফাউস্ত বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করে এর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, বাঙালী একে সাদরে গ্রহণ করেছে, তাই এর দ্বিতীয় সংস্করণও এত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হবে, যাতে আশা করি প্রথম সংস্করণের সকল রকম দোষত্রুটি বিদূরিত হবে। এই সংস্করণেই আমি গ্যোতের কত নিকটে এসেছি তা বোঝার ক্ষমতা নীরেনবাবুর নেই, কারণ উনি নিজেই স্বীকার করেছেন, বহুকাল পূর্বে অর্জিত ওঁর সামান্য জার্মান জ্ঞানও আজ মরচে ধরে গেছে, কাজেই উনি চৈত্রের পরিচয়ে ঠিকই লিখেছেন, "কানাইবাবুর এই অনুবাদ সমগ্রভাবে জার্মানের সহিত মিলাইয়া

পড়িবার যোগ্যতা আমার নেই।" হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের এ যোগ্যতা আছে, তিনি কী বলেছেন তা উপরেই উল্লেখ করেছি। আর সম্প্রতি অযাচিত ভাবে পূর্ব জার্মেনীর সমাজবাদী সরকার এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, তাঁদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তাঁরা জেনেছেন আমার অনুবাদ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে। ইহা সুবিদিত, জার্মান বিশেষজ্ঞ মানে তিনি মাতৃভাষা তো বটেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও ভালো রকম বোঝেন। সুতরাং এ থেকে আমি নিশ্চিত হতে পারি আমার অনুবাদপদ্ধতি যথার্থই সমুচিত।

আমি সম্যকরূপে অবহিত, চণ্ডীদাস হতে কাজি নজরুল অবধি বাঙলার বরেণ্য কবিগণের বিপুল সাধনার ফলে, বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপ্রমেয় অবদানের ফলে, বাঙলার কাব্যভাণ্ডার ইংরাজি বা জার্মান কাব্য ভাণ্ডারের সমতুল্য। ইহা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ যে বাঙলায় সাবলীল ছন্দ লেখার সম্ভাবনায় আমার আস্থা কম, তাহলে এত সুধীজনের অভিমতে আমি প্রায় তিনশ পাতার সাবলীল ছন্দ লিখলুম কি করে?

বাঙলার এইসব বরণীয় কবিদের অজস্র কাব্যসুধাধারার বর্ষণের ফলে বাঙলার কাব্যসাহিত্যের উর্বর ভূমিতে বহু বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আর এর প্রত্যেকটি ছন্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতা রচনা করেছেন, শুধু তাই নয় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বহু নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেছে। তাই আজ বঙ্গভাষার সকল প্রকার কবিতার ছন্দ, হোক তা গদ্যপদ্য বা ছন্দবদ্ধ পদ্য, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় আর প্রতি শ্রেণীর সাধারণ নিয়ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে, আর সেই পুস্তক পথপ্রদর্শক হয়েছে। এখন বাংলা ছন্দের ওপর কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি কেউ কী অনুবাদের ক্ষেত্রে, কী স্বকীয় রচনার ক্ষেত্রে কবিতা লিখতে চান তো এইসব নিয়মের সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তবে যদি তিনি চেষ্টা করেন, আর ছন্দ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তবেই তা হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল হবে। এই উপায়ে কবিতা রচনা করাকেই আমি "খাঁটি বাংলা পদ্ধতি" বলি, আর এইরূপে রচিত ছন্দকে "খাঁটি বাংলা ছন্দ" বলি।

এ অতি সহজ কথা। কিন্তু নীরেনবাবু লিখেছেন, "খাঁটি বাঙলা পদ্ধতি বলিতে, কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে, তিনি (অর্থাৎ আমি) কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমার (অর্থাৎ নীরেনবাবুর) বুদ্ধির অগম্য।" তা তো বটেই! তাই তিনি

বাঙলায় ছন্দ গঠনের নিয়ম উপেক্ষা করে, গ্যোতের ছন্দ নাকি অনুকরণ করে, রাফাএলের এক অনুবাদ-কবিতা লিখে ফেলেছেন ও তাহা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত করেছেন। সেটি হলো এই :

গাহিছেন সূর্যদেব, সনাতন সংক্রমণে,
প্রতিদ্বন্দ্বী তারাদলে সদর্প সঙ্গীত,
সমাপিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত আবর্তনে
বজ্রের গর্জনসাথে, যথা নির্ধারিত।
দেবগণ বলদৃপ্ত এ প্রোজ্জ্বল দৃশ্যেতে,
যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে,
সৃষ্টির অচিন্ত্য কীর্তি এ বিপুল বিশ্বেতে
তেমনই মহিমময় যেমন আদিতে।

উনি ইহা রচনা করেছেন শুধু আমাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে, অর্থাৎ আমাকে শেখাবার জন্যে :

১। কি করে বাঙলায় সাবলীল ছন্দ লেখার সম্ভাবনায় আমার আস্থা বৃদ্ধি করে, আমি গ্যোতের আরো নিকটে আসি।

২। "ফাউস্তে"র মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে ভাষায়, ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা যায়।" এ ওঁর ভাষা, চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত।

৩। "চেষ্টা করিলে খাঁটি বাঙলা ভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অধিকাংশে অবিকৃত রাখা যায়.।" ইহাও ওঁর ভাষা, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। সম্ভবত এইটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে উক্ত অনুবাদ-কবিতা লিখেছেন।

এখন দেখা যাক্ এইসব মহৎ সঙ্কল্প কতদূর কার্যে পরিণত হয়েছে!

(ক) প্রথমেই দেখা যাক্ ওঁর আক্ষরিক অনুবাদ কেমন হয়েছে? এই আট ছত্রের কবিতায় ১৬টি এমন সব বাঙলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার জার্মান প্রতিশব্দ মূলে নেই, যথা :

(১) দেব (২) সনাতন (৩) সংক্রমণে (৪) প্রতিদ্বন্দ্বী (৫) তারাদলে (৬) সদর্প (৭) চিরাভ্যস্ত (৮) আবর্তনে (৯) গর্জন (১০) দেবগণ (১১) প্রোজ্জ্বল (১২) দৃপ্ত (১৩) দ্যোতনা (১৪) কীর্তি (১৫) বিপুল (১৬) বিশ্বেতে।

অর্থাৎ প্রতি ছত্রে গড়ে দুটি করে "বলদীপ্ত" বাঙলা শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে যার জার্মান প্রতিশব্দ মূলে নেই। এই হলো আক্ষরিক অনুবাদের নমুনা ?

(খ) এখন এর ছন্দের স্বরূপ আলোচনা করা যাক্। উনি যার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন, সেই "মিলগ্রন্থন" গ্যোতের ছন্দের মতন হয়েছে, নিঃসন্দেহে। বস্, এইখানেই গ্যোতের ছন্দের সঙ্গে মিলও শেষ হলো !

গ্যোতের এই অনবদ্য কবিতার ছন্দ হচ্ছে জার্মান 'ফিয়েরটাকৃটের।" অর্থাৎ যার প্রতি ছত্রে চারটি প্রস্তরিত দল [syllables] ও চারটি অপ্রস্তরিত দল থাকে। কিন্তু গ্যোতে এর প্রথম ছত্রে চারটি প্রস্তরিত দল ও পাঁচটি অপ্রস্তরিত দল দিয়ে ও পরের ছত্রে চারটি প্রস্তরিত ও চারটি অপ্রস্তরিত দল দিয়ে, আর এরই লয় সৃষ্টি করে, এই ছন্দে এক অপূর্ব হিল্লোল এনেছেন, যা পাঠকের হৃদয়মনেও দোলা দেয়। কই, নীরেনবাবুর গ্যোতের অনুকরণে লেখা এই ছন্দে এই অপূর্ব দোলার তো কোনো চিহ্নও নেই ! বা এতে গ্যোতের ছন্দই বা কোথায় ? এই কি সদর্পে ঘোষিত, "চেষ্টা করিলে খাঁটি বাঙ্গলাভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অধিকাংশে অবিকৃত রাখা যায়" এই উক্তির নমুনা ?

আর উনি কি বাংলা ছন্দ লিখেছেন না অন্য কিছু ? তাহলে এটা কী ছন্দ হলো ? গদ্যপদ্য, মুক্তক বা অমিত্রাক্ষর নয়, তাতো বুঝলাম। কিন্তু এ কি পয়ার ? দীর্ঘপয়ার ? মাত্রাবৃত্ত না লৌকিক ? এরও কোনোটাই নয়। অর্থাৎ এ হলো না গ্যোতের ছন্দ না কোনো প্রচলিত বাংলা ছন্দ !

(গ) এখন দেখা যাক ওঁর অনুবাদটা কেমন হলো ?

মূলের সঙ্গে তুলনা করলে এই আট ছত্রের অনুবাদে এগারটি ভুল হয়েছে, তার মধ্যে দুটি মারাত্মক ভুল। যথা :

(১) "সূর্যদেব" লেখা ভুল। গ্যোতে "সূর্য"কে দেবত্ব দেন নি, ওঁরও তা দেবার অধিকার নেই।

(২) "সনাতন সংক্রমণে" লেখা ভুল। মূলে আছে "পূর্বেরই মতন।" এই শব্দ দুটি উনি কোথা হতে আমদানি করলেন ?

(৩) "সদর্প" শব্দ ব্যবহার করা ভুল। এর কোনো ভাব মূলে কোথাও নেই।

(৪) "সমাপিয়া"—ভুল। মূলে আছে "সমাপ্ত করছে," যা পদ্যে হবে "সমাপিছে।"

(৫) "চিরাভ্যস্ত"—এ শব্দের ব্যবহার ভুল। এর কোনো ভাব মূলে নেই।

(৬) "আবর্তনে"—এ শব্দের ব্যবহার ভুল। এর কোনো ভাব মূলে নেই। মূলে আছে "পূর্ববিহিত বিশ্বভ্রমণ"। উনি "চিরাভ্যস্ত আবর্তনে" এই শব্দ দুটি কোথা হতে আমদানি করলেন ?

(৭) "বজ্রের গর্জন সাথে"—ইহা মারাত্মক ভুল। শেলী ঠিক অনুবাদ করেছেন, "with thunder speed"

(৮) "দেবগণ"—ভুল। শেলী ঠিক লিখেছেন—"Angels."

(৯) "যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে"—এ মারাত্মক ভুল। শেলী ঠিক অনুবাদ করেছেন, "Though none its meaning fathom may"। "দ্যোতনা" ও meaning এক কথা নয়। "দ্যোতনা"—এই কথা উনি কোথা হতে আমদানি করলেন ?

(১০) "কীর্তি" এই শব্দের ব্যবহার ভুল। এর ভাব মূলে কোথাও নেই।

(১১) "বিপুল বিশ্বেতে"—এই দুই শব্দের ব্যবহার ভুল। মূলে এর ভাব নেই।

দাঁড়ালো এই মূলের সঙ্গে তুলনা করে এই আট ছত্রের অনুবাদ কবিতায় এগারটি অনুবাদের ভুল, যার মধ্যে দুটি মারাত্মক ভুল, যা মূলের ভাবই বিকৃত করে। এই হলো অবিকল অনুবাদের নমুনা, যার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি গ্যোতের আরো নিকটে আসব ?

(ঘ) এখন দেখা যাক ওঁর ছন্দ কেমন সাবলীল হয়েছে ?

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি গ্যোতের এই অপূর্ব কবিতার শান্তভাবের কথা। ইহাই অনুভব করে কবিবর শেলী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। "প্যানসফি"-দর্শনে বিরাট বিশ্বের যে সুসংগতির কল্পনা আছে তাহাই এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে শুধু কয়েকটি সহজ সরল জার্মান শব্দে। কঠিন শব্দের জন্য প্রসিদ্ধ জার্মান ভাষার একটি কঠিন শব্দও ব্যবহার করেন নি বলেই গ্যোতে এই অপূর্ব শান্তভাব এমন প্রসাদগুণ বিশিষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন। এ যেন উপনিষদে ব্রহ্মবর্ণনা! শেলী এই ভাব তাঁর অপূর্ব অনুবাদে ফোটাতে পেরেছেন, তাই তা পড়ে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু নীরেনবাবুর ঘনসন্নিবেশিত "বলদৃপ্ত" যুক্তাক্ষরগুলি, বিশেষ করে প্রক্ষিপ্ত শব্দ ও ভুল অনুবাদের যুক্তাক্ষরগুলি, "বজ্রের গর্জনসাথে" এই অপূর্ব শান্তভাবের রসটাই নষ্ট করে দিয়েছে। উনি হয়তো মনে করেন ঘন ঘন যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ ব্যবহার করলেই ভাব ও রস যাই হোক, ছন্দ সাবলীল হয়। অধিক টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

কানাইলাল গাঙ্গুলী

পুস্তক পরিচয়

History of the Communist Party of the Soviet Union (মস্কো, ১৯৬০)

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এক নূতন যুগের সূচনা করেছে, বর্তমানে তা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। কিছু কূপমণ্ডুক বা জ্ঞান-পাপী থাকা সম্ভব, কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা কিংবা নীরবতার ষড়যন্ত্র সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যাহত সাফল্যের মুখে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। সোভিয়েত বিপ্লব ক্রমশ দুনিয়ার বৃহত্তম জনসমষ্টিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে কৌতূহল জাগা তাই স্বাভাবিক। শুধু কৌতূহল নয়, প্রশ্নও জেগেছে। বিংশ পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী অনেক ঘটনা অনেকের পুরনো ধারণার মূলে আঘাত করেছে। নিছক ভাবাবেগে যাঁরা অভিভূত, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তবে মনে হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নূতন ইতিহাসে অনেক নূতন তথ্য আছে যা ইঙ্গিতপূর্ণ এবং অশেষ মূল্যবান। কোনো হালকা মন্তব্য করার আগে মনে রাখলে ভাল হয়, এই পার্টি রাশিয়ার জনসাধারণকে তিনটি বিপ্লবে পরিচালিত করেছে; সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্তালিনগ্রাদের বিজয়ী লালফৌজের আত্মা এই পার্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ ধ্বংসলীলার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পার্টির নেতৃত্বে কৃষি ও শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এই পার্টির নৈতিক শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

নূতন ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই পুরনো ইতিহাস (১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত) মনে পড়ে—আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উপর যে বইটির প্রভাব সুবিদিত। দুটি বইয়ের গঠনসজ্জা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি প্রায় এক রকম। দুটি বইতেই লেনিনের বিভিন্ন বই এবং বক্তৃতার সারাংশ উপস্থিত। দুটি বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ দিয়ে। পুরনো বইতে স্তালিনের লেখা এবং বক্তৃতার উদ্ধৃতি অসংখ্য, বইটি শেষ করা হয়েছে স্তালিনের বক্তৃতার একটি অংশ দিয়ে। নূতন

বইতে স্তালিনের লেখা এবং বক্তৃতার উল্লেখ আছে, তবে উদ্ধৃতি সীমিত। ক্রুশ্চেভের লেখা এবং বক্তৃতার উদ্ধৃতি স্বল্প। লেনিনের নামের পাশে সর্বত্রই স্তালিনের নাম নূতন বইতে সাড়ম্বরে উল্লিখিত হয় নি। লেনিনের নামের পাশে ক্রুশ্চেভের নামোল্লেখ চোখে পড়ে না। পার্টির পুরনো নেতাদের সম্পর্কে এবং স্তালিনের অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কিছু নূতন তথ্য নূতন বইতে আছে, যার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে, পার্টির পত্রিকা প্রকাশ এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের কথা নূতন বইতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এঁদের ভূমিকা ভুলে গেলে, কিংবা খাটো করে দেখলে, কিংবা দু একজন বড়ো নেতার অবদান বড়ো করে দেখলে, পার্টির সামূহিক নেতৃত্বের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। নূতন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ কাগজ "ইসক্রা" গড়ে তুলতে যে পেশাদার বিপ্লবীরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবুসকিন, কালিনিন, লিতভিনভ, ক্রুপসকায়া, পেত্রোভস্কি, সৌমিয়ান, স্তালিন, সার্দলভ প্রভৃতি, (পৃঃ ৬৫)। ১৯০৫ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে যে প্রতিনিধিরা লেনিনের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বোগদানভ, ক্রুপসকায়া, লিতভিনভ, লুনাচার্সকি প্রভৃতি (পৃঃ ৯৩)। প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রতিভাবান কূটনীতিবিদ লিতভিনভের নাম ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত হলেও পুরনো ইতিহাসে তাঁর নাম চোখে পড়ে না। ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরে জারতন্ত্রের হিংস্র দমননীতির কঠিন বৎসরগুলিতে যাঁরা মস্কো, পিটার্সবুর্গ, বাকু এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে পার্টির সংগঠন শক্তিশালী করবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তুব্রোভিনস্কি, কালিনিন, কুইবিসেভ, সার্দলভ, জাপারিদজে, অর্জোনিকিদজে, সৌমিয়ান, স্পান্দারিয়ান, স্তালিন (পৃ ১৫৮-৫৯)। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাগ্ সম্মেলনে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, স্তালিনকে তার মধ্যে "কো-অপ্ট" করা হয়; নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, গোলোশচোকিন, অর্জোনিকিদজে, স্পান্দারিয়ান (পৃঃ ১৬৮)। ১৯১২ সালে প্রকাশিত "প্রাভদা" পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে এবং নিয়মিত লেখক হিসাবে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাতুরিন, ক্রুপসকায়া, মলোতভ, সার্দলভ, স্তালিন, গর্কি (পৃঃ ১৭০-৭১)। নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় কমিটির

ঐতিহাসিক অধিবেশনে যে "বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র" গঠিত হয়, তাঁর সভ্য ছিলেন বুবনভ, জারঝিনস্কি, স্তালিন, সার্দলভ এবং উরিতস্কি। লেনিন স্বয়ং ছিলেন এই কেন্দ্রের কর্ণধার (পৃঃ ২৫৩)। পুরনো বইতে যে তথ্য আছে তা এই রকম: বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র স্তালিনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। কি কারণে জানি না কেন্দ্রের অন্যান্য সভ্যদের নাম উল্লিখিত হয় নি (পৃঃ ৩১৮, পুরনো ইতিহাস)। ১৯১৮-২০ সালে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক অভিযান এবং দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের বিদ্রোহের মুখে যখন বিপ্লব বিপন্ন, কমিউনিস্ট পার্টি তখন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বিপ্লবকে রক্ষা করে। শ্রমিক-কৃষকদের মধ্য থেকে একদল নূতন "যুদ্ধ বীর" পুরোভাগ আসেন—প্লুচার, ভরোশিলভ, বুদেনি, চাপায়েভ ইত্যাদি (পৃঃ ৩০৩)। জারিৎসিন রক্ষার অমর যুদ্ধে লালফৌজকে পরিচালিত করেন ভরোশিলভ এবং স্তালিন (পৃঃ ৩০৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জারিৎসিন যুদ্ধজয়ের মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবীরা লেনিনকে গুলিবিদ্ধ করে এবং উরিতস্কিকে হত্যা করে (পৃঃ ৩০৪-৫)। আজারবাইজানে সোভিয়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে অর্জোনিকিদজে, কিরভ, মিকোয়ান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন (পৃঃ ৩২৭)। এই ঐতিহাসিক পর্বে যে নেতৃবৃন্দ পুরোভাগে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আন্দ্রিয়েভ, ক্রুশ্চেভ, মার্ণিক, ঝানভ, মিকোয়ান, ভরোশিলভ, স্তালিন, অর্জোনিকিদজে, কালিনিন, সার্দলভ, কুইবিসেভ প্রভৃতি (পৃঃ ৩৩৮)। প্রদত্ত তালিকায় দুটি নাম নিখোঁজ: মলোতভ এবং কাগানভিচ। ষষ্ঠদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে পূর্বোক্ত নেতাদের কয়েকজন উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, যথা কুইবিসেভ (পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি), অর্জোনিকিদজে (ভারী শিল্পের কমিসার), মিকোয়ান (সরবরাহ বিভাগের কমিসার), ইত্যাদি (পৃঃ ৪৫৮)।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানে স্তালিনের ভূমিকা আদৌ স্বীকার করা হচ্ছে না বলে যে প্রচার চলছে, এই বই পড়ে তা পুরো সত্য বলে মনে হয় না। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে স্তালিনের ভূমিকার খুঁটিনাটি বিবরণ এই ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য স্তালিনের ভূমিকার নূতন মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে স্তালিন বাদে আরো যাঁরা সংগঠন-শক্তি, নিষ্ঠা, সাহস, দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের ভূমিকা গৌণ করে দেখবার অভ্যাস বোধ হয় পরিত্যাজ্য। নূতন ইতিহাসের তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, পুরনো ইতিহাসে স্তালিনের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, অন্যান্য নেতাদের (বিশেষ করে

ক্রুপসকায়া, লিতভিনভ, উরিতস্কি, অর্জোনিকিদজে) ভূমিকার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

নূতন ইতিহাসে স্তালিনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য আছে, যা পুরনো বইতে অনুপস্থিত। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের পতন এবং অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার সময় পার্টির সামনে এক নূতন পরিস্থিতি হাজির হয়। পার্টির বহু কমিটি এবং নেতা অস্থায়ী সরকারকে "জনগণের দ্বারা পরিচালিত" করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্তালিন স্বয়ং "শান্তি স্থাপনের জন্য অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবার" পক্ষপাতী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত সংশোধন করেন। এই প্রসঙ্গে স্তালিন নিজে যা লিখেছিলেন, বইতে তা উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ২১৭)। স্তালিন সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্বে লেখা লেনিনের চিঠি উল্লেখযোগ্য। লেনিন স্পষ্টই সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনকে অপসারণ করবার সুপারিশ করেছিলেন: "think over a way of removing Stalin from that post and appointing somebody else, differing in all other respects from comrade Stalin by one single advantage, namely, that of being more tolerant, more loyal, more polite and considerate to comrades, less capricious, etc." (পৃঃ ৩৮৭)। স্তালিন-চরিত্রের যে দোষগুলি লেনিনের চোখে ধরা পড়েছিল, তা সম্ভবত পার্টির কর্মীদের কাছে মারাত্মক মনে হয় নি, কেননা লেনিনের এই চিঠি প্রতিনিধিরা শোনবার পরে স্তালিনকেই সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত করেন। স্তালিন-চরিত্রের দোষগুলি ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পার্টি এবং জনগণের মধ্যে তাঁর অপরিসীম খ্যাতি তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে তিনি নিজেকে অভ্রান্ত মনে করতে থাকেন। তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। পার্টিতে গণতন্ত্র উপেক্ষিত হয়। ব্যক্তি-পূজা পার্টি এবং রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতিসাধন করে (পৃঃ ৬৭০-৭১)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তি-পূজা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ব্যক্তি-পূজা প্রচলিত হতে পেরেছিল এবং তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্যক্তি-পূজা নিন্দিত হয়, পূজিত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে। এমন কি বেরিয়া (যাকে "political adventurer and scoundrel" বলা হয়েছে) দণ্ড পান স্তালিনের মৃত্যুর পরে।

ব্যক্তি-পূজা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে: স্তালিনের মধ্যে "মারাত্মক দোষ" থাকা সত্ত্বেও তাঁরই নেতৃত্বে কি সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তর নূতন ইতিহাসে পাওয়া যাবে। স্তালিনের অবদান অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাঁর অবদান অতিরঞ্জিত করা ভুল। "ইতিহাস বীরের সৃষ্টি" তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনায় ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেন, জনগণের ভূমিকা তাঁদের কাছে উপেক্ষিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের চমকপ্রদ সাফল্যের উৎস সন্ধান করতে হয় সমগ্র পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ভূমিকার মধ্যে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিযুক্ত সেনাধ্যক্ষদের (বুদেনি, গোভোরভ, কোনেভ, ম্যালিনভস্কি, তিমোশেঙ্কো, সোকোলভস্কি, ভাতুতিন, ভোরোনভ, ভরোশিলভ, জুকভ প্রভৃতির) অসাধারণ দক্ষতার মধ্যে, দেশপ্রেম এবং সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অটুট বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ জনগণের বীরত্ব, ত্যাগ এবং মনোবলের মধ্যে (পৃঃ ৬০০-৬০২)। বীরের ভূমিকা বড়ো করে দেখবার অভ্যাস যাঁদের মজ্জাগত, তাঁদের কাছে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, তবে বস্তুবাদী ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনার বিচারের এই পদ্ধতি সম্ভবত অসঙ্গত মনে হবে না।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে ব্যক্তি-পূজা প্রথম প্রকাশ্যে নিন্দিত হলেও, উনবিংশ কংগ্রেস থেকেই তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৬-৪৮ সালের মধ্যে পার্টিতে গণতন্ত্র প্রসারিত করা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত বৈঠক, আঞ্চলিক এবং শহর পার্টি সংগঠনের নিয়মিত সম্মেলন, পার্টি কমিটিগুলির নিয়মিত বৈঠক, সমালোচনা, আত্মসমালোচনা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় দর্শন, জীববিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব এবং অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হয়। অসংখ্য বৈঠক, সম্মেলন এবং আদর্শগত আলোচনার পরিণতি উনবিংশ পার্টি কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই পার্টির নিয়মাবলীর পরিবর্তনের উপর রিপোর্ট পেশ করেন ক্রুশ্চেভ। এই কংগ্রেসেই পার্টি তার বর্তমান নাম (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি) গ্রহণ করে (পৃঃ ৬২৬-৬৩৪)।

উনবিংশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার চার বৎসর পরে ঐতিহাসিক বিংশ পার্টি কংগ্রেস আহূত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬)। ইতিমধ্যে স্তালিনের মৃত্যু ঘটেছে (৫ই মার্চ, ১৯৫৩) এবং বেরিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে শুধু ব্যক্তি-পূজাই নিন্দিত হয় না। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বিশেষ অবস্থায় শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হয়, যে তত্ত্বগুলির বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিংশ পার্টি কংগ্রেসের সময় পূর্ণ সভ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮ লক্ষ এবং প্রার্থী সভ্যের ৪২ লক্ষ (পৃঃ ৬৬৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধের সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ নূতন পূর্ণ পার্টি সভ্য এবং প্রায় ৫০ লক্ষ প্রার্থী সভ্য পার্টিতে যোগদান করেছিলেন (পৃঃ ৬০৩)।

১৯৫৭ সালের ৭ই নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের চল্লিশ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতির যে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ বিবরণ নূতন ইতিহাসে আছে তার মধ্যে পার্টির আত্ম-প্রত্যয় প্রতিফলিত। চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস থেকে পার্টির প্রধান শিক্ষা এই : "the path of Socialism is the only correct path for the whole of mankind." (পৃঃ ৬৮৫-৯৭)।

লেনিনের প্রায় সমস্ত লেখার সারাংশ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এই বইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং প্রগতিবাদী আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে।

সুনীল সেন

জুনাপুর স্টীল (উত্তরখণ্ড)—গুণময় মান্না। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। দাম নয় টাকা।

একদিকে প্রবীণদের শিল্পের নামে বাণিজ্য, অন্যদিকে তরুণতমদের বিকার-বিলাসে বাংলা কথাসাহিত্যে যখন চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তখন সৎ ঔপন্যাসিকের চারিত্র্যের অভ্রান্ত প্রমাণে গুণময় মান্নার জুনাপুর স্টীল-এর দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের আশ্বস্ত করে। পরিচয়ে ইতোপূর্বে সমালোচিত উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডটির মতো দ্বিতীয় খণ্ডেরও জীবননিষ্ঠ এবং সেই কারণেই পরিণত শিল্পকর্মের মাহাত্ম্য বাংলা উপন্যাসের মেরুদণ্ডহীনতায় সত্যি বিস্ময়জনক।

জুনাপুর স্টীল-এর পটভূমির বিপুল বিস্তার প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রোমান্টিক কেচ্ছাকাহিনীর বৈচিত্র্যসাধনের নিছক অলংকরণের মতো এই পটভূমি আসে নি ; বাণিজ্যিক স্বার্থজর্জরিত আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে শিল্পীর জিজ্ঞাসা এবং জীবনের মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় টানেই একটি বিরাট শিল্পাঞ্চল বিধৃত হয়েছে। সেই সমগ্রতার বিন্যাসেই একদিকে স্যার ধীরানন্দ

মুখার্জী, জুনাপুর স্টীল কোম্পানীর অন্যতম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার টম্সন্ এবং মিসেস টম্সন্, লেবার অফিসার অমরেশ ব্যানার্জী এবং তাঁর মেয়ে সুমিত্রা, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র অনাদি ব্যানার্জী, এস্, আর মিটার, জেনেরাল ম্যানেজারের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট, এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়ে লিলি, মিসেস রয়, সিনিয়র ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রী, জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র সুপ্রকাশ রায়, অ্যাক্‌শন্ কমিটির প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসী নেতা মনোতোষ মুখার্জী এবং তার মেয়ে শংকরী, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ মাধুবন, সোস্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি সমীরমোহন সেন এবং তার স্ত্রী মীনাক্ষী প্রভৃতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র ; অন্যদিকে শিবলাল এবং তার বোন পুষ্প, ব্লাস্ট ফার্নেসের খালাসী অপি সাউ, তার স্ত্রী কান্তু এবং মেয়ে মেনকা, তাদের প্রতিবেশী লছমীকান্ত মিশির এবং তার স্ত্রী সরসতিয়া, লেবার অফিসারের দালাল বনমালী পাল, লেদম্যান করালী বারুই, রামেশ্বর সাহু, শিউপ্রসাদ, সুখন, বোরখা সিং এবং তার স্ত্রী রুক্‌মিনি, রামবিলাস মিশির, পার্বতীচরণ, অভিরাম দাস, কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসরক্ষক আনন্দ এবং পার্টির সেক্রেটারি সেখ ইসমাইল, বরখাস্ত শ্রমিক গদাধর পাণ্ডে, শ্রমিকশ্রেণীর পাত্রপাত্রী—এই সমস্ত অজস্র চরিত্রের চিন্তা, বিশ্বাস আচরণে, ঘটনার সংঘাতে তাদের আবেগপ্রতিক্রিয়ায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেই যেমন সেই জনপদজীবনের জটিলতা প্রাণবন্ত হয়েছে, তেমনি সেই জটিলতায়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলোর ব্যক্তিস্বরূপ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

কোনও রকম সরলীকরণকে প্রশ্রয় দেন নি বলেই গুণময় মান্না বিদেশী ও দেশী মালিকের স্বার্থের সংঘর্ষের জর্জরিত জীবনের দ্বিধা সংশয় বিভ্রান্তি এবং বিশ্বাসের আবেগের বলিষ্ঠতায় শ্রমিকদের আত্মোপলব্ধির প্রয়াসকে গভীর মানবিক সত্যরূপেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, যাতে আঘাত-যন্ত্রণাদীর্ণ সাধারণ জীবনের অসাধারণ মহত্বকে, তার গৌরবময় ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে অনুভব করে আমরা শুদ্ধ হই।

স্পষ্টতই লেখক টলস্টয়ের ওঅর অ্যাণ্ড পীস্-এর প্যাটার্নটিকে অনুসরণ করেছেন : এক একটি দৃশ্যের স্তর পরম্পরায়, ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বের অসংখ্য তরঙ্গের সমবায়ে জীবন-সমুদ্রের বিশাল রূপ রচনায় তিনি নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন। কোনও কোনও দৃশ্য, ঘটনা চরিত্র তো মনে দাগ কেটে যায় : যেমন অন্ধকার রাত্রিতে শিল্পশহর জুনাপুরের রূপ, শ্রমিকদের সাময়িক বিভ্রান্তি

এবং অসামান্য বিশ্বাসের প্রেরণা, এস-ডি-ওর বাংলোর দিকে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা এবং তাদের গুলি করে মারার দৃশ্য, ভোলা যায় না লছমীকান্ত, সুখন, আনন্দ, আত্মগোপনকারী শিবলালের আশ্রয়দাতা বোরখা সিং এবং তার স্ত্রী রুক্মিনিকে, তেমনি অবিস্মরণীয় রুক্ষ কর্কশ, আত্মমর্যাদাবোধ ও সততায় কঠিন অপি সাউ, তার স্ত্রী কাহ্নু ও মেয়ে মেনকা, কাহ্নুর পরিচর্যায় লছমীকান্তের স্ত্রী সরসতিয়ার সন্তান প্রসবের দৃশ্যের রূপকে রক্ত ও অশ্রুতে সিক্ত শ্রমিক জীবনের নতুন সম্ভাবনার উদ্ভাস।

শ্রমিক জীবনের দ্বিধা সংশয়, আত্মোপলব্ধির প্রয়াস কেন্দ্রীয় তাৎপর্যের সংলগ্নতা পায় শিবলালের চরিত্রে, তার আত্মসচেতনতার সমস্যায়। শিবলালই জুনাপুর স্টীল-এর জীবন নাট্যের সূত্রধর। শ্রমিকদের সংগ্রাম তার কাছে নিছক দাবিদাওয়ার ব্যাপার নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশেরই অপরিহার্য স্তর। এ সংগ্রামের শরিক হওয়ার অর্থ আত্মপরায়ণতার মালিন্য থেকে এক গভীর ঐক্যের শুদ্ধতায় চৈতন্যের ব্যাপ্তি, জীবনের পূর্ণতার উপলব্ধি। ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা গলে বিশুদ্ধ হওয়ার চিত্রকল্পে শিবলালের শুদ্ধতা সন্ধানের মোটামুটি একটি সামগ্রিক রূপ অবশ্যই ফুটেছে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতায় তা তীক্ষ্ণ হতে পারে নি বলেই আমাদের প্রত্যাশা ঠিক পূর্ণ হয় না। বনমালী পালের ভাইঝি লীলাকে (লেবার অফিসারের লালসায় আত্মসমর্পণ করেছে বলে যার নামে দুর্নাম রটানো হয়েছে) গ্রহণ শিবলালের শুদ্ধতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু সেটা দ্বন্দ্বের জটিলতায়, শিবলালের চেতনার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আসে না বলেই অনেকটা পরিমাণেই বিবর্ণ। আর শিবলাল তার জীবনের মৌল সত্য সন্ধানের আকুতিতে সুবিধাবাদী কুটিল ষড়যন্ত্রকারী মনোতোষ মুখার্জীর সঙ্গে যে ভাবে একাত্মতা অনুভব করেছে ("শেষকালে এমন হল, ধ্বনির অপরিহার্য প্রতিধ্বনির মতো একজন কথা বললেই আর একজনের হৃদয়ে তার সমর্থন মেলে, এবং একটা কথা ভাববার সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেখলে অন্যে ঠিক সেই কথাটাই বলেছে।" পৃঃ ৩৬৮), তা পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন, বিসদৃশ।

শিবলালের বিশ্বাস প্রত্যয়ের বিপরীত প্রান্তে পাই লেবার অফিসার অমরেশ ব্যানার্জীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং তার জীবনযাত্রায় অনিবার্য শূন্যতাবোধের আশ্চর্য উজ্জ্বল চিত্র। লীলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপনের সামান্য ত্রুটিটুকু ভুলে গিয়েই স্বীকার করতে হয় এই চরিত্রচিত্রণের অসামান্যতা তথা লেখকের জীবনের সমগ্রতাবোধ।

রোমান্টিক মুখরোচক কাহিনীর প্রলোভনে যাঁরা ভোলেন না, কিংবা সাহিত্য সমালোচনার নামে সুবিধাবাদী, পক্ষপাতদুষ্ট, কুরুচিগ্রস্ত মনোভাবের ধৃষ্টতায় বিভ্রান্ত হন না, সেই সমস্ত সৎ পাঠকদের কাছে মানবিক প্রত্যয়নিষ্ঠ লেখক গুণময় মান্নার জুনাপুর স্টীল শুধু পাঠযোগ্য নয়, একটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা হিসেবেই গৃহীত হবে।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

উপন্যাস ও অবক্ষয়

লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। শিরোনামা : আধুনিক উপন্যাসের চেহারা। এই আলোচনায় আধুনিক ইংরাজী উপন্যাস সম্পর্কে এমন কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আলোচনায় বলা হয়েছে যে ১৯৬১ সালের অক্টোবরের শুরু থেকে ১৯৬২ সালের নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত টাইম্‌স্ পত্রিকায় মোট ২৫৬টি উপন্যাস সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের কারও নাম ছাপা হয় নি কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন বয়সের। প্রতি সপ্তাহে তাঁদের হাতে এমন সমস্ত বই বাছাই করে দেওয়া হতো যেগুলো সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বাছাই করতে হতো এই কারণে যে সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকাটি ছিল দীর্ঘ। ১৯৬১ সালে ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ৪৪৮৫টি, ১৯৬২ সালের প্রথম ছ-মাসে ২২৯৯টি। টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে উপন্যাস সমালোচিত হতে পারে পাঁচটি কি ছ'টি। অতএব মাত্র ২৫৬টি উপন্যাস সমালোচিত হতে পেরেছে।

কিন্তু এই ২৫৬টি উপন্যাসের সমালোচনা থেকে কি কোনো সিদ্ধান্ত টানা চলে? টাইম্‌স্ পত্রিকায় সে-চেষ্টা করা হয় নি। তবে সিদ্ধান্ত না করা যাক, সবক'টি সমালোচনা একসঙ্গে পড়ার পরে আধুনিক উপন্যাসের চেহারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা নিশ্চয়ই করা সম্ভব। এই ধারণাটি কী?

দেখা যাচ্ছে, একটি বিষয়ে সকল সমালোচকই একমত। কোনো উপন্যাসই সেই শ্রেণীর নয় যাকে বলা চলে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত বা আলোড়ন-সৃষ্টিকারী। অথচ অল্প কিছুকাল আগেও এই শ্রেণীর উপন্যাস যে একেবারে প্রকাশিত হয় নি তা নয়। অবশ্যই কোনো কোনো উপন্যাসকে সমালোচক এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সাম্প্রতিক উপন্যাস-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো উপন্যাস সম্পর্কেই কোনো সমালোচক বলতে পারেন নি যে এই বিশেষ উপন্যাসটির জন্যেই পাঠকসাধারণ এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। আলোচ্য

সময়কালের মধ্যে এমন উপন্যাস একটিও প্রকাশিত হয় নি যেটি হাতে নিয়ে সমালোচক বলতে পারতেন যে উপন্যাসটি প্রত্যেকটি পত্রিকায় সমালোচিত হবার মর্যাদা দাবি করতে পারে। উপন্যাস সম্পর্কে এই উক্তি শুধু টাইম্স্-এর সমালোচকদের নয়, অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনা-স্তম্ভের দিকে তাকালেও মোটামুটি এই উক্তিকে মেনে নিতে হয়। সাহিত্য-জগতে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়।

সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী? গোড়াতেই বলতে হয়, চিরাচরিত ধরনের কোনো গল্প বা প্লট সাম্প্রতিক উপন্যাসে একেবারেই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে 'তারপরে তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগল'-ধরনের গল্প তো একেবারেই নয়। picaresque খুবই কম, যদিও একেবারে লোপ পায় নি। মজার গল্প প্রায় না-থাকার মতো। ছোটগল্পের বই যদিও প্রকাশিত হয়ে চলেছে কিন্তু খুব যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে তা নয়। চিরাচরিত ধরনে লেখা ছোটগল্প বা শেষ লাইনে চমকসৃষ্টিকারী ছোটগল্প বাজারে এখন আর কাটে না। যে-সব ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায় তাদের তাদের আবেদন খুবই অল্পসংখ্যক লোকের কাছে বা সেগুলো সবই ইমপ্রেশনিস্ট ধরনের লেখা।

সাম্প্রতিক উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ যৌনতা। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উপন্যাসিকরা বাঁধা সড়ক ছেড়ে অনেক সময়েই অলিগলিতে বিচরণ করে থাকেন। শুধু ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি এখন আর উপন্যাসে তেমন কাটছে না, আমদানি করতে হয়েছে উভয় প্রকারের সমকামিতা কিংবা যৌনবিকৃতি, বা যৌন-সন্ত্রাশ বা যৌন-অক্ষমতা। অর্থাৎ, খুন থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষরা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সে-জায়গায় আসর জুড়ে বসছেন এমন সব মানুষ যাঁরা নেশাগ্রস্ত, আত্মহত্যা-প্রবণ, অবৈধ প্রেমে বিশ্বাসী, আতঙ্ক বা বাতিকগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ (বামন, খোঁড়া, কানা ইত্যাদি), পানাসক্ত, স্নায়ুরোগী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে এমন সব মানুষকেও হাজির করা হচ্ছে যারা কোনো সামাজিক অন্যায়ের বলি। কোথাও কোথাও জাতি বা বর্ণবিদ্বেষকে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। ব্যাপারটা প্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ফ্যাশনের মতো। আর সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, উপন্যাসে এমনি ধরনের কথা কিছু থাকলে সমালোচকরা অনুকূল হয়ে ওঠেন।

সাম্প্রতিক কালে বিদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ব্যাপকভাবে অনূদিত হচ্ছে। তার একটি সুফল এই যে উপন্যাসের পাঠকরা এখন অতি অনায়াসেই সারা বিশ্বে বিচরণ করতে পারছেন এবং উপন্যাসের মাধ্যমে এখন বিশ্বের যে-কোনো সমস্যাকে উপস্থাপিত করা চলে।

তবুও শেষ কথাটা এই যে উপন্যাস আর এখন আগেকার মতো জনপ্রিয় নয়। বরং দেখা যাচ্ছে, অনুরক্ত পাঠকদের কাছেও এখন অনেক বেশি কদর জীবনী, ইতিহাস, শিল্প ও ভ্রমণ সম্পর্কিত গ্রন্থের। এই প্রবণতা নিতান্তই সাময়িক তা কিছুতেই বলা চলে না। এই বিশেষ আর্টফর্মটির সূত্রপাত হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তারপরে ভিকটোরীয় যুগ পার হয়ে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাস-সাহিত্য জয়প্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছিল। এবারে কি অবক্ষয়ের পালা?

অপরাজেয় শিল্পসত্তা

১৯১২ সাল। রেনোয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে চলেছিল। তাই দেখে রেনোয়ার বন্ধুরা স্থির করলেন যে রেনোয়ার চিকিৎসার জন্যে কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকবেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের খোঁজখবর করবার জন্যে তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করে সারা ইউরোপে খোঁজখবর করতে লাগলেন।

অনেক বিচার-বিবেচনার পরে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনার একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনা হল। ভদ্রলোককে দেখে পছন্দ হল রেনোয়ার। তার কারণ বোধহয় এই যে এই ভদ্রলোকের চিকিৎসাশাস্ত্রে যতোই পাণ্ডিত্য থাক, শিল্পজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না।

রোগীকে পরীক্ষা করার পরে ডাক্তার কথা দিলেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি রোগীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা-দুটোকে আবার সজীব করে তুলবেন। কথাটা শুনে রেনোয়া শুধু একটু হাসলেন। ডাক্তারের কথাকে তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন, তা হয়তো নয়। কিন্তু মনে মনে তাঁর কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর পক্ষে আর কোনো দিনই সুস্থ মানুষের মতো চলেফিরে বেড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও তিনি কথা দিলেন যে ডাক্তারের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। কারণ ব্যাপারটা তাঁর কাছেও স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। হায়, তিনি যদি সত্যিই শিল্পের প্রেরণা পাবার জন্যে

গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারতেন! তিনি যদি সত্যিই ক্যানভাসের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ক্যানভাসের ছবিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন!

ডাক্তার তার চিকিৎসা শুরু করলেন পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে। মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, রেনোয়ার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তাঁকে অনেক বেশি জীবন্ত দেখাচ্ছে।

তারপর একদিন সকালে এসে ডাক্তার ঘোষণা করলেন যে রেনোয়াকে হেঁটে বেড়াতে হবে। রেনোয়া তখন ছবি আঁকবেন বলে সবে ঈজেলের সামনে এসে বসেছেন। তাঁর কোলের ওপরে রয়েছে রঙদানী। ক্যানভাসের ওপরে চোখ রেখে তন্ময় হয়ে তিনি ভাবছিলেন। ডাক্তারের ঘোষণা শুনে তাঁকে হুইলচেয়ার সমেত ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন রেনোয়ার ঠিক মুখোমুখি।

তারপরে ডাক্তার হাত ধরে রেনোয়াকে চেয়ার থেকে তুলে ধরলেন। গত দু-বছরের মধ্যে এই প্রথম রেনোয়া নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিহ্বল চোখে তিনি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

একটু পরেই ডাক্তার রেনোয়ার হাত ছেড়ে দিলেন এবং রেনোয়াকে হাঁটবার নির্দেশ দিলেন। হাতদুটি সামনে বাড়িয়ে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক সামনেটিতে। রেনোয়া যদি পড়ে যান তা হলে তিনি ধরে ফেলবেন।

কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। রেনোয়া নিজেই ডাক্তারকে আরো পেছনে সরে যেতে বললেন। তারপরে সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে একটি একটি করে পা ফেলে ঈজেলটাকে একপাক ঘুরে এলেন।

রেনোয়ার স্ত্রী নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, আনন্দে যেন তাঁর বুকটা ফেটে যাবে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রেনোয়া অতি অদ্ভুত এক ঘোষণা করে বসলেন। তখনো তিনি হুইলচেয়ারে বসেন নি, তখনো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই অবস্থাতেই ডাক্তারের উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'বাস, আর নয়। এই শেষ। হাঁটবার চেষ্টা করতে গিয়েই যদি আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি শেষ হয়ে যায় তবে ছবি আঁকব কী নিয়ে!' একটু থেমে ঠোঁটের ওপরে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটিয়ে তুলে তিনি আবার বললেন, 'যদি আমাকে বলা হয় যে তুমি হাঁটতে চাও না ছবি আঁকতে চাও তাহলে আমি বলব, আমি ছবি আঁকতেই চাই।'

এই চূড়ান্ত ঘোষণা করে রেনোয়া আবার তাঁর হুইলচেয়ারটিতে বসলেন। তারপরে তিনি আরো সাত বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কোনো দিনও তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন নি।

রেনোয়ার জীবনের এই শেষ সাত বছরের অনেকগুলো ফটো আছে। এই ফটোগুলো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই সাক্ষ্য দেবেন, তারপর থেকে রেনোয়ার শরীর ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমেই তাঁর শরীরের নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে যাচ্ছিল। হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে বেঁকে গিয়েছিল যে আঙুল দিয়ে তিনি আর কোনো কিছু ধরতে পারতেন না। অনেকে লিখেছেন যে এই শেষ জীবনে রেনোয়া যখন ছবি আঁকতেন তখন রঙের তুলি তাঁর হাতের সঙ্গে বাঁধা থাকত। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অসুখে ভুগতে ভুগতে রেনোয়ার শরীরের চামড়া এতই নরম হয়ে গিয়েছিল যে একটা কাঠের তুলি ধরতে হলেও সেই চামড়ায় ফোস্‌কা পড়ে যেত। রেনোয়া করতেন কি, হাতের তালুতে একটুকরো ন্যাকড়া নিতেন আর বাঁকানো আঙুল দিয়ে তুলির হাতলটাকে চেপে ধরতেন। তাঁর শেষ জীবনের ছবি এইরকম অস্বাভাবিক উপায়ে চেপে ধরা তুলির সাহায্যে আঁকা। কিন্তু তবুও তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছবি এঁকে গিয়েছেন। তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি বা তাঁর চোখের দৃষ্টি একটুও ঝাপসা হয়ে যায় নি। শরীরের যন্ত্রণা যতোই অসহ্য হয়ে উঠেছে ততোই তিনি বেশি বেশি ছবি এঁকেছেন।

এই শেষ জীবনে রেনোয়ার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর ছিল রাত্রিযাপন। বিছানার চাদরের সঙ্গে সামান্য একটু ঘষা লাগলেই তাঁর গায়ের চামড়া উঠে ঘা হয়ে যেত। এজন্যে বিছানায় শোয়ানোর আগে তাঁর সারা গায়ে ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হত। সারারাত তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করতেন কিন্তু তবুও কোনোদিন আত্মহত্যার চিন্তা করেন নি।

সর্দি হলে তাঁর নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত কিন্তু অক্ষম হাত দিয়ে নাক মুছবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর হার্নিয়া-বেল্‌ট্ গায়ের চামড়ায় কেটে বসত—মুখ বুজে সহ্য করতেন তিনি। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পরে তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরত—মনে মনে অভিশম্পাত দেওয়া ছাড়া তাঁর কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু তারপরেও সকাল হতো। হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাগানে একপাক ঘুরিয়ে আনা হতো তাঁকে। আর তারপরেই তিনি একেবারে অন্য মানুষ। ঈজেলের সামনে এসে বসতেন তিনি। রঙের তুলি বাড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে থাকত তাঁর সামনে। এমনি ভাবেই তিনি আশ্চর্য সব ছবি এঁকে গিয়েছেন। এক অপরাজেয় শিল্পীসত্তার কাছে শরীরের যন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

অশোক বসু

চ ল চ্চি ত্র

দুটি বিদেশী ছবি ঃ আইল্যাণ্ড" এবং হোয়্যার দ্য হর্ট উইণ্ড্ ব্লোজ্ ॥

জাপানী চরিত্রে শিল্পসুষমার প্রতি সর্বাঙ্গীন আকর্ষণের কথা প্রায় প্রবাদবাক্যের রূপ ধারণ করেছে। দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, শিষ্টাচারে, চারুকলায় সর্বত্রই ঐ শিল্পপারিপাট্যের ছাপ প্রকট, দূরদেশ থেকেও আমরা তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে থাকি।

পারিপাট্য বা শোভনতার প্রতি অটুট সতর্কতা যে অতিব্যস্ততায় পরিণত হয়ে শিল্পকর্মের আন্তরিকতা নষ্ট করে না তা নয়। 'গেট অফ্ হেল'-এর মতো costume film-এর পক্ষে stylisation অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু ক্ষেত্রান্তরে তা কৃত্রিমতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। ঐ কৃত্রিমতা বা 'artiness' মস্কো উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রাপ্ত 'আইল্যাণ্ড' নামক জাপানী ছবিটির গুণ অনেক পরিমাণে নষ্ট করেছে।

ডকুমেণ্টরী পদ্ধতি এবং কাহিনী চিত্ররীতির সংমিশ্রণের সার্থক প্রয়োগ আমরা কেনেতো শিন্দোর 'চিল্‌ড্রেন অফ্ হিরোশিমা' ছবিতে দেখেছি। এর পেছনে ফ্ল্যাহার্টির চিত্রভাষার অনুশীলন হয়তো অনেকটাই দায়ী—শিন্দোর 'আইল্যাণ্ড' ছবিতে ফ্ল্যাহার্টির 'ম্যান্ অফ্ আরান্'-এর প্রভাব আদৌ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এ ছবিটিতে একটি কৃষক দম্পতির আয়াসসাধিত জীবনযাত্রার সরলরৈখিক নাটকীয়তাবর্জিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু চিত্রভঙ্গিতে লোকদেখানো সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা বিষয়বস্তুর গৌরবকে অনেকাংশে লঘু করেছে। 'ম্যান্ অফ্ আরান'-এর বিরূপ প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে যে চরম সত্যতার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে তা 'আইল্যাণ্ড' ছবির মিঠে সুরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চলচ্চিত্রে 'কাব্যগুণে'র আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে মাত্রাতিরিক্ত ঔদার্যের পরিচয় দিই। ভালো ক্যামেরায় তোলা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অভিনন্দিত করি 'কাব্যগুণসম্পন্ন' বলে। 'ম্যান্ অফ্ আরান' বা 'পথের পাঁচালী'তে কাব্যগুণ আছে, কিন্তু তার জন্য ফ্ল্যাহার্টি বা সত্যজিৎ রায়কে কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয় নি—প্রকৃতি ও মানুষের

পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ঘাটনে সে-কাব্য আপনি উৎসারিত হয়েছে, তার জন্য অষ্টপ্রহর ক্যামেরার আতসকাঁচে চিনি মাখাতে হয় নি।

এ ছবিকে 'নির্বাক' করার মধ্যে অপপ্রযুক্ত stylisation-এর আরেকটি দিক প্রকট হয়েছে। শব্দহীন যুগের চলচ্চিত্রের ব্যাকরণই ছিল আলাদা, তার সম্পাদনপদ্ধতিও ছিল ভিন্ন, শব্দযুক্ত ছবিতে তাকে হুবহু প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—উপস্থিত চরিত্রগুলির মুখের কথা চাপা দিলেই কোনো ছবি 'পটেম্‌কিনে'র মর্যাদার অংশভাক্ হয় না। 'আইল্যাণ্ড' 'শব্দযুক্ত' অথচ নির্বাক ছবি। ডকুমেণ্টরী পদ্ধতির ছবিতে সংলাপকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না বটে তাই বলে ছবিতে উপস্থাপিত চরিত্রগুলিকে বোবা বানানো হয় না, বরং তাদের কণ্ঠস্বরকে সহায়ক প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেনেতো শিন্দো এই ছবিতে নানা প্রাকৃতিক শব্দের সাহায্য নিয়েছেন, অথচ চরিত্রগুলিকে নির্বাক রেখেছেন, যদিও শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ আবেগ প্রকাশের জন্য তাকে সশব্দ কান্নার আশ্রয় নিতে হয়েছে (ছবিটির শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত)। গত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত জাপানী ছবি 'হ্যাপিনেস্ অফ্ আস্ এ্যালোন'-এও এই জাতীয় নিরর্থক বচনহীনতা লক্ষ্য করেছি। একে চলচ্চিত্র-ভাষায় কোনো অভিনবত্বের সংযোজন মনে না হয়ে বরং ব্যবসাগত প্রচারেরই অঙ্গ বিশেষ বলে মনে হয়।

আইল্যাণ্ড ছবিতে অন্তিম মুহূর্ত ছাড়া সর্বত্রই কেনেতো শিন্দো "বিনাটকী-করণে"র চেষ্টা করেছেন। জুল দাসিনের "হোয়্যার দ্য হট্ উইণ্ড্ ব্লোজ" এর ঠিক বিপরীত—এ ছবি প্রতিটি সিকোয়েন্সে নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় সমৃদ্ধ। দাসিন্ নোভেল-ভাশ-পূর্ব পঞ্চাশদশকীয় ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। কার্নের মতো তাঁর চিত্রনাট্যে কাহিনীসজ্জার কুশলতা পাওয়া যায়, ক্লুজোর মতো তিনিও জীবনের রুক্ষ কঠিন পরুষ দিকের প্রতি আকৃষ্ট। আর সে কারণেই সিসিলি কিংবা গ্রীসের (নেভার অন্ সানডে) রুক্ষ অঞ্চল এবং অমার্জিত অধিবাসীদের তাঁর ছবিতে দেখা যায়।

রজার ভালিয়াঁর গকুর পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত এ ছবিটির পটভূমিকা এ শতাব্দীর প্রথমপাদের সিসিলির এক সাগরতীরে ছোট শহর। এখানকার আধুনিক সভ্যতা বহির্ভূত জগতে—ভবঘুরে বেকার যুবক, প্রাচীন ভাস্কর্য সংগ্রাহক নগরশাসক, যৌনকামনা কাতর কুরূপা নারী, প্রাণচঞ্চল এক কন্যা, নগর শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এক অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত কারবারী, তার সুদর্শন যুবক পুত্র ও তার প্রণয়প্রার্থী বিচারকের বয়স্কা স্ত্রী, বহির্জগতের

প্রতিভূরূপী এক ইঞ্জিনিয়ার ও শিশুপুত্রসহ এক টুরিস্ট দম্পতি—বিচিত্র চরিত্র সমাবেশে দাসিন এক নাটকীয় সংঘাতময় জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায়। ফরাসীসুলভ সংযত humour and irony এ ছবিকে উপভোগ্য করেছে। মালিনা মারকুরী, ইভ্‌স্ ম‍ঁতাদ্, পিয়ের ব্রাস্যর, মার্চেল্লো মাস্ত্রাইয়নি প্রমুখ ক্ষমতাশালী অভিনেতৃ-সম্মেলনের ফলে অভিনয় এ ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ ছবি ফরাসী চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও, হলিউডের পণ্যভোজী ভারতীয় দর্শকের কাছে এর মূল্য নগণ্য নয়।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি : অভিযান

বিদেশে যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের গুণগ্রাহী তাঁরাও তাঁর ছবির তথাকথিত 'শ্লথগতি' সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করেন। ত্রুফো অবশ্য সরাসরি তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের চিত্র-সমালোচকেরা "প্রাচ্যত্বে"র দোহাই দিয়ে নানা ভাবে তাঁদের অস্বস্তিকে ঢাকতে চেষ্টা করেন। সত্যজিৎ রায়ের পূর্ববর্তী ছবিগুলির গতি শিল্পগত বিচারে দূষণীয় কিনা সেটা এখানে বিচার্য নয়, কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'অভিযান'-এর প্রথমার্ধ অন্তত শ্লথগতির অভিযোগে অভিযুক্ত হবে না, একথা তর্কাতীত—মাঝখানে কিছু অংশ 'indoor-drama' জাতীয় স্থৈর্য লাভ করলেও ছবি শেষ হয়েছে আবার প্রচণ্ড জলদ তালে এবং চিত্রনাট্যের এই উপভোগ্য গতিময়তা সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছাড়া আর কোনো ছবিতে এমন করে লভ্য হয় নি। সম্পাদনার চাতুর্যে, কাহিনী বর্ণনার সৌষ্ঠবে 'অভিযান' সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র গতি-দক্ষতার যথাযথ পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে শুধুমাত্র ঐ দক্ষতা সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। তাঁর ছবি থেকে মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এমন কোনো অভিজ্ঞতা আমরা আশা করতে অভ্যস্ত হয়েছি যা আমাদের অনুভাবনাকে অনেকদিন পর্যন্ত অধিকার করে থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের বোধকে সমৃদ্ধ করবে। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি "কাঞ্চনজঙ্ঘা" আমাদের সেই অভিজ্ঞতার অংশভাক্ করেছিল—তারাশঙ্করের উপন্যাসাশ্রয়ী এই ঘটনাবহুল বিপুলকায় ছবিটি উপভোগ্য হলেও সে রকম কোনো অভিজ্ঞতায় মনকে সমৃদ্ধ করে না।

এ ছবিকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাধারণ সৎ মানুষের উত্তরণের প্রচেষ্টার রূপায়ণ বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে—নামকরণেও ঐ জাতীয় প্রতিশ্রুতি আছে। প্রতিকূলতা রচনায় সত্যজিৎ রায় স্বভাবসিদ্ধ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষের অসামান্য অভিনয় সে-ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে, বীরেশ্বর সেন এবং 'উকিলবাবু'র অভিনেতারও প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু অভিযানকারী চরিত্রটিকে তিনি কোন রঙে এঁকেছেন? তার সমস্যা দ্বিবিধ—সামাজিক স্তরভেদের নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের প্রচেষ্টা, এবং একই সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীর সঙ্গে সম্পর্কজনিত জটিলতা। সাধারণভাবে দুটি সমস্যাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে মৌল। সত্যজিৎ রায় কি কারণে জানি না দুটি সমস্যাকেই লঘুভাবে চিত্রিত করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গিতে humour প্রাধান্য পাওয়ায় নরসিং-এর ভদ্দরলোক হবার চেষ্টাটা প্রায় ভদ্রলোকদের হাসিতামাশার পর্যায়ে রয়ে গেছে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাজনিত নারীবিদ্বেষও অনেকটা ঐ 'মজা'র মেজাজ মেশানো মনে হয়। মেরী নিলীমার সঙ্গে বিষম-সামাজিক প্রেমের অসার্থক পরিণতির মুহূর্তটুকু গভীরভাবে চিত্রিত, কিন্তু তার 'impact' বর্ণনায় আবার লঘুসংলাপে হাস্যরসাশ্রিত হাল্‌কামেজাজ এসে গেছে। শেষ পর্যন্ত নরসিং-এর প্রেমের সমস্যাকে সত্যজিৎ রায় রোমান্টিক রঙে রঞ্জিত করেছেন। সেতারের ঝংকারে বাস্তবাতিক্রান্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে, খোলা দরজার ভেতর দিয়ে নরসিং-এর কল্পনায় প্রস্তুত এক নারীমূর্তি আলোক-উদ্ভাসিত পটভূমিকা থেকে ছবির মতো ভেসে তার ঘরে এসেছে। ঐ দেহোপোর্জিবিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে যে তিক্ততা ও গভীর বেদনা ব্যঞ্জিত হতে পারত, সত্যজিৎ রায় তাকে মধুর করেছেন সংলাপের কৌতুকময়তায়, সংগীতে। মধুর রসের প্রতি কারো সহজাত বিরাগ থাকবার কথা নয়। "অপুর সংসার"-এ অপু-অপর্ণার দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্যচিত্রণ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, কিন্তু এ ছবির মূল মেজাজের (অবশ্য সর্বত্রই বাঞ্ছিত রুক্ষতাকে অনেক মোলায়েম করা হয়েছে) সঙ্গে ঐ মাধুর্যের সাজুয্য নেই। ওয়াহীদা রহমানের সুন্দর অভিনয় সত্ত্বেও তাই গোলাবীপর্ব প্রত্যয়হীন এবং অগভীর মনে হয়।

অনুরূপ কারণেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নরসিং আমাদের কায়িক শ্রমজীবীশ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য বলিষ্ঠ প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার দুঃখ বেদনা হতাশা অধঃপতন সব কিছুকেই দূর থেকে

লঘু ভাবে দেখা এবং দেখানো হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের ‘অযান্ত্রিক’ ছবির ট্যাক্সী ড্রাইভার বিমলের ক্রোধ ভালবাসা, যন্ত্রের প্রতি মানবিক মমত্ববোধ, এক কথায় তার মানসিক উগ্রতা, আন্তরিক নৈকট্যে পরম উষ্ণতায় বিশ্বাসযোগ্য এবং আমাদের মনেও অভিজ্ঞতার সঞ্চারী। কিন্তু নরসিং-এর জীবনযাত্রায় কাহিনীগত কৌতুহল ছাড়া আর কোনো ভাবগত সংযোগ আমাদের নেই।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য মহৎ শিল্পকর্মের সঙ্গে এই ঘটনাপ্রধান উপভোগ্য সুনির্মিত ছবিটির একাসন দান যেমন আদৌ সমর্থনীয় নয়, তেমনি এ-ছবিকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর পরমোৎসাহী সমালোচকেরা সত্যজিৎ রায়ের শিল্পনিষ্ঠায় সন্দেহ করে যে কটুকাটব্য করছেন, সেটাও নিন্দনীয়। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও, সাধারণ বাংলা ছবির মানদণ্ডে ‘অভিযান’ যে অনেক উচ্চ পর্যায়ের রচনা বলে প্রমাণিত হবে সেটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। শুধুমাত্র ‘টাইপেজ’ সৃষ্টিতেই ‘অভিযান’ বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয় এবং বিশেষভাবে সত্যজিৎ রায়ের স্বভাবজ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। চলচ্চিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এ ছবিতে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় আছে যা সচরাচর বাংলা ছবিতে মেলে না আজকাল। তাছাড়া একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিটি কর্মে সমান মহত্ত্ব আমরা প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু সে প্রার্থনা ক্ষেত্রে বিশেষে পূর্ণ না হলেই সেই শিল্পী সম্পর্কে অশিষ্ট ভাষণ বর্ষণ করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনাই ‘রক্তকরবী’, ‘গোরা’ বা ‘বলাকা’ পর্যায়ের নয়!

ধ্রুব গুপ্ত

পরিচয়-এর এই সংখ্যার ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে শ্রীমতী সুলেখা সান্যালের মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল। শ্রীমতী সুলেখা ছিলেন পরিচয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর লেখিকা এবং অনেকাংশে পরিচয়েরই আবিষ্কার। এই অকালমৃত্যুতে পরিচয় যতোখানি ক্ষতিগ্রস্ত হল তা পূরণ হবার নয়। আগামী সংখ্যায় তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিয়ে তাঁর উদ্দেশে আমরা যথাসাধ্য স্মৃতি-তর্পণ করব।

সম্পাদকীয়

দেশের সঙ্কটকালে সাহিত্য আকাদেমির পক্ষ থেকে ভারতীয় লেখকদের উদ্দেশ্যে আবেদন এসেছে—দেশরক্ষার জন্য তাঁরা তাঁদের লেখনী ধারণ করুন। বাঙলা দেশের লেখকেরা অনেক পূর্বেই চারটি স্বতন্ত্র বিবৃতির দ্বারা নিজেদের ওরূপ সংকল্প ঘোষণা করেছেন। পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকাদির মারফৎ এই সংকল্প-জাত কিছু ফসলেরও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়াও লেখকেরা দল বেঁধে সভাসমিতিতে যোগদান করেছেন, নতুন সমিতি গঠন করেছেন, মিছিলে পা মিলিয়েছেন, এবং জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াসের সঙ্গে এইভাবে যুক্ত থাকছেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বাঙলা দেশের লেখকেরা অতীতেও দেশের প্রতিটি পরম ক্ষণেই আপনাদের দায়িত্বের ও সুস্থ চিন্তাভাবনার প্রমাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। স্বদেশীর যুগ থেকে মন্বন্তরের দিন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এইরূপই ঐতিহ্য। স্বাধীনতার সুযোগে শুধু কলাকৈবল্যবাদের নামে সেক্স্‌-সোফিস্টিকেশন বিলাস, আধ্যাত্মিকতার নামে তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড়ফুঁক, বৈদগ্ধ্যের নামে বদ্‌লের-মালার্মে-কপচানিতেই যদি তা এখনো আত্মতৃপ্ত থাকত, তা হলে বাঙালী সাহিত্যিকের নাম মুছে গেলেও মানুষের সভ্যতার কোনো ক্ষতি হতো না—দেশের ইতিহাসের দুর্ভার বরং কিছুটা লঘুই হতো। আজ সেই ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের কালে একালের সাহিত্যিক আপনার সুস্থ চেতনাতেই সেই স্বাদেশিকতা ও মানবতার পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবেন—আপন সৃষ্টিকর্মেও প্রতিষ্ঠিত হবেন, দেশবাসীকেও সত্যসঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত করবেন,—এই আমাদের আশা।

জাতীয় জোয়ারের সব থেকে বড় দান এই যে, ভাষাগত, রাজ্যগত, জাত-উপজাত-সম্পর্কিত আকণ্ঠ পরিমাণ পঙ্ক আজ নিশ্চিহ্ন—অন্তত কিছুকালের মতো জাতি আজ সত্যই ঐক্যবদ্ধ। প্রাণাবেগের যখন জোয়ার ডাকে তখন তার সঙ্গে অবশ্য ভেসে আসে অনভিপ্রেত নানা আবর্জনাও। স্রোতেরই নিয়মে তা ভেসেও যায়, তাই জীবনই হয় জয়ী। স্বদেশীর দিন হতে এই সত্যেরও প্রমাণ আমরা জাতীয় প্রাণোচ্ছ্বাসের পর্বে পর্বে পেয়েছি। আর, সে ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষাও পেয়েছি আবর্জনাকে আভরণ করে তোলায় বিপদ কত, প্রমত্ততাকে প্রেরণা করে তুললে কোন্

চোরাবালিতে নিমজ্জন অনিবার্য। সাহিত্য আকাদেমি যে মহাকবির বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁরই কাছ থেকে আমরা এই কর্তব্য-চিন্তায়ও লাভ করতে পারি আমাদের শিক্ষা, নিতে পারি আমাদের সঙ্কট-মুহূর্তের দীক্ষা।

সমকালীন বহুপ্রশ্নের বিচারেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের গুরুরূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করি না—আর তাতেই আত্মরতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজতর হয়েছে বলে মনে করি। কি স্বদেশী যুগে, কি মহাযুদ্ধের কালে, কি সভ্যতার সংকটজনক ফ্যাশিস্ত ঔদ্ধত্যের দিনে,—রবীন্দ্রনাথ মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্যের ও লেখক হিসাবে আমাদের দায়িত্বের এক পৌরুষমণ্ডিত বীর্যবান্ মানবতার ও সৃষ্টিচেতনার অধিকার আমাদের, বিশেষ করে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের, দান করে গিয়েছেন। তাতে ভাববিলাসের ক্ষেত্র সংকুচিত, প্রমত্ততার সুযোগ অনুপস্থিত। সত্যের সুস্থ উদার স্বীকৃতিতে এই রবীন্দ্ররিকথ প্রাণবান, প্রদীপ্ত ও সৃষ্টিপ্রবুদ্ধ। আমরা যদি চাই যে এ যন্ত্রণা ও সংগ্রাম মহৎ কোনো জীবন-সম্পদে জয়ী হোক, সৃষ্টির শাশ্বত সত্যে সমুজ্জল হোক, তা হলে সেই কবি-নির্দেশেই আমাদের দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রসারিত করতে হবে—কারণ পশ্চাদ নয় সম্মুখই আমাদের পথ,—এমন কি, বর্তমানের ক্ষেত্র থেকেও ভবিষ্যতের দিগন্তের দিকে রাখতে হবে দৃষ্টি,—যে ভবিষ্যৎ যেমন আমাদের এই দেশের, তেমনি সর্বমানবেরও।

প্রাণপ্রবাহই জয়ী হবে, উত্তেজনার আবর্জনা নয়। আজ যখন এশিয়ার জ্ঞান-দীপাবলীর আয়োজন সংশয়িত তখন ইরান-যাত্রী কবির ভাষণটুকু স্মরণীয়: "চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনি মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই আমি আজ এই কামনা ঘোষণা করি যে, আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশ মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক—তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধ সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।" আমাদের এই 'নূতন নিরাময় সমাজনীতি'—সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনের সংকল্প জয়ী হবেই।

সেই ভবিষ্যৎ থেকে সেই নিয়তি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না, ভারতবর্ষকেও না—যতোই চীন থেকে আসুক আক্রমণের ঝটিকা; সাময়িক ভাবে বিপন্ন হোক্ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, ভারতমনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ, তার মানব-

ভ্রাতৃত্বের সাধনা। বরং আজকের উদ্দীপ্ত ভাবাবেগ ও উৎক্ষিপ্ত রোষবহ্নি অপবিত্র সেই বৈদেশিক ঔদ্ধত্যের আবর্জনাকেই শুধু ভস্মীভূত করবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় চেতনায় কবি-কথিত সেই মিলনের পথকেও প্রশস্ত করবে—যে মিলনে আমাদের চিত্তের প্রকাশ—যে মিলনে শুধু প্রাচ্যদেশেরই প্রতিষ্ঠা নয়, সর্বমানবেরই সার্থকতা। যতোদূর বুঝি—বিশেষ করে এটি লেখকেরই কাজ, সৃষ্টি-সাধকেরই দায়িত্ব, সাহিত্য-শিল্পেরই অপরিহার্য দায়ভাগ।

কারণ, লেখক সাহিত্যরচনা করবেন শুধু তা নিয়েই নয় যা তাঁর চোখে অত্যন্ত করে পড়ে, তা নিয়েও যাতে মানুষের অত্যন্ত আশা—ইতিহাসের যা অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারি: "বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা-অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয় তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট।...সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎ সৃষ্টি ক'রে চলেছে।"

রবীন্দ্র শতবার্ষিক-উৎসবপূর্তি বৎসরে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়তো থাকত না যদি না দেখতাম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িকতার ঝঞ্ঝা-তাড়না বিক্ষোভ-বিভ্রান্তিতে পরিণত না হচ্ছে। আমরা তা দুর্লক্ষণ বলেই মনে করি, কিন্তু তাকে খণ্ড ও ক্ষুদ্র বলেই জ্ঞান করি। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনটি ঘটনার উল্লেখ কেউ কেউ করেছেন: একটি ঘটেছে উত্তর কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে, যার ফলে 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছে। আরেকটি ঘটেছে যাদবপুরের একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে, যার ফলে মধ্যরাত্রির গোপন ষড়যন্ত্রে ভস্মীভূত হয়েছে জনকল্যাণব্রতী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বহু পরিশ্রমে ও মমতায় গড়ে তোলা একটি গ্রন্থাগার। আরেকটি ঘটেছে জলপাইগুড়িতে, যার ফলে একজন প্রাক্তন সেনাপতির প্রত্যক্ষ প্ররোচনা

ছাত্রদের দিয়ে নরহত্যা করাতে চেয়েছে। ঘটনা তিনটি বিচ্ছিন্ন। কোনো কোনো মহলে তা নিয়েও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উত্তেজনার একটি প্রবাহ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্র থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও উত্থিত হয়েছে। স্বদেশীর দিন থেকে অন্ধ উত্তেজনার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তাতে আমাদের সন্দেহ নেই—এটাই সত্যকার স্বাদেশিকতার ঐতিহ্যের বাহক, আর প্রত্যেকটি সৎ লেখকই জানেন—এরূপ উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তাঁর ঐতিহ্য, তাঁর দায়িত্ব—যেমন তা দায়িত্ব প্রত্যেক সৎ মানুষের।

ইওরোপের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জাতি-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিদ্বেষকে আশ্রয় করে যে মানববিদ্বেষী মতবাদ শেষ পর্যন্ত কুৎসিত সর্বনাশের দিকে ইওরোপকে চালিত করেছিল, তারও সূত্রপাত এরূপ দুঃসময়ের দুর্বুদ্ধিকে সম্বল করেই ঘটেছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা—রবীন্দ্রনাথের দেশের লেখকরা যেন আজ সহজে বিস্মৃত না হই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই মতবাদের বিরুদ্ধে ও এই মতবাদ-আশ্রয়ী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নির্মম ধিক্কার ঘোষণা করেছিলেন। অতএব সাহিত্য আকাদেমির ডাকে যথার্থ রূপে সাড়া দিয়ে নিকট বর্তমান ও দূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণাই আমরা পোষণ করব।

৫

পরিচয়

পৌষ ১৩৬৯
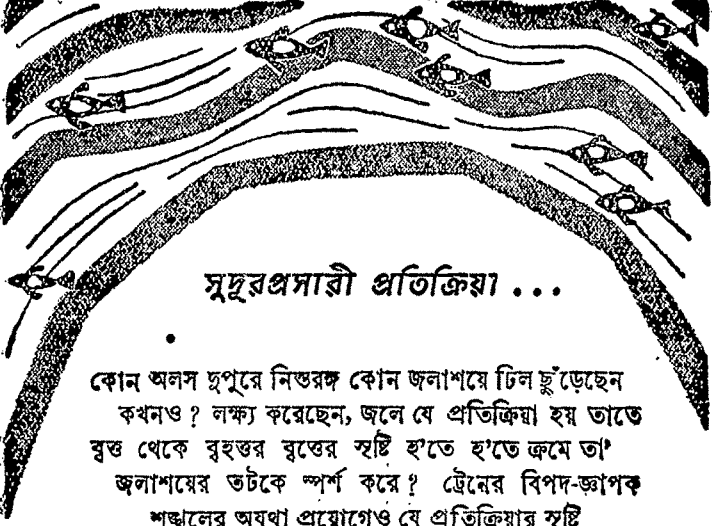
কোন অলস দুপুরে নিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়েছেন কখনও? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত থেকে বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা' জলাশয়ের তটকে স্পর্শ করে? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেও যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলও এমনি সুদূরপ্রসারী—কোন বিশেষ ট্রেনের যাত্রাই শুধু তা'তে বিঘ্নিত হয় না, পর পর বহু ট্রেনই বিলম্বিত হয়। ফলে, যাত্রী ও রেল-প্রতিষ্ঠান—উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, এই ঘটনার সঙ্গে একেবারেই সংশ্রবহীন সাধারণ মানুষই এই ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন।
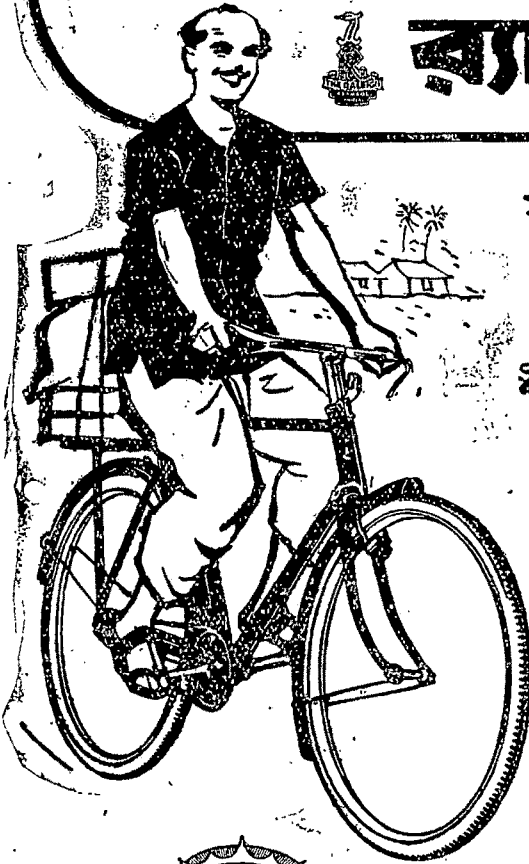
সপুষ্পা　　　　　　　　　　বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন

অংশু দত্ত

এক

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন নামে খ্যাত। ইতিহাসে এ ধরনের আন্দোলনের আরও নজির আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিকাশের জন্য অতীতে প্যান-অ্যামেরিকান ইউনিয়ন গঠিত হয়। সমগ্র জার্মানভাষীদের একরাষ্ট্রে মিলিত করার উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে 'আলডয়চের ফেরবান্দ' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্যান-জার্মান মতবাদ প্রচার করে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গত শতকের শেষদিকে 'প্যান-ইসলাম'-এর স্লোগান তোলা হয়েছিল। তেমনি শ্লাভ জাতিদের মধ্যে ঐক্যপ্রচেষ্টার লক্ষ্য নিয়ে উনবিংশ শতকে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্যান-শ্লাভনিজম মতবাদের প্রচার হয়।

এইসব আন্দোলনের মূল ভিত্তি ভিন্নধর্মী। প্যান-জার্মান আদর্শের ভিত্তি একভাষা, এক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। প্যান-শ্লাভনিক মতবাদের ভিত্তি অনুরূপ ভাষা, প্রধানত এক ধর্মীয় সংগঠন (পূর্বদেশীয় খৃষ্টধর্ম), অনুরূপ সংস্কৃতি। প্যান-ইসলামীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল এক ধর্ম এবং, ঐস্লামিক সমাজে ধর্মের অনুশাসন সর্বব্যাপী বলে, অংশত এক ধরনের জীবনযাত্রাপদ্ধতি। প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নের অবশ্য ভৌগোলিক বনিয়াদই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামাজিক কাঠামো অনুরূপ: ইওরোপীয়রা অভিজাত, বর্ণসঙ্কর মিশ্র সম্প্রদায় মধ্যস্তরে এবং নিগ্রো ও আদি-আমেরিকানরা সর্বনিম্নে। এর ওপর তাদের রয়েছে একই ধরনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ভিত্তি কী? কয়েক বছর আগে জনৈক মার্কিন পর্যটক দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন থেকে ঘানায় টেলিফোন করতে গিয়ে শুনলেন, লণ্ডন এক্সচেঞ্জের মারফৎ ঘানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পর্যটকের এই ছোট্ট অভিজ্ঞতা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগহীনতার প্রতীক। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের সুযোগের একান্ত অভাব। পূর্ব আফ্রিকা থেকে পশ্চিম আফ্রিকা যাওয়ার কোনো রেলপথ নেই। দুর্গম বিষুবরৈখিক অরণ্য, অনাব্য নদী, দুস্তর মরুভূমি, এ সবই আফ্রিকানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে। ঘানার নাগরিক ও কেনিয়ার নাগরিকের আফ্রিকার যে-কোনো শহরের চেয়ে অনেক সহজে সাক্ষাত হবে লণ্ডনে। ভৌগোলিক বিচ্ছেদ জন্ম দিয়েছে মানসিক বিচ্ছিন্নতার। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের 'ড্রাম' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅ্যান্টনী স্যাম্পসন আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর পত্রিকার পাঠকদের মনোভাব থেকে বলেন, ঘানার অধিবাসীরা জোহানেস-বার্গকে এক বিরাট নোংরা বস্তি বলে মনে করে। তারা ভাবতেও পারে না, সে-শহরে আফ্রিকান চিকিৎসক, আফ্রিকান নার্স আছে। তাদের ধারণা, সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে নিরন্তর গৃহযুদ্ধ। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গেরা ভাবে ঘানার নাগরিকেরা আমেরিকানদের মতো ধনী। লাগোস শহরেও জোহানেসবার্গের মতো বস্তি আছে শুনে তারা হতাশ হয়।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাজনিত পারস্পরিক অপরিচয় নিশ্চয় আফ্রিকান ঐক্যের পথে বাধা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য অনেক বিঘ্নও আছে। এই মহাদেশে বহু ভাষা ও বহুতর উপভাষার প্রচলন। আছে বহু ধর্ম (খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ছাড়াও প্রায় প্রতি উপজাতির নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে) ও অসংখ্য উপজাতি। এমন অবস্থায়, সারা আফ্রিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন কী ভাবে সংগঠিত হলো—আর কেমন করেই বা সেই আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে পারল?

আফ্রিকানদের অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই প্রধানত এই ঐক্যবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে। সারা মহাদেশ প্রথমে ইওরোপীয় বণিকদের শোষণ এবং পরে সাম্রাজ্যবাদের শাসনের শিকার হয়েছে। আমরা জানি, ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যাহ্নে ইথিওপিয়া বাদে আফ্রিকায় অন্য কোনো স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। আর ইথিওপিয়াকে ঠিক খাঁটি নিগ্রো রাষ্ট্র বলাও যায় না।

বহিরাগত ইওরোপীয়দের প্রভুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এবং আফ্রিকানদের উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতায় আস্থা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে, বিশেষত যখন আফ্রিকানরা উপলব্ধি করেছে যে নিজেদের মধ্যে যতোই প্রতিযোগিতা থাক, সামগ্রিকভাবে উপনিবেশিকতা বজায় রাখতে ইওরোপীয়রা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে। পারস্পরিক মেলামেশা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ছিল ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে। অতএব, খুব স্বাভাবিকভাবে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের জন্ম হলো ইওরোপে। অবশ্য গার্ভে-প্রবর্তিত 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের শুরু পশ্চিম গোলার্ধে। কিন্তু, এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে দেখানো হয়েছে, সে-আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান নিগ্রোদের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের যে-ধারা আফ্রিকার নিগ্রোদের সমষ্টিগত চেতনার প্রতীক, তার জন্ম ইওরোপের শহরে শহরে। কিন্তু যেহেতু আফ্রিকার নিগ্রোদের তুলনায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রোরা অনেক পরিমাণে অগ্রসর এবং যেহেতু তারাও বর্ণবৈষম্য ও শোষণের শিকার অতএব স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্কিন ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোরা।

দুই

ত্রিনিদাদের এক নিগ্রো ব্যারিস্টার শ্রীহেনরী সিলভেণ্টার-উইলিয়াম্‌স্ সর্বপ্রথম প্যান-আফ্রিকান আদর্শের বাস্তব রূপ দেন। লণ্ডনে পড়তে এসে তিনি পশ্চিম আফ্রিকানদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরে আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি একাধিক আফ্রিকান কৌমপ্রধানকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে (যথা রোডেসিয়া, গোল্ডকোস্ট ইত্যাদি) বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ আফ্রিকানদের জমি ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়। জমি হস্তান্তর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সিলভেণ্টার-উইলিয়ামস ১৯০০ সালে লণ্ডনে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের অন্যতম নেতা দ্যু বোয়ার ভাষায়, "এই সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং এই সর্বপ্রথম 'প্যান-আফ্রিকান' কথাটি বিভিন্ন অভিধানে স্থান পেল।" সম্মেলনের প্রতিনিধিরা আসেন প্রধানত ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় থেকে। এবং সম্মেলনের দাবিতে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক শাসনে নেটিভ বা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকটা উপেক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এই আন্দোলন বেশিদিন টিকে থাকেনি। সম্মেলনের কয়েক বছর বাদেই সিলভেস্টার-উইলিয়ামস ওয়েস্ট ইণ্ডিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে জোয়ার আসে। কিন্তু তার স্রোত ছিল দ্বিমুখী: এক ধারার নেতা ছিলেন ড্যু বোয়া, অন্য ধারার মার্কাস অরেলিয়াস গার্ভে। ১৯২০ সালে গার্ভের পরিচালনায় 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুরু হয়। এর মূলকথা ছিল: নিগ্রোরা যেখানেই থাক না কেন, আফ্রিকা হলো তাদের মাতৃভূমি। অতএব, সব নিগ্রোকে আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গার্ভের বর্ণসচেতনতা যেন ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতার উল্টো পিঠ। ইহুদীরা যেমন নিজেদের ঈশ্বর-নির্বাচিত সম্প্রদায় ভাবে, গার্ভে তেমনি ভাবতেন যে নিগ্রোরা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এবং মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবৎপ্রেরিত। তাঁর নিজের ভাষায়, "সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ যেমন অবিমিশ্র 'শ্বেত' জাতিতে বিশ্বাসী; আমিও তেমনি অবিমিশ্র কৃষ্ণ জাতিতে বিশ্বাসী।" এই জন্য তাঁর আন্দোলনে বর্ণসঙ্করদের কোনো স্থান ছিল না। 'খাঁটি' নিগ্রোদের নিয়ে গার্ভে সম্মেলন আহ্বান করেন ও পরে নিগ্রো জাতীয় চার্চ, নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গার্ভে 'দি ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাণ্ড আফ্রিকান কম্যুনিটিজ লীগ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়লেন।

১৯২০ সালে নিগ্রো 'রাষ্ট্রে'র প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে নিউ ইয়র্ক শহরে। দূরদূরান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে ৩৩ বছরের যুবক গার্ভেকে আফ্রিকার 'অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি' নির্বাচিত করে। একই সঙ্গে একটি 'ছায়া' মন্ত্রিসভাও নির্বাচিত হয়। এবং যথোচিত রাজকীয় গাম্ভীর্যে গার্ভে তাঁর অনুচরদের কাউকে 'নীল নদীর ডিউক' কাউকে 'কঙ্গোর আর্ল' কাউকে বা 'জাম্বেসির ব্যারন' ইত্যাদি খেতাবে বিভূষিত করলেন। আফ্রিকাকে মুক্ত করার জন্য গঠিত হলো 'সার্বজনীন আফ্রিকান সেনাদল'। অর্থ? প্রথম প্রথম তার অভাব হয় না। আমেরিকা, ইওরোপ ও আফ্রিকার নিগ্রোরা বহু দান-খয়রাত করেন।

'আফ্রিকার যুবরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত বৃটিশ হন্তুরাসের এক নিগ্রো ধনী স্যর ইসাইয়া ইমান্যুয়েল মর্টার তো একাই ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন। নিগ্রো রাজ্যের আদর্শ প্রচারের জন্য গার্ভে ইংরাজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় 'নিগ্রো জগৎ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ১৯২৩ সালে সংগঠনের নেতারা দাবি করেন যে তাঁদের সভ্যসংখ্যা ৬০ লক্ষ।

'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুধু কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। লাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোদাসদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা আমেরিকান নিগ্রোরা ভোলেনি। গার্ভে ও তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা দাবি করলেন: "শ্বেত-আমেরিকানরা আফ্রো-আমেরিকানদের লাইবেরিয়ায় যেতে ও তাকে উন্নত করতে সাহায্য যোগাক। তারপর রয়েছে জার্মানির আফ্রিকান উপনিবেশ-সমূহ। আমেরিকান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোরা মিত্রপক্ষের হয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছে। অতএব, তাদের হাতে এই সব দেশগুলি তুলে দিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে বাধ্য করা হোক। তার ওপর, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডের কাছে আমেরিকা কোটি কোটি টাকা পায়। ঋণশোধে এরা অপারগ হওয়ায়, বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন ও ফরাসী উপনিবেশ আইভরী কোস্ট লাইবেরিয়ার হাতে তুলে দিয়ে, লাইবেরিয়াকে তার ইতিহাসের যোগ্য দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করুক।"

গার্ভের লাইবেরিয়ায় বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু রাজনীতিক নেতার সমর্থন পায়। আমেরিকার সরকারী সমর্থনের আশায় গার্ভে লাইবেরিয়ায় এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আফ্রো-আমেরিকানদের বসতি স্থাপনের জন্য লাইবেরীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি পাওয়া। লাইবেরিয়া-শাসকদের অধিকাংশ হচ্ছেন মুক্তিপ্রাপ্ত আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের বংশধর। অতএব গার্ভের প্রস্তাব তাঁদের সমর্থন পেল।

১৯২৪ সালে গার্ভে প্রেরিত দ্বিতীয় এক প্রতিনিধিদল ও লাইবেরীয় সরকার যথাবিহিত আলোচনান্তে স্থির করলেন: (১) প্রথম দুই বছরে বিশ থেকে তিরিশ হাজারের মতো নিগ্রো পরিবার লাইবেরিয়ায় যাবে; (২) লাইবেরীয় সরকার বিনামূল্যে হাজার হাজার একর জমি এদের বিলি করবেন; (৩) নবাগত নিগ্রোরা লাইবেরীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করার শপথ নেবে; (৪) গার্ভের সংগঠন, 'দি ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন'

বা ইউ. এন. আই. এ., এই পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা খরচ করবে।

পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য সাধারণ্যে আবেদন জানানো হলে প্রভূত সাড়া পাওয়া যায়। বহু অর্থব্যয়ে ইউ. এন. আই. এ. নয়া উপনিবেশিকদের জন্য হাসপাতাল, টাউন হল, আদালত, ডাকঘর, পুলিশ-ঘাঁটি, সিনেমা হল, পাঠাগার, বিদ্যালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে।

যখন এইসব আয়োজন সমাপ্তির পথে, তখন হঠাৎ লাইবেরীয় সরকার প্রতিশ্রুত কনসেশন প্রত্যাহার করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যেসব মালমশলা লাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে-সব বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়। লাইবেরীয় সরকারী মহলের সন্দেহ ছিল, লাইবেরিয়ার সরকারকে উচ্ছেদ করে সে-দেশের ক্ষমতা দখলই হচ্ছে গার্ভে ও তাঁর দলবলের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া হয়তো লাইবেরিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির শাসক, বৃটেন ও ফ্রান্স, লাইবেরীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তাদের উপনিবেশের এত কাছে এমন সংগ্রামাত্মক আন্দোলন সহ্য করা হবে না। কারণ যা-ই হোক না কেন, 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের আকস্মিক অপমৃত্যুতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

লাইবেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার বুদ্বুদ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া, গার্ভে-আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী, ব্ল্যাক স্টার লাইনের দেউলিয়ায়। অবস্থা চরমে ওঠে যখন ১৯২৫ সালে প্রবঞ্চনার অপরাধে গার্ভে মার্কিন সরকার কর্তৃক পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এরপর আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে এবং ভগ্নহৃদয় ভবিষ্যৎ 'আফ্রিকা-রাজ্যের রাষ্ট্রপতি' গার্ভে ১৯৪০ সালে প্রায়বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

গার্ভে নিজকে নিগ্রোজাতির মোসেস বলতেন। মোসেস-পরিচালিত ইহুদীদের সঙ্গে অবশ্য গার্ভে-পরিচালিত আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'প্রবাসী' নিগ্রোদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে ইহুদীরা গোলামের মতো দিন কাটাত। আফ্রিকা থেকে বলপ্রয়োগে নিগ্রোদের আমেরিকায় এনে সেখানে তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়েছিল। ইহুদীদের জেরুসালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মোসেস। আমেরিকান নিগ্রোদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল গার্ভের।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা যে অনেকাংশে অবাস্তব তাতে সন্দেহ নেই। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর সমগ্র নিগ্রো অধিবাসীদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম নয়। প্রথমত, কয়েকপুরুষ আমেরিকা-বাসের ফলে উন্নততর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমেরিকান নিগ্রোদের সকলেই যে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে ফিরতে চাইত, তা মনে হয় না। আর তারা চাইলেও তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের জায়গা কোথায়? ১৯২০ সালে আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। আর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে গার্ভে-অনুগামীদের বসবাস করতে দেবে এমন কথা ভাবা অলীক স্বপ্ন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা-নির্বাচন, উপাধি বিতরণ ও সৈন্যদল গঠন সত্ত্বেও গার্ভের আশা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। মহাশূন্যে তো আর রাষ্ট্র গঠন করা যায় না।

তিন

গার্ভের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অন্য ধারার নেতা দ্যু বোয়া 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের মূল্যবিচার প্রসঙ্গে বলেন, "সামগ্রিকভাবে বাস্তবে রূপায়ণ অসম্ভব হলেও এই আন্দোলন ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ। তবু এর নিষ্ঠা ও ব্যবহারিক দিকটির কথাও বলা দরকার। গার্ভে প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতাই নন, প্রচার-অভিযানেও তাঁর নিপুণ পারদর্শিতা। তাঁর নির্ভীক প্রচার ও সংগঠনের মারফৎ গার্ভে সারা দুনিয়ার নিগ্রোদের এক নতুন প্রেরণা ও স্বাজাত্যাভিমান এনে দিয়েছেন। অন্য সব কিছু ভুলে গেলেও, এ অবদান কিছু কম নয়।"

বস্তুত, গার্ভে ছিলেন উপপ্লাবক জননেতা। জন-মনস্তত্ত্ব তিনি ভালো বুঝতেন; কেমন করে বিক্ষোভ জাগাতে হয়, কি-ভাবে সাহস ও বিশ্বাস দিতে হয়, এসব ছিল তাঁর নখদর্পণে। পক্ষান্তরে দ্যু বোয়া ছিলেন মননশীল অধ্যাপক। গার্ভে যেখানে আবেদন করতেন হৃদয়বৃত্তির কাছে, সেখানে দ্যু বোয়ার আবেদন যেত বুদ্ধিবৃত্তিতে। গার্ভে ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতা ও জাতিগর্বকে আঘাত করতে চাইতেন কৃষ্ণবর্ণগর্ব দিয়ে। আর দ্যু বোয়া ছিলেন সব রকমের জাতি-আভিজাত্য-গর্বের শত্রু। তাঁর নিজের অজস্র রচনা ও বক্তৃতায় দ্যু বোয়া 'শ্বেত' জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

গার্ভের অনেক আগে তিনি প্রচার ও আন্দোলনে নেমেছেন। এবং গার্ভে যখন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি জ্যামেইকা ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, ছ্যু বোয়া ততোদিনে আমেরিকান নিগ্রোদের কিছু অংশকে সংগঠিত করতে পেরেছেন।

যাই হোক, প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের দুর্ভাগ্যবশত ছ্যু বোয়া ও গার্ভে একসঙ্গে কাজ করতে পারেন নি। তার একটা কারণ আমরা আগেই বলেছি, ছ্যু বোয়া গার্ভের মতো বর্ণাভিজাত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় এক কারণ, উভয়ের লক্ষ্য ও আদর্শগত পার্থক্য। ছ্যু বোয়ার লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। বর্ণসমস্যাকে তিনি ধনতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। গার্ভে কিন্তু ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমের প্রকাশ্য সমর্থন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়: "পৃথিবীর প্রগতির জন্য ধনতন্ত্রের প্রয়োজন আছে। যারা এর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক ও যথেচ্ছাক্রমে বাধা দেয়, তারা মানবিক প্রগতির শত্রু।" গার্ভের আক্ষেপ শুধু ছিল, "আফ্রিকা কেন পৃথিবীকে কৃষ্ণাঙ্গ রকফেলার, রথস্‌চাইল্ড ও হেনরি ফোর্ড উপহার দেবে না?" অন্যদিকে নব্বুই বছরের বৃদ্ধ ছ্যু বোয়া ১৯৫৮ সালে ঘানায় অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান সম্মেলনে বাণী পাঠান: "বেসরকারী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বেসরকারী ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে।·· যে আফ্রিকান কৌম থেকে আপনাদের সকলের জন্ম, সেই আফ্রিকান কৌমসমাজ প্রথম থেকেই ছিল সাম্যাত্মক···পশ্চিমী পুঁজিবাদীদের ভিক্ষান্নের জন্য নিজেদের মহান ঐতিহ্য বিক্রয় করার চেয়ে বরং আপনাদের আর কিছুদিন উপবাসে থাকা শ্রেয়ঃ।···আফ্রিকা জাগো।" আর এই ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই তিরানব্বুই বছরের নেতা ছ্যু বোয়া প্রকাশ্যে ও সগর্বে আমেরিকান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন।

কার্যক্রমের দিক থেকেও ছ্যু বোয়ার আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বহমান। 'আফ্রিকায় ফিরে চল'-এর ডাকে তিনি ভোলেন নি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, আফ্রিকামহাদেশের বিভিন্ন জনমুক্তি সংগ্রামে সকলের সমবেত সাহায্য দান। এই উদ্দেশ্যে ছ্যু বোয়ার নেতৃত্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে পাঁচটি প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে পারী শহরে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে মোট সাতান্ন জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলন থেকে যে-সব দাবি তোলা হয় তার মধ্যে এইগুলি ছিল প্রধান:

(১) আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশগুলিতে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে অছি শাসন প্রবর্তিত হোক (পরবর্তীকালে লীগ অফ নেশন্সের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা)।

(২) আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য মিত্রশক্তিরা কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণ করুক।

(৩) লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক এই নীতিগুলির বাস্তবে রূপায়ণ তত্ত্বাবধানের জন্য এক স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হোক।

প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে প্রস্তাবিত ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক গৃহীত হয়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে কংগ্রেস আফ্রিকার সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশেষ করে ভার্সাই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ইভনিং গ্লোব পত্রিকার পারীস্থ প্রতিনিধি লেখেন, "ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম।" ১৯১৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা মন্তব্য করে, "প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস রচিত কর্মসূচীতে অযৌক্তিক কিছু নেই।"

প্রথম কংগ্রেসের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্যু বোয়া ও তাঁর বন্ধুরা ১৯২১ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেস আয়োজন করলেন। এবার মোট ১১৩ জন প্রতিনিধি যোগ দেন, তার মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খোদ আফ্রিকা থেকে। লণ্ডন, ব্রাসেলস ও পারী শহরে এর অধিবেশন বসে এবং স্থানীয় সমাজতন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেকে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেস থেকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি ওঠে এবং দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লীগ অফ নেশন্সের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের আবেদনপত্রটি লীগের 'সরকারী দলিল' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রায় একই সময়ে পারী শহরে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনেরও প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু কয়েক বছর কাজ করার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি লণ্ডন ও লিসবোয়ায় (লিসবনে) তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। লণ্ডনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি, যোগদান করেন এইচ. জি. ওয়েলস এবং বাণী পাঠান ভাবী প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

[ক] স্বদেশশাসনে ঔপনিবেশিক জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার ;

[খ] সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ;

[গ] আফ্রিকাবাসীর স্বার্থে আফ্রিকার উন্নয়ন ;

[ঘ] বিশ্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বেআইনী ঘোষণা ; কিন্তু যদি এই লক্ষ্য বাস্তবে প্রয়োগ না করা যায়, তবে যতোদিন শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, ততোদিন কৃষ্ণাঙ্গদের আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অধিকার।

কংগ্রেসের লিসবোয়া অধিবেশনে পর্তুগালের দু'জন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী বক্তৃতা করেন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশে 'চুক্তিবদ্ধ শ্রম' ব্যবস্থার (যাকে প্রায় দাসত্ব বলা যায়) বিলোপ সাধনে সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখনীয়, আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশে আজ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শ্রমদানের নিয়ম প্রচলিত আছে।

দ্যু বোয়া চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের আয়োজন করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, একটি জাহাজ ভাড়া করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচার-পর্যটন চালাবেন। এবং তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর কোনো এক শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ কোম্পানীগুলির সহানুভূতির অভাবে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। সেই বছরে নিউ ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

দ্যু বোয়া লিখেছেন: "আফ্রিকা মহাদেশে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯২৯ সালে আমরা অনেক চেষ্টা করি। যাতায়াত সহজ বলে টিউনিস শহরটি নির্বাচন করা হয়।...কিন্তু দু-টি দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হলো। প্রথমত, ফরাসী সরকার খুব ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে আমাদের জানালেন, সম্মেলন ফ্রান্সের যে-কোনো শহরে অনুষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু ফরাসী আফ্রিকায় নয়। আর দ্বিতীয় বাধা আসে: পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট।" অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হতে না হতে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে এল। তাই, পঞ্চম আফ্রিকান কংগ্রেস ১৯৪৫ সালের আগে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

অবশ্য ইতিমধ্যে আফ্রিকার ঐক্যাকাঙ্ক্ষী নেতারা যে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তা নয়। ১৯৩৬ সালে ইতালীর ইথিওপিয়া আক্রমণে 'ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ফ্রেণ্ডস অফ আবিসিনিয়া' নামে একটি সংস্থার জন্ম হলো, যার

উদ্দেশ্য ছিল ইথিওপিয়ার স্বাধীনতারক্ষা। এই সংস্থার কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্য অন্য কয়েকজন উৎসাহী লোকের সাহায্যে ১৯৩৭ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো' স্থাপন করেন। নামে আফ্রিকান হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি অনাফ্রিকান জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সমর্থন জানায়। অনাফ্রিকানদের এতে 'সংশ্লিষ্ট' সদস্যপদ (অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ) লাভের অধিকারও দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিত হয়। শেষোক্ত সংগঠনে ইতিপূর্বেই বৃটেন ও বৃটিশ আফ্রিকার নানা সংস্থা সম্মিলিত হয়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিষ্ঠানিক ঐক্যের পর, সংগঠন ও আদর্শ উভয় দিক থেকেই প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশন প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস আন্দোলনের বৃটিশ শাখার স্থান গ্রহণ করে।

১৯৪৫ সালে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। গোল্ডকোস্টের প্রতিনিধি ছিলেন নক্রুমা, কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করলেন জোমো কেনিয়াট্টা, আর সিয়েরা লিওন থেকে আসেন ওয়ালেস জনসন। আফ্রিকার জনগণের (বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার) স্বাধীনতার দাবি সমর্থন ছাড়া, সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় এবং রোডেসিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের ওপর জোর করে যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টার নিন্দা করে। সম্মেলন শেষে কংগ্রেস আটলাণ্টিক সনদের নীতিগুলি মেনে চলার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিদের আহ্বান জানায়।

পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কাজে প্রয়োগের ভার পড়ে প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের ওপর। এ ছাড়া কোয়ামে নক্রুমা নিজ উদ্যোগে একটি পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েট গঠন করলেন, যার লক্ষ্য ছিল পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়ণ। পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েট ও পশ্চিম আফ্রিকান ছাত্র-সংঘের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে লণ্ডন শহরে এক সম্মেলন আহূত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে প্যান-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রস্তুতি হিসাবে পশ্চিম আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শপথ গ্রহণ করলেন।

এই সম্মেলনের এক বছর পরে পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েটের সম্পাদক কোয়ামে নক্রুমা গোল্ডকোস্টে ফিরে সেখানকার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারও দশ বছর বাদে গোল্ডকোস্ট স্বাধীনতা পায়। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এতগুলি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু হয়েছে।

এই নব পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কী দেখা যাক।

চার

এতদিন প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছিল। আফ্রিকা মহাদেশে সংগঠন করা তো দূরের কথা, এর পাঁচটি কংগ্রেসের একটিও আফ্রিকার বুকে মিলিত হতে পারেনি। আফ্রিকার এতগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হবার পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন তার বাণী সোজাসুজি লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর কাছে পৌছে দেবার সুযোগ পেয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের অর্থ-সমস্যাও মিটেছে। অর্থাভাবে কোনো আফ্রিকান ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না, একথা আজ চিন্তাতীত।

পক্ষান্তরে সারা দুনিয়াব্যাপী ঐক্যবদ্ধ নিগ্রো ফ্রন্ট গঠনের প্রেরণাও বুঝি আর তেমন শক্তিশালী নেই। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অধিবাসীদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হয়েছে। ওয়েস্টইণ্ডিজে নিগ্রোরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের পথে এগিয়ে গেছে। সর্বোপরি আফ্রিকার বহু উপনিবেশ শুধু স্বাধীনতাই পায়নি, তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এমন কি শত্রুতা পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। ইথিওপিয়া-সোমালিয়া ও ঘানা-টোগো সীমান্ত নিয়ে মনোমালিন্য, মরক্কো ও মরিতানিয়ার বিবাদ, ঘানা ও নাইজেরিয়ার প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমে বলেছি, প্যান-জার্মান আন্দোলনের ভিত্তি এক ভাষা ও সংস্কৃতি, প্যান-ঐস্লামিক আন্দোলনের বনিয়াদ এক ধর্ম আর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নির্ভর-স্তম্ভ হলো অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। পরাধীন, শোষিত ও ঘৃণিত নিগ্রোদের সমস্বাতন্ত্র্যচেতনা স্বাভাবিক কারণেই জাগে। কিন্তু আজ যখন আফ্রিকানরা স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় নিজেদের সম্মানজনক স্থান আদায় করে নিতে পারছে,

তখন তাদের মধ্যে প্যান-আফ্রিকান মনোভাব দুর্বল হয়ে ভাষা, ধর্ম, সমাজাদর্শ ও কৌম অনুযায়ী বিভেদ জাগাটা খুব অভাবিত বলা যায় না।

তাই সমস্ত আফ্রিকান রাষ্ট্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের চেষ্টা এখনও সফল হয় নি, বা অদূর ভবিষ্যতেও তার সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, অথচ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের সাধারণ মতামত জোরের সঙ্গে বলার জন্য ঐক্যের প্রয়োজন আছে, একথা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অস্বীকৃত নয়। এবং এই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন এবং অন্য যা কিছু ব্যবস্থা-অবলম্বন প্রয়োজন, তা তারা করে। গত পাঁচ বছরে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে আফ্রিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম আটটি স্বাধীন দেশ (ইথিওপিয়া, ঘানা, টিউনিসিয়া, মরক্কো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সুদান) পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারের জন্য আক্রায় মিলিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে এইগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য : (ক) আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় নির্দিষ্ট করে ঘোষণার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রতি আহ্বান; (খ) আলজেরিয়ার জনমুক্তি সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন; (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

পরের বছর আগস্ট মাসে ন-টি আফ্রিকান রাষ্ট্র আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ ও 'অন্যান্য সাধারণ সমস্যা' আলোচনার জন্য লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ায় মিলিত হয়। এর প্রকাশ্য অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে কায়রোস্থিত 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'-এর প্রেরিত দূতদের পূর্ণক্ষমতাসহ সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সম্মেলনে গিনি প্রজাতন্ত্রের নেতা শ্রীসেকু তুরে গিনি কর্তৃক 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'কে স্বীকার এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সম্মেলনে আলজেরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবে ফ্রান্সকে যুদ্ধ বন্ধ করে 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রদের ফ্রান্সকে উক্ত সংগঠন-প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র আলজেরিয়ায় ব্যবহার থেকে বিরত করতে আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া, স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'কে বৈষয়িক সাহায্যের অনুরোধও সম্মেলন করে।

নক্রুমার আহ্বানে আক্রায় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে 'নিশ্চয়াত্মক

কার্যক্রম' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য, আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলন দমন ও সাহারায় ফ্রান্সের পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে 'নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম' গ্রহণ করা। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নীচেরগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে কমনওয়েলথ থেকে বিতাড়ন, তার পণ্য বয়কট ও তার কাছ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট প্রত্যাহার ; (২) ফরাসী পণ্য বর্জন ও স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে ফরাসী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ; এবং (৩) আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন।

এর দু-মাস বাদে দশটি আফ্রিকান রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় মিলিত হয়। এ ছাড়া কিছুকালের মধ্যেই স্বাধীনতা পাবে এমন দু-টি দেশ (নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া) ভোটাধিকার ছাড়া আলাপ-আলোচনায় যোগ দেয়। এখানে আফ্রিকান ঐক্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পরও এর যথার্থ রূপ এবং সঙ্ঘবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত সময় নিয়ে মতৈক্যে পৌছান যায় নি। ঘানার পররাষ্ট্রসচিব বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্যে'র প্রয়োজন সমর্থনান্তে উল্লেখ করেন যে ঘানার নতুন সংবিধানে আফ্রিকান ঐক্যের স্বার্থে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আফ্রিকান রাষ্ট্র ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব তিনি পেশ করেন। এর উত্তরে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্র ইউনিয়ন গঠনের উপযুক্ত মুহূর্ত এখনও উপস্থিত হয়নি। ট্যাঙ্গানাইকা নেতা জুলিয়াস নিয়েরেরে ট্যাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডার মিলনে এক পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান। মতবিনিময়ের শেষে সম্মেলন একটি যৌথ আফ্রিকান বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, একটি যৌথ আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, আফ্রিকান অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এর পর ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন। এখানে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ছিল : মরক্কো, ঘানা, মালি, গিনি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও লিবিয়া। টিউনিসিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া ও টোগো উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণে অনিচ্ছা জানায়। সম্মেলন থেকে কঙ্গোর

নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতি সাধারণভাবে সমর্থন জানানো হয়। এ ছাড়া অন্য একটি প্রস্তাব মারফৎ মরিতানিয়াকে ফ্রান্সের 'উপগ্রহ রাজ্য' আখ্যা দিয়ে সে-দেশের ওপর মরক্কোর দাবি সমর্থিত হয়। সম্মেলন থেকে একটি 'আফ্রিকান চার্টার' গৃহীত হয়, যদিও লিবিয়া ও অন্তর্বর্তী আলজেরীয় সরকারের প্রতিনিধিরা এই সনদে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। সম্মেলনের শেষে ঘোষিত হলো, "যত শীঘ্র সম্ভব একটি আফ্রিকান উপদেষ্টা পরিষদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান সমবায়ে এক রাজনৈতিক কমিটি এবং বিভিন্ন দেশের সেনাপতিদের নিয়ে এক আফ্রিকান হাইকম্যাণ্ড গঠিত হবে।"

আলাপ-আলোচনার মারফৎ পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থাবলম্বন শুধু রাষ্ট্রনেতাদের সম্মেলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও জনসংগঠন-গুলির সোৎসাহ শক্তি এই কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষে ৫০টি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি আক্রায় মিলিত হয়। মোট ২৫টি আফ্রিকান দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে কেনিয়ার শ্রমিক নেতা টম এম্বোয়া সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনের একটি কমিটি প্রস্তাব করে যে, প্রথমত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর সারা আফ্রিকা জুড়ে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্মেলন থেকে আক্রায় একটি স্থায়ী দফতর স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

এর পর ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বয়কট ও আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যদান বিষয়ে আলোচনা চলে। তৃতীয় সম্মেলন আহূত হয় কায়রো শহরে (মার্চ, ১৯৬১)। সম্মেলন আলজেরীয় সরকারকে সর্বাত্মক সমর্থন জানায় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাহারা আলজেরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করে। এ ছাড়া গিজেঙ্গা-পরিচালিত স্টানলেভিল সরকারের প্রতিও আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। অন্য এক প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করার জন্য সম্মেলন আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানায়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐক্যের আগ্রহ শুধু মাঝে মাঝে সম্মেলন অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। চেষ্টা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তা গঠনের।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত এই স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি। বরং প্যান-আফ্রিকানিস্টরা গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অন্যদিকে ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তির প্রস্তাব আজও প্রকৃতপক্ষে কাগজে-কলমে বন্দী হয়ে আছে বলা যায়।

প্রথমে মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। দ্য গলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের পর একদিকে যেমন ফ্রান্সের চাপিয়ে দেওয়া বৃহত্তর রাজ্য ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ভেঙে গিয়ে আটটি পৃথক দেশে (মরিতানিয়া, গিনি, সেনেগাল, সুদান, আইভরী কোস্ট, ঊর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে) পরিণত হলো, অন্যদিকে তেমনি স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনেরও সুযোগ এল। এর প্রথম প্রকাশ: সেনেগাল, সুদান (ভূতপূর্ব ফরাসী সুদান), ঊর্ধ্ব ভলতা ও দাহোনে'র মালি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন প্রচেষ্টায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। এই সিদ্ধান্তের পর এক যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে মালি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে, যার আদর্শ ছিল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান।

আনুষ্ঠানিকভাবে মালি যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। তার মধ্যে কিন্তু ঊর্ধ্ব ভলতা ও দাহোমে পশ্চাদপসরণ করেছে। অর্থাৎ মালি যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হলো মাত্র দু-টি দেশ নিয়ে সুদান (পূর্বতন ফরাসী সুদান) ও সেনেগাল। সেপ্টেম্বর মাসে মালি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে শিথিল বন্ধন বজায় রেখে স্বাধীনতা চায়। পরের বছর (১৯৬০) এপ্রিল মাসে ফ্রাঙ্কো-মালি চুক্তিতে মালির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার পর জুন মাসে মালি পূর্ণ স্বাধীন দেশে পরিণত হলো। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর মালি যুক্তরাষ্ট্র দু-মাসেরও বেশি টেকেনি। আগস্ট মাসের শেষার্ধে সুদানী ও সেনেগালী নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সেনেগালী নেতাদের মতে সুদানী নেতারা (বিশেষ করে মোদিবো কেইতা) অন্যায়ভাবে নিজেদের প্রভুত্ববিস্তারে ব্যাপৃত। সঙ্কট চরমে ওঠে যখন কেইতা (যিনি ছিলেন সুদান ও মালি যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের প্রধান মন্ত্রী) সেনেগালী নেতাদের পদচ্যুত করলেন। উত্তরে সেনেগালী আইনপরিষদ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে সেনেগালের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এবং কেইতা ও অন্যান্য সুদানী নেতাদের কিছুকাল স্বগৃহে অন্তরীণ রাখার পর তাঁদের মুক্তি দিয়ে সুদানের রাজধানী

বামাকো শহরে পাঠানো হয়। সুদানের নেতারা অভিযোগ করেন, সুদান-সেনেগাল সংঘর্ষের মূল প্ররোচক মালিস্থ উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারীবৃন্দ। সঙ্গে সঙ্গে এমন দাবিও ওঠে যে সংবিধানতঃ মালি যুক্তরাষ্ট্র এরকমভাবে ভেঙে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের শেষদিকে সুদানী আইনপরিষদও মালিযুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা মেনে নেয়।

মালি যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা, তার বাস্তবে রূপায়ণ ও তার পতন সবই কিছুটা আকস্মিক। এর তুলনায় ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তির প্রগতি অতি বিলম্বিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতই বিলম্বিত যে সংযুক্তি-প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়ণ এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি বললেই চলে। ১৯৫৯ সালের মে মাসে নক্রুমা ও সেকু তুরে এক যুক্ত বিবৃতিতে দুই দেশের মিলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়নের পরিকল্পনাও প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনানুসারে আফ্রিকান রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রতিটি সদস্য-দেশের নিজ স্বাতন্ত্র্য, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও পৃথক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকার স্বীকৃত থাকবে। সমগ্র রাষ্ট্রসঙ্ঘ মিলিতভাবে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যদিও প্রতি রাষ্ট্রের পৃথক সেনাদল থাকবে। এ ছাড়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থাপিত হবে এক সাধারণ অর্থনৈতিক পরিষদ এবং নোট-মুদ্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অধিবাসীরা পাবে দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকার; তাদের নিজ নিজ দেশের এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের।

জুলাই মাসে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো নক্রুমা, তুরে এবং লাইবেরিয়ার টাউবম্যান স্থির করেন যে ১৯৬০ সালে আফ্রিকার সমগ্র স্বাধীন রাজ্যকে এক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করে আরও সুষ্ঠুভাবে ঐক্যবদ্ধ আফ্রিকান সমাজ গঠনের চেষ্টা হবে।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা মালি প্রজাতন্ত্রের মোদিবো কেইতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ঘোষণা করেন যে ঘানা ও মালি এক আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সব কথা খুলে না বললেও নক্রুমা একথা প্রকাশ করেন যে কেইতার সঙ্গে তিনি ঘানা-মালি ঐক্যবন্ধন বিষয়ে আরো কতকগুলি ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

পরের মাসের শেষে (ডিসেম্বর, ১৯৬০) নক্রুমা, কেইতা ও সেকুতুরে এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘানা, গিনি ও মালির সমন্বয়ে এক ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তের কথা বলেন। এই ইউনিয়নের থাকবে সাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক

ও অর্থনৈতিক নীতি। ইউনিয়ন গঠন ও সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বনের উপায় নির্ধারণের জন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এ ছাড়া ঠিক হলো যে এ তিন দেশের রাষ্ট্রপতিরা বছরে চারবার করে মিলিত হবেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা ছাড়া ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তি প্রস্তাব খুব বেশি দূর এগিয়েছে বলা যায় না।

আফ্রিকার রাজনীতিতে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বামপন্থী কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা পশ্চিমী নেতৃত্ব সরাসরি মেনে নিতে অনিচ্ছুক তাঁদের ঐক্যপ্রচেষ্টার কথা এতক্ষণ বলা হলো। এঁরা ছাড়া পাশ্চাত্ত্যপন্থী রাষ্ট্রনায়করাও নিজেদের ঐক্য গড়ার কাজে নেমেছেন। মালি যুক্তরাষ্ট্র উদ্বোধনের কিছুদিন বাদে আইভরী কোস্ট, উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে মিলে 'সাহেল-বেনিন" ইউনিয়ন গঠন করে। এই চারটি দেশ, বিশেষ করে প্রথম দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রয়েছে। জনসংখ্যার চাপের ফলে ভলতার বহু নাগরিককে আইভরী কোস্টে গিয়ে জীবিকার্জন করতে হয়। ভলতার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের গতিপথ হলো আইভরী কোস্টের আবিদিয়ান বন্দরের মধ্য দিয়ে। অতএব, এইসব রাষ্ট্রের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আইভরী কোস্টের রাজধানী আবিদিয়ানে ১৯৫৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে এই চারটি দেশের নেতৃবৃন্দ সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন গঠনের জন্য কয়েকটি বিধানের কথা ঘোষণা করেন :

(ক) উল্লিখিত চারটি দেশ নিয়ে এক শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ;

(খ) অর্থ, বিচারব্যবস্থা, শ্রম, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য ও করব্যবস্থা সম্পর্কে এই সব দেশের আইনসমূহের সামঞ্জস্য বিধান ;

(গ) পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সংহতি-তহবিল স্থাপন ; এবং

(ঘ) ইউনিয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক 'কঁসেই দ্য লঁাতাং' ; (মৈত্রী পরিষদ) গঠন।

সাহেল-বেনিন ইউনিয়নের হোতা ছিলেন আইভরী কোস্টের বিখ্যাত নেতা হুফুয়ে বোয়াঞি। মালি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পরিবর্তে যে তিনি অন্য এক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? প্রথমত মৌলিক আদর্শের দিক থেকে মালির প্রধান সমর্থক সুদানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

হুফুয়ে-র অনেক প্রভেদ, কারণ এঁদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী। এ ছাড়া, ফরাসী 'কম্যুনিতে'র সঙ্গে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, সে-বিষয়েও মালির নেতাদের সঙ্গে হুফুয়ে বোয়াঞ্জি একমত হতে পারেন নি। যেখানে মালি যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা ফরাসী 'কম্যুনিতে'কে কমনওয়েলথের আদর্শে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, সেখানে ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করাই হুফুয়ে-র অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু মালি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই 'কঁসেই দ্য লাঁতাৎ'-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি (উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার, আইভরী কোস্ট ও দাহোমে) ফ্রান্সের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। আগস্ট মাসে এই চারটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, যদিও স্বাধীনতা পাবার পরেও গিনি, মালি প্রভৃতি দেশের তুলনায় এদের মধ্যে ফরাসী প্রভাব অনেক বেশি মাত্রায় বজায় থাকে।

পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ কর্তৃক মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পরে পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার চারটি দেশ,—মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ইয়ুবাঁগুাই-শারি) কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (পূর্বেকার ফ্রান্স শাসিত মোয়াইয়েন বা মধ্য কঙ্গো), গাবোঁ প্রজাতন্ত্র ও শাদ প্রজাতন্ত্র—চুক্তি মারফৎ এক শুল্ক ইউনিয়ন ও 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করল। এই 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রে' বাণিজ্য পণ্য, সম্পত্তি ও মূলধনের স্বাধীন গতিবিধি থাকবে বলে স্থির হয়। এর ওপর বন্দর, রেলপথ, নৌবাহন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টেলিকম্যুনিকেশন) প্রভৃতি পরিচালনার জন্য এক যৌথ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিন্তু 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করলেও প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি।

মোটামুটি বলা যায় সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন আর বিষুবরৈখিক শুল্ক ইউনিয়ন হলো অধুনাখ্যাত ব্রাজাভিল শক্তিগোষ্ঠীর সংহতির পথে প্রথম পদক্ষেপ। পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ এইসব দেশের পূর্বোক্ত নামকরণের কারণ, জনসমক্ষে এরা প্রথম গুরুত্ব পায় ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ব্রাজাভিল সম্মেলনের সময়, যদিও তারও আগে অক্টোবর মাসে, এদের মধ্যে সাতটি রাষ্ট্রের নেতারা আবিদিয়ানে মিলিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ঘানা, গিনি, মরক্কো

প্রভৃতি দেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠীত কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে এরা কেউই যোগ দেয় নি।

আবিদিয়ান ও ব্রাজাভিল সম্মেলনের সময় এইসব রাষ্ট্রের নেতারা নিজেদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। এঁদের সমস্যা ছিল, কেমন করে নিজ নিজ দেশের জনমতের বিপক্ষে না গিয়ে আলজেরীয় সমস্যার এমন সমাধান খুঁজে বার করা যায় যা ফ্রান্সের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্তভাব ধীরে ধীরে কেটে গেছে এবং গোষ্ঠীর নেতারা তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়েছেন।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দাকার শহরে দ্বাদশ ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক নীতি ও শুল্ক আইনগুলির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আর কিছুদিন বাদে দ্বাদশ শক্তির রাষ্ট্রনায়কেরা ইয়াউদে শহরে সম্মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বোক্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করেন। এই ইয়াউদে সম্মেলন থেকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার শুল্ক ইউনিয়নকে (যে ব্যবস্থা পূর্ববর্তী দু-বছর যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল) নবজীবন দেওয়া হয় এবং আবিদিয়ানে এই ইউনিয়নের একটি স্থায়ী দফতর স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া মূলধন লগ্নী করার এক সাধারণ এলাকা ও ঐক্যবদ্ধ বাজার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গৃহীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয় বিমান পরিবহনের জন্য এক সংযুক্ত কোম্পানী স্থাপন, ঐক্যবদ্ধ ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা সম্পর্কে অনুরূপ নীতি গ্রহণ এবং বিচারব্যবস্থা ও নাগরিকত্বের অধিকারদান সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে গৃহীত আইনকানুনের সামঞ্জস্যবিধান করা হবে। এমনকি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরামর্শ ও এক সম্মিলিত দেশরক্ষা চুক্তির কথাও ঘোষিত হয়।

ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের ঐক্যানুগ প্রগতির আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্ট। ১৯৬০ সালের শেষে যখন তারা আলজেরীয় বিদ্রোহী ও ফরাসী সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার প্রস্তাব করে, তখন এই প্রস্তাবের কার্যকারিতায় তারা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বস্তুত অন্য প্রায় সব আফ্রো-এশীয় দেশ কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আলজেরীয় বিতর্ক শেষ হতে না হতেই এই প্রস্তাবের সমর্থন আসে খোদ আলজেরীয় বিদ্রোহী সরকারের কাছ থেকে। কঙ্গো সঙ্কটেও এই শক্তিবর্গ খুব সাবধানে বলেছে, 'কঙ্গোর সমস্যা কঙ্গোনীয় জনগণেরই সমাধান করা উচিত।' এবং কাসাভুবুকে সমর্থন করলেও তারা গিজেঙ্গা সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য

সমালোচনা থেকে বিরত ছিল। এক কথায়, এরা কঙ্গো সঙ্কটে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এড়িয়ে গেছে।

১৯৬১ সালের মে মাসে ব্রাজাভিল গোষ্ঠী এবং অন্য আটটি রাষ্ট্র (নাইজেরিয়া সিয়েরা লিওন, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, টিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও টোগো) মনরোভিয়ায় মিলিত হয়ে স্থির করে যে অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই বিশটি দেশ এক হয়ে ভোট দেবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংহতির ওপর জোর না দিয়ে, পূর্বোক্ত দেশ সমূহের নেতারা স্থির করেন, অর্থ নৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

পাঁচ

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের কাছে এবার স্পষ্টতর হয়েছে। অতীতে গার্ভের নেতৃত্বে যে 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন চলে আজ আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বরং দ্যু বোয়া প্রভৃতির পরিচালনায় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন অন্তত কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে বলা যায়, যেহেতু মহাদেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল থেকে আজ ঔপনিবেশিক শাসন লুপ্ত। স্বাধীন হবার পর আফ্রিকার দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করবে এমন আশা অনেকে করতেন। আজ বুঝতে পারা যায়: সমস্ত আফ্রিকান দেশ নিয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। অবশ্য আঞ্চলিকভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলতে পারে এবং বিচ্ছিন্নভাবে তার পক্ষে আংশিক সাফল্যলাভও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কৌম, ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির পার্থক্য ছাড়াও আজ মৌলিক মতাদর্শ ও নীতির পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই, আফ্রিকান ঐক্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই দুই বিপরীতমুখী স্রোত। একদিকে, ঘানা, গিনি, মালি, মরক্কো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী; পূর্ব-পশ্চিম বিবাদে নিরপেক্ষতা অবলম্বন ও আফ্রিকায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ যাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে, আইভরী কোস্ট, মরিতানিয়া, সেনেগাল, ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ মধ্য কঙ্গো) প্রভৃতির নেতৃত্বে ব্রাজাভিল গোষ্ঠী; যারা পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি পশ্চিমপন্থী। এই দুই গোষ্ঠী অর্থ নৈতিক, সামরিক

ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় বাস্তব অগ্রগতির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনও মেলেনি।

ছয়

পাঠকদের সুবিধার্থে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও আনুষঙ্গিক বর্ষপঞ্জী এখানে সংক্ষিপ্তকারে উপস্থিত করা হলো।

১৯০০—হেনরী সিলভেস্টার-উইলিয়ামস-এর উদ্যোগে বৃটেন ও ওয়েস্ট ইণ্ডিস্ থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি লণ্ডন শহরে মিলিত হন।

১৯১৯—পারী শহরে ছ্য বোয়ার নেতৃত্বে প্রথম আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২০—ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হয়।

১৯২১—লণ্ডন, ব্রাসেল্‌স্ ও পারী শহরে দ্বিতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৩—লণ্ডন ও লিসবনে তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৭—নিউ ইয়র্কে চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৯—টিউনিস শহরে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠানের বিফল প্রচেষ্টা।

(অর্থনৈতিক সংকট ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ)

১৯৪৫—ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯৫৭—প্যান-আফ্রিকানিস্ট নেতা কোয়ামে নক্রুমার নেতৃত্বে প্রথম আফ্রিকান-নিগ্রো রাষ্ট্র হিসাবে ঘানার স্বাধীনতালাভ।

এপ্রিল, ১৯৫৮ : আক্রা শহরে আটটি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

ডিসেম্বর, ১৯৫৮ : সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলন (অল্ আফ্রিকান পিপলস কনফারেন্স)।

এপ্রিল, ১৯৫৯ : মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

মে, ১৯৫৯ : ঘানা-গিনি সংযুক্তির কথা ঘোষণা।

মে, ১৯৫৯ : আইভরী কোস্ট, উধ্ব´ ভলতা, নাইজার ও দাহোমে সাহেল্-বেনিন ইউনিয়ন গঠন করে।

জুন, ১৯৫৯ : আইভরী কোস্ট, উধ্ব´ ভলতা, নাইজার, দাহোমে,

সেনেগাল, সুদান, ও মরিতানিয়া, পশ্চিম আফ্রিকান শুল্ক ইউনিয়ন গঠন করে।

আগস্ট, ১৯৫৯ ঃ আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য মনরোভিয়ায় সম্মেলন।

জানুয়ারি, ১৯৬০ ঃ টিউনিসে সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় কংগ্রেস। বিষুবরৈখিক শুল্ক ইউনিয়ন গঠন।

এপ্রিল, ১৯৬০ ঃ নক্রুমার আহ্বানে আক্রায় 'নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম' নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলন।

জুন, ২৯৬০ ঃ আদ্দিস আবাবায় ১০টি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

আগস্ট, ১৯৬০ ঃ সুদান ও সেনেগালের বিরোধের ফলে মালি যুক্তরাষ্ট্রের অপমৃত্যু।

অক্টোবর, ১৯৬০ ঃ আবিদিয়ানে আইভরী কোস্ট প্রমুখ ৭টি আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

নভেম্বর, ১৯৬০ ঃ ঘানা ও মালির এক সাধারণ আইন পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ ঃ ঘানা-গিনি ও মালির ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ ঃ দ্বাদশ আফ্রিকান রাষ্ট্রের ব্রাজাভিল সম্মেলন।

জানুয়ারি, ১৯৬১ ঃ কাসাব্লাঙ্কায় ৭টি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ ঃ ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা দাকার শহরে মিলিত হন।

মার্চ, ১৯৬১ ঃ ইয়াউন্দে শহরে ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের রাষ্ট্রনেতারা মিলিত হন।

মে, ১৯৬১ ঃ মনরোভিয়া সম্মেলন।

জুন, ১৯৬১ ঃ কাসাব্লাঙ্কায় ৩৮টি দেশের ৪৫টি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন। আন্তর্জাতিক প্রভাববিহীন সারা আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়ন সঙ্ঘ গঠন করার সিদ্ধান্ত।

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

চতুর্থ অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

কালবেলা—সন্ধ্যা। ল্যাণ্ডিং সমেত দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মোচড়ের মুখটায় হাতজোড় করা অবস্থার মহাত্মা গান্ধীর সেই বিখ্যাত ছবি। ছবিখানা কোনো শিল্পীর আঁকা। ফ্রেমের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছেন গান্ধীজী।

নিচে ল্যাণ্ডিং-এ একটা গোল টেবিল। খান কয়েক চেয়ার। টেবিলে দিশী বিদেশী পত্রিকা ছড়িয়ে আছে। কংশ ও বীরেশ—দুই ভাই সুবোধ বালকের মতো সেই সব পত্রিকা দেখছে চুপ করে। দেখছে আর wits and humour পড়ে নিজের মনেই খিল খিল করে হাসছে শিশুর মতো। মাঝে মাঝে অতি কুতূহলে একজন আর একজনকে দেখাচ্ছে—তখন দুজনেই হাসছে ছেলেমানুষের মতো। ওদের পরনে স্লিপিং স্যুট—ষ্ট্রাইপ দেওয়া কাপড়ের তৈরি। মাথার চুল 'সুবোধ বালকের' মতো সামনে পাট করা। নিরক্ত—রোগী রোগী ভাব।

বীরেশ খুব হাসছে নিঃশব্দে—থেকে থেকে। হঠাৎ হঠাৎ খিল খিল করে। গম্ভীর হয়ে অন্যধারে পত্রিকা দেখছিল কংশ তার মতো। বীরুর চাপল্য তাকে কৌতূহলী করে।

কংশ : আরে!

বীরেশ : (পত্রিকা দেখিয়ে) সত্যি দাদা ছাখো, এদের হিউমার-টিউমার-গুলো এত subtle হয়! পড়ে ছাখো! (হাসে)

(কংশ ও বীরেশ দুজনেই তখন হাসে)

[রসময়ের প্রবেশ]

রসময় সোজা ঢুকে নিজের মনে ওপরে উঠে যান সিঁড়ি ধরে। এমন সময় কংশ ও বীরুর অকস্মাৎ হাসি শুনে তিনি ঘুরে তাকান। দেখেন। তাকিয়ে থাকেন। ওরা চুপ করে থাকে।

রসময় : নির্মল আনন্দ উপভোগ করছ বলে মনে হচ্ছে।

(দুজনে উঠে দাঁড়ায়)

কংশ : (মাথা চুলকে) আজ্ঞে না, এই…

রসময় : বেশ। আজকে তোমার তারিখ ছিল না মামলার ?

কংশ : আজ্ঞে না, তারিখ আছে পনোরোই, বুধবার।

রসময় : বুধবার !

কংশ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রসময় : (বীরুকে) তোমার paperও সব তৈরি হয়েছে ?

বীরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রসময় : আশু-র সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কাল নাকি তোমাদের একটা Joint discussion আছে, Barrister সেনও থাকবেন !

বীরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ ; আশুবাবু খুব করছেন।

রসময় : হ্যাঁ, করবার যা তা সবাই করবে ; শুধু তোমরাই যা আমাকে এতটুকু অনুগ্রহ করলে না।…যা হোক সব বুদ্ধি করে কাজ করবে। আশু যা বলে শুনো,—সে আমার বন্ধু-জন…তার কর্তব্য সে ঠিকই করবেখন…আর…আর কি !

হঠাৎ মুখ তুলতেই গান্ধীজীর ছবি নজরে পড়ে। অস্বস্তি বোধ করেন রসময়। নিজের হাতে নিজেকে আড়াল করে ওপরে উঠে যান দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ত্বরিৎ পায়ে।

কংশ ও বীরু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ পুতলির মতো। হঠাৎ কংশ নিজের হাতের চেটোতে একটা ঘুষি মেরে মনে বলাধান করে নেয়। আর পায়চারি শুরু করে অস্থির ভাবে।

বীরেশ : আচ্ছা দাদা ?

কংশ : (থেমে পড়ে) কি ?

বীরেশ : নাঃ।

কংশ : যাচ্চলে !…… …আসল কথা কি জানো ভাইটি !

বীরেশ : কি ?

কংশ : দুই আর দুই চার-ও বটে আবার চার না-ও বটে, আমার পড়তায় পড়ল না।

বীরেশ : মানে ?

কংশ : মানে একটা নিশ্চয়ই আছে, একেবারে কি আর বাজে বলিছি।

বীরেশ : পাগলামী করো না।

কংশ : তোমার হিসেবে মিলল না বলে কথাটা পাগলামী বল না।

বীরেশ : পাগলামী নয় তো কি! হুঁঃ, কী একেবারে বিজ্ঞের মতো একটা কথা বললেন! ঐ করেই তো···

কংশ : ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। বিজ্ঞজন যাকে মনে করো তাঁকে একবার ঘটনাটা জিজ্ঞেসা করে দেখো।

[একাউন্টেন্ট মিঃ ব্যানার্জিসহ কণ্ট্রাকটরের প্রবেশ]

কণ্ট্রাকটর : এই যে বীরেশবাবু, আছেন দেখি। আর ঘর ছাড়া এখন আর যাবার জায়গাই বা কোথায়! কি বলেন!

বীরেশ : আমি এখন বাড়িতেই থাকি। কোথাও তো বেরুই না।······ কিন্তু খাতাপত্তর!

কণ্ট্রাকটর : আছে আছে, সব আছে।···কোথায় গেল।

ব্যানার্জি : নামাচ্ছে গাড়ি থেকে। বিরাট ব্যাপার তো!

কণ্ট্রাকটর : তা বটে। গোটা একটা কনস্ট্রাকসনের হিসেব ওর পেটের ভেতর।···এই যে এসে গেছে।

(খাতাপত্রের বিরাট একটা মোট নিয়ে বেয়ারার প্রবেশ)

বীরেশ : এ যে দেখি গন্ধমাদন হে!

কণ্ট্রাকটর : তবে! এখন রাখব কোথায়। Secured একটা জায়গায় রাখতে হবে কিন্তু। একখানি কাগজ এধার ওধার হলে রক্ষে নেই।

ব্যানার্জি : হ্যাঁ, important document সব।

বীরেশ : (কংশকে) কোথায় রাখা যায় দাদা বলতো?

কংশ : ছাখো, বাবাকে বলো।

বীরেশ : আসুন আমার সঙ্গে।

[বীরেশ, কণ্ট্রাকটর, ব্যানার্জি ও বেয়ারার ওপরে প্রস্থান]

[সুহাসের প্রবেশ]

সুহাস : কে এল রে?

কংশ : ঐ বীরুর বন্ধু Contractor Mr. Ghosh. কি সব account পত্তরের ব্যাপার, খাতাপত্তর নিয়ে এসেছেন।

সুহাস : তাহলে গোলমাল এখনও মেটেনি বল।

কংশ : (নিজের হাত দেখতে দেখতে) আচ্ছা মা, বৃহস্পতি তুঙ্গী হলে তো শুনেছি লোকের ভালো হয়।

সুহাস : হুঁঃ, কিছুই আর এখন আমার মাথায় আসছে না।...এতই কি পাপ করেছিলাম!......এত বৈভবের-ই বা কি দরকার ছিল তোমাদের! সব চাইতে মুস্কিল হয়েছে ওঁকে নিয়ে। মুখে তো কিছু বলবেন না।...বড় গর্ব করেছিলাম, আমার ছেলেদের মতো ছেলে হয় না।

কংশ : আচ্ছা মা, কি লাভ এখন সেই দুঃখু করে!

সুহাস : তোমাদের বংশে কেউ কোনদিন লক্ষপতি ছিল না। কিন্তু নামে যশে তাঁদের সম্মান সমাজে কি কিছু কম ছিল? উনি একজন, সারাজীবন শুধু মাস্টারী-ই করলেন। খুঁটেপুটে যা পেলেন সব ঢাললেন তোমাদের পেছনে। ছেলেপুলে মানুষ হলেই যথেষ্ট হলো। কি হবে অর্থ দিয়ে! হিসেবটাই অন্যরকম। তা তোমরা বুঝলে না, শুঝলে না; পূর্বপুরুষের ধ্যানধারণা পাল্টে দিয়ে নিজেরা যা ভাবলে আর করলে, তাতে বংশের সুনাম তো গেলই, এমনকি নিজেরাও বাঁচতে পারলে না। এই কি হওয়া উচিত ছিল!

কংশ : উচিত অনুচিতের কথা নয় মা। আসল কথা কি জানো, বীরুকে যা বলছিলাম আর কি, আমাদের পড়তায় পড়ল না।

সুহাস : বেহিসেবীর আবার হিসেব কি রে! গোটাটাই তো তোদের ফাটকা। সে আবার কি রকম, নিজের সঙ্গেই নিজে বাজী লড়ছিস তোরা। কোনো মানে হয়!

[কংশ-র চোখে একটা সত্য প্রতিভাত হয় যেন। তবু সে কোনো কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে সেই সত্য মননে]

[অসীম ও কল্যাণীর প্রবেশ]

...এসো বাবা এসো। তোমাদের কথাই ভাবছিলাম।

অসীম : কেন মা। আমি তো আপনাকে বলেই গিছলাম আগে থেকে।

সুহাস : তা বলেছিলে ঠিকই কিন্তু ঠিক ঠিক যে মনে করে আসবে...। যেমনি ভুলো আমার জামাই, তেমনি ভুলো আমার মেয়ে, এসো বাবা।

কল্যাণী : তাই তো বলবে। ধরে নিয়ে এলাম কি না! এক্ষুনি বেরিয়ে

যাচ্ছিল Laboratory-তে। বললাম কথা দিয়েছ না তুমি মাকে খেতে যাবে, Laboratory যাবে মানে! তবে এলো।

অসীম : না মা।

কল্যাণী : এই!

সুহাস : যাক ধরে এনেছিস বেশ করেছিস। নইলে হয়তো আবার শুনতুম কপি-তে য়্যাটম বোমা বেরিয়েছে কপি খাওয়া চলবে না।

কল্যাণী : কিন্তু সত্যিই মা জানো, সব খবরই বাজে ভেবো না। সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত radio active হয়ে গিয়েছে শুনছি। এমন কি শাকপাতা পর্যন্ত যে তুমি নিশ্চিন্তে খাবে তার পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টি নেই।

সুহাস : কি বলিস কি! অসীম।

অসীম : পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ না হলে দেখবেন সাংঘাতিক একটা বিপর্যয়ের স্বষ্টি হবে সংসারে।

সুহাস : সত্যি বলছ।

অসীম : সত্যিই মা।

সুহাস : তাহলে কি হবে! সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে?

অসীম : শৌর্য বীর্যের যা দাপট, তাতে আশঙ্কা করবার কারণ আছে বৈ কি মা!

সুহাস : ওরাও তাহলে বাজী ফেলেছে বলো।

অসীম : কিসের বাজী?

সুহাস : সেই কথাই তো বলছিলাম কংশ-কে। বলছিলাম, নিজের সঙ্গে নিজে বাজী না লড়লে কি আর এমনিতে কেউ এমনধারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে! তা না হলে ছাখো নিজের মঙ্গলামঙ্গল বলেও তো একটা কথা আছে।

অসীম : গোটা ব্যাপারটাই তো আত্মঘাতী।

সুহাস : নিজেই নিজেকে তাড়া করে চলিছি আর কি! ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

অসীম : তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

সুহাস : য়ঁ্যা! সে তো মানুষের এক সাংঘাতিক উন্মাদ অবস্থা। কি যেন,

আমার এ সব মাথায়ই আসে না। এই বিয়ে থা, মেয়ে জামাই, ঘর সংসার, ছেলেপুলে, সব মিথ্যে, সব ফাঁকি ?

কল্যাণী : কেন তুমি ওর কথা শুনছ বলতো মা! এসো, খেতে দেবে এসো।

সুহাস : চল তাই দেই। যতদিন দেওয়া যায় আর খাওয়া চলে ততক্ষণই ভালো। এসো বাবা অসীম।

[সুহাসের সঙ্গে অসীম ও কল্যাণীর প্রস্থান]

(কংশ এতক্ষণ ঐ একই ভাবে দাঁড়িয়ে সেই বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মায়ের কথাবার্ত্তা শুনছিল। এতক্ষণে তার চিন্তাভাবনাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার বাচনভঙ্গীতে)

কংশ : আমিই আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলিছি…

(কথাটা বলেই কংশ সেই গোলটেবিলটাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে—)

—এই-এই-এই-এই-এই…তাড়া করে নিয়ে যাই…ই-ই-ই-ই-ই!

[বেগে রঞ্জন-এর প্রবেশ]

রঞ্জন : অমল! অমল! অমল আছিস। অমল।

[সিঁড়িতে কল্যাণীর প্রকাশ]

কল্যাণী : কে! ও!

রঞ্জন : অমল অমল, আছে অমল!

কল্যাণী : দেখছি।

[কল্যাণীর প্রস্থান]

রঞ্জন : অমল! অমল!! অমল!!

[সিঁড়িতে অমলের প্রকাশ]

অমল : কে! কে!

রঞ্জন : (কথাটা বলেই রিভলবার চালায়) আমি, তোর বাবা।

(অমল সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে। কংশ কিন্তু দৃকপাতহীন; তখনও চক্রাকারে শব্দ করে নিজেকে তাড়িয়ে চলেছিল, গুলীর শব্দে সে গোলটেবিলের নিচে গিয়ে ঢোকে)

[সিঁড়িতে রসময়-এর প্রকাশ]

রসময় : কি ব্যাপার কি!

রঞ্জন : আপনি ঘরে যান প্রফেসর।

রসময় : আ-হা-হা-হা···(কয়েক ধাপ নামেন)

[সিঁড়িতে অমলের পুনঃপ্রকাশ]

অমল : You swine !

(কথাটা বলে অমলও রঞ্জনকে লক্ষ্য করে রিভলবারের গুলী ছোঁড়ে)

রসময় : অমল ! অমল !

(রঞ্জন কথা না বলে এলোপাথারি গুলী চালায় অমলকে লক্ষ্য করে)

রঞ্জন : সরে যান প্রফেসর ! (অমলকে) রাসকেল তোমাকে আমি···।

(গুলী চালিয়ে যায়)

অমল : বাবা সরে যান !

রসময় : এই ছাখো কেউ কোনো কথা শুনছে না—I say stop it. Stop this fatricidal war for God's sake···রঞ্জন ! অমল ! এই ছাখো···

(হঠাৎ ঝুঁকে পড়া ব্যতিব্যস্ত দেহটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বুক পাঁজরা চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়ান রসময়। গুলীবিদ্ধ হয়েছেন।)

[রঞ্জনের বেগে প্রস্থান]

অমল : বাবা ! বাবা !

রসময় : সামনে পেছনে দুদিক থেকে সমানে গুলী চালাচ্ছে——বললুম, শুনলে না।

(ইতিমধ্যে ওপর নিচ থেকে সবাই ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রসময়কে)

···সমানে গুলী চালাচ্ছে।

(কথাটা বলেই টলে পড়ে যান রসময় সিঁড়ির ওপরেই)

আ-াঃ,···এই যে, বেরুচ্ছে, রক্ত বেরুচ্ছে···

সুহাস : এ আমার কি হলো ! কে করলে আমার এমন সর্বনাশ !

রসময় : রক্তেই কি শোধন হবে !

(হাত উল্টে পড়ে যান হুমড়ি খেয়ে। একটু পরে মাথাটা তোলেন)

Cheerio sons—have courage—onward to victory—Victory in suffering—Victory in defeat—Victory in death.···কংশ, ভেঙে পড়ো না,—বীরু, তুমি আবার শক্ত করে বাঁধ বাঁধো—অসীম, harness the atom to the benefit of man—কল্যাণী !

কল্যাণী ঃ বাবা।

রসময় ঃ কল্যাণময়ী মা আমার!—ওগো!

সুহাস ঃ উঃ! (নিঃশব্দ কান্নায় মুচড়ে ভেঙে পড়েন) বলো! কি হলো, বলো! আমি ঠিক শুনব, বলো! কথা বলো! কথা বলো!

অমল ঃ মা!

সুহাস ঃ জানি, পুলিস এলে এর পরেও বলতে হবে—আমার স্বামী স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন।

—যবনিকা—

ভ্রম-সংশোধন

পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃঃ ৬৭৩

পংক্তি ৭, ৮, ৯, প্রস্তরিত স্থলে প্রস্বরিত

অপ্রস্তরিত „ অপ্রস্বরিত

মহানির্বাচন

বিষ্ণু দে

সেও করেছিল বটে মানবিক মনীষার মহা নির্বাচন—
জীবনে অর্জিত সিদ্ধি অথবা কর্মের।
ছেড়েছিল বেহেস্তের প্রাসাদের আশা, চেয়েছিল অভাজন
শিল্পের পরমোৎকর্ষ, রচয়িতা মননধর্মের।

মনীষার অনিশ্চিত অন্ধকারে সে কি থেকে থেকে
যন্ত্রণায় ভেবে দেখে কি বা লাভ? ফুটা পকেটের
গর্তে হাত দিয়ে ভাবে নির্লোভ এ সাধনায় পেকে
সোনালি ফল কি কিছু পেয়েছে সে পিঠের, পেটের?

জানি না, অবশ্য তাকে দেখে মনে হয়, তার ক্ষণিক বিষাদ
তলে তলে মননের ভিতে ভিতে জল দেয়, যার পাকা হাতে
তার ঘর, হাওয়া, আলো, আকাশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ,
আবিশ্ব স্বাধীন হাওয়া নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, দিনে রাতে।

বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, সবই সত্য, তবুও সে আপন কর্মের,—
যে কর্মে সাধনা সিদ্ধি হরিহর, অনিশ্চিতে প্রচ্ছন্ন নিশ্চিত,
সেই কর্মে মুগ্ধ তার গর্বের বিনয়ে আর তুচ্ছ হারজিত
সে বুঝি মানে না তার মনোনীত ক্ষুরধার স্রষ্টার ধর্মের॥

জননী জন্মভূমি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলিনি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত।
আমার ভালবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি!

হে দেশ, হে আমার জননি—
কেমন করে তোমাকে আমি বলি!

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি 'উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার দুহাতের
দশ আঙুলে তার স্মৃতি
—আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই হে জননি, তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধরে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।

আমরা জীবনকে নিজের মত ক'রে সাজাচ্ছিলাম
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে, হে জননি,
আমরা ভালবাসার কথা ব'লে যাব।

পুনর্বিচার,—এবং একটি সত্য

সিদ্ধেশ্বর সেন

কোনো ভ্রান্তি নয়, এই এক অনুভব
বোধ কিম্বা অভিজ্ঞতা, যাই বলো, তার নাম
এ এক কঠিন রীতি, আহৃত বৈভব
সব ফেলে দিয়ে, পুনর্বার দেখা পরিণাম

এ কী ভ্রান্তি, এ কী নয় নিজস্ব মূল্যের
খোঁজ, যা দিয়ে গড়বে পৃথিবী নাকি জীবন
সে কী এতোই সাধারণ, সে-পাওয়া, সে তুল্যের
উপমান-উপমেয়, শুধুই তা চর্বিত-চর্বণ ?

এ যদি হয়, তা আলো, রঞ্জন-রশ্মির
দেহপট ফুঁড়ে যায়, অস্থি ও পঞ্জর
বুকের জটিল খাঁচা, হৃদপিণ্ড অস্থির
সব সত্যে দেয় মেলে, দেহেমনে জ্বর

এলে রোগী কী দেখবে চোখে, তার উপশমে
একমাত্র দেখা যায় অন্তস্তল, উরঃফলকে, স্টরনমে।

...paint not the object but the
effect it produces

—Mallarme

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

হাহাকার জাগিতেছে, রৌদ্রালোক, তুহিন স্মরণ
শীতের সকালে, রাতে, কখনো বা হিম দ্বিপ্রহরে ;
কাঁদিতেছে একা একা তিরেসিয়া, হা অন্ধ হনন,
নিষ্ঠুরতা, পলাতক, আকাশ, বাতাস ফেরে ঘরে।

পাতাল, নবমবৃত্ত বর্ণে স্বর্ণে, গন্ধ, হাহাকার
যেন ঈশ্বরের নাম, দিনঅন্তে কুরুক্ষেত্র, মুখ,
প্রখর, হিমাঙ্ক নিম্নে জাগিতেছে নিঃসীম আকার,
রমণী জায়া ও কন্যা, রৌদ্রালোক, তুহিনের সুখ।

ডাকি, নাম, বন্ধু, ফুল, ওফেলিয়া শৈশবের নাম,
নামে গন্ধ, স্পর্শে স্মৃতি, নিশি-জাগানিয়া, কোজাগর,
আলোকের ছটা, কান্না, হাওয়া বহিতেছে, পরিণাম :
ডিস্‌ডিমোনার স্বর, মৃত ঠোঁটে অটল অকর।

ঘুম-ভাঙানিয়া, রিক্ত, জাগিতেছি, বিচূর্ণ, আকার ;
হিম মধ্যরাত্রে এল্‌সিনোরের রৌদ্র অহঙ্কার।

সাময়িক ব্যর্থতায়

অনন্ত দাশ

কিছুই থাকেনা কাছে ; সমগ্রতা, পুষ্পে অনুরাগ
ছন্দোময় সমারোহে কারা ডাকে প্রণয়ী—সম্মানে
শুধু কণ্ঠ উচ্চারণে সাড়া দেয় স্নেহার্দ্র পরাগ
সর্বদা আমার বুকে রিক্ততা বিষাদে, ব্যবধানে,
প্রসাদিত মুখে কত অক্ষমতা, দারিদ্র্যের ছাপ
সমুদ্রের তীরে যেন বসে আছি দীর্ঘকাল ধরে
শুধু চলাচলে তারা রেখে গেছে দুঃখের প্রলাপ
আমার সাফল্য ঐ চিরন্তন নির্জন অধরে।

কোথাও রাখিনি তাই স্মৃতিচিহ্ন নামে, অভিধায়
বিক্ষুব্ধ তরল নদী ছুটে যায় দক্ষিণ সাগরে
এমনই ক্ষয়িষ্ণু প্রেম ফেলে যাব পুষ্পে, জলাশয়ে
উত্তরে ঝর্ণার শব্দ চারিদিক নড়ে ওঠে ঝড়ে।
কিছুই রাখব না হাতে, কিছুই থাকে না চিরকাল
নিকট বন্ধুত্ব, প্রেম, ভেসে যায় শৈশব সকাল।

সনেট

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার মতন একা কেহ নেই, ছিলনা কখনো।
যেন অন্তরের বুকে একা গাছ গোধুলি বেলায়,—
দিবস নিশীথে শুধু জেগে থাকা। নিসর্গে কি কোনো
আন্তরিক ছায়াবীথি নেই? শুধু রৌদ্রে বেলা যায়।
কোথায় পবিত্র মেঘ মাতৃবৎ আকাশে আমার?
নিষ্করুণ বৃক্ষাবলী রৌদ্রে জ্বলে কঠিন পুরুষ।
চতুষ্পার্শ্বে দ্বাররক্ষী, পদতলে ম্লান মৃত্তিকার
শীতল শরীর। হায়, বেঁচে নেই কেহ নিষ্কলুষ।
একাকী বাঁচিতে আর সাধ নেই, প্রাণ ধারণের
অর্থ যদি কিছুমাত্র থাকে তাহা 'অস্তি'তে নিহিত
এরকম নয়। বুঝি বাগানের অসংখ্য বৃক্ষের
করে করক্ষেপনেই প্রকৃত জীবনে উপনীত
হওয়া যায়। এরকম প্রাণহীন গোধুলি প্রান্তরে
অন্তহীন জাগরণে শূন্যতা। ফিরিতে চাহি ঘরে।

অবিন্যস্ত ব্যাপ্তির উঠোনে

বঙ্কিম মাহাত

সূর্যের রোদ্দুর বেঁকে নেমে গেল ঘরের চৌকাঠে
পাহাড়ের অন্তরালে সূর্যকে ডাকল কেউ তীব্র লোভ ছুঁড়ে
আকাশে ছড়িয়ে পড়ল শতাব্দীর যন্ত্রণায় রক্তাক্ত নদীরা।
নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ আমি ঘরের ভেতরে হাহাকারে
অসহ্য কান্নায় কাকে ডাক দিতে পিদ্দীমের আলো নিভে গেল।
উঠোনের এককোণে পুঁই মাচা, ইঁদুরের শব্দ শোনা গেল ;
পেয়ারা গাছের নিচে কবে যেন ঠাকুমাকে বসতে দেখেছিলাম
লেবুর ফুলের গন্ধে অন্ধকারে ঝুলছে আজো
রূপকথার রূপসী কন্যেরা।

কার যেন কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ, ছ্যাখো, রাত্রির হৃদয়
সহস্র ভগ্নাংশে ভেঙে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে গহীনে :
এই অন্ধকার থেকে আরো গাঢ় অন্ধকারে সে আমায় নিয়ে গিয়েছিল
আরো যন্ত্রণার রাজ্যে, আরো কোনো অবিন্যস্ত ব্যাপ্তির উঠোনে।
হৃদয়ে দু-কান পেতে শুনলাম অন্য এক ঝরণার উতরোল ধ্বনি
হারিয়ে গেলাম আমি—উজ্জ্বল উজ্জ্বল আহা
আকাশে কী এতো তারা জ্বলে।

যে প্রশ্ন

তাপস গুপ্ত

রৌদ্রাঘাতে পুনরায় আন্দোলিত হলো শাখাগুলো।
যে প্রশ্ন একদা ছিল কুসুমের তীব্র সম্ভাবনা—
যার ঘ্রাণ পাকে পাকে ছড়াবে জটিল বহুদূর,
আজ বিভাসিত প্রায় ; করে আর্ত-পতন ঘোষণা।

বৃক্ষটব কাছাকাছি আসে ; কতদীর্ঘ আলাপন,
অযাচিত অনুরাগ সর্পিল মাটির মধ্যস্থলে—
যেনবা ধূসর তীব্র তরঙ্গের মাঝে, অবিশ্বাসে
প্রেমরাগ হতে চায় চিরস্থায়ী অচঞ্চল ধীর।

অথচ সে, ডালপালা রক্তলাল পোড়ামাটি টবে
দৃঢ়স্থির অধিষ্ঠিত ; গোপন অঙ্গার ইতিহাস
রয়েছে অন্তর দেহ, সেথা। ঐ প্রীতদের কত
নগ্নকায় ইতিবৃত্ত বক্ষধৃত অক্ষয় অম্লান।

উদ্ভাসিত অন্য তারা কঠোর বিরূপ আলোচনে,
চলচ্চিত্র স্বাভাবিক, অশ্লীল মাদক অভিনয় ;
নির্মম নিষ্ঠুর স্বর-কোলাহল বোবা পরিবেশে—
শ্বেত রৌদ্র ভাঁজ মধ্যে উদ্যত ছায়ার তরবারি।

রৌদ্রাঘাতে পুনরায় আন্দোলিত হলো শাখাগুলো।
যে প্রশ্ন একদা ছিল কুসুমের তীব্র সম্ভাবনা—
যার ঘ্রাণ পাকে পাকে ছড়াবে জটিল বহুদূর
আজ বিভাসিত প্রায় ; করে আর্ত-পতন ঘোষণা।

"শেষ সন্ধ্যা"

সুলেখা সান্যাল

সকালের বাতাস সারেঙ্গীর স্বরে করুণ হয়ে উঠল। বিশ্রী দেখতে একটা যন্ত্র থেকে এক আশ্চর্য, মধুর, করুণ স্বর তুলে তুলে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছেন নিমাইবাবু। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সেই আশ্চর্য স্বরের সাগরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ভাসিয়ে ভাসিয়ে তুলে যেন এক রুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা ভরে ভরে তুলতে লাগলেন।

এত বড় শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ আমি। ব্যবসা করে খাই। রুক্ষ নীরস গদ্যের জীবনে নিজেকে ঠেসে ঠেসে ভরে দিয়েছি চিরকাল। আজ সকালে এসেছিলাম নিমাইবাবুর কাছে, বাজনা শুনতে নয়, এসেছিলাম একটু বৈষয়িক কাজে। তখন তিনি ঐ যন্ত্রটা নিয়ে পরম যত্নে ধুলো ঝাড়ছিলেন। একগাদা সরু সরু টেলিগ্রাফের তারের মতো অসংখ্য তার দেওয়া বেঁটে, কিম্ভূত কিমাকার যন্ত্রটাকে তিনি প্রায় বুকের কাছে তুলে পরিষ্কার করছিলেন এমন করে, মনে হচ্ছিল আদর করছেন।

"কি যন্ত্র মশাই ওটা? কিম্ভূত কিমাকার দেখতে!"

"সারেঙ্গী।"

"ভারী পুরনো হয়ে গেছে তো যন্ত্রটা। বাজান না মশাই শুনি—কখনও তো শুনি নি ও বাজনা।"

"কচিৎ বাঙালীদের হাতে শোনা যায়—শুনবেন আর কি করে? বাঙালীরা সারেঙ্গী বাজায় না—এ লজ্জাই তো ভাঙতে গিয়েছিলাম খাঁ সাহেবের কাছে।"

"শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়েছিলেন তো তাঁকে দিয়ে যে বাঙালীরাও পারে। আমি তো শুনেছি সব যন্ত্রই বাজাতে পারেন আপনি—স্বীকার করিয়ে নেন নি?"

মুহূর্তের মধ্যে কেমন উদাসীন আর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন নিমাইবাবু।

সুলেখা সান্যালের এই অপ্রকাশিত গল্পটি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"কেমন ক'রে জানবো বলুন? সে কথা জানবার আর তো সময় হয় নি···" বলে সারেঙ্গী তুলে নিয়েছিলেন কোলের ওপর আর আঙুলের গায়ে ঘষে ঘষে, অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়, অদ্ভুত স্বর বার করে শুনিয়েছিলেন আমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বর, তাল, লয়, মান কিছু বুঝি না, তবু সে স্বরে যেন কী ছিল। যেন মনে হচ্ছিল কেউ একজন মনের সমস্ত প্রেম, ভক্তি আর প্রার্থনায় নিজেকে নত করে দিয়েছে তার প্রিয়তমের কাছে। তার চোখের জল, শঙ্কা-সংকোচ সব সে বিসর্জন করে দিতে চাইছে কারও পায়ে। না, না, এ সব আমি কিছু ভেবে বলছি না, আমার কোনো কবিত্বও জাগে নি। তবু সেই ঝরে পড়া স্বরের মধ্যে এ জিনিস আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম, করে আমি বিষাদে, বেদনায়, করুণায় আর সহানুভূতিতে অন্য মানুষ হয়ে যেতে লাগলাম। কী যে বলতে এসেছিলাম নিমাইবাবুকে তা আমি আর মনে করতে পারলাম না। আমার তখন সব অন্য অন্য কথা মনে পড়তে লাগল, অন্য অন্য ইচ্ছে জাগতে লাগল। আর তখনই দীর্ঘ করুণ একটা টান শেষ করে সারেঙ্গী থেমে গেল। কিন্তু থেমে যাওয়ার পরেও নিমাইবাবু যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। মনে হলো কী এক দুঃখের পাথারে তিনি এখনও ডুবে রয়েছেন। ম্লান, বিষণ্ণ, উদাস একটা সংকেতে ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে আছে। যেন স্বগতোক্তি করছেন, "এই স্বরটাই শেষ দিয়েছিলেন তিনি।"

"শেষ মানে? বেশিদিন শেখেন নি বুঝি?"

"সময় আর পেলেন কোথায় যে শেখাবেন? যা অহঙ্কার ছিল! ঠিক অহঙ্কারীর গর্ব নিয়েই একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেবল যন্ত্রটা পড়ে ছিল আমার জন্যে।"

"কী ব্যাপার মশাই? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন। কিছু কাণ্ডবাণ্ড বুঝি?"

"হ্যাঁ, সে অনেক কাণ্ড। সে কথা শুনলে আপনার দিন খুব খারাপ হয়ে যাবে বিনয়বাবু, বিশ্রী হয়ে যাবে মনটা। কী দরকার মশাই ওসব শুনে।"

"না না বলুন। এই আমি বসলাম লেপ্টে, না শুনে উঠছিনে।"

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রইলেন নিমাইবাবু, তারপর স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগলেন আপন মনে ঃ

"আমার তখন বয়স অল্প। সাত বছর বয়স থেকে গান, সেতার, বীণ, এস্রাজ সবগুলোর দরজায় ঘুরছি। জীবনে অন্য কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা

নেই। যে কাকা আমাকে মানুষ করেছেন তাঁর কেবল একই আকাঙ্ক্ষা আমাকে সত্যিকারের শিল্পী করে তোলার। তিনি বেঁচে থাকতে তাই আমার একটাই মাত্র কাজ ছিল, দিনে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজ করা। আর কিছু ভাবনা আমার ছিল না, করতামও না। কিন্তু সেই শিল্প একদিন যে আমার পেশায় দাঁড়াবে আমিও আগে ভাবিনি, কাকাও কখনও ভাবেন নি। কাকা মারা যাবার পর স্ত্রী, পুত্র নিয়ে দায়িত্বের বোঝা টানতে গিয়ে আমি পেশাদার হয়ে গেলাম। পথে বসব না জানতাম, বরং পথের লোকেরা আমার বাজনা শুনে ঘরে উঁকি দিয়ে যেত। কোলকাতায় এসেছি, অনেক তখন রোজগার, অনেক ছাত্র। তারা নানা জনে নানা বিদ্যা আহরণ করে আমার কাছ থেকে, কেউ প্রয়োজনে, কেউ অপ্রয়োজনে। কেউ দু-দিন পরে চলে যায় ধৈর্য রাখতে না পেরে, কেউ ধৈর্য ধরে টিকে থাকে।

নিজের ঘরভরা যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গর্ব হয়, আনন্দ হয়, আবার কী এক অভাববোধ মনকে পীড়িত করে। সে হচ্ছে শিল্পীর অসন্তুষ্টি। একদিন একটি ছাত্রের কথায় সে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। সে বললে, 'আমার এক বড়লোক বন্ধু সারেঙ্গী শিখতে চায় মাস্টারমশাই। ওকে নাকি কোন্ অবাঙালী বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছে, বাঙালীদের সারেঙ্গীতে এতটুকু নাম নেই। ওটা অবাঙালী মুসলমানদের একচেটিয়া। আপনার কাছে···।'

শুনে আমার ভারী ক্ষোভ হয়েছিল সেদিন, বলেছিলাম, 'ঠিক আছে। তাকে ঠিক ছ-মাস পরে আমার কাছে এনো। শেখাব তাকে সারেঙ্গী।'

তারপরে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম ভালো সারেঙ্গীর গুরু। চিৎপুরের বাজনার দোকানগুলোতে, কিছু জানাশোনা লোকজনকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে একদিন খোঁজ পেলাম। ওরা বললো, "আপনাকে যেতে হবে তাঁর কাছে। যদি তাঁর সাক্রেদদের হাত ছাড়িয়ে আর্জিটা একবার পেশ করতে পারেন, যদি কোনোমতে মন গলাতে পারেন তাঁর, তবে হয়তো শেখালেও শেখাতে পারেন।" জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন? অনেক টাকাতেও শেখান না? তবে তাঁর পেশা কি?'

'টাকা?'—ওরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'পেশা?'—সে কথাতেও হাঁ করে রইলো যেন আমি আরব্য উপন্যাসের গল্প শোনাচ্ছি ওদের, যেন ওরা এসব কথা জীবনে শোনে নি। মুচকি হেসে,

মেহেদী দেওয়া দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারা বললে, 'যান। গেলেই বুঝতে পারবেন।'

গেলাম খুঁজে খুঁজে। বৌবাজারের গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির দরজার কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্রের সমস্বর একঘেয়ে নাকী স্বরের মধ্যে প্রথম বারের কড়ানাড়া গেল ডুবে। বিরক্ত হয়ে আবার জোরে জোরে কড়া নাড়লাম। মনে হলো একজন কেউ উঠে দরজার কাছে এসেছে। বাকি যন্ত্রগুলো আর্তনাদ করেই চলেছে সেই এক স্বরে সা রে গা মা পা ধা নি। সেই যে আমার সেতারের গুরু বলতেন 'এক সাধে তো সব সাধে' অর্থাৎ এক সা রে গা মা পা ধা নি-তেই যদি হাত পাকাতে পারে তো বাকিগুলোর জন্যে ভাবনা নেই। আর যা করতে গিয়ে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজে কতদিন চোখের জল পড়েছে, ধৈর্য হারিয়েছি, এরা দেখছি সেটি আশ্চর্যরকম আয়ত্ত করেছে।

যে দরজা খুলে দিল তার এক হাতে তখনও সারেঙ্গী ধরা। লম্বা, চওড়া শরীর কিন্তু শিশুর মতো সরল মুখ, ছোট ছোট চোখ। সে দরজা খুলে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই একটানা সা রে গা মা পা ধা নি শুনতে শুনতে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে ভাবছি পালাই, তখন ওদের মধ্যে একজনের বোধহয় দয়া হলো, বললে, 'বৈঠিয়ে বাবুজী।'

সারা ঘরখানায় কোথাও বসার জায়গা নেই। ঘরের এককোণে শুধু ভাঙা একটা প্যাকিং বাক্স উপুড় করা। তার ওপর বসে সে যন্ত্রে আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই কথা বলে উঠলাম, 'ইম্‌তাজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দু-কানে হাত দিল, দিয়ে হাসলো, বললে, 'তিনি তো ওপর থেকে এখন নামবেন না বাবুজী।'

'কখন নামেন তিনি ?'

'সে অনেক দেরি।'

'কত দেরি ? আমি না হয় অপেক্ষা করব।'

'আজ তো কিছুতেই হবে না।'

'তবে কবে হবে বলুন, আমি সেইদিনই আসব।'

লোকটি তবু চুপ করে আছে। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টুবুদ্ধি আছে ওর মনে।

আমাকে যারা বলেছিল 'যদি সাক্‌রেদ্‌দের হাত ছাড়িয়ে একবার তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন…,' তার অর্থ এখন বুঝতে পারলাম।

সে বললে, 'বাবুজী, খাঁ সাহেব তো এখন আর কাউকে শেখান না।'

'না শেখান্। তবু একবার দেখা করতে চাই আমি।'

নাছোড়বান্দার মতো বসে রইলাম। লোকটি খানিক চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'আজ আপনি যান বাবুজী। তিন দিন বাদে আসবেন। আমি বলে রাখবো তাঁকে। যখন নিচে নামবেন তখন দেখা হবে।'

আমার তবু উঠতে ইচ্ছে নেই। ভাবলাম গল্প করে করে লোকটিকে খুশী রাখি, পরে কাজে লাগবে। 'আপনারা সবাই বুঝি খাঁ সাহেবের দেশের লোক?'—গায়ে পড়ে আলাপ করছি।

'হ্যাঁ বাবুজী।'

'সবাই বুঝি এ বাড়িতে থেকে কাজ-কর্ম করেন কোথাও?'

আমাদের কথা বলা দেখে অন্য লোকগুলি তাদের যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে শিশুর মতো সরল গলায় হেসে উঠল কয়েকজন, 'কাজকর্ম আবার করব কি? সারেঙ্গী বাজাই—এই তো কাজ।'

'তবে চলে কি করে আপনাদের?'

ওরা আবার হেসে উঠলো, 'বাঈ থাকতে, ওস্তাদ থাকতে ওদের আবার চলার ভাবনা।'

'তবে যে বললেন উনি কাউকে শেখান না। এই যে আপনারা দশটা লোক যন্ত্র নিয়ে শিখছেন, কে শেখান তবে?'

'উনি, উনি। হাতে ধরে শেখান না। আমরা রাত তিনটে থেকে উঠে বেলা একটা পর্যন্ত এমনি করে সারে গামা বাজিয়ে যাই, যাব—মাসের পর মাস। উনি যেমন আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা অনায়াসে করে দেন, তেমনি একদিন অনায়াসে এসে নতুন একটা গৎ দিয়ে যান। কিন্তু যতদিন না দেবেন ততদিন এমনি চলবে…ভীষণ কষ্টের বাবুজী। আপনার তাগদ বরবাদ হয়ে যাবে।'

মনে মনে বুঝলাম ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। রাত তিনটেয় উঠে আর মাসের পর মাস সাধনাতেও যদি ওদের তাগদ অটুট থেকে থাকে তবে

আমার তাগদও থাকবে। কিন্তু আজ ওরা আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে দেবে না এটা নিশ্চিত। সুতরাং আজ আমাকে যেতে হবেই।

যে লোকটি তিনদিন পরে আমাকে আসতে বলেছিল তাকে বললাম, 'তিনদিন পরে নয় ভাই। আমি কাল, পরশু রোজ আসব। আপনি একটু বলে রাখবেন আমার কথা।'

তার পরদিন যথাসময়ে গেলাম, গেলাম তার পরদিনও। কিন্তু সেই একই অবস্থা রোজ। সেই সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, সেই মুচকি হাসি, সেই ফিরিয়ে দেওয়া।

তৃতীয় দিনের দিন অবস্থাটা একটু পাল্‌টেছে মনে হলো। কড়া নাড়তে গিয়ে দেখি দরজাটা খোলাই রয়েছে, ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সেই সা রে গা মা পা ধা নি—বেজেই চলেছে কেবল বসবার জন্যে সেই উল্টানো প্যাকিং বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের মাঝখানে এসেছে ছোট্ট একখানি তক্তপোষ, তার ওপর ঘন লাল রঙের একখানি জাজিম পাতা। ওরা আজ সবাই যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আজ আর সেই অবহেলাভরা মুচকি হাসি নেই, ভারী প্রাণখোলা ডাক ভেসে এল, 'আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে।' আমাকে ওরা বসতে ইঙ্গিত করছে তক্তপোষের ওপর।

যে লোকটি প্রথম দিন আমার সঙ্গে কথা বলছিল সে আজ বললে, 'আজ ওস্তাদজীর সঙ্গে দেখা হবে বাবুজী।'

ওরাও সকলে মাথা নেড়ে সমর্থন করে ডুবে গেল নিজেদের সাধনায়। সেই লোকটিও বাজাতে লাগল মাথা নিচু করে, একসময় তার আঙুল আবার থেমে গেল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা সে বুঝে নেবার চেষ্টা করলে, তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'বাবুজী, এই যে তিনদিন ধরে আপনি কষ্ট পেলেন এতে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই।'

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে সে বললে, 'বুঝলেন না বাবুজী। ওটা ওস্তাদেরই আদেশ। একদিন, দু-দিন, তিনদিন ধরেও যে ধৈর্য রাখতে পারে তাকে দেখা দেন তিনি। যাদের ধৈর্য নেই—তারা আর আসে না। আপনি আমার পরীক্ষায় পাস করেছেন বাবুজী।'

'এইবার শেখাবেন তো আমাকে?' পাশের যন্ত্রটাকে কোলের ওপর তুলে নিই।

‘শেখাবেন কিনা সে তাঁর মর্জী। আমার কাছে আপনি পাস। গুরুজীর কাছে আরও পরীক্ষা আছে…’

হঠাৎ সারেঙ্গীগুলো থেমে গেল, ঘরের সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়িতে খড়মের শব্দ করে কেউ একজন নেমে আসছেন। খালি গা, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, প্রৌঢ় এক সৌম্য চেহারার মানুষ। কাঁধের ওপর একখানা তোয়ালে ফেলে নেমে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলেন। জল ঢালার শব্দ পেলাম, বুঝলাম স্নান করতে নেমেছেন তিনি।

ওরা ততোক্ষণে ঘরের সঙ্গে লাগানো বারান্দায় মস্ত একটা উনুন কোথা থেকে টেনে এনে রাখলো, তার ওপর চাপানো একটা উৎসব বাড়ির রান্নার হাঁড়ি।

মাথা মুছতে মুছতে স্মিত প্রসন্নমুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। ওদের মধ্যে দু-জনে মিলে পাশের কোনো একটা ঘর থেকে বয়ে নিয়ে এলো একটা কাঠের মন্দিরের মতো জিনিস, ঘরের মাঝখানে রাখল, সামনে পেতে দিল একটা আসন। সে মন্দিরে কি আছে দেখবার জন্যে একটু উঁকি দিলাম আমি চেষ্টা করে, দেখি, কিছু নয়—একপাশে একটি কালীর ফটো, আর একপাশে পাথরে গড়া ছোট একটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। তারই সামনে চুপ করে বসে আছেন তিনি। একখানা বড় কাঠের থালায় হাঁড়িতে যা সেদ্ধ হচ্ছিল তারই খানিকটা রেখে দিল ওদেরই একজন কেউ। দেখি, তা এক ধরনের খিচুড়ী—চাল, ডাল, ঘি, বাদাম, পেস্তা মেশানো খাদ্য। লম্বা একটা হাতা দিয়ে তা থেকে একটু প্রসাদ প্রথমেই তিনি অনায়াসে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন কথা না বলে, হাত পেতে গ্রহণ করলাম আমি, খেলাম। তারপর ওরা প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল তাঁর হাতের দেওয়া প্রসাদ, আবার সরে গেল কাঠের মন্দিরটা।

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, সেই স্মিত হাসি নিয়েই উঠে এসে আমার পাশে বসলেন, ‘আপনার কথা শুনেছি। রোজ এসে ফিরে গেছেন। তার মানে গরজ আছে খুব।’ তারপর মুখের সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা কাঠিন্য, একটা রূঢ় জিজ্ঞাসার ছাপ ফুটে উঠল, ‘সারেঙ্গী শিখতে চান কেন? আরও তো কত যন্ত্র আছে? এ বড় তখলিফের ব্যাপার, এ আপনি পারবেন না বাবুজী।’

'পারব ওস্তাদজী—আপনি যদি মেহেরবানী করেন একটু।'

'গান-বাজনা এর আগে কিছু করা অভ্যাস আছে?'

আমি সতর্ক ছিলাম সেকথা স্বীকার করবো না বলে, তাহলে হয়তো কিছুতেই শেখাতে রাজী হবেন না উনি। বললাম, 'না, কোনো অভ্যাস নেই, সামান্য স্বরবোধ আছে, সারেঙ্গী শেখারই আমার খুব ইচ্ছে।'

আমার মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, একটু হাসলেন কি ভেবে। আমার সত্যিকার পরিচয় ধরে ফেললেন নাকি?

না, কোনো কথাই তুললেন না সে সম্বন্ধে, গম্ভীর হয়ে অন্য কথা বললেন, 'কোনো ওস্তাদের কাছে শিখতে হলে আগে নাড়া বাঁধতে হয় জানেন?'

'শুনেছি, কখনও বাঁধি নি। বলুন আমাকে সেজন্যে কি করতে হবে?'

'সোনা, চাঁদি আর অন্য অনেক জিনিস লাগবে। শ' রূপেয়া খরচ লাগবে আপনার।'

'সে খরচ আমি নিশ্চয়ই দেব। আমি টাকা দিয়ে দেব, আপনি আয়োজনটা করে দিন।'

একটু গম্ভীর হয়ে আবার কি ভাবলেন, বললেন, 'সপ্তাহে দু-দিন করে শেখাব আমি। প্রতিদিনের জন্যে পঁচিশ টাকা করে লাগবে—পারবেন দিতে?'

আমাকে কি উনি পরীক্ষা করছেন? কেমন জেদ চেপে গেল, বললাম, 'পারব নিশ্চয়ই। বেশি হলেও পারব।'

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'বাবুজী, আপনি করেন কি?'

একটা ঢোঁক গিললাম আমি। মিথ্যে কথা বলতে বুকের ভেতরে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল, তবু বললাম, 'ব্যবসা করি।'

কি বুঝে হাসলেন একটু কে জানে। উঠে দাঁড়ালেন, 'বেশ এরপর যেদিন ইচ্ছে আপনার আসবেন—নাড়া বাঁধতে। তারপর শেখাব।'

'কালই একশো টাকা দিয়ে যাব আমি। পরশু থেকে শিখতে চাই।'

'কাল! পরশু! আচ্ছা!' মনে হলো মুখ টিপে ওঁর সাকরেদদের মতো উনিও মুচকি হাসছেন। উনি কি ভেবেছেন টাকার জন্যে আমি যাবো পিছিয়ে? আমার তখন আয় মাসে হাজার দেড়েক। সামান্য কটা টাকার ভয় দেখিয়ে উনি কি আমাকে ভয় পাওয়াতে চান?

একশো টাকা পরদিন গিয়ে দিয়ে এলাম সাকরেদদের হাতে।

তার পরদিন গেলাম তাঁরই নির্দেশমতো। আজও দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি ঘর শূন্য, তক্তপোষের ওপর আজ সাদা চাদর পাতা, দু-পাশে দুটো তাকিয়া পড়েছে, ইমতাজ খাঁ বসে বসে পান খাচ্ছেন। পাশে আর একটা সারেঙ্গী, তার ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছেন আপন মনে।

আমি যেতেই আজ ভারী প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, 'আইয়ে বাবুজী।' টাকা কটি পায়ের কাছে রেখে বসলাম পায়ের কাছে। উনি গুরু, আমি শিষ্য—অন্য কিছু আমার মনে পড়ল না কারণ শিল্পীর জাত নেই। উনি হাত ধরে আমাকে পাশে বসালেন, টাকাগুলো তেমনি রইল পড়ে, একবার ফিরেও তাকালেন না, তুলবার চেষ্টাও করলেন না। সারেঙ্গী ধরা শেখাতে লাগলেন আমাকে। শিখবার প্রক্রিয়াটা দেখালেন। কঠিন সে প্রক্রিয়া। আমি এতগুলো যন্ত্র বাজাই কিন্তু কোনো যন্ত্র শিখবার এমন অদ্ভুত প্রক্রিয়া আমি জানি না। সুর বেঁধে দিলেন। সব আমি অবোধ শিশুর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কারণ আমি যে কিছুই জানি না।

'আজ এই পর্যন্ত। বাড়িতে অভ্যেস করে কালই আসবেন। খুব কঠিন জিনিস, ধৈর্য রাখতে পারলে তবে।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলেন আস্তে আস্তে। টাকাগুলো তেমনি পড়ে রইল তক্তপোষের ওপর। আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

বাড়িতে গিয়ে সারেঙ্গী সাধতে বসে আমার প্রায় কান্না পেয়ে গেল। এ কী প্রক্রিয়া! জানি সারেঙ্গী বাজাতে হয় আঙুলের উল্টোপিঠে ঘষে ঘষে কিন্তু আমার গুরু যা দিয়েছেন সে রকম প্রক্রিয়ার কথা জীবনে শুনি নি—জানি না। আঙুলগুলো জ্বালা করতে লাগল, ঘষায় ঘষায় ছাল উঠে গেল, কিন্তু কী যে জেদ চেপেছে। অন্য সব ঘরভরা আয়োজনকে আমার এ জেদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। মনে হলো কত সহজে এ সব শিখেছি আমি, তার তুলনায় কত কঠিন এ সাধনা! কিন্তু সত্যিই কি কঠিন? নাকি আমাকে পরীক্ষা করছেন উনি? ওঁর সাকরেদদের সেই গা জ্বালানো মুচকি হাসি মনে পড়তে লাগল। ওঁর সেই সন্ধানী চোখ দুটোর দৃষ্টির কথা মনে পড়তে লাগল আর প্রতিজ্ঞায় আমি দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলাম। ওই মুচকি হাসিকে আমি বিস্ময়ে পরিণত করব।

সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াকেই আয়ত্ত করে নিয়ে পরদিন আবার গেলাম টাকা

নিয়ে। ঠিক তেমনি খালি ঘরে চুপ করে বসে আছেন তিনি। আমাকে ঢুকতে দেখে হয়তো সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখে কিন্তু পরক্ষণেই হাসি দিয়ে তা তিনি মুছে ফেললেন। তেমনি টাকা রইল পড়ে, বললেন, 'বাজান।' বাজালাম। সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াতেই যতোটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম শোনালাম তাঁকে। দু-চোখের বিস্ময় এবার স্থায়ী হয়ে রইলো, বললেন, 'আপনি পারবেন বাবুজী। এইভাবে সারেঙ্গী বাজানোর নিয়ম নয়। আমি আপনার ইচ্ছেটা পরীক্ষা করার জন্যে এ উপায় দিয়েছিলাম। বাবুজী আপনি তো অদ্ভুত। তাই ঠিক করে নিয়ে এসেছেন?' পিঠের ওপর হাত রাখলেন, যেন আদর করে। তারপর সত্যিকারের প্রক্রিয়াটা দিলেন শিখিয়ে। অনেক বাজনা শেখা হাতে সেটা আমার কাছে এতটুকু কঠিন মনে হলো না। আশা হলো পরীক্ষার পালা তাঁর শেষ হয়েছে হয়তো।

মাসখানেক এমনিই চলল। নিয়মিত যাই, শিখি। সেই তিনি তেমনি অপেক্ষা করে থাকেন আমার জন্যে, সেই তেমনি টাকাগুলো তক্তপোষে পড়ে থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে উঠে চলে যান।

সেদিনও যথাসময়ে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের চেহারা আবার আগের মতন। সেই তেমনি উল্টানো প্যাকিং বাক্স, তেমনি দশটা যন্ত্রের একটানা সা রে গা মা পা ধা নি। শুনলাম ওস্তাদজী মুজরায় গেছেন, বেনারস না লক্ষ্ণৌ—কোথায়।

'কবে ফিরবেন?'

'ঠিক নেই। সাতদিন হতে পারে, একমাস হতে পারে, তিনমাস হতে পারে।'

নাড়া বেঁধেছি। এসেছি শিখতে। টাকাতো ওঁর নামেই আনা। টাকাগুলো আমি সাকরেদদের মধ্যে একজনকে দিয়ে এলাম।

এমনি চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। যখনই যাই, শুনি, 'এখনও ফেরেন নি তিনি।' কবে ফিরবেন তা ওরা জানে না। নিয়মিত দিনে গিয়ে টাকাটা রেখে আসি, ওরা তেমনি মুচকি হাসে।

এমনি করে তিনমাস কেটে গেছে। আমি ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি নির্দিষ্ট দিনে সারেঙ্গী ঘাড়ে বয়ে বয়ে। অনেক ছাত্র ছেড়ে গেছে আমাকে দিনের পর দিন সময়মতো না পেয়ে।

আজও গিয়েছিলাম—শেষবারের মতো। ভেবেছিলাম আজও যদি তিনি না ফিরে থাকেন তবে আর যাব না। এই শেষ!

সেদিন খুব সকাল সকাল গিয়েছিলাম, ভেজানো দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তেমনি সবাই বসে আছে সারেঙ্গী হাতে কিন্তু আজ ওরা বাজাচ্ছে না, কী এক আগ্রহে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। আমাকে দেখেই সমস্বরে বলে উঠল, 'আইয়ে বাবুজী, আইয়ে।'

বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমার হাত ধরলে, 'তথ্‌লিফ্‌ আপনার শেষ হ'য়েছে বাবুজী। যান্‌—ওপরে চলে যান।'

'ওপরে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুজী, ওপরে। এই সিঁড়ি—উঠে যান। ওস্তাদজী ওপরে অপেক্ষা করে আছেন আপনার জন্যে।'

'ফিরেছেন তিনি তবে?'

সে আবার মুচকি হাসলো, 'সে সব বাৎচিৎ তাঁর সঙ্গে করবেন বাবুজী, লেকিন ওপরে আপনার ডাক পড়েছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অভিমানে, ক্ষোভে মন আমার ভরে তুলেছিলাম। দেখা হলে কী বলব ওস্তাদজীকে সব মহড়া দিচ্ছিলাম। বলব, 'আমার আর শেখার ইচ্ছে নেই সারেঙ্গী। কিন্তু একটা জিনিস শিখে নিলাম—সে তোমাদের! তোমরা আসলে শিল্পী হলে কি হবে, নিজেদের অহঙ্কার আর জাতের কৌলিন্য ছাড়তে পারনি আজও, না হ'লে অনর্থক এমন হয়রানী করে মানুষকে!'

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে উঠতেই ভারী সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোনো মন্দিরে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে কারা পুজো করছে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, চন্দনের গন্ধে সকালবেলার আলো-বাতাস যেন ভরে উঠেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখি রেলিঙ-ঘেরা চওড়া বারান্দার একপাশে একটি সাদা পাথরের মন্দির। তার মধ্যে অপূর্ব সুন্দর এক যুগলমূর্তি, রাধা আর কৃষ্ণ। রাধাকে কে যেন মনের মতো করে সাজিয়েছে—পরনে দামী পোষাক, পাথরের শরীরে নানা অলঙ্কার, মাথায় তাঁর মুকুট—যেন বিজয়িনীর মূর্তি। কৃষ্ণের নিরাভরণ মূর্তি, হাতে শুধু একটি রূপোর বাঁশী। আর তার সামনে দুটি আসনে দু-জন মানুষ, একজন ওস্তাদ ইম্‌তাজ খাঁ। অন্যজন—জানি না আমি তিনি কি! হিন্দু না মুসলমান, বাঙালী না অবাঙালী? ভেজা চুলের গোছা

পিঠের ওপর ছড়ানো, গরদের একখানি শাড়ি কুঁচিয়ে পরা, রেশমী ব্লাউজ লম্বা হাতার।

আমাকে দেখে ওস্তাদজী ইসারা করলেন একটু, বুঝলাম বসতে বলছেন স্বরে।

নিরাভরণ অথচ পরিচ্ছন্ন একটি গালিচা পাতা ঘরে গিয়ে বসলাম। একপাশে পাখোয়াজ, আর একপাশে একটি তানপুরা নিয়ে দু-টি মানুষ বসে আছেন।

কখন একটা মৃদু সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিধার, পাখোয়াজ আর তানপুরার সঙ্গতের সঙ্গে। দু-টি নারী পুরুষের সাধনা করা শিক্ষিত গলার স্বরে কী যে যাদু ছিল। কী যেন গাইলেন ওঁরা! মনে হলো সামস্তোত্র, মনে হলো কোনো পদাবলী, মনে হলো কবীরের ভজন না হয় কোনো উর্দু প্রার্থনা। আমি সে সব তলিয়ে কিছুই বুঝলাম না। সুরের জালে আমি জড়িয়ে গিয়ে সম্মোহিত হয়ে গেছি।

সময় কেটে গেছে কোথা দিয়ে। ওস্তাদজী গান শেষ করে ঘরে এসে বসেছেন আর সেই দীপ্ত নারী মূর্তি (নিশ্চয়ই ওস্তাদজীর সঙ্গিনী) হাসিমুখে আমার সামনে সুন্দর পাথরের থালায় রেখেছেন প্রসাদী, রেখেছেন সরবৎ। আমি নবাগত বলে আমাকেই প্রথম সম্বর্ধনা জানালেন তিনি। সকালের আলো এসে তাঁর চোখে, মুখে পড়েছে, খোলা চুলে পড়েছে। পরে জেনেছিলাম ইনিই সেই বিখ্যাত রোসেনা বাঈ। থাক্ সে কথা।

আস্তে আস্তে সব মোহ কেটে গেল। বাস্তবে ফিরে এলাম আবার। সেই তেমনি স্মিত হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ইমতাজ খাঁ; 'বাবুজী ভালো আছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ক্ষোভ আর অভিমানে আমার যেন গলা বুজে এলো, বললাম, 'শরীর ভালো আছে কিন্তু মন ভালো ছিল না ওস্তাদজী? তিনমাস পরে ফিরলেন আপনি। বেনারস গিয়েছিলাম মুজরায়, ওরা বললো?'

হাসলেন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে, 'ওদের ওইরকমই নির্দেশ যে দেওয়া ছিল।'

কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি বাবুজী। জানি আপনি খুব দুঃখ পাবেন, রাগও হবে। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় নেই। আমি আজকাল কাউকে

শেখাই না কিন্তু আপনার ধৈর্য দেখে মায়া হয়েছে আমার। দুটো জিনিসের অভাব হলে মানুষ এ পথ ছেড়ে দেয়। আমি আপনাকে টাকার পরীক্ষা করেছি, দেখেছি টাকার জন্যে পরোয়া নেই আপনার। বাকি ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা—তাতেও আপনি জিতেছেন। নইলে আমি আমার ঘরে ডেকে আনতাম না আপনাকে।'

কথাগুলো ভারি মিষ্টি। কখনও হেসে, কখনও গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন কথাগুলো কিন্তু আমার তখনও ক্ষোভ যায় নি। তখনও অভিমানের একটা সূক্ষ্ম জাল আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তারই ঝোঁকে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, 'আমি কিন্তু রোজ এসে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে গেছি আপনাকে—ওদের হাতে। যা আপনি বলেছিলেন।'

'রুপেয়া!' একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে, 'সমুচা লে যাইয়ে আপ্'—উঠে ঘরের একটা কোণ থেকে ছোট্ট একটা রেশমী থলি বার করে আমার পায়ের কাছে রাখলেন, 'এ টাকা যাবার সময় আপনার হাতে দিতাম। কথাটা ওঠালেন তাই। এ পর্যন্ত যা টাকা দিয়েছেন সব আছে ওর মধ্যে। টাকার জন্যে আমি শেখাইনা বাবুজী।'

ইস্! লজ্জায়, অপমানে নিজেকে বিকৃত মনে হতে লাগলো। হঠাৎ ওঁর দু'টি হাত ধরলাম আমি। তখন অন্য এক ভাবে চোখ আমার ছলছলিয়ে উঠেছে, অন্য আর এক আশঙ্কায় গলা বুজে আসছে। বললাম, 'ওস্তাদজী। তাহলে আপনি কি আমাকে বিদায় করে দিচ্ছেন? আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'আরে ছি ছি'—দু'হাতে আমাকে প্রায় আলিঙ্গন করলেন তিনি, 'রাগ তো আমি করিনি। বরং কত তখ্লিফ্ আপনাকে আমি দিয়েছি এই তিনমাস ধরে, আপনি বরং আমাকে ক্ষমা করে দিন বাবুজী। আজ থেকে আমরা দোস্ত্। কাল থেকে রোজ আপনি আসবেন। কোনো এত্তেলা লাগবে না। এই ওপরে, সোজা উঠে আসবেন, আমি না থাকি আপনার বহিন্ রোসেনা থাকবে। দরকার মতো ও আপনাকে নতুন পাঠ দিয়ে দিতে পারবে।'

তবু সেই অর্থের প্রশ্ন আমার মন থেকে যায় না, মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করি, 'কি দেবো আপনাকে?'

'কি আবার? যদি কিছু দিতে চান—দোকান থেকে ভালো জর্দা দেওয়া দু-খিলি পান।'

'না, না,'—হেসে ফেললাম, 'আদান-প্রদান না থাকলে কেমন লাগে যে।'

'বেশ মাসে পাঁচটাকা দেবেন, যদি মন না শোনে। টাকা নিয়ে কী করবো আমি? খাইতো নিরামিষ, রোসেনা আর আমি একটা মুজরা নিই বছরে—বছর চলে যায়…'

সারেঙ্গীর প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, গৎ শেখাতে লাগলেন। অন্য যন্ত্রে যার আঙুল অভ্যস্ত, এ সব শেখা তার কাছে নতুন নয়। তবু মিথ্যে যখন বলেছি তখন বোকামীর ভান করতেই হবে। উনি কিন্তু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন, বারে বারে তাকাতে লাগলেন আমার আঙুলের দিকে।

সেদিনকার মত শেখানো হয়ে গেলে বললেন, 'বসুন বাবুজী, গান শুনবেন? শুনবেন আমার সারেঙ্গী?'

বিহ্বল খুশিতে মাথা নাড়লাম আমি। তখন রোসেনা বাঈ এসে আসরে বসলেন, পাখোয়াজে তাল পড়ল, তানপুরার সুর চড়ল, সারেঙ্গী তুলে নিলেন খাঁ সাহেব আর সুরের সুধাসাগরে ডুবে গেলাম আমি। ভৈঁরোর সুরে সারেঙ্গী বাজতে লাগল, গান চলতে লাগল।

তারপর এক সময় রোদ এসে পড়ল ঘরে—সারেঙ্গী নিয়ে উঠে এলাম আমি। সমস্ত পথ যেন আমার কাছে সারেঙ্গীর একটানা সুরের মতো মনে হতে লাগল।

মাঝখানে একবার কয়েকদিনের জন্যে মুজরায় গেলেন ইমতাজ খাঁ, রোসেনা বাঈকে সঙ্গে নিয়ে। সেই কটা দিন ছাড়া তার পরের একটা বছর ধরে আর কোনো ব্যাঘাত হয়নি শেখায়। আমি তাঁর কাছে আর শিক্ষার্থী ছিলাম না, হয়ে গিয়েছিলাম দোস্ত্, আর রোসেনা বাঈ-এর ভাইয়া।

একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রোজই যাবার আগে তাঁর বাঁধা সুরে সারেঙ্গী বেঁধে নিয়ে যাই। সেদিন ভুলে গেছি, বেঁধেছি আমার অন্য যন্ত্রের সুরের প্রক্রিয়ায়। সারেঙ্গীর ওপর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি দিয়ে একবার মাত্র স্পর্শ করলেন তারগুলো, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বসে রইলেন গম্ভীর হয়ে, উচ্চকণ্ঠে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'রোসেনা।'

রোসেনা বাঈ বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে।

'রোসেনা, তোমার ভাইয়াকে আর শেখাবো না আমি।'

'সে কি? কেন?'—বড়ো বড়ো প্রশান্ত চোখ তুলে রোসেনা বাঈ বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করেলেন।

‘তোমার এই ভাইয়া একটা মস্ত মিথ্যুক। ওস্তাদকে ঠকিয়েছে। আমার কি শেখানো উচিত—তুমিই বল?’

তখনও জিনিসটা আমার বোধগম্য হয়নি। লজ্জায়, গ্লানিতে মাথা নিচু করে বসে আছি আমি। রোসেনা বাঈ দেখি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, বললেন, ‘বেশ তুমি না শেখাও, শেখাবো আমি। ভাইয়া মাথা তোলো, কিচ্ছু লজ্জার ব্যাপার নয়।’

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ইম্‌তাজ খাঁ বললেন, ‘সত্যি কথা বলতো দোস্ত্, কটা বাজনা তুমি জানো? কত বছর ধরে গান শিখছো? আমি ধরতে পারিনি ভেবেছ? অনেকদিন আগেই ধরেছি।’

এতক্ষণে সংশয় কাটল আমার, মাথা তুলে বললাম, ‘হ্যাঁ, এই একটা ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। ভয় ছিল যদি না শেখান! তার জন্যে কী শাস্তি দেবেন দিন্।’

‘শাস্তি?’ কপট রাগের ভান করে, গলার স্বর গম্ভীর করে তিনি বললেন, ‘তুমি সেতার শেখাবে রোসেনকে—এই তোমার শাস্তি। ওর নাকি এই মুসলমানী বাজনা সারেঙ্গীর চেয়ে সেতার বেশী ভালো লাগে। ও আজও ভুলতে পারল না যে আমি মুসলমান……।’

রোসেনা বাঈ একটুখানি লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন, তারপর বললেন, ‘যাই ভাইয়ার জন্যে পান নিয়ে আসি। নাড়া বাঁধবো মিষ্টি পান দিয়ে।’

ইমতাজ্ খাঁ সেই চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, ‘তুমি কি আমাদের এই জীবনকে ঘেন্না করো দোস্ত?’

‘না তো’—ঘাড় নাড়লাম আমি।

‘না, তোমরা ঠিক এ ভাবে হয়তো দেখতে অভ্যস্ত নও। কি করবো—উপায় নেই। তোমাদের এই রোসেনা বাঈ, এর নাম ছিল পুতুল, ছিল হিন্দু ঘরের বিধবা। অল্পবয়সের লোভানীতে ভুলে যে পুরুষটির সঙ্গে ও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে কেবল বাইরের জগতে ওকে আছড়ে ফেলে দিয়েই গেল, কেউ ওকে আর তুলে নিল না। ও কেমন করে কার হাত বদল হয়ে হয়ে গিয়ে পড়েছিল লক্ষ্ণৌতে, সেখানে মুসলমানী বাঁদীর পরিচয়ে আমার মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু ও যে তা নয় তা আমিই আবিষ্কার করেছিলাম কারণ বাঁদী হতে হলে যে সব মুসলমানী কায়দাকানুন

জানা থাকা দরকার তা ও জানত না। ওকে গানবাজনার পথে আমিই এনেছিলাম—আজও ও ঐ পথেই আছে। আমাকে বিয়ে করতে হলে ওকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়—ও চেয়েছিল, আমিই দিই নি, বলেছি না হল বিয়ে, শিল্পীর আবার আলাদা ধর্ম কি আর তার পরিবর্তনই বা কি ? তোমার বিশ্বাস তোমার, আমার বিশ্বাস আমার—আর আমাদের দুজনের বিশ্বাস মিলে তো গান আর সুর। যেমন করে চললে তুমি সুখী হও আমি তেমনি করেই চলব······

রোসেনা বাঈও একদিন বলেছিলেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, "আমার জন্যে নিজের জীবনের ধারা উনি একেবারে দিয়েছেন পাল্‌টে এ কথা কেই বা বিশ্বাস করবে ? উনি নিরামিশাষী—ওঁর চালচলন এমন করে রেখেছেন যে ফকিরের চেয়ে বেশী নয়। কেন ? পাছে কোথাও আমার মনে এতটুকু ব্যথা লাগে। আর আমার নিজের কথা যদি বল, আমি নিজেকে হিন্দু ভাবিনা, মুসলমানও ভাবিনা। যে মানুষের সঙ্গে থেকে নিজের মূল্য পেয়েছি আমি নিজেকে কেবল সেই মানুষ হিসাবে ভাবি।'

এমনি চলছিল। বন্ধুত্বে, স্নেহে, সুরে বৌবাজারের সেই গলির দোতলার একটা ঘরে আমার মনটাকে রোজ রেখে আসতাম আমি। কেবল সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে খাঁ সাহেবের বেঁধে দেওয়া সুরের স্পর্শ। বাড়িতে বসে যখন বাজাতাম তখন যেন ওমনি হাসিমুখ রোসেনা বাঈ-এর মিষ্টি সুরেলা গলায় ডাক আস্‌তো 'ভাইয়া', ইমতাজ খাঁর গুরুগম্ভীর ডাক শুনতাম 'দোস্ত'।

কিন্তু একটা রক্তের লোভ যে রক্তমাখা থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল এ বিষয়ে একেবারে সচেতন ছিলাম না আমরা। আমি ছিলাম না, ইমতাজ খাঁ ছিলেন না, রোসেনা বাঈ ছিলেন না—ছিল না আরও হাজার হাজার আমাদের মত বোকা লোক। কিন্তু সে এগিয়ে আসছিল নিঃশব্দে, অগোচরে।

সেই বোধহয় আমি শেষ গেলাম ওদের কাছে। কদিন আগে একটা নতুন একটা কঠিন গৎ দিয়েছিলেন। সেদিন সেটা শুদ্ধ নির্ভুলভাবে বাজিয়ে শোনালাম তাঁকে। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছিল। সারেঙ্গীর ওপর আমার হাত চলছিল দ্রুত, নির্ভুল, পাশে চোখ বুজে বসে ছিলেন ইমতাজ খাঁ, ওপাশে রোসেনা বাঈ। ধূপের গন্ধ উঠছিল বড় ধূপাধার থেকে, সামনে একটা পেতলের থালায় যুথী, মল্লিকা, বেলফুল।

আমার বাজনা থেমে গেলে রোসেনা বাঈ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন

আমার দিকে। ইমতাজ খাঁ চোখ খুললেন অনেক পরে, যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে উঠে এলেন। বললেন, 'দোস্ত্, তোমাকে আজ আমার শ্রেষ্ঠ বাজনাটি শোনাই। আমার রোসেনার ওটা খুব পছন্দ—অনেকদিন বাজাই না। বাজাই রোসেনা?'

রোসেনা বাঈ হঠাৎ আমার সামনেই কেঁদে ফেললেন। সে কান্নার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে আসতেই তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন, 'আজ সকাল থেকে তোমার কী হয়েছে বলতো? কেবল আমাকে কাঁদাচ্ছো।'

কেমন ম্লান, বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠল ওস্তাদের ঠোঁটে, উত্তর দিলেন না সে প্রশ্নের, সারেঙ্গীটাকে কোলের ওপর তুলে নিলেন। তাঁর ঘরানায় তিনি বাজালেন, আমার কানে বাজতে লাগল বেলা শেষের পূরবীর করুণ তান। মনে হল বাইরের যে ধোঁয়া-ধুলো ভরা আকাশটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনে তাতে কেবল অস্ত রবির রক্তাভ আলোই ছড়িয়ে পড়েনি, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে রোসেনা বাঈ-এর চোখের জল, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে ইম্‌তাজ খাঁর বিষণ্ণ ম্লান হাসি, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার বিস্ময়।

আস্তে আস্তে সে সুর ক'টা ঝঙ্কার শেষবারের মত তুলে মরে গেল রিণ্ রিণ্ করতে করতে। রোসেনা বাঈ মাথা নিচু করে রইলেন, সারেঙ্গীটি তেমনি কোলের ওপর নিয়ে চুপ করে বসে আছেন ইমতাজ খাঁ—আমি সে বিষণ্ণতার পর্দা ছিন্ন করতে পারলাম না। ইচ্ছে হল কিছু কথা বলি, বলে ঘরের এ স্তব্ধতার জালটা ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু সাহস হল না।

তারপর কখন একসময় দেখি ইমতাজ্ খাঁ আমার পিঠের ওপর হাত রেখেছেন, হাসছেন, বলছেন 'দোস্ত্।' রোসেনা ডাকছেন 'ভাইয়া।' আবার সহজ হয়ে এসেছে ঘরের আবহাওয়া। তখন দু'হাতে সেই বিষণ্ণ জাল ছিঁড়ে ফেলতে আর আমার কষ্ট হল না। তানপুরা তুলে নিয়ে কোনো ভূমিকা না করে, কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে গান ধরে দিলাম আমি। গাইলাম আশার গান, সান্ত্বনার গান। আসবার সময় রোসেনা বাঈ এগিয়ে এলেন সিঁড়ি পর্যন্ত, ইমতাজ খাঁ এলেন, পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, 'আজকের সন্ধ্যেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে দোস্ত্, তোমার মনেও, আমাদের মনেও। ভারী বিষণ্ণ লাগছিল সারা দিনটা—তুমি তা কাটিয়ে দিয়ে গেলে।'

পরদিন সকাল থেকে সেই জানোয়ারটা তার রক্তাক্ত থাবা বসালো মানুষের বুকের মাঝখানটায়। আমরা যে পাড়াটায় ছিলাম সেখান থেকে স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সরে আসতে হল অন্য পাড়ায়। একটা অপ্রত্যাশিত, অনাস্বাদিত যন্ত্রণার মধ্যে ছিটকে পড়লাম কোথা থেকে কোথায়। নিজেকেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে তো? নিজেকে বাঁচানোর প্রশ্নটা আগে দেখা দিল।

দু'দিন পরে মনে পড়ল তাঁদের কথা—ইমতাজ খাঁ, রোসেনা বাঈ! কার কাছে বলবো তাঁদের নাম? ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা, আতঙ্কে আর অবিশ্বাসে ভরে গেছে মানুষের মন। যে বড়লোক ছাত্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার সাহায্যে পুলিশ এস্‌কর্ট নিয়ে যেতে যেতে আরও একদিন দেরি হয়ে গেল।

গলির মুখের দু'ধারের জমায়েত মানুষেরা পুলিশের গাড়ি দেখে অদ্ভুত নিঃশব্দে কাছাকাছি গলিগুলোর মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—কিন্তু মনে হল লুকিয়ে লুকিয়ে এ-কোণ ও-কোণ থেকে আমাকে দেখে ওরা হাসছে বিদ্রূপের হাসি। হয়তো তা আমারই মনের ভুল। ছাত্রটি আমাকে কানে কানে একবার বলেছিল, 'মাস্টারমশাই—যাওয়াটা নিরর্থক। আমি শুনেছি রাজাবাজারের বদ্‌লা ওরা এখানে নিয়েছে······।'

আমি কিছু শুনতে চাই না—চাইলাম না। সেই পরিচিত বাড়িটার সামনে নামলাম। যেন তেমনি একই সঙ্গে সেই যন্ত্রগুলোর সারেগামাপাধানি শুনবো বলে কান পাতলাম, তেমনি ভেজানো দরজা খুলতে গেলাম, দেখি ভাঙা দরজা খোলাই পড়ে আছে—যেন কারা সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এখুনি বলে উঠবে, 'আইএ বাবুজী।'

নিস্তব্ধ ঘর পেরিয়ে অভ্যাসমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। একবার মনে হল যেন রামকেলীর স্বর বাজছে কোথায়, আবার সেটা থেমে গেল। বারান্দায় শ্বেতপাথরের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে সেই যুগলমূর্তি তেমনি দাঁড়িয়ে—কেবল রাধার গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, কৃষ্ণের হাতের বাঁশী গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে—অনেকগুলো পায়ের চাপে তা চ্যাপ্‌টা হয়ে গেছে। মেঝেতে এখানে ওখানে শুকনো রক্তের দাগ—যেন লাল গোলাপের শুকনো পাঁপড়ি ছড়িয়ে আছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল 'ভাইয়া', কে যেন গম্ভীর গলায় ডাকলে 'দোস্ত্‌।' কোথা থেকে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর আওয়াজ

ভেসে এল। ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাখোয়াজ আর তানপুরা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ঘরের জাজিম্‌খানা কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে আর অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা পোশাক-আশাক, শাল, জরির নাগরায় বিশ্রী হয়ে। দেওয়ালে লেগেছে রক্তের ছোপ, শুকিয়ে তা এখন কালো হয়ে মিশে আছে। সারা ঘরখানায় একটা বীভৎস, শূন্যতা, একটা আর্ত প্রার্থনা, একটা কান্নার স্বর যেন ছড়ানো পড়ে আছে, কারা যেন তাকে পা দিয়ে দলে দলে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সারেঙ্গীটাই কেবল—যেটা ইমতাজ খাঁ নিজে বাজাতেন। কেউ হয়তো অমন বিশ্রী দেখতে যন্ত্রটাকে লাথি মেরে ঘরের একপাশে ছুঁড়ে ফেলেছে। সেটাকে তুলে নিলাম, আঙুলের ছোঁয়া লেগে তাতে স্বর বেজে উঠলো রিণ্‌ রিণ্‌ করে। মাঝখানের দুটো তার গেছে ছিঁড়ে তবু মনে হচ্ছে সেই সেদিনকার সন্ধ্যেবেলার শেষ স্বরটা বেজে বেজে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার তরঙ্গ উঠে আমার বুকের ভেতরকার চাপা কান্নাকে বাইরে টেনে আনছে। ভূতের মতো বসে আছি শূন্য ঘরে।

ঘরের দরজার ছায়া ফেলে কে যেন এসে দাঁড়াল, ডাকল, 'মাস্টার-মশাই।' কারা যেন লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠে আসছে। আমার চারপাশ থেকে স্বরটা হঠাৎ থেমে গেল। ছাত্রটি আমার হাত ধরল, 'মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ আটকে থাকার সময় নেই ওঁদের—তাড়া দিচ্ছেন। তাছাড়া টেন্‌সন্‌টা আবার বেড়েছে—ওঁরা যেতে বলছেন।'

চলে এলাম। সিঁড়ির মুখে কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকলে, 'ভাইয়া', কার যেন স্পর্শ পেলাম পিঠের ওপর 'দোস্ত্‌'—নিচে সেই যন্ত্রগুলো একটানা বাজতে লাগলো সা রে গা মা পা ধা নি, সা রে গা মা পা……

পুলিশ অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী করছিলেন মশাই অতক্ষণ ধরে? রেখেছে নাকি কাউকে? যেমন এরা, তেমনি ওরা··· উঠুন মশাই উঠুন, আমাদের কি অত সময় আছে। আমার হাতের সারেঙ্গীটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালেন, 'ওটা আবার কি? জোটালেন কোথা থেকে? না, না, কোনো জিনিসপত্র এভাবে নেওয়া এ্যালাও করা···।'

আমার সেই বড়লোক প্রভাবশালী ছাত্রটি ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি বললো তাঁকে কে জানে, বিরক্তমুখে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন অবশেষে।

যারা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল তারা এই শব্দ করে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাশ ফেলে হাসাহাসি করতে করতে লাগল। রক্ত খাওয়া দানবটা কেবল রক্তই খায় না—যাতুও জানে। ওরা ত্ু'পক্ষই সেই রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর হাসছে।

স্ত্রী পুত্রকে নিরাপদ দায়িত্বে রেখে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। সে কথা ভুলতে আমার অনেকদিন লেগেছিল।"

"এই সেই সারেঙ্গী!"—ব'লে পরমযত্নে তাকে একটা কালো কাঠের বাক্সে ভরে রাখলেন নিমাইবাবু।

আমি কেমন অভিভূতের মত বসেছিলাম। আমি তো ব্যবসায়ী মানুষ, নিরেট হিসেব-নিকেশে আমার অবকাশগুলো ভরা। সুর আমার মনে দাগ কাটে না, গান শুনলে আমার অস্বস্তি লাগে। কিন্তু সেই আমারই মনে হতে লাগল ওই কালো বাক্সটার মধ্যে থেকে কী একটা সুর ছড়িয়ে পড়ে সকালের এই প্রসন্ন আলোকে ঢেকে ফেলেছে হঠাৎ। কোথা থেকে একটা বিশ্রী কোলাহল উঠছে, সকালের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে কাদের হাতের লাগানো আগুনে আর তারই মধ্যে কাঁদছে একটা প্রার্থনা, একটা আত্মনিবেদন, একটা শেষমুহূর্তের শূন্যতা।

নিমাইবাবুর সেই মুখটার দিকে আর আমি তাকাতে পারলাম না। নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না এখন কিন্তু ঐ দানবটা যে একদিন আমাকেও গিলেছিল এ কথা নিমাইবাবু জানেন না। এ শহরে উনি নতুন এসেছেন।

সংস্কৃতি ও সমকাল

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কালচার' কথাটা নিয়ে তর্কবিতর্কের খবর অন্তত আমার জানা নেই। এতে বিস্মিত হওয়ার কারণ দেখি না, কারণ আমাদের গদ্যের বয়স যাই হোক, জীবন্ত, ব্যবহারিক গদ্য, যা সামাজিক জীবনের ছন্দে ছন্দিত, তার বয়স নিশ্চয়ই একশ বৎসরের বেশি নয়। এই একশ বৎসরের মধ্যে যে গদ্যের জন্ম ও বৃদ্ধি তার বৈজ্ঞানিক বিচার এখনও হয়নি। অতি আধুনিক গদ্যের গতিপ্রকৃতি দেখে বরং মনে হয়, এখনও অনেক বড়ো পরিবর্তন এর সামনে আছে, যার ফলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বীরবলের গদ্য আগামী একশ বৎসরে প্রায় সেকেলে হয়ে পড়বে। এই ধারণা ভ্রান্ত হলেই খুশি হবো, কারণ শরৎচন্দ্র, বীরবল ও রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গদ্যে বাংলা ভাষা যে রূপ নিয়েছে, তার স্বচ্ছতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ইংরেজী ড্রাইডেন ও অ্যাডিসনের সংগে তুলনীয়। এটাই আশা করব, পরবর্তীকালের গদ্যে মাঝে মাঝে সাময়িক বৈচিত্র্য দেখা দেবে, কিন্তু বাংলা গদ্য ঘুরে ফিরে তার কেন্দ্রীয় স্বভাবেই ফিরে আসবে, যার প্রকৃতি এর মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।

ঐতিহাসিক সূত্রানুসারে যিনি প্রথম বাংলাভাষার অভিধান রচনা করবেন, তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রথম জানব, কবে, কে এবং কোন্ অর্থে প্রথম 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, এবং তারপর কালক্রমে শব্দ দুটির অর্থব্যাপ্তি, সংকোচ বা পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। যতদিন না এ-জাতীয় অভিধান তৈরি হচ্ছে, ততদিন আমাদের আলোচনা কিছুটা অনুমান-নির্ভর এবং দুর্বল হতে বাধ্য। ইংরেজীতে কালচার ও সিভিলিজেশন শব্দ দুটি কম বিভ্রাট সৃষ্টি করেনি। অনেকের কাছে এরা সমার্থক এবং আধুনিক কালেও কেউ কালচার প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাঁকে প্রথমে শব্দটি ব্যাখ্যা করে অগ্রসর হতে হয়—অন্তত সাবধানীরা তাই করেন। বাংলাতেও আমরা বোধ হয় কালচার অর্থে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কথা দুটি ব্যবহার করলেও, এদের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে একদম নিশ্চিত হতে পারিনি। প্রথমটি

সুশ্রব নয়, তাছাড়া কৃষিকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয় বলে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুমোদিত চিৎপ্রকর্ষ শব্দটিও সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে নি, বোধ হয় ওজন ভারী বলেই। বরং ঐ অর্থে সংস্কৃতি কথাটির ব্যবহারই আজকাল ব্যাপক। কৃষির সংগে যোগ আছে বলেই কৃষ্টি কথাটি বর্জনীয়, এটা আমার কাছে সুযুক্তি ঠেকে না, কারণ কালচার কথাটার মধ্যেও ঐ একই ব্যঞ্জনা বর্তমান।

এই আলোচনায় আমরা প্রথমেই ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ ও সামাজিক উৎকর্ষ, এই দুটি ধারণার মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমানা আঁকতে চাই। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলতে আমরা প্রথমটাই বুঝব, দ্বিতীয়টি বোঝাতে আমরা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করব, যেমন সভ্যতা। আমাদের এই সতর্কতার কারণ সম্প্রতি এদেশে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও কালচার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার। বিশেষতঃ রাজনৈতিক বক্তৃতা মঞ্চে।

সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রভেদ বেশ স্পষ্ট—প্রথমটিতে স্বাধীনতার যুক্তি হিসেবে ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বেশি শোনা যায়নি; দ্বিতীয়টিতে ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিই তার স্বতন্ত্র জাতীয়তার অকাট্য যুক্তি, সুতরাং তার পৃথক বাসভূমির সঙ্গত কারণ। একটু পরেই আমরা দেখব, সংস্কৃতি কথাটির এ প্রসঙ্গে যে-অর্থে ব্যবহার, সে-অর্থ আমাদের নয়, যদিও এ-অর্থেও শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। এখন ভারতে ও পাকিস্তানে জোর জাতীয় ঐক্যের চিন্তাভাবনা চলেছে। যদিও সমস্যাটি দুই দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবু এর সমাধানে দুই দেশের চিন্তায় বেশ মিল দেখা যায়। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে দুই দেশেই চিন্তানায়কেরা জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উপর যথেষ্ট জোর দিচ্ছেন। সংস্কৃতিকে জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট মূর্তিও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এমনি একটা বিগ্রহের ব্যবহারিক মূল্য রাজনৈতিক জীবনে খুব বেশি। কিন্তু পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে রাজনৈতিক মঞ্চে সংস্কৃতির কয়েকটি ভয়ানক ভূমিকা দেখার পর অনেকেরই টনক নড়েছে; এবং রাজনীতিকেরা এখন যখনই, যে-কোনো দেশেই, কোনো এক সুপ্রভাতে কৃষ্টির পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তখন বুদ্ধিজীবিদের একটু নড়েচড়ে বসা দরকার। দরকার এজন্য নয় যে তাঁরা অনধিকার চর্চা করছেন। কৃষ্টি-চর্চা বা কৃষ্টি-চিন্তা

কোনো শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়, বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকেই কৃষ্টির একমাত্র উপযোগী আবহাওয়া বর্তমান, তা-ও নয়। বুদ্ধিজীবীদের সন্দেহের কারণ অন্যত্র। রাজনীতিক যখন কৃষ্টির কথা বলেন তখন তাঁর চোখের সামনে একটা অদৃশ্য মানচিত্র থাকে—সেখানে জাতীয় কৃষ্টির সীমা-রেখা অত্যন্ত চড়া রঙ্গে আঁকা। আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে বরং মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির সীমানা একেবারেই তর্কাতীত। সংস্কৃতি ততোটা মানুষে মানুষে যোগাযোগের সেতু নয়, যতোটা দেশে দেশে সীমানার প্রাচীর। এবং যেখানেই জাতীয় কৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ, সেখানেই প্রাচীরের ওপারেই দুটি একটি শত্রুপক্ষও বর্তমান। অনেক সময় এই শত্রুপক্ষের উপস্থিতিটিই উৎসাহের আগুনে ইন্ধন। নাৎসী আমলে জার্মানিতে কালচার-চেতনা, ইহুদী-বিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা মিলেমিশে একটা সর্বাত্মক জ্বরের মতো দেশকে পেয়ে বসেছিল, তাই এখন কৃষ্টি ও জাতি এ দুয়ের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পর্কের আভাসেই আমরা শঙ্কিত।

দোষ রাজনীতিকের নয়। কালচার বা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি শব্দগুলির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় ধারণাটি কখনও ব্যষ্টি-প্রসঙ্গে, কখনও সমষ্টি-প্রসঙ্গে আমরা কাজে লাগাই। প্রথম প্রসঙ্গে সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে তা বুঝিনা। অথচ উভয় অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ শুধু বহুল নয়, ন্যায্য। অধুনা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এই দুই শাস্ত্রের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। এবং মানুষের সমাজ ও ইতিহাসচিন্তাও অনেক নতুন পথের খোঁজ পেয়েছে। আজ তাই সহজে কোনো সমাজকেই, তার জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি যতোই আদিম হোক না কেন, কৃষ্টিহীন বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। নৃতাত্ত্বিকের চোখে সাঁওতাল অসভ্য নয়, বরং এক প্রাচীন, অবিমিশ্র ও জীবন্ত কৃষ্টির উত্তরাধিকারী। গ্রীকো রোমান সভ্যতা, বা ভারতীর আর্য সভ্যতা উৎকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সব সমাজকেই এই সব সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে, এ ধারণা আজ অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কৃষ্টিকে বিচার করি, তাতে দোষ নেই, কারণ একটা বিশেষ ও স্পষ্ট অর্থে শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ অর্থে, চিৎপ্রকর্ষের অর্থে যখন আমরা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কথা বলি, তখন সামাজিক কৃষ্টি অবান্তর প্রসঙ্গ না হলেও, ভিন্ন প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই। ব্যক্তির কৃষ্টি একটা উত্তরাধিকার নয়, অবিমিশ্র উত্তরাধিকার তো নয়ই, এটা অর্জনের ব্যাপার, এবং অর্জিত জিনিসটি বা অবস্থাটি যেহেতু একটি সক্রিয় ও

অনুসন্ধিৎসু মনের অবিরাম প্রশ্ন ও প্রয়াসের ফল, তাই তার উৎস, তার জন্মভূমি বহু-বিচিত্র। আমাদের সংস্কৃতজন বা বিদগ্ধজন তাই মানসিক গঠনে প্রায়ই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বনাগরিক (cosmopolitan)।

যখন কৃষ্টি এই দ্বিতীয় অর্থে সীমিত, তখন সে ব্যাপারে রাজনীতিকের উৎসাহ ক্ষীণ। শুধু রাজনীতিক কেন, সমাজের একটা বড়ো অংশ এই বায়বীয় ও উন্নাসিক জিনিসটি নিয়ে মাতামাতি করা সন্দেহের চোখে দেখবে। এই বিশেষ অংশ কৃষ্টিহীন বলে নয়, কৃষ্টিকে তাঁরা সমগ্র জীবনের প্রেক্ষিতে অনত্যাবশ্যক ও প্রান্তিক বলে ভাবেন, তাই। খ্রীষ্টধর্মের পিউরিটান সংস্করণের যে সব দেশে প্রতিপত্তি সেখানে, এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ সম্বন্ধেই কথাটা বোধ হয় খাটে। ধর্মীয় প্রভাবের ফলে এসব দেশে জীবন সম্বন্ধে একটা গভীর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে! রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বা হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম আচার ও অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পিউরিটান ও মুসলিম সমাজ অধিকাংশ শিল্পকর্ম সম্বন্ধে হয় নিরুৎসাহ, নয় বিরুদ্ধবাদী। এই পরিবেশ সর্বদা শিল্পচর্চার অনুকূল নয়। এবং যদিও শিল্প ও সংস্কৃতি সমার্থক নয়, তবু শিল্প ও মননই সংস্কৃতির দুটি প্রধান উপজীব্য; তাছাড়া দুটি ক্রিয়া প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মনন-বর্জিত শিল্পী ও সৌন্দর্য-বোধহীন মনস্বী প্রায় আজগুবী ব্যাপার। এটা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয় যে পিউরিটান দেশগুলিতে, দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম সমাজে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, বা মহৎ শিল্পীর নজীর নেই। ইতিহাস বরং বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। প্রত্যেকটি পিউরিটান দেশে, বা প্রতিটি মুসলিম সমাজেই ইতিহাসের কোনো না কোনো যুগে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব নয়, যখন সভ্যতা শীর্ষগামী। আসলে আমি যে প্রভেদটি টানতে চাচ্ছি সেটা, সৃষ্টির, দৃষ্টির। একজন মামুলী মানুষ শিল্প-সাহিত্যকে কি চোখে দেখে, তার প্রভেদ। এবং এই প্রভেদটি যদি নেহাৎ কাল্পনিক না হয়, তাহলে আমরা খানিকটা বুঝতে পারব, কেন রাজনীতিক, যিনি জাতীয় সংস্কৃতির কীর্তনে পঞ্চমুখ, ব্যক্তিসংস্কৃতির ব্যাপারে অনাগ্রহী। রাজনীতিক যদি এই সংস্কৃতিতে অনুৎসাহী হন, তবে সেটা তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন বলেও নয়, তিনি একটা বিশেষ সমাজমনের ভাগী বলে। তাঁর অনিচ্ছা, তাঁর অনাগ্রহ সম্পূর্ণ তাঁর নিজের নয়, অনেকখানিই তাঁর সমাজমনের। এবং এই অনাগ্রহ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বোধ হয় সচেতন নন।

তাই বলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রসঙ্গে রাজনীতিকের উৎসাহ অযৌক্তিক বা মেকী এটাও প্রমাণ হয় না। তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ হতে পারে, তাঁর সহানুভূতির ক্ষেত্র ছোট হতে পারে, হতে পারে তাঁর দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়। এতে আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু আপত্তির কারণ ঘটে তখনই, যখন জাতীয় সংস্কৃতিকে একটা অবিচল ও অজটিল কিছু বলে চালানোর চেষ্টা হয়। যেন একটা কিছু যা একেবারেই তৈরী এবং চিরকালের জন্য। আর জাতির দায়িত্ব যেন সেই মূল্যবান বস্তুটির খবরদারি করা। তাকে নষ্ট হতে না দেওয়া, তাকে বিজাতীয় সম্পর্ক থেকে সরিয়ে রাখা।

এখানেই ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাজনীতিকের বিরোধ। ইতিহাস বলবে, দু-চারটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা অরণ্যে বা উপত্যকায় দু-চারটি আপাতস্থির ও অবিকৃত কৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব। এর বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তর জনসমাজে কালস্রোত তার ভাঙাগড়ার চিহ্ন রেখে গেছে; সভ্যতার জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ঘটেছে; এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো সমাজ তার দুর্মর প্রাণশক্তির জোরে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শুধু টিকে আছে নয়, সভ্যতার আলোও জ্বালিয়ে রেখেছে। সমাজতত্ত্ব বলবে আজকের পৃথিবীতে কোনো সমাজই আভ্যন্তরীণ গঠনে সরল নয়, প্রতিটি সমাজই শ্রেণীবিন্যস্ত; এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গরীবের কৃষ্টি মধ্যবিত্তের কৃষ্টি নয় বা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কৃষ্টিও এক নয়। একই সমাজের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীগত কৃষ্টি। ব্যাপক অর্থে কৃষ্টি বলতে যদি একটা সমাজের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বুঝি, তাহলে সমাজতত্ত্বের এই সত্যকে মেনে নিতে হয়। বাংলাদেশের গ্রামে যে কৃষক বা জেলে সন্ধ্যাবেলা পাশের গ্রামে যাত্রা দেখার জন্যে অনেকখানি কাদামাটির পথ ভাঙে, তার সাথে শহরের সিনেমা-পাগল, ফুটবলমত্ত মানুষটির মিল কোথায়? এবং শেষোক্ত ব্যক্তিটি যদি হঠাৎ বড়ো শহরের বড়ো ক্লাবের বিদেশী তামাশার মাঝখানে গিয়ে পড়ে, তাহলে সেও ঠিক স্বজন-সান্নিধ্য-রসে সিক্ত হয়ে ফিরবে না। কৃষ্টির এ-ও একটা সংজ্ঞা হতে পারে: কৃষ্টি আমাদের অবসরের জীবন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে একই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র কৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়।

অবশ্য এই বিভিন্নতা যে দ্বন্দ্বমূলক হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই, বিশেষ করে যেসব সমাজের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে একটা সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে। সমাজের বিভিন্ন অঙ্গে যতই বৈচিত্র্য থাক, একটা ঐক্যের সম্পর্কও গড়ে দিয়েছে

এই ধর্মীয় একাত্মতা। আবার এ-ও সত্য যে সম্ভাব্য ঐক্যকে সম্পূর্ণ হতে দিচ্ছে না ধনবণ্টনের অসাম্য। তাই সর্বাত্মক ঐক্যের মধ্যেও খানিকটা বিরোধ, খানিকটা বিভিন্নতা থেকেই যাচ্ছে। এবং এই বিরোধ ও বিভিন্নতা প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিটি শ্রেণীর আপন আপন কৃষ্টিতে।

ম্যথু আর্নল্ডের চিন্তায় এইখানেই একটা গোলমাল দেখা যায়। সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে, বা বিশেষ করে স্বদেশের সমাজে খ্রীষ্টধর্মকে, তাঁর মনে হয়েছিল মৃতশক্তি। আবার সমাজের তিনটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে চরিত্রগত গরমিল বিশ্লেষণ করেও, কৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনি সমাজতাত্ত্বিকের বিচার দেখাতে পারেন নি, বা প্রতিটি শ্রেণীর চরিত্র বা প্রবণতা বোঝেন নি। কৃষ্টি বলতে তিনি ব্যক্তির 'চিৎপ্রকর্ষ'ই বুঝেছেন। তাঁর বিদগ্ধ মানুষগুলি তাই অন্ধকার আকাশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তারা। এবং তাঁর বিবেচনায় মানুষের কৃষ্টি ধর্মের বিকল্প।

অবশ্য আর্নল্ডের মূল প্রস্তাব মেনে নিলে, তাঁর সংস্কৃতির সংজ্ঞা স্বীকার করে নিলে, তাঁর সিদ্ধান্তটা মেনে নেওয়াও সম্ভব। কিন্তু তাঁর চিন্তায় সমাজ সম্বন্ধে হতাশা আজ অনেকের কাছে অনর্থক নৈরাশ্যবিলাস বলে মনে হবে। তাছাড়া, কোনো সমাজের শ্রেণী-বিন্যাসই চূড়ান্ত নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ক্রমাগত এটাকে ভাঙাগড়ার ছন্দে নাচাচ্ছে, এবং প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যেও চরিত্রগত বদল ঘটছে, বিস্ময়কর ভাবে ঘটছে—এ সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। গণ-সংস্কৃতি কথাটা তাঁর সময় অতোটা চালু হয়নি, এবং বেঁচে থাকলে আজ এই সংস্কৃতিকে তিনি যে সুলক্ষণ বলে ভাবতেন না, তাও পরিষ্কার।

ম্যানহাইম নির্দেশিত পথে এলিয়টের চিন্তা তাই আর্নল্ডের যুক্তি খণ্ডাতে ব্যস্ত। শুধু সমাজের চঞ্চলতা নয়, সমাজ-মধ্যস্থ প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে চঞ্চলতা তাঁর কাছে পরম সত্য। ঠিক তেমনি সত্য প্রতিটি পেশার ও শ্রেণীর আপন আপন কৃষ্টি। ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ শ্রেণী-কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নয়, আত্মস্থ করে। এলিয়টের উত্তম শ্রেণী, যাকে তিনি ইলিয়াইট বলেছেন, সমাজের বিভিন্ন 'বর্ণের' প্রতিনিধিস্থানীয়। তাই বলে এই শ্রেণী-সংস্কৃতি তুলনীয় অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে একেবারে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এলিয়টের বিদগ্ধজন অপরাপর শ্রেণী ও পেশার ধর্ম ও মর্ম সম্বন্ধে কুতূহলী, এবং সর্ব-শ্রেণীর উত্তমজনের সমবায়েই তাঁর উত্তম সমাজ। অবশ্য এটা অনেকটা আদর্শ প্রস্তাবের মতো শোনায়, না

হলে হালে সি. পি. স্নো-র 'দুই সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে এত ধুলো উড়তো না। সমাজের সুশিক্ষিত স্তরেই যদি 'দুই সংস্কৃতি' সত্য হয়, তাহলে বৃহত্তর সমাজে বহু সংস্কৃতির অস্তিত্বও বা অসম্ভব কেমন করে? কিন্তু এলিয়ট এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন এই ভাবে যে তাঁর ধারণায় যে কোনো সমাজের সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদই হল সাধারণ ধর্ম। তাই শ্রেণী-সংস্কৃতি যেন অনেকটা উপ-সংস্কৃতি—মৌলিক ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য।

ক্লাইভ বেলের সংগে এলিয়টের মিল এইখানে যে যদিও তাঁরা দুই-জনেই ব্যক্তিগত চিৎপ্রকর্ষের কথা বলেন, তবু এটাকে সম্পূর্ণ সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যাপার মনে করেন না। বরং বিপরীত। সামাজিক উৎকর্ষের উপর ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ যেন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। উপরন্তু বেলের উত্তমজনের জন্য সমাজকে রীতিমতো মূল্য দিতে হয়, একটা আলাদা শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হয় যা শ্রমব্যবস্থার শিকলে বাধা নয়—অবসরভোগী। এইখানেই এলিয়ট ও বেলের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বড়ো তফাৎ। বেলের সংস্কৃতি অনেকখানি শৌখিন, একটা অতি সচ্ছল শ্রেণীর অবসরের অনিশ্চিত ফসল। আর এলিয়টের সংস্কৃতি শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের সামগ্রিক ফসল—এ কোনো বিশেষ আবহাওয়ার আনুকূল্যের আশা করে না। বেলের বিদগ্ধজন একটা বিশেষ সমাজের সৃষ্টি হলেও তার আনুগত্য সমাজের কাছে তো নয়ই, দেশের কাছেও নয়। সে বিশ্বনাগরিক—কজমোপলিটান। জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় আদর্শ যখন তার সংস্কৃতির সাথে বিরোধ ঘটায়—এবং তার কাছে সংস্কৃতি ও সত্য সমার্থক—তখন সে সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরে, তথাকথিত দেশদ্রোহিতার ঝুঁকি নিয়েও। তার ব্যক্তিগত বিচারের স্থান সামাজিক সিদ্ধান্তের অনেক উপরে, এবং শেষোক্ত বস্তুটি বড়োজোর একটা অনির্দিষ্ট ধারণা, একটা ফাঁকা বুলি, একটা জনশ্রুতি যা বারবার উত্তরকালের বিচারে ধিক্কৃত হয়েছে। এলিয়ট এমন কোনো বিরোধের কথা ভেবে অযথা চিন্তিত নন, যদিও এমনও নয় যে এর সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু বেল যেখানে মূলত নৈরাজ্যবাদী এলিয়ট যে-কোন মূলত সমাজ-শৃংখলায় বিশ্বাসী। উত্তমজনের জন্য কোনো অতিরিক্ত স্বাধীনতা তিনি চান নি।

সংস্কৃতি প্রসংগে আলোচনায় বেল ও এলিয়টের চিন্তার মধ্যে এই তফাৎটা ইংগিতপূর্ণ। এবং বর্তমান কালে বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎস ও প্রতিপত্তি যেসব দেশে সেখানেও

সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ক্রমেই শক্তি অর্জন করছে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। সুতরাং যে সংস্কৃতি মানুষকে প্রথমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা শেখায়, তাকে খর্ব করছে নতুন নতুন বাধা নিষেধ। যেখানেই সংঘাত বাধছে ব্যক্তির দাবি ও সমাজের দাবির মধ্যে, সেখানে ব্যক্তিকে হঠ্‌তে হচ্ছে সমাজকে ঠাঁই করে দেবার জন্য। অনেকে বলবেন ব্যক্তি ও সমাজের দাবির মধ্যে এই বিরোধ সম্পূর্ণ কৃত্রিম বা কাল্পনিক। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তা মনে হয় না। যদি মানতেও হয় যে বৃহত্তর সমাজের যাতে কল্যাণ, ব্যক্তির কল্যাণও তারই মধ্যে, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ কিসে, তার অমোঘ ও অভ্রান্ত বিচার সম্ভব কিনা। সবচেয়ে বড়ো কথা, ব্যক্তি যদি নিজেকে ব্যাহত মনে করে, সেই মনে করাকে কতটুকু মূল্য দেব। ব্যক্তি যদি সমাজের ইচ্ছার (এ হেন বস্তুর অস্তিত্ব যদি থাকেও) সঙ্গে নিজের ইচ্ছার মিল ঘটাতে না পারে, তবে তার চিন্তার ও কর্মের কতটুকু স্বাধীনতা সমাজ দেবে ? আর এই সমস্যার জন্ম যখন প্রধানত জ্ঞানী ও গুণীরাই দেবেন তখন সমাজতান্ত্রিক, এমনকি গণতান্ত্রিক দেশেও তাঁদের ভূমিকা কি ? নিছক বিরুদ্ধতার ? না অক্ষম সংখ্যালঘু বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ? না গঠনমূলক, আত্মসচেতন, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও আপোসহীন দ্বন্দ্বের ?

এ প্রশ্নের কোনো সহজ জবাব নেই। কারণ বিদগ্ধজন প্রতিরোধের সামনে বা প্রতিকূল পরিবেশে কি করবেন, তা তিনিই জানেন। এবং এঁরা সবাই যে মিলিত হয়ে সভা করে একই কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, তারও নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রশ্নটি সমাজের দিকেই ঠেলে দেওয়া যায়। সমাজ এঁদেরকে ফাঁকা মর্যাদা দিয়ে কার্যত অক্ষম করে রাখতে পারে অথবা এঁদেরকে একেবারে উপেক্ষা করে নিম্নস্তরের বুদ্ধিজীবীদেরকে সম্মান দিয়ে সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে এঁদেরকে অস্বীকার করে অন্তত শান্তি ও শৃঙ্খলার দুশমন একদল বিকৃতবুদ্ধি উৎকেন্দ্রিক লোক হিসেবে এক ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। এবং এ ধরনের রায় দিতে সমাজ পাতি-বিদগ্ধ শ্রেণীর সরব সমর্থন পাবে। এই সমাজ-সচেতন ও দায়িত্বশীল শ্রেণী 'সরকারী বুদ্ধিজীবী'র গদি উজ্জ্বল করবেন, এবং এঁরা সর্বদাই সুস্থবুদ্ধির মানুষ হবেন, আর বৃহত্তর ও মহত্তর সামাজিক মঙ্গল চিন্তায় এঁরা অষ্টপ্রহর অস্থির থাকবেন। এঁদের প্রতিপত্তি

ও শ্রীবৃদ্ধিই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবে সরকার বা সমাজ কতখানি কৃষ্টি-সচেতন। ফলে এমন অবস্থা অসম্ভব নয় যে যাঁরা ব্যক্তিগত সংস্কৃতির নির্দেশে চিন্তাভাবনায় থাকবেন সংখ্যাগুরু চিন্তার বিপক্ষে তাঁদের ভাগ্যে জুটবে বিড়ম্বনা। রাসেলের মতো মনীষিকেও আদালতে কাজীর ভৎর্সনা শুনতে হয়েছে, তাঁর দায়িত্ব-হীনতার জন্য।

আমার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে সমাজ সর্বদাই অত্যাচারী বা মূঢ় বা অসহিষ্ণু। এটাও মেনে নিতে বাধা নেই যে কোনো সমাজই কখনই এতখানি সভ্য নয় যে সক্রেটিসেরা কোনোদিনই বিপন্ন হবেন না। কিন্তু এটাও আমার প্রতিপাদ্য নয়। বরং আমি মনে করি, একনায়কতন্ত্রের বাইরে যে-কোনো সমাজেই যথেষ্ট মূঢ়তার সংগে বিস্তর শুভবুদ্ধি আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে। ঋষিরা কালেভদ্রে লাঞ্ছিত হন বলে যারা জেলখানায় অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে, তারা সবাই ঋষি নয়। আমার বিবেচনার বিষয় সংস্কৃতি। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কৃতি সামাজিক সভ্যতার অনুকূল আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে, তবু প্রায়শঃই ব্যক্তিগত সংস্কৃতি মানুষকে সমাজের স্বাভাবিক গতির উল্টোপথে ছোটায়। যদিও পরিণামে এই বিরুদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষেই কল্যাণসূচক, কিন্তু আপাতত ব্যক্তির সাথে সমাজের এই দ্বন্দ্ব একটা সামাজিক সত্য। অনেক সমাজ এইখানে বিস্তর সকৌতুক সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের ধৈর্য বা কৌতুকবোধ অতটা পুষ্ট নয় বলে এসব উৎকেন্দ্রিকতার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

বর্তমান যুগের এই একটা মস্ত হেঁয়ালী যে ইতিহাসে কখনও এমন ব্যাপক ও সুপরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতির প্রতি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায়নি। অথচ, এই পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, যাঁরা সত্যকার গুণী ও বিদগ্ধজন, যাঁরা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক; তাঁদের সাথে রাষ্ট্রের আজই সবচেয়ে বেশি আড়াআড়ি। কারণ বোধ হয় এই যে রাষ্ট্র সংগঠনের প্রতীক, সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্যের। লক্ষণীয় এই যে যেসব দেশে গণতন্ত্র পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এই বিরোধ অন্তঃশীল হলেও, যেখানে শাসনপদ্ধতি আলাদা, যেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নি বা কোনোদিন হলেও রকমারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের হাতে মার খেয়ে গণতন্ত্র যেখানে মৃত বা মুমূর্ষু, সে সমস্ত দেশে এই বিরোধ প্রায়ই প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। এবং এর ফলও অবধারিত। বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রশক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খান, এঁদের মধ্যে একদল আপোস করেন বা নিজেদের বিকিয়ে

দেন। এঁদের মধ্যে একদল আপোস করেন বা নিজেদের বিকিয়ে দেন। এঁদের শ্রীবৃদ্ধির কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধি কৃষ্টির জয় সূচনা করে না। রাষ্ট্রশক্তি যখন সরবে কৃষ্টির মুরুব্বিতা করে, তখন হয় 'জাতীয় কৃষ্টি'র জন্য করে, যার একটা সরকারী সংজ্ঞা আছে, বা জাতীয় 'গৌরবে'র জন্য করে, যার পিছনে প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা সক্রিয় থাকে। এখানে কৃষ্টিকে সরকারী প্রচারের সেবাদাসীর ভূমিকায় দেখা যায়। ফলে যাঁরা সত্যকার 'প্রকৃষ্টজন' তাঁরা এই কৃষ্টির হাট থেকে সরে থাকেন।

এই প্রচার জিনিসটা অতি আধুনিক না হলেও, খুব পুরনো নয়। বর্তমান কালেই রাষ্ট্রশক্তির আদরে লালিত হয়ে এটা একটা পোষা দৈত্য হিসেবে সব দেশেই সমাদৃত। এই দৈত্যের কাছে রাষ্ট্রের আশা অনেক। কিন্তু এ যখন প্রবল আগ্রহে সংস্কৃতিকে বুকে চেপে ধরে, তখন বেচারীর দেহটি সেই আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লেও, প্রাণটি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে।

রাষ্ট্রের সাথে বিদগ্ধ সমাজের অসঙ্গতির উৎস এখানেই। কৃষ্টি যাঁর মনোমণ্ডলের বাতাসের মতো, তিনি কোনো অবস্থাতেই কতকগুলি ক্ষেত্রে আপোস করতে পারেন না। রাষ্ট্রশক্তি ব্যস্ত থাকে ক্ষমতা অর্জনে, সংরক্ষণে ও বিস্তারে, প্রকৃষ্টজন মগ্ন থাকেন সত্য ও সুন্দরের চর্চায়। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ক্ষমতার গর্বে, গরজে ও তাগিদে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সর্বদা সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না, অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে সমাজের সামনে উপস্থিত করতে হয়; এবং মাঝে মাঝে এই কর্মে সমাজের সম্মতিও প্রয়োজন। সমাজের বৃহত্তর অংশের অন্তত মৌন সম্মতিটুকু পাওয়া আজকাল রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ না হলেও, সম্ভব; কিন্তু বাধা পেতে হয় সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের কাছ থেকে যাঁরা সহজে বিভ্রান্ত হন না, যাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনলস চর্চায় শানিত, যাঁদের কাছে সরকারী প্রচারনা প্রায়ই প্রতারণার মুখোশ। প্রতিটি সমাজেই এই সুসংস্কৃত শ্রেণী তার সজাগ চক্ষুর মতো জেগে থাকে।

সমস্ত পৃথিবীতে আজ বিদগ্ধজনের পরিস্থিতি এক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা বাদ দিলেও; প্রতিটি দেশের ঘরোয়া রাজনীতিও ক্ষমতা দখলের নির্মম প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে এই একই খেলার রকমারী সংস্করণ প্রচলিত। এই পরিবেশে বুদ্ধিজীবীর পক্ষে স্বধর্ম রক্ষা করে চলা

কঠিন। তাঁকে শুধু যে রাষ্ট্রশক্তির সাথেই বোঝাপড়া করতে হচ্ছে, তাই নয়, মধ্যম ও অধমের সাথেও তাঁর প্রতিযোগিতা। কারণ শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে ক্রমেই 'গণ-সংস্কৃতি'র সমাদর বাড়ছে—জনসাধারণের উপযোগী করে এ জিনিসটার উৎপাদন রাষ্ট্রের নির্দেশে না হলেও, রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ও আশীর্বাদে। স্কুলে, কলেজে, সিনেমায়, বই-এর বাজারে পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র আজ এই গণ-সংস্কৃতি গদীনশীন। এর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকে চিনে নিতে হলে যে রুচি ও মনস্বিতার প্রয়োজন, যে বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন, তার উপযোগী আবহাওয়া আজ দুর্লভ।

চিন্তার কথা এই যে আজকাল অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা, ও মোটামুটি শিক্ষার বহুল প্রসার, শতলক্ষ বই-এর বিক্রি ও শতসহস্র ডিগ্রিধারী যুবক-যুবতীর কথা ভেবে একটা সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান: এতদিনকার গণ্ডীবদ্ধ সংস্কৃতি এখন আপামর জনসাধারণের আয়ত্ত, সংস্কৃতির আজ পরম সুদিন।

কিন্তু সাধারণ অর্থে উন্নতি ও আমাদের অর্থে সংস্কৃতি এক কথা নয়, এবং দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ নির্ণয় করা মুশকিল। কাজেই যদি ক্লাইভ বেল ও অপরাপর বহু পণ্ডিতের একমত হতে হয় যে সভ্যতার যে স্তরে পেরিক্লিসের অ্যাথেন্স উঠেছিল, অদ্যাবধি পৃথিবীর আর কোনো সমাজ সেখানে পৌঁছতে পারেনি, যদিও শক্তি, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের বিচারে এরা অনেকেই সে যুগ ও সেই সমাজকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে—তাহলে তথাকথিত উন্নতির সমস্ত লক্ষণ সত্ত্বেও নৈরাশ্যের কারণও আছে অনেক।

বিশেষ করে এই বিংশ শতকে। গত শতাব্দীতে য়ুরোপীয় জগতে পৃথিবীর মানুষের জন্য আশা ছিল অত্যুচ্চ। সেটা সাম্রাজ্যবাদী স্থিতি, সমৃদ্ধি ও সন্তুষ্টির যুগ, বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ, গণতন্ত্রের প্রসারের যুগ। কিন্তু এ শতকে, দুটি মহাযুদ্ধের পর, এবং গণতন্ত্রের পরাজয়ের অনেকগুলি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এ আশা আর সুলভ নয় যে উন্নতি অনিবার্য ও অবধারিত; ইতিহাসের ধারা স্বভাবতই অগ্রমুখী।

কোনো নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নতির সমীকরণ অবৈজ্ঞানিক। তবু এ নিয়ে বেশি মতান্তর নেই যে সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ হলো

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তাই প্রতিটি দেশেই, যেখানে গণতন্ত্রের অন্তত একটুখানি মৌখিক সমাদর আছে, সেখানে সংস্কৃতির সংজ্ঞা পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

প্রথমত, রাজনীতিকেরা যে জাতীয় সংস্কৃতির কথা বলেন, সেটা আমাদের অর্থে সংস্কৃতি নয়, সেটা নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অর্থে সংস্কৃতি। এই অর্থে আমরা সভ্যতা কথাটি ব্যবহার করেছি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর-সম্পর্কহীন নয়, কিন্তু সমার্থকও নয়। অসংস্কৃত ব্যক্তির চেতনায় সভ্যতার অস্তিত্ব নেই, সভ্যতার উপলব্ধির জন্য সংস্কৃতির প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে যাদুঘরে সভ্যতার কায়া, তার আত্মা প্রকৃষ্টজনের মনে, বিদগ্ধজনের চেতনায়। তাই যে দেশে বিদগ্ধ সমাজ নেই, প্রকৃত অর্থে তার সভ্যতাও নেই, কারণ সে সভ্যতার উপলব্ধি নেই।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি জন্মসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নয়, অর্জিত সম্পদ। কোনো বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পদ নয়। উপযুক্ত গুণ, মেধা ও চর্চার সমন্বয় যাঁর মধ্যে, তাঁরই আয়ত্ত।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী না হলেও, সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয়তাবোধের নির্মম শত্রু। রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধটা বাহ্য, আন্তরিক নয়, কারণ শুভবুদ্ধির উপর যে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা, তা সমালোচনার ভয়ে অযথা ত্রস্ত নয়; বরং সমালোচনার মূল্যে আস্থাশীল, অতএব শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ বন্ধু না হলেও, এদের সম্বন্ধে অন্তত শ্রদ্ধাশীল।

চতুর্থত, সংস্কৃতি সংগঠনে উৎসাহী নয়। এবং বর্তমান যুগের হুজুগ যে সব প্রতিষ্ঠানিক কৃষ্টি-কেন্দ্র, এদের প্রাথমিক আদর্শ যাই হোক, প্রায় অনিবার্য নিয়মেই এদের গণ্ডীতে কৃষ্টির ও প্রকৃষ্টজনের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। সুতরাং একটু তাকিয়ে দেখলে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-বৃদ্ধিকে কৃষ্টির বিস্তার বলে মনে করা অসমীচীন। প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা অধোগতির দিকে। এবং এই অধোগতির সঙ্গে বর্তমান যুগের ছাঁচে-ঢালাই য়ুনিফর্মিটির প্রতি মোহ অনেকখানি সম্পর্কিত। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ম যত সহজে চেনে, ব্যতিক্রম তত সহজে চেনে না, মাঝারিকে যতটা বোঝে, প্রতিভাকে তা নয়। তাই এদের প্রভাব যতই সর্বাত্মক হচ্ছে, ততই দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করার চেষ্টাও বেড়ে চলেছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের

ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে না। সংস্কৃতির বিচারে এরা মৃত, কারণ এরা সৃষ্টিধর্মী নয়।

এবং সবশেষে সমাজের প্রতি বিদগ্ধ-শ্রেণীর দায়িত্ব। আগেই বলেছি যে, সংস্কৃতির ধর্মই হলো ব্যক্তিগত সত্যবোধকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। এবং আমাদের বিদগ্ধজন এই একটি ক্ষেত্রে কোন আপোস করেন না। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের প্রতি আনুগত্যে যেহেতু তিনি অবিচলিত, এবং এ-দুটি আদর্শকে কোনো কোনো সমাজ কোনো কোনো সময় ভুললেও কোনো সমাজই চিরকালের জন্য বর্জন করে না, সুতরাং শেষ বিচারে এঁরাই সমাজের প্রতি সর্বোচ্চ দায়িত্বের পরিচয় দেন। এঁদের শ্রেণীগত দুর্বলতা হলো এই যে সমাজ-সেবক ও খাদেমে কওমদের দলে কখনোই, বোধ হয় আলস্যবশতই, নাম লেখান না। *

* রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

অরুণা হালদার

পরদিন ১৩ই জানুয়ারি (১৯৬২), আমার লেনিনগ্রাদ যাবার কথা। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ে বসতেই শ্রীযুক্তা বীকভা এলেন, তাঁর চালনায় নিচে গিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে এলাম। শ্রীতীমকিয়েফ মহাশয়ও ততক্ষণে এসে গেলেন। আমরা ৯॥০ টায় তৈরি হয়ে বেরুব। এসব হোটেলে টিপ্‌স বা বখশিস্ দেবার নিয়ম আছে কিনা জানি না। সহসা দিতে ভরসাও হয় না—পাছে মানুষকে অপমান করে ফেলি কোথাও। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—"কেউ কেউ দেয়, কেউ কেউ নেয়।" নানা কথা ভেবে আমি শেষ পর্যন্ত আমার পুঁজি বার করলাম—গিরিশের 'কড়াপাক', বেশ ম্যাগনাম সাইজের। তাতে করে আমার ভাগে কম পড়লেও যেরূপ আনন্দকর পরিবেশের তখন সৃষ্টি হলো যে, তা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। ভাবলাম যারা এটম বোমা বানায়, তারা তা বানাক ; আমরা না হয় সন্দেশই বানাব। তাতে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়। জিনিসপত্রের সঙ্গে কিন্তু লক্ষ্য করলাম, প্লেনের প্রেসারেই সম্ভবত, আমার দিল্লীতে ১০ তারিখে কেনা বড়ো একটা ঔষধের বোতল কোথাও ফেটে গিয়ে ওষুধ ধীরে ধীরে বার হয়ে যাচ্ছে। এ ওষুধ বিদেশে দুর্লভ। তবুও ক্ষুণ্ণ মনে তা ফেলে আসতে হলো। পরে দেখেছি কিছু ক্রীমের বোতলও ঐরূপ কোনো কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমার সঙ্গে ৭৫৲ টাকার ভারতীয় নোট ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থাও আমার লাভ হয় নি। এজন্য এখানকার কর্তৃপক্ষ আমায় ৫০ রুবল অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করলেন তখনই।

যাত্রার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই যথারীতি আবার হোটেলের ভেস্টিব্যুলে গেলাম। সেখান থেকে পাশের ঘরে গিয়ে আমার পাসপোর্ট ইত্যাদি ছাড়িয়ে নিতে হলো। ফিরে এসে কোট পরিধান করে জিনিসপত্র সমেত ট্যাক্সিতে উঠলাম। এবার দিনের আলোতে মোটর ছুটল মস্কো এয়ারপোর্টের দিকে। মস্কোতে দুটি এয়ার স্টেশন আছে—একটি আন্তর্জাতিক এয়ারস্টেশন ; অন্যটি

আভ্যন্তরীণ—সোভিয়েত দেশের আভ্যন্তরীণ স্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য। তুই পৃথক এলেকায় তুই স্টেশন। পথ দীর্ঘ। তুপাশে সারি সারি বার্চ গাছ। অবশ্য কোনো গাছেই এখন পাতার বালাই নেই। গাছের বিবর্ণ গুড়িগুলি প্রোথিত রয়েছে কেবল সাদা ঘনস্তূপ বরফের তরঙ্গে। রাশি রাশি মেঘের সমুদ্র যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। শুনলাম বরফ এ দেশের লোক এতো ভালোবাসে যে বিদেশে গিয়েও তার মায়া কাটাতে পারে না। দেখতে দেখতে যাচ্ছি—ঘরের ছাদে, জানালার কার্নিসে, গাছের ডালে, সর্বত্র বরফ জমা। মস্কো নগরী ছাড়িয়ে যত উপকণ্ঠের দিকে এগুতে লাগলাম গ্রামীণ জীবনের আভাস ততই কিছুটা পেতে লাগলাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি বরফের মধ্যে যেন মাথা গুঁজে আছে। তার পায়ে বরফ, গায়ে বরফ, মাথায় বরফ—চতুষ্পার্শ্বে তাই।

এয়ারপোর্টে যখন পৌছুলাম তখন আমার প্লেন ছাড়তে মাত্র তু-মিনিট বাকি। তার মধ্যে আর আমার জিনিসপত্র তোলা সম্ভব নয়। অতএব, তীরে এসে তরী ডুবল। সাড়ে দশটার প্লেনে যাওয়া হলো না। পরের প্লেন দেড়টাতে। তাতেই যাবার ব্যবস্থা হলো। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সময়-জ্ঞান নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগলাম। দেশে সর্বদাই আমার স্বামীর কাছে আমার লটবহর নিয়ে চলার জন্য ও অনেকখানি সময় হাতে না নিয়ে বেরুবার জন্য আমি বহুবার বকুনি খেয়েছি। এবার কিন্তু বকুনিটা (অনুচ্চারিত হলেও) আমার একার প্রাপ্য নয়। আপাতত ইন্‌টুরিস্ট ঘরে এসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইন্‌টুরিস্ট হচ্ছে সোভিয়েত দেশের মধ্যে ভ্রমণ ব্যবস্থার সংস্থা, হোটেলে, স্টেশনে সর্বত্র তার শাখা আছে। অবশেষে আবার প্লেন এলো, যে বড়ো বিমানে এদেশে এসেছি এ প্লেন তার চেয়ে ছোট আকারের। তবে এও জেট। সে প্লেনে জিনিসপত্র চড়ানো হলো। এখানে অত বেশি কড়াকড়ি নেই; তাই শ্রীযুক্ত তীমফিয়েফ ও বীকভা প্লেনের একেবারে কাছে এলেন। প্লেনে ওঠার আগে বরফে পা পিছলে বেশ ভালোভাবে আছাড় খেতে খেতে আমি সামলে নিলাম। আঘাত পেলাম না বটে, কিন্তু নিজের তখন মনের ব্যথাটা দেহের ব্যথার থেকে কম নয়—শাড়িটায় বেশ কাদা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পুরনো ভয়ও জাগল। এইতো বিমান, সেই আবার মাথা ঘুরবে, নিঃশ্বাস নিতে পারব না। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে প্লেনে উঠলাম। প্লেনও ছাড়ল। এবারও প্লেনে কান ব্যথা করতে লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত আর অতটা কষ্ট হলো না। প্লেনে লোক কম। এ প্লেনও যথেষ্ট ওপরে

ওঠে। ঘণ্টাখানেক পথ অতিক্রম করে তিনটা নাগাদ লেনিনগ্রাদে এয়ার-স্টেশনে এসে পৌছলাম।

লেনিনগ্রাদে মস্কো থেকেই বীকভা যে তার পাঠিয়েছিলেন সেই তার অনুসারে যাঁরা আমায় নিতে আসার কথা তাঁরা আগের প্লেনটিতেই আমার খোঁজ করবেন। সুতরাং মস্কো থেকে আবার একবার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করা হয়েছে। বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার জন্য প্লেন লেনিনগ্রাদের এয়ারপোর্টে নামতেও দেরি করল। প্রায়ান্ধকার বিষণ্ণ ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে প্লেন অবশেষে নামল লেনিনগ্রাদে। এবার আমার মনে হলো যদি কেউ না এসে থাকেন, বা এসে ফিরে গিয়ে থাকেন, তবে কি করা যাবে? ভাষা জানি না। ইংরাজী তো লোকে মোটেই বোঝে না। অগত্যা "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে" মনে করে জিনিসপত্র স্বদ্ধ নামবার উপক্রম করছি, এমন সময় শুনতে পেলাম "নমস্তে জী"। একটি দীর্ঘাকার যুবক এগিয়ে এলেন সহাস্য মুখে; তাঁর কণ্ঠে আমার দেশী ভাষায় ঐ অভিবাদন শুনতে পেলাম—প্লেনের ভিতরেই। তাঁর নাম পেচাংকো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এলেন আমাদের পূর্ব পরিচিতা শ্রীযুক্তা ভেরা আলেকসান্দ্রোভনায়া, নভিকভা। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে দেবার দরকার নেই। আমার স্বামী ও আমার তিনি পূর্ব পরিচিতা, ভারতে তিনি কয়েকবারই গিয়েছেন। আমার স্বামী তাঁকেও আমার শীতবস্ত্রাদির ন্যূনতার আশংকা করে পত্র দিয়েছিলেন। ফলে তিনিও কোট এনেছিলেন। এখানে গহনাপত্রের মতো কোটই লোকের প্রধান সম্পত্তি। নভিকভার সেই কোট আমার নতুন কোট না কেনা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। শ্রীযুক্ত পেচাংকো মারাঠী জানেন; মারাঠা ইতিহাস তাঁর অধ্যাপনার বিষয়। শিষ্টাচার শেষ হলে জানলাম যে শ্রীযুক্ত পেচাংকো লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক ডীন (প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের)। শ্রীযুক্তা নভিকভা উক্ত বিভাগের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষা। তিনি এখানকার বাংলা ভাষার বিশারদও। এই দু জনকে দেখে ও দেশের ভাষায় কথা কইতে ও শুনতে পেয়ে আর আমার অসুবিধা বা অপরিচয়ের কথা বিশেষ মনে হলো না। এরপর আবার সেই কাস্টমস্ ও অন্যান্য পর্ব শেষ করে মালপত্র স্বদ্ধ ট্যাক্সিতে ওঠা গেল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নেভা নদীর আঁকে বাঁকে ছড়ানো দ্বীপগুলির উপর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঝীরভস্কি প্রোস্পেক্টে আমার জন্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে এসে পৌছলাম।

লেনিনগ্রাদও দেখলাম মস্কোর মতোই তুষারে সমাচ্ছন্ন। উপরন্তু প্রথম দর্শনেই বুঝলাম সে অশ্রুমতী এবং বায়ুরোগগ্রস্তা। শুনলাম তার কারণ, নেভা নদীর মোহনা কাছাকাছি, তা ফিনল্যাণ্ড সাগরে পড়েছে। সুতরাং সমুদ্র মোহনার সুবিধা আর অসুবিধা দুই-ই তার আছে। সে শহর আবার আর্কটিক অঞ্চলেরও বেশ কাছে। সমস্ত রাস্তাটায় ভিজে ভিজে বাদলা হাওয়া যেন সর্বাঙ্গ জড়িয়ে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠতে লাগল। লেনিনগ্রাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা উৎফুল্ল হবার মতো নয়। এমন সীসামোড়া আকাশ দেখেই আমার মন-মাথা খারাপ হয়ে যায়। ভারতে আমাদের অনেক কিছু নেই, তা জানি; কিন্তু যা আছে সেই অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণের সোনা-ঢালা আলোর কি তুলনা হয়? সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি, শীতের প্রকোপ সকল কিছুতেই সেই সূর্যালোক আমাদের আশ্রয়। সেই সূর্য এখানে দুর্লভদর্শন। অনেক রাস্তাঘাট পেরিয়ে শেষে আমার আস্তানায় গাড়ি এসে দাঁড়াল। লেনিনগ্রাদ খানিকটা দেখতে পেলাম পথেই। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সামান্য রূপ তুলনা করতে হলো—তা না করলে লেনিনগ্রাদিস্টরা আপনাকে নিষ্কৃতি দেবে না। মস্কো এখন প্রধান নগরী, কিন্তু লেনিনগ্রাদ রুশ সংস্কৃতির গৌরব। আমিও দেখলাম—মস্কো মহানগরী, সুবিশাল—ষাট লাখ লোকের শহর। লেনিনগ্রাদে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস, সে সুন্দরী বরাঙ্গিনী, সুচারুগঠনা। ২৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম পিওৎর (পিটর দি গ্রেট্) নেভার মোহনায় এ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চাইছিলেন সমুদ্রযাত্রার পথ, দেশের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পশ্চিমাভিমুখে। তারপর থেকে জারদের আমলে এ শহর ছিল রুশিয়ার রাজধানী। পিওৎরের নামেই তার নাম হয়েছিল সেণ্ট্ পিটর্সবুর্গ। প্রাসাদে অট্টালিকায়, জাঁক-জমকে, সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বিলাসে—শিল্পে সংস্কৃতিতেও—পিটর্সবুর্গ ভরে ওঠে। আবার অক্টোবর বিপ্লবেরও তা স্মৃতিকাগার। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সহস্র দিবসব্যাপী অনমনীয় সংকল্পের তা অপরাজেয় তীর্থক্ষেত্র। যাক্, আমাকে এ শহরে থাকতে হবে, দু' বছর বসে তার পরিচয় গ্রহণ করতে পারব—এখন শুধু দেখছি তার বহিঃসজ্জা।

বাড়ির দুয়ারে ট্যাক্সি থামল। মানতে হবে রাস্তাটি প্রশস্ত, তার চেয়েও বেশি বাসোপযোগী উদ্যানে-আলয়ে সুরম্য। জিনিসপত্র কী করে নামাব ভাবছি। শ্রীযুক্ত পেচাংকোই (আমাদের সহকারী ডীন) তৎপরতার সঙ্গে তা নামিয়ে লিফ্‌ট-এ তুলে ফেললেন। তারপর একে-একে তা আমার নির্দিষ্ট

কামরায় পৌঁছে দিলেন। দেশে এরূপ পরিস্থিতিতে আগে পড়ি নি, সুতরাং তুলনা করার সুযোগ নেই। তবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এই যে, এখানকার মানুষ কোনো রকম কাজকেই নিচু কাজ মনে করে না, বা তাতে মানহানির তোয়াক্কা রাখে না। শ্রীযুক্ত পেচাংকোকে মুখে ও মন থেকেও ধন্যবাদ জানালাম। তাঁদের সঙ্গে এবার আমার বাসস্থানে গৃহাভ্যন্তরে পা বাড়ালাম।

একটি বৃহৎ ফ্ল্যাটকে দুইভাগ করা হয়েছে। এক অংশে একজন দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপিকা থাকেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্তা আদিলক্ষ্মী।* তিনি এখানে গত চার বৎসর আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তামিল ও তেলেগু ভাষার অধ্যাপিকা। তিনিও আছেন একা—স্বামী মাদ্রাজে বেতার পত্রিকা 'বাণীতে' ভাল কাজ করেন। প্রথম এসেই এই মহিলাটির কাছে আমি নূতনত্বের ধাক্কা কাটিয়ে অনেকখানি সহায়তাও পেলাম। চার বৎসরে তিনি এখানে সংসারপত্র গুছিয়ে বসেছেন—আমি একেবারে অথৈ আগন্তুক। কিছুক্ষণ পরে আদিলক্ষ্মী নিজের ঘর থেকে বাইরে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। দেখলাম চার বৎসরে তিনি রুশ ভাষাটা সুন্দররূপে আয়ত্ত করেছেন। তিনি সকলকার চায়ের ব্যবস্থা করলেন। আরো খানিকটা পরে অপর সকলে বিদায় নিলেন। ঠিক হলো ১৫ তারিখে সোমবার আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিতে হবে। এজন্য শ্রীযুক্ত পেচাংকো সেদিন সাড়ে নয়টায় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আর ১৪ তারিখ রবিবার শ্রীযুক্তা নভিকভার কাছে আমার ও আদিলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ রইল দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্নে।

আমিও সেদিনের মতো শ্রীযুক্তা আদিলক্ষ্মীর আতিথ্য গ্রহণ করে তৃপ্তি পেলাম। দশই জানুয়ারির পর থেকে খাদ্য যা গ্রহণ করছি, সে সকল খাদ্য আমার অনভ্যস্ত। এই প্রথম ভাত তরকারী বোতলে-রক্ষিত সীম, এবং সম্বর জাতীয় টক দাল খেতে পাওয়া গেল। তাঁকেও ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর কাছেই শুনলাম—পরদিন রবিবার একজন বাঙালী ডাক্তার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। লেনিনগ্রাদেও বাঙালী কাউকে দেখব, একথা তখনো কল্পনা করতে পারি নি।

সেদিনটা সামান্য গোছগাছ করে বিশ্রাম করব। আমার দু'খানি ঘরের ছোটটি শয়নকক্ষ; অন্যটি রীতিমত বড়, তা বসবার, কাজ করবার ও খাবার

* ইনি গত ৩০শে জুলাই (১৯৬২) লেনিনগ্রাদেই অকালে মারা গিয়েছেন। সম্পাদক

ঘর। রান্নাঘর ও স্নানঘর শ্রীযুক্ত আদিলক্ষ্মীর সঙ্গে একত্রিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া গ্যাসের চুলা, টেলিফোন, রেডিও, আসবাবপত্র, সবই আছে। আজ আর বেলা নেই, কালও কাজ নেই। তাই শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম সহজে এল না। প্রথমত নূতন জায়গা, দ্বিতীয়ত এই স্থানে আমাকে থাকতে হবে দু'টি বৎসর ;—এরূপ নানা মিশ্রিত চিন্তা আমার মনকে আলোড়িত করতে লাগল।

পরের দিন ডাক্তার মুখার্জি এলেন। এঁরা কলকাতার লোক। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ইনি আই-এম-এস্ ডাক্তার। ভারতসরকার তাঁকে এদেশে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশেষ শিক্ষার বিষয় হল—অত্যুচ্চগামী বিমানে যাত্রীদের দৈহিক ক্রিয়া, বিশেষ করে হার্ট ও হায়ার নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়ার কখন, কি ভাবে ও কতভাবে পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধান করা। সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে আমাদের সরকার কিছু জেট বিমান খরিদ করছেন। এসব জেট্‌বিমান মেঘলোকের দূরতম উচ্চতায় আরোহণ করে, তাই ওসব শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধেয়। সেই সূত্রেই ডক্টর মুখার্জিকেও এদেশে পাঠানো হয়েছে। বিদেশে প্রথমেই এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী বাঙালী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বড়ো ভালো লাগল। মাস তিনেক তিনি এসেছেন— আরও প্রায় দেড়মাস লেনিনগ্রাদে থাকবেন। প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমাদের বাসায় দেখা করতে আসতেন। আমারও তাঁকে মনে হতো একটি স্নেহভাজন আত্মীয়। মানুষটি ডাক্তার। কিন্তু পড়াশুনো নানা দিকে, কাজেই আলাপ-আলোচনায় মার্জিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত সর্বদাই। আরও পাওয়া যেত সরস কৌতুকের অনুভূতি। এই হিউমার বা কৌতুকবোধ খুব বেশী লোকের থাকে না। মার্জিত বুদ্ধির ও সরস হৃদয়ের একটা সমন্বয় শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তা বাঙালী চরিত্রের একটা অনুশীলনীয় গুণ। অথবা বলব, তা নিয়েই বাঙালী চরিত্র। ডাক্তার মুখার্জি অন্তত এরূপ একজন বাঙালী।

পূর্ব দিনেই শ্রীযুক্তা নভিকভা শুনেছিলেন ডাঃ মুখার্জির কথা। তিনি বাঙালী আর নভিকভা বাঙলার অধ্যাপিকা। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের জানিয়ে যান—আমাদের সঙ্গে সেদিন ডক্টর মুখার্জিও তাঁর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলে তিনি সুখী হবেন। ডক্টর মুখার্জিকে তার সমাদরপূর্ণ নিমন্ত্রণের কথা জানানো হল। তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা তিন

ভারতীয় ডাল ভাত তরকারী খেয়ে রুশ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। একটা আশ্চর্য যোগাযোগ—ডাক্তার মুখার্জি, আদিলক্ষ্মী ও আমি তিনজনেই নিরামিষাশী—বাঙালী হয়ে, ডাক্তার হয়েও যুবক মুখার্জির এমন মতিগতি! এই কারণেই আমাদের আলাপ-আলোচনা আরও বেশি জমল। রবিবার দুপুরে একত্র বসে খিচুড়ী কিংবা নিরামিষ ঝোল ভাত খেতে খেতে আনন্দকর একটা আত্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠল। ছুটির দিনটা ছুটির মতো করেই সকলে উদ্‌যাপন করতে লাগলাম।

অপরাহ্ণে বাসে করে আমরা চললাম শ্রীযুক্তা নভিকভার গৃহে। শহরের এটি নূতন অঞ্চল—অনেক সাত-আট তলা বাড়ি উঠছে। তারই একটি বাড়িতে নিচের তলায় ছোট সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট। তবে আধুনিক ব্যবস্থা সবই তাতে আছে—অবশ্য টেলিফোন ও কেন্দ্রিক তাপের আয়োজন এই মহলে এখনো হয়ে ওঠে নি। স্বামী (নভিকভ্) ও একটি ছেলে (মিরোঝা) নিয়ে ভেরা আলেক্‌-সেন্দ্রিয়োভনায়ার সংসার। আলমারি-ভরতি বাঙালা বই-এর রাশি মনকে চমৎকৃত করে তুলল। জানালায় আছে একটি ক্যাক্‌টাসের টব ও লেবু গাছ। সিরোঝা ছেলেটি প্রিয়দর্শন—দেখতে পিতা নিকোলাস নভিকভের মতো। শ্রীযুক্ত নভিকভ ফোক্‌লোরিষ্ট, লোককথাবিদ্; তিনি রুশ সাহিত্যের ইন্‌ষ্টিটিউটের ঐ বিভাগের গবেষক। এঁদের ফ্ল্যাটেও তিনখানি ঘর—সাধারণত এত ঘরের ফ্ল্যাট্ এদেশে কারও কপালে জোটে না। এঁদের বইপত্র শুদ্ধ ফ্ল্যাটখানি তবু বড়ো কিছু নয়। তবে স্বচ্ছল গৃহকর্ত্রীর সযত্ন ও নিপুণ হস্তস্পর্শের আভাস তাতে পাওয়া গেল। ছেলেটি ডাক-টিকেটের ভক্ত, ইংরেজীও একটু-একটু বলতে পারে। শ্রীযুক্ত নভিকভ্ ইংরেজী জানেন না। আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় যা হল তা তাই হল ভেরা নভিকভার ও আদিলক্ষ্মীর মাধ্যমে।

তারপর আহারের পালা। আমাদের জন্য বিশেষ করে নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্মিতানা সহযোগে আলুর চপ তার একটি বিশেষ উপকরণ। এ ছাড়া, ছানার পুর দিয়ে পাটিসাপ্‌টার মতো একটা বিশেষ পদও নভিকভা রন্ধন করেছেন। প্লাম বা আড়ুবোখরার চাট্‌নিও ছিল। আর শেষে এল সেই লিমন, চা-কেক এবং ফল। দেখছি ভোজন এদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে, দফায় দফায় হয়। আহারান্তেও কিছুক্ষণ গল্প চলল। ফিরবার জন্য ট্যাক্সি কিন্তু পাওয়া গেল না। রবিবারের সন্ধ্যা, বাসে ট্রামে ভয়ানক ভিড়। ট্যাক্সির অভাবে শেষ পর্যন্ত একটি বাসেই আমাদের গৃহস্থরা উঠিয়ে দিয়ে

গেলেন। তাঁদের 'দোঃসিদানিয়া' শুনতে শুনতে বাস ছাড়ল। কিন্তু সমস্ত রাস্তাটা আমরা দুই ভারত-কন্যা সহযাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে চললাম।

রুশীয়রা কন্টিনেণ্টা পিপ্‌ল্‌—দ্বীপবাসী ইংরেজের মতো চুপচাপ নয়। ঢিলেঢালা প্রকৃতি, অজস্র কথা বলা তাদের অভ্যাস। সুতরাং কাছাকাছি সমস্ত আসন থেকেই প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল—বিশেষত আমার কপালে আদিলক্ষ্মীর মতো কুস্‌কুমের ফোটা নেই কেন? অতএব, আমি পাকিস্তানী কিনা। বাঙলা দেশের নিয়মানুযায়ী সিঁথিতে সিঁন্দুর পরতে হয়, মাথার আবরণ সরিয়ে তাদের তা দেখাতে হলো। বাঙলা ও মাদ্রাজ দুটো ভিন্ন রাজ্য, একথা আদিলক্ষ্মী তাদের বোঝালেন। তারপর আমরা কে, কেন এসেছি, কোথা থাকি, এ সব প্রশ্ন। অবশেষে তাঁরাও নিজেদের পরিচয় দিলেন—তাঁরা একদল ইঞ্জিনীয়ার। আমি অবশ্য আদিলক্ষ্মীর সহায়তাতে এসব শুনছিলাম। আমরা নিজেদের পাড়ায় এসে গিয়েছি। তাঁরা জানালেন—ভারতবর্ষকে তাঁরা ভালোবাসেন আর ভালোবাসেন নেহরুকেও। একথা সত্য, তার প্রমাণ অন্যত্রও দেখেছি। তবু এই জানা কথাটাও কানে বেশ ভালো লাগল এখন। ভাবলাম আমার দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা আমাকেও আত্মীয় রূপেই চান।

যাত্রার পালা শেষ করে কাল থেকে কাজের পালা যখন শুরু হবে তখন দু' বৎসরের মতো এই বিদেশে এই বোধটুকু হবে আমার প্রধান সম্বল।

সাম্প্রতিককালে দর্শনের দুই শিবিরের সংগ্রামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

বি. বীখোভ্স্কি

সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি নূতন অধ্যায়ে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার এবং সমগ্র চিন্তা-জগতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধ নবরূপ ধারণ করে। শুধু যে এই বিরোধের লক্ষ্যই বদলে যায় তাই নয়, পদ্ধতি ও কৌশলেরও বদল হয়। একশ বছর আগে মার্কসীয় দর্শনের অস্তিত্বের প্রথম যুগে এর বিরোধীরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সম্পূর্ণ অবহেলা করত, নীরবতার অস্ত্রে বস্তুবাদের এই সর্বোচ্চ রূপের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করত। লড়াইয়ের এই পদ্ধতি গ্রহণের কারণ যে কেবল বৈপ্লবিক দর্শনের প্রতি মনোযোগ না দেবার চেষ্টা তা নয়; শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দর্শনের সাথে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতাও তার অন্যতম কারণ।

সাধারণভাবে কিছুদিন আগে পর্যন্তও পুঁজিবাদী জগতের অধিকাংশ সমাজ-স্বীকৃত (academic) দার্শনিকের জ্ঞান-পরিধির বাইরে ছিল মার্কসীয় বস্তুবাদের অবস্থিতি। সেখানে ছাত্ররা মূলত পরিচিত হতো বহু শতাব্দী পূর্বের দর্শন-গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে; তারা মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বসমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব অনায়াসে দিতে পারত—যে সব প্রশ্নের কোনো তাৎপর্যই আজ নেই। কিন্তু তাদের কাছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ উপস্থাপিত করা হতো এমন ভাবে, যেন তা কোনো আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন দার্শনিকের মনোযোগের অযোগ্য বিষয়। উদাহরণস্বরূপ ফরাসী অস্তিত্ববাদীদের প্রধান জঁ পল সার্ত্রের স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "১৯২৫ সালে আমার বয়স যখন কুড়ি বছর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস্‌বাদ পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সাম্যবাদী ছাত্রদের সাবধান করে দেওয়া হতো, তারা যেন আলোচনার মধ্যে মার্কস্‌বাদের প্রসঙ্গ না তোলে, এমন কি তার উল্লেখটুকুও যেন না করে, কারণ তা করলে তা পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পাবে না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্পর্কেই এমন

ভীতি ছিল যে আমাদের হেগেলীয় দর্শনও ঠিকমতো পড়ানো হতো না।... হেগেলীয় ঐতিহ্য, মার্কস্‌বাদী শিক্ষক এবং চিন্তার কোনো কর্মসূচী ও হাতিয়ারের অভাবে আমাদের কালের ছাত্ররা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত হতে পারত না—আমাদের আগের যুগেও ছিল একই অবস্থা, পরের যুগেও অন্যতর কিছু হয় নি।" প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি এই অবস্থা হয়, তবে মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি অবস্থা ছিল সহজেই অনুমান করা যায়।

বুর্জোয়া আদর্শের ধারকগণ তরুণ সমাজের উৎসুক সন্ধানী বুদ্ধিকে বর্তমান যুগের সর্বাগ্রসর দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু মার্কস্‌বাদ নব নব গৌরব অর্জন করতে থাকল। সরকারী পুঁথিবাগীশ দার্শনিকদের নীরবতার চক্রান্ত সত্ত্বেও এই দর্শন লোকচিত্তে স্থান লাভ করে সমাজচেতনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হলো।

মার্কস্‌বাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নীরবতার স্থান গ্রহণ করল গভীর বিচারের অনুপযোগী একটা 'বৈচিত্র্যহীন ও আদিম দর্শন' হিসাবে এর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য-সূচক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ। সমালোচনা-মূলক বিশ্লেষণের বদলে পাওয়া গেল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য এবং স্পর্ধিত ও উন্নাসিক নিন্দাবাণী। তর্কের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে যান্ত্রিক বা স্থূল (vulgar) বস্তুবাদের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করার কৌশল নেওয়া হলো। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই 'সমালোচকদের' কেউই বিষয়টাকে অধ্যয়ন বা উপলব্ধি করার কষ্টটুকুও স্বীকার করেননি; অবশ্য এই জাতের 'সমালোচকরা' পার পেয়েছেন তাদেরই মধ্যে, প্রকৃত মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে যাদের ধারণা ছিল না।

গত দশ-পনের বছরে অবস্থার পরিমাণগত ও গুণগত বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে ভাববাদের সংগ্রাম নূতন স্তরে উপনীত হয়েছে, তার প্রকৃতিতেও দেখা দিয়েছে নূতনত্ব। শেষ হয়েছে নীরবতা ও তাচ্ছিল্যের ষড়যন্ত্রের পালা। আমাদের পরাদর্শগত শত্রুরা নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করেছেন। মার্কস্‌বাদী দর্শন সংক্রান্ত গভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিস্তারিত সমালোচনা বহুক্ষেত্রে সমকালীন ভাববাদী দার্শনিকদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিপুল অংশ অধিকার করেছে।

ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে তীব্র, নিরবচ্ছিন্ন এবং অক্লান্ত সংগ্রাম চলেছে, এমনটা আর কখনো দেখা যায় নি। দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বিগত দশকে যত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে এবং যত বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, মার্কস্‌বাদের আগের একশ বছরের ইতিহাসে তা হয় নি বললে ভুল করা হয় না। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। গত দশ বছরে মার্কস্‌বাদী বিশ্বদৃষ্টি মানবসমাজকে যতটা প্রভাবান্বিত করেছে, এমনটা আগে কখনো হয় নি। সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমাগতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সামাজিক আর্থনীতিক সাফল্য এবং সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কীর্তির কথা সর্বস্বীকৃত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যার দার্শনিক ভিত্তি ঐতিহাসিক সৃজনক্ষেত্রে সেই মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টির সাহায্যে পরিচালিত জাতিসমূহই এই সকল কীর্তির অধিকারী হয়েছে। মার্কস্‌বাদ আজ. বুর্জোয়া ভাববাদীদের কাছে এমন ভয়ংকর ও সুস্পষ্ট বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে যে তাকে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বুর্জোয়া মতবাদের ধারকবৃন্দের সমগ্র শক্তি ও তাঁদের যুক্তিবিদ্যার সমস্ত অস্ত্র কাজে লাগানো হয়েছে।

মার্কিন 'বস্তুবাদী' রিয়ালিস্ট জন ওয়াইল্ড তাঁর কোনো বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন: "সর্বোপরি আমরা যে শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভাবাদর্শগত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তা কেবল বাস্তব অস্ত্রেই নয়, মতবাদের অস্ত্রেও সুসজ্জিত। সেগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন আইডিয়ার স্তূপমাত্র নয়। তারা একটা দার্শনিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও একটা সম্পূর্ণের মধ্যে সন্নদ্ধ—তার সুপরিচিত নাম হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। তা সমকালীন চিন্তাধারার গভীর উৎসসম্ভূত মহান বিশ্বদর্শন সমূহের অন্যতম।"

"সমসাময়িক পৃথিবীতে মার্কস্‌বাদের প্রভাব এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে এই দর্শন উপলব্ধি ও আয়ত্তীকরণের চেষ্টার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন।"—একটি প্রভাবশালী ইংরেজি দর্শন-পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও অধ্যাপক অ্যাকটন-এর মার্কস্‌বাদ-বিরোধী পুস্তকের গোড়াতেই এই কথাগুলো রয়েছে। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্সটিটিউট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার বিভাগীয় রিপোর্ট-রচয়িতারা ঘোষণা করেছেন: "সাম্যবাদীদের প্রকৃত গোপন অস্ত্র হলো মার্কসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই ঐতিহ্যের সহায়তায় তাদের চোখে এমন সব তথ্য ধরা পড়ে, যা পশ্চিমী. শ্রমিকদের চোখ এড়িয়ে যায়।"

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাররোধকল্পে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম-ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা বুর্জোয়াতন্ত্রের ধারকগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মার্কস্‌বাদ-বিরোধীদের

হাতে অস্ত্র জোগানোর জন্যই জেস্যুইট ও ডমিনিক ধর্মযাজকদের (ওয়েটার, বোখেন্‌স্কি) রচিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধী বৃহদায়তন গ্রন্থসমূহের আবির্ভাব। অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠ্য বিষয় হিসাবে এর প্রচলন হলো। সাম্যবাদ-বিরোধী বিশেষ ধরনের একটা বিশ্বকোষও রচিত হলো ১৯৫৮ সালে। মার্কস্‌বাদ-বিরোধী সমস্ত ধারার শক্তিকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলো বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যেখানে ক্যাথলিক উদ্দেশ্যবাদী (teleologist) ও সোস্যাল-ডেমোক্রাট-তত্ত্ববিশারদগণ মিলিত হয়ে "সাম্যবাদ উৎখাত" করার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় করলেন।

সমকালীন ভাববাদী দর্শনের মূল ধারাগুলির পরিচয় দান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আদর্শগত সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে বুর্জোয়া সমালোচনার কয়েকটা বিশেষ লক্ষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই এখানে করা হবে।

রণকৌশলের চূড়ান্ত পরিবর্তনে বুর্জোয়াপক্ষের ভাবাদর্শগত পুনরস্ত্রসজ্জা মোটেই সূচিত হয় না। ভাববাদীদের প্রাচীন দার্শনিক ধারণা-ভিত্তি অটুট রয়েছে; বস্তুবাদের প্রতি তাঁদের তীব্র ঘৃণাও দূর হয় নি। কৌশল, আক্রমণ পদ্ধতি, ছলাকলা এবং সমালোচনারীতির ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কস্‌বাদ-বিরোধী সংগ্রামে নবকৌশলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের প্রচারকদের কয়েকটি স্বীকৃতি এখানে উদ্ধৃত হলো।

আল্‌ফ্রেড মেইএর (Meyer) তাঁর 'মার্কিস্‌জম, ইউনিটি অফ থিয়োরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্‌' নামক গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন: "আমরা মার্কস্‌বাদকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা নিয়েই লিখেছি—এই ধারণা যাতে না হয় সেই জন্য জোর দিয়ে বলছি যে আমরা বরং মার্কস্‌বাদী বৈজ্ঞানিকদের রূপন-সৌষ্ঠব, মননের ঔজ্জ্বল্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রগাঢ় গুণমুগ্ধতা প্রকাশ করতে চাই।...তাঁদের ধারণাসমূহের ফলপ্রসূতা ও সজীবতা তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে প্রকাশিত।" এর পরের দুশো পৃষ্ঠা নিয়োজিত হয়েছে 'মার্কস্‌বাদ উচ্ছেদে'র কাজে।

মার্কস্‌বাদের সমালোচনায় নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য অকপটভাবে সুপরিচিত ক্যাথলিক দার্শনিক গুস্তাভ্‌ ওয়েটার ব্যক্ত করেছেন: "সাম্যবাদ-বিরোধিতায় খুব বেশি রঙ চড়িয়ে কেবল কালো ও সাদায় ভাগ করার বিপদ

রয়েছে, কারণ এতে বিরোধী পক্ষের এক ফোঁটা কৃতিত্বও স্বীকার করা হয় না; বরং তার কৃতিত্বের যেটুকু আছে তাকেও নাকচ করা হয়। এই বিরোধিতাকে অতিরঞ্জন বলে লোকে যতই বুঝতে পারে, ততই এর খণ্ডন যুক্তি সমূহে তাদের সন্দেহ জাগে এবং তারা আরো সহজে শত্রুপক্ষের সূক্ষ্মতর প্রচারে বিশ্বাস করতে থাকে।" অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় আপনি মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করাতে হলে তার সীমাটা জানা দরকার।

বর্তমান পর্যায়ে দর্শনের দুই শিবিরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ এই নূতন কৌশলটি সমকালীন বিভিন্ন ভাববাদী মহলে মার্কস্‌বাদের 'মর্মকোষজাত সমালোচনা' (immanent criticism) হিসাবে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর সারকথা হলো এই যে এতে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বাইরের থেকে পূর্ব গঠিত বস্তুবাদ-বিরোধী ধারণাসমূহের পাদপীঠ থেকে সমালোচনা করা হয় না, এমন ভাবে করা হয় যেন মার্কস্‌বাদের পাদপীঠ থেকেই করা হচ্ছে বলে মনে হয়। ফলের ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে ফেলার জন্যে পোকা-মাকড়ের যে কৌশল, এ হলো তাই। মার্কস্‌বাদ-বিরোধীরা বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রাথমিক সূত্রগুলি শর্তাধীনে স্বীকার করে নেন; উদ্দেশ্য হলো, সব রকম ব্যাসকূটের সাহায্যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে বস্তুবাদ-বিরোধী, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা। সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের উদ্ভাবনা, বিকৃতি, কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ও মার্কসীয় তত্ত্ববিরোধী অন্যান্য নীতির সাহায্যে এই জাতের অস্ত্রোপ্রচার করা হয়ে থাকে।

এ সবেরই লক্ষ্য হলো এই 'প্রমাণ' করা যে, মার্কসবাদ সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না, এর কোনো কোনো অংশের সঙ্গে অপরাপর অংশের অমিল রয়েছে, যুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে এর কোনো না কোনো অংশের সঙ্গে অপরাপর অংশের অমিল রয়েছে, যুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে এর কোনো না কোনো সূত্রের স্ব-বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার এ পর্যন্তও বলা হয় যে লেনিনবাদী উপলব্ধির সঙ্গে মার্কস্‌বাদের সামঞ্জস্য নেই, এঙ্গেল্‌স্‌-এর মত মার্কসের তত্ত্বকে খণ্ডন করে এবং মার্কস্‌ও তাঁর চিন্তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে স্ব-বিরোধিতা করেছেন ইত্যাদি।

আলংকারিক ভাবে বলতে গেলে এই নতুন কৌশলটা হলো এই যে মার্কস্‌বাদের সমালোচকেরা মার্কস্‌পন্থীদের সঙ্গে কয়েক পা একসাথে চলে তাদের সতর্কতা শিথিল করে দিয়ে মেরুদণ্ডে চোরা আঘাত হানার চেষ্টা করে।

প্রায়শই 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার প্রতিজ্ঞাগুলি (propositions) বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সূত্রাবলীর এমন ভাষ্যে রূপ লাভ করে যাতে সেগুলি প্রকৃত স্ব-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয় এবং তার পর প্রমাণ করা কঠিন হয় না যে বুর্জোয়া দর্শনের সনাতন সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মতো ভিত্তি মার্কসবাদীদের নেই।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত আক্রমণের ক্ষেত্রে এখন 'মর্মকোষজাত' সমালোচনারীতি সর্বাগ্রগণ্য। ডমিনিক দার্শনিক বোখেন্স্কির মতো হিংস্র সাম্যবাদ-বিরোধীও এর প্রশংসা করেছেন। কিছুদিন আগেও তিনি কঠোরভাবে ঘোষণা করেছিলেন: "ডায়ামেট (ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) শুধু ভ্রান্ত দর্শনই নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি—এটা পাপ বিশেষ।…খ্রীষ্টানদের পক্ষে এটাকে শুধু মূর্খতাপ্রসূত ও মিথ্যা নীতি হিসাবে দেখলেই চলবে না, তাদের মনে রাখতে হবে এ হলো শয়তানী জাদুবিদ্যা।" এখন সেই বোখেন্স্কিই অন্য ভাষায় কথা বলেছেন: "সাম্যবাদী দর্শনে নিঃসন্দেহে বহু সঠিক ধারণা রয়েছে…এমন কি যে সব বক্তব্যকে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় সেগুলির (বস্তুবাদ এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অধিকাংশ নীতি) মর্মমূলে সত্যের অস্তিত্ব আছে। এমন কথাও বলা যায় যে এর উপাদানীভূত অংশগুলির প্রায় প্রত্যেকটিরই পক্ষ সমর্থন করা যেতে পারে… ।" এই কথাগুলিতে নিজের বস্তুনিষ্ঠা ও শুভেচ্ছা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে ধরে নিয়ে বোখেন্স্কি এরপর আক্রমণে কোমর বেঁধেছেন। তাঁর পরের কথাটা হলো: "কিন্তু কোনো চিন্তাশীল মানুষই সাম্যবাদীদের কৃতকর্মের সমর্থন করতে পারেন না।"

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধী সংগ্রামে 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার পাশাপাশি আর একটা যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তা হলো ভাববাদীদের পক্ষ থেকে ভাববাদকে মুখোশ পরিয়ে ছদ্মবেশে সাজানোর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। আমাদের বিরোধী পক্ষকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে কিছুতেই বলা চলবে না যে সমসাময়িক দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বস্তুবাদের লড়াই চলেছে; তার সহজ কারণ হলো এই যে ভাববাদী দর্শনের অস্তিত্বই নেই। অন্তত বুর্জোয়া দর্শনের সাম্প্রতিক কোনো প্রধান ধারাই নিজেকে ভাববাদী বলে মনে করে না, কোনোটিই স্বীকার করে না যে তার তরফ থেকে দার্শনিক ভাববাদের পতাকাতলে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হচ্ছে। কোনো টমিস্ট

(Thomist), অস্তিত্ববাদী (Existentialist), নব্য-যথাস্থিতিবাদী (Neo-positivist), প্রয়োগবাদী (Pragmatist)—কেউই নিজেকে ভাববাদী-দর্শনের প্রতিনিধি বলে মনে করেন না। তাঁদের সকলেই নির্দ্বিধায় নিজেকে দার্শনিক ভাববাদের বিরুদ্ধপন্থী বলে ঘোষণা করতে প্রস্তুত ; এবং প্রায় সেই উপায়েই তাঁরা ভাববাদকে অপ্রমাণ করে থাকেন, যে উপায়ে অপ্রমাণ করেন বস্তুবাদকে।

দর্শন জগতে যা ঘটেছে, তা পুঁজিবাদের স্বপক্ষীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তারই সমধর্মী : পুঁজিবাদের সবচেয়ে উৎসাহী এবং অনমনীয় সমর্থকরাও আজ পুঁজিবাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করছে। কোনো এক অবোধগম্য উপায়ে পুঁজিবাদ 'জনায়ত্ত' হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথবা মোটামুটি অদৃশ্য ও বিকীর্ণ ও রূপান্তরিত হয়ে 'সাম্যবাদী মরীচিকায়' এবং সাম্যবাদীদের অসুস্থ কল্পনার 'শিকারে' পরিণত হয়েছে। একই ভাবে কোনো অবোধগম্য উপায়ে ভাববাদও অদৃশ্য হয়েছে, দর্শনের ক্ষেত্র থেকে। আসলে ব্যাপারটা যেন এই যে সাম্যবাদীরা আগের মতো এখনও দর্শনের দুই শিবিরের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আর অস্তিত্ববিহীন এমন এক দার্শনিক ভাববাদকে আক্রমণ করছে, যার পক্ষভুক্ত সমর্থক কেউই নেই।

ছদ্মবেশী এই দার্শনিক তামাসার মূল কথাটা কি ? এতে সর্বোপরি এটাই প্রমাণিত হয় যে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী নবতম চিন্তাধারার পাশে মর্যাদা হারিয়ে দার্শনিক ভাববাদ নতমুখ হয়েছে। ভাববাদের আর সেই আকর্ষণী চৌম্বক শক্তি নেই। ভাববাদের পতাকাতলে মানুষকে আর সমবেত করা যাচ্ছে না। তাই ভাববাদী বক্তব্যের উপর বৈচিত্র্যময় অভিনব লেবেল সাঁটা দরকার। দার্শনিক স্পষ্টতাকে বিলুপ্ত করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত চেষ্টা, দর্শনের সীমারেখাগুলোকে লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা এবং মূলগত যে সব দার্শনিক প্রশ্ন দর্শনের শক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, তা থেকে মনোযোগ অপসারণের চেষ্টা—বস্তুবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নূতন কৌশলের লক্ষণ হিসাবে এদের গ্রহণ করা যায়।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের সংগ্রামকে বাতিল এবং এই সব ঝোঁককে দার্শনিক কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করে আমাদের মতবিরোধীরা বস্তুবাদী বিশ্ব উপলব্ধিকে চোরা আঘাত হানতে চায়, এই দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী বিশ্বদৃষ্টির মধ্যের সীমারেখা মুছে ফেলতে চায়। দর্শনক্ষেত্রে যে কোনো তৃতীয় পন্থা

প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের ধারকদের পরোক্ষ কৌশল না হয়ে পারে না, এটা লড়াইয়ের অস্বীকৃতি নয় বরং বিপ্লবী ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দূরপ্রসারী কৌশল—লেনিনবাদী এই সূত্রটি বার বার প্রমাণিত হচ্ছে।

মার্কসবাদের বিবর্ধমান প্রভাব এবং সমসাময়িক ভাবাদর্শগত সংগ্রামে এর প্রাধান্যবৃদ্ধিতে ভাববাদীরা শুধু কৌশল বদল করতে বাধ্য হয়েছে তা নয়, ভাববাদী শিবিরেও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন-গুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা দরকার। এই প্রবন্ধে আমরা শুধু কয়েকটা লক্ষণসূচক ঘটনার সাধারণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। প্রথমেই চোখে পড়ে ভাববাদের মৌলিক নানা ধারার ক্রমাবনতি এবং মার্কসবাদের বিপক্ষে মানব-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সুসমঞ্জস বিকল্প কোনো ব্যাপক তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপনায় তার অক্ষমতা। সমস্যার বিচূর্ণীকরণ, মানসদিগন্তের সঙ্কীর্ণ সীমানা রচনা, জীবন ও ভাবনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গভীর বক্তব্য ও বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তের বদলে দর্শনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যাসকূট রচনার চাপল্য—বর্তমান যুগের ভাববাদী অবক্ষয়ের এগুলিই হলো সাধারণ লক্ষণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রয়োগবাদ এক সময়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল তার ভগ্নদশার মধ্যে, বিজ্ঞানের প্রতি কঠোর আনুগত্যের ভান ত্যাগ করে নব্য-যথাস্থিতিবাদীদের অগোপন ধর্মীয় উচ্চাশার মধ্যে, অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যময় প্রভাব হ্রাসের মধ্যে এবং যথাপ্রতিভাসবাদী সম্প্রদায়ে (Phenomenological school) ও আমেরিকার প্রকৃতিবাদী (Naturalism) মহলে পরস্পরবিরোধী মতবাদের তীব্র আভ্যন্তরীণ বিসম্বাদের মধ্যে সমকালীন ভাববাদী দর্শনের সকল সম্প্রদায়েরই অন্তঃসারশূন্যতা বিচিত্র রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করছে।

বস্তুবাদের সঙ্গে সংগ্রামে যতই পরাজিত হবে ততই ভাববাদের ভাঙন তীব্রতর হয়ে উঠবে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশসমূহের দর্শনক্ষেত্রে জীবনধর্মী যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা ভাববাদের তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত বন্ধ্যাত্ব উদ্‌ঘাটিত করে ধাপে ধাপে সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করবে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পথে অগ্রসর হবে। আমাদের দায়িত্ব এই ঘটনাক্রমকে সাহায্য করা—শুধু ভাববাদের সমালোচনা তীব্রতর করে তুললেই হবে না, পুঁজিবাদী জগতে যে সব দর্শন সম্প্রদায় পথ খুঁজে ফিরছে ও দ্বিধার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে হবে।

ভাববাদী বক্তব্যকে পরিশ্রুত করে মার্কসবাদের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা

দান্দ্বিক বস্তুবাদের 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার পরিপূরক। মার্কসবাদের ইতিহাসে দেখা যায় নি সম্পূর্ণ অভিনব এমন কিছুই 'মর্মকোষজাত' সমালোচনায় নেই। প্রকৃতপক্ষে এ হলো শোধনবাদীরা বহু পূর্বেই যে সব কৌশল সমূহের ব্যবহার করেছে, সেগুলিরই সম্প্রসারণ মাত্র। বস্তুত দার্শনিক শোধনবাদ—মার্কসীয় পন্থায় সক্রিয় ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণ ভাবে শোধনবাদ ও বিশেষ করে দার্শনিক শোধনবাদ প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের জয়েরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রথম দেখা দেয়। বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ হিসাবে হয় শোধনবাদের আবির্ভাব। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলসমূহে মার্কসবাদী চিন্তার বিজয়ের ফলে জটিলতর নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের বিরোধী-পক্ষের নিজেকে পুনর্গঠন করার ও তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টাটাই এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মতাদর্শের বিশেষ রূপ হিসাবে শোধনবাদের সার কথা হলো এই যে এতে মার্কসবাদী উপাদানের সাহায্যেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়। মার্কসপন্থী ও অন্ততপক্ষে মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মার্কসবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই হলো শোধনবাদী যুক্তিধারার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। এই চেষ্টায় নিযুক্ত সকল শোধনবাদীকেই—কাণ্টপন্থী, মাথ্‌পন্থী, স্বজ্ঞাবাদী, যথাস্থিতিবাদী ও অন্যান্য সকলকেই—মার্কসীয় বিদ্যার পাঠ নিতে হয়েছে। মিথ্যাচার, কূটতার্কিকতা ও সুবিধাবাদী উপাদান নির্বাচনের ভিত্তিতে যে শোধনবাদ গড়ে উঠেছে, তার বিশেষ লক্ষণটি এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

সামাজিক চেতনার নূতন স্তরের সম্মুখীন হবার চেষ্টায় পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রচারের নূতন কায়দা অবলম্বনের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তার মধ্যেই শোধনবাদের উদ্ভব-রহস্য নিহিত। কার্লমার্কসের শিক্ষাবলীর ঐতিহাসিক নিয়তির স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন: "ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি এমনই যে, মার্কসবাদের তত্ত্বগত বিজয়ে তার শত্রুপক্ষ মার্কসবাদী ছদ্মবেশ গ্রহণে বাধ্য হয়।" (লেনিন রচনা-সংগ্রহ, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬)। বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী চিন্তার সাফল্য ও কীর্তির অনুবর্তী হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে শোধনবাদের বিপরীতধর্মী ঢেউ কি ভাবে উঠেছে তা শোধনবাদের যে কোনো ইতিহাস রচয়িতারই চোখে পড়বে।

উনিশ শতকের শেষদিকে মার্কসবাদের প্রসারের প্রতিক্রিয়ারূপে আন্তর্জাতিক সোস্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যে শোধনবাদের আবির্ভাব হয় এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি মার্কসবাদ লেনিনবাদের সাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপুল কীর্তি অর্জনের ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে শোধনবাদী ঝোঁকের উদ্ভব হয়েছে।

দার্শনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমকালীন ভাববাদী দর্শনের সমালোচনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে শোধন করার যে কোনো চেষ্টা বুর্জোয়া দর্শনের কোনো না কোনো প্রচলিত ধারা থেকে অনুপ্রেরণা পায়, তাতে দার্শনিক ভাববাদের সাম্প্রতিক কীর্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষাবলীর সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের কোনো সম্প্রদায়ের বক্তব্যের সংযোগ সাধন করে মার্কসবাদকে এই সব 'কীর্তি'র সাহায্যে 'সমৃদ্ধ', 'গভীরতর' এবং 'ব্যাপকতর' করার উদ্দেশ্যে তার সমালোচনা করা হয়। সুতরাং শোধনবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হলে প্রথমে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য, এর মার্কসবাদ-বিরোধী চরিত্র এবং সমকালীন বুর্জোয়াদর্শনের ধারা বিশেষের সঙ্গে এর রক্ত-সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়ে, তার পর যে সব ভাববাদী বক্তব্যের সাহায্যে কোনো শোধনবাদী দার্শনিক মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকৃত করছে তারই তথ্যাতথ্যের ভিত্তিতে তাকে নাকচ করতে হবে। শোধনবাদীরা যে সব বুর্জোয়া ভাবধারার মোহে মুগ্ধ হয়, যতদিন সেগুলো খণ্ডিত এবং নির্মূল না করা হচ্ছে, ততদিন শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে। সুতরাং সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনের বহু বিচিত্র ধারার সঙ্গে সংগ্রাম শোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। দুটোই পাশাপাশি চলে ; শোধনবাদের সমালোচনা বুর্জোয়া দর্শনের সমালোচনার উপর নির্ভর করে এবং পরবর্তী ধাপে নিজেই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কসবাদের সমসাময়িক 'সমালোচক'দের রণপদ্ধতির যে সব বিশেষ কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের সাধারণ চিত্র আঁকা হলো, তা আরো পরিষ্কার হবে, যদি আমরা লক্ষ্য করি কি ভাবে এই উপায়গুলো মার্কসবাদ-বিরোধীদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে জাঁ পল সার্ত্র ও এ. লেফেভ্‌র্ (Lefevre)—এই দুজনের সর্বাধুনিক রচনাগুলিকে গ্রহণ করা যায় ; প্রথম জন 'মর্মকোষজাত' সমালোচকদের আদর্শস্থানীয় প্রতিনিধি, এবং

দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্কসবাদের 'সংশোধন' ও শোধনবাদী বিকৃতি সাধনক্রিয়ার নেতৃস্থানীয়।

জঁা পল সার্ত্রের আধুনিকতম দার্শনিক রচনা 'দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার সমালোচনা' (Criticism of Dialectical Reason) আমাদের সামনে রয়েছে। বইটির আদ্যোপান্ত মার্কসবাদ-বিরোধিতায় নিয়োজিত। সার্ত্রের শান্তির সপক্ষে বাণী এবং আলজিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কুশ্রী লড়াইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদকে আমরা যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি। কিউবার জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকপট সহানুভূতি আমাদের প্রশংসা পায়। কিন্তু সাথে সাথে যে ভ্রান্তির উপর তাঁর দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাও আমাদের হতাশ না করে পারে না।

'মর্মকোষজাত সমালোচক'দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে সার্ত্র সমাজচিন্তার বিবর্তনে মার্কসবাদের বিরাট ভূমিকার উচ্চ মূল্যায়ন দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত করেছেন; বলেছেন যে মার্কসবাদকে অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়া, এর অবদানকে মর্যাদা না দেওয়া বা এর কীর্তিনিচয়ের দ্বারা পরিচালিত না হওয়া সম্ভবপর নয়। সার্ত্র ঠিক কথাই বলেছেন যে মার্কসীয় চিন্তাসম্পদের মার্কসবাদ-বিরোধী খণ্ডন প্রচেষ্টা প্রাক্-মার্কসীয় ধারণাবলীর পুনরুজ্জীবনের আশাহীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। সার্ত্র চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করেন না যে মার্কসবাদ পুরনো হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূল কথা হলো এই যে মার্কসবাদ এখনো পূর্ণতা লাভ বা আধ্যাত্মিক পরিণতি অর্জন এবং বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই এর ক্রমাগ্রসরণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সার্ত্র তাঁর আবিষ্কৃত মার্কসবাদের 'নিশ্চলতা' দূর করে তার অব্যবহৃত নিহিত শক্তিকে মুক্তিদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

শোধনবাদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের নৈকট্য সম্পর্কে যে কোনো ইঙ্গিতকেই সার্ত্র সুদৃঢ় ভাবে অস্বীকার করেন, কোনো শোধনবাদের কথা বলা চলবে না—বললে তা হবে মামুলী ছেঁদো কথা, নতুবা মূর্খামি। এর কারণটা এ নয় যে শোধনবাদের অস্তিত্ব নেই, বরং ঠিক তার বিপরীত: যা শোধনবাদ নয় এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই; আমরা সকলেই শোধনবাদী; শোধনবাদ ছাড়া কোনো ধরনের চিন্তাকর্ম সম্ভবপর নয়। সার্ত্র বলেন: "যাঁরা নিজেদের পূর্বসূরীদের বিশ্বস্ততম সমর্থক বলে মনে করেন, পূর্বসূরীদের ধারণানিচয়ের

পুনরাবৃত্তি করার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেগুলির পরিবর্তন সাধন করে বসেন ; নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে।" এক কথায় চরম অভিন্নতা অসম্ভব ব্যাপার এবং সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে কিছুরই পুনরাবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপনা সম্ভবপর নয় এবং সকল পুনরাবৃত্তি ও অনুকৃতির মধ্যেই শোধনক্রিয়াটি লুকিয়ে থাকে।

এটা নজরে আনা কঠিন নয় যে এই বিচারের ভিত্তিতে রয়েছে ন্যায়শাস্ত্রীয় তার্কিকতা—দ্বান্দ্বিক মনোভাবের পরিবর্তে একটা সাপেক্ষবাদী (relativisim) মনোভাব। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির এই ধরনের ব্যাখ্যা অস্তিত্ববাদীদের সমস্ত দার্শনিক পদ্ধতির একটা প্রধান লক্ষণ। তাঁরা যখন বলেন : "সত্যের বিবর্ধনই আমাদের কাছে সার কথা, সত্যের অস্তিত্ব ও তার বিকাশে আমরা বিশ্বাস করি," তখন তাঁরা এই বক্তব্যের মধ্যে দ্বান্দ্বিকের পরিবর্তে সাপেক্ষবাদী বিষয়বস্তুই অনুপ্রবিষ্ট করেন। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর একটা সূত্রে : "আমাদের মতে, দর্শন যাকে বলে তার অস্তিত্ব নেই···বাস্তবিক যা আছে তা হলো দর্শনসমূহ।" কোনো সমস্যার প্রকৃত দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির মূল, যে এ সম্বন্ধে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবের একটাকে বাদ দেওয়ার মধ্যে নেই, রয়েছে বরং তাদের ঐক্যকে আবিষ্কার করার মধ্যে, বাস্তবসত্যকে তার বিবর্তনের সঙ্গে মেলানোর মধ্যে, দর্শনের ক্রমবিবর্তন তার ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মধ্যে—এটাই লক্ষ্য করা দরকার।

যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে এই বিচার করলে আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই : মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সার্ত্রের মার্গের (gnoseology) বৈপরীত্যটা কোথায় ?

সার্ত্র সরাসরি বলেন যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাঁকে পরিতৃপ্ত করে না এবং মার্কসীয় দর্শনের দুর্বলতম অংশ হলো এটাই। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের 'দুর্বলতা' হলো এই, এতে আত্মমুখীনতাকে দাবিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ এ তত্ত্ব কেবলই বস্তুনিষ্ঠ। যে এ জ্ঞানতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, যে এটা বস্তুভিত্তিক প্রতিবিম্বনবাদ।

সার্ত্রের সমস্ত লেখার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে আত্মমুখীনতার ও বস্তুনিষ্ঠার মধ্যে দ্বান্দ্বিক পারস্পরিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে, এবং তাদের আধিবিদ্যক (metaphysical) বিরোধিতা সম্বন্ধে তাঁর অনুপলব্ধি।

সার্ত্রের কাছে আইডিয়া হলো সংগ্রামের অস্ত্র মাত্র। তিনি তাদের বস্তুসারকে

অবহেলা করেন। এ হলো প্রায়োগিক (pragmatic) ও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি-বিশেষ; সোরেল ও প্যারেটোর মতবাদের এবং 'কল্পকথা-তত্ত্বের' (theory of myths) কাছাকাছি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা মার্কসীয় প্রতিবিম্বন-তত্ত্বের নিকটবর্তী নয়।

যে জ্ঞানতত্ত্ব সার্ত্র পোষণ করেন এবং যা মতাদর্শের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর বিচারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে তা আসলে আত্মকেন্দ্রিক (subjectivist) জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ। সমকালীন 'পদার্থ-বিজ্ঞানী' ভাববাদীদের মতামতের উপর নির্ভরশীল 'জ্ঞানমার্গীয়' (gnoseological) ধারণাবলীই এতে প্রস্তাবিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "বর্তমানে একমাত্র যে জ্ঞান-তত্ত্বটি সিদ্ধ, তার ভিত্তি সূক্ষ্ম পদার্থবিদ্যায় (micro-physics) প্রমাণিত সত্যের উপর; এতে পরীক্ষাকারীও পরীক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।" এটা সুবিদিত যে, মার্কসীয় প্রতিবিম্বন-তত্ত্ব জ্ঞাতার সক্রিয়তাকে যোগ্য স্থান দিলেও কখনোই বিষয়ী ও বিষয়ের সীমানা মুছে ফেলে না বা জ্ঞানের বস্তু-নির্ভরতাকে অস্বীকার করে না। নির্ভুলতার উপরই মার্কসবাদের শক্তি নির্ভরশীল—এই মর্মে লেনিনের যে কথা, তা কোনক্রমেই এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় যে মার্কসবাদেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। মার্কসবাদ শুধু যে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশই করে তা নয়, বাস্তবে তাকে রূপায়িত করার শক্তিও তার আছে—আমাদের এই বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত বক্তব্য দুটির ঐক্যের উপরে।

কিন্তু সার্ত্রের নিজের স্বীকৃতি অনুসারে যা তাঁকে অস্তিত্ববাদের দ্বারা মার্কসবাদের 'পরিপূরণে' প্রণোদিত করেছে, সেটা আসলে কি? তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: "শুধুমাত্র মার্কসবাদী হতে আমাদের বাধাটা কি?" সার্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে উত্তর দাঁড়ায়: তা হলো মার্কসীয় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত বিষয়বস্তু, তার বস্তুবাদী চরিত্র এবং নিয়ন্ত্রিত ক্রমাগ্রসরণের বাস্তব ভিত্তিতে তার দৃঢ় প্রত্যয়।

সার্ত্র লিখেছেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদেই ইতিহাসের একমাত্র বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করি যে অস্তিত্ববাদই বাস্তবের স্বরূপ নির্ণয়ে একমাত্র কার্যকরী পন্থা।" সার্ত্র অস্তিত্ববাদের দ্বারা মার্কসবাদের পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জ্ঞানের মূর্ততা (concreteness) সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক দাবিটা যোগ করে দেন। ক্রমাগত

জোর দিয়ে তিনি তাঁর পাঠক সমাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে মার্কসবাদে মূর্ততার অভাব, মার্কসবাদ বিমূর্ত ও বর্গীকরণ-প্রবণ, এবং এতে বাস্তবকে অতি সরলীকরণের ও যুক্ত্যাভ্যাসের (rationalisation) ঝোঁক প্রবল।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিশেষকে নির্বিশেষে, মূর্তকে অমূর্তে পরিণত করার যে মূল অভিযোগগুলো সার্ত্র করেছেন, তিনি যতই সেগুলো 'প্রমাণ' করছেন, ততই তাঁর অভিযোগের চরম ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদের একটি প্রাথমিক সূত্র হলো এই যে সত্য মাত্রেই মূর্ত। প্রথমে একটিমাত্র দেশে সর্বহারা বিপ্লবের জয়লাভ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনের জন্য লেনিনবাদী পরিকল্পনার ভিত্তিমূলে যে সাম্রাজ্যবাদী যুগের এবং রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার বাস্তব লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ ছিল না—এমন কথা কি বলা যায়? এ কি সত্য হতে পারে যে জনগণতন্ত্রী দেশসমূহে কমিউনিস্টদের নীতি ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে জটিল ও বিশেষ পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হয় নি? বিশেষ কোনো দেশে কোন্ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে তা সে দেশের ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে—এই গভীর উপলব্ধিই যে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণার উৎস নয়—এটা কি খাঁটি কথা? সার্ত্র বিলাপ করেন যেন মার্কসপন্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বাস্তব বিচারপদ্ধতির অভাবের দরুণই বর্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, "উপলব্ধি ব্যতিরেকেই ইতিহাস সংঘটিত হচ্ছে।" ঐতিহাসিক স্বতঃস্ফূর্ততার পরিবর্তে ইতিহাস-চেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যে ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, তার সম্পর্কে এত বড়ো ভুল বোঝার অন্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা শক্ত।

অস্তিত্ববাদের সাহায্যে মার্কস্‌বাদকে 'গভীরতর' করার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণের জন্যই সকল-প্রত্যক্ষ মূর্ততাকে অস্বীকার করে মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে এই অকারণ অভিযোগ। কিন্তু সার্ত্রের উপস্থাপিত যুক্তির মধ্যেই তাঁর নিজস্ব দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্ভব রহস্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন: "ধনিক ও সর্বহারার শ্রেণী বিরোধে সামাজিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যে কাঠামোর মধ্যে এই কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় বিরোধগুলি তারই পটভূমিকা মাত্র।" অন্যত্র তিনি বলেছেন: "সর্বহারা হলো অমূর্ত ধারণা বিশেষ; বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে সর্বহারাদের—বহুবচনেই তাদের অস্তিত্ব।" সার্ত্রের পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের চালকশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের মূল বিষয়টাই ঝাপসা

হয়ে যায়। এতে অনতিপ্রয়োজনীয় খণ্ডিত বিষয়সমূহ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পিছনে ঠেলে দেয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানমার্গে অনিবার্যভাবে দুই-ই থাকে—সাধারণীকরণ ও পৃথকীকরণ, বহুল পরিমাণে যোজন ও বিযোজন। এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে বিজ্ঞানচর্চা বা তত্ত্বগত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্ভবপর নয়। সর্বহারা আর বুর্জোয়া পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র—এ সবই হলো বৈজ্ঞানিক অমূর্ত ধারণা (abstraction) অর্থাৎ বাস্তবজীবনের বহুবৈচিত্র্যের বিষয়মুখ সার সত্যের যুক্তিসিদ্ধ প্রতিফলন। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক ধারণাবলী হলো সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের যুক্তিজাত নির্দেশ সমূহ (logical co-ordinates). বৈজ্ঞানিক চিন্তার সহায়তায় নানা ধরনের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে এগুলির প্রয়োজন হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রয়োগশীল কর্মসাধনে। এদের অবহেলা করে ইন্দ্রিয়লব্ধ অব্যবহিত উপাত্তে পর্যবসিত করার অর্থ হলো সামাজিক কর্মধারাকে দিক্‌ভ্রান্ত করা ও পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলা। সাত্র্‌-এর চিন্তা পদ্ধতি ঠিক এতেই পর্যবসিত হয়। শ্রেণী-সংগ্রামে জাতিগত পার্থক্য সমূহের অন্তরালেও যে আন্তর্জাতিক সর্বহারার স্বার্থগত ঐক্য রয়েছে তা তিনি দেখতে চান না ; বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন স্তরের অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে সে-যুগের প্রধান সংগ্রামী বৈপরীত্যের অস্তিত্ব আছে, সেদিকে তিনি চোখ বুঁজে থাকেন। এর মধ্য থেকেই আসে তাঁর আহ্বান—মার্কস্‌বাদকে অস্তিত্ববাদের স্তরে 'উন্নীত' করার। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার একমাত্র অর্থ হলো মার্কস্‌বাদকে বিসর্জন দিয়ে এমন এক বিশ্বদৃষ্টি অবলম্বন করা যার কাঠামোতে ব্যাপক ঐতিহাসিক দিগন্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রবেশ নিষেধ।

মার্কস্‌বাদের অমূর্ততার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার প্রকৃত অর্থ হলো মার্কস্‌বাদী বিশ্বদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক চরিত্রের সমালোচনা করা। সাত্র দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেছেন বিধিবদ্ধতার আনুগত্যকে, যাতে আছে দুই-ই, সাদৃশ্য ও পুনরাবৃত্তি। তিনি বলেন: "দ্বান্দ্বিক দর্শন পূর্ব-নিরূপণবাদ (Determinism) নয়।" বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে এবং পরিবর্তন ক্রিয়ার মূলে আছে যে অভিন্নতার অস্তিত্ব তাকে উপলব্ধি না করেই তিনি মার্কস্‌বাদকে দোষ দিয়ে বলেন যে মার্কস্‌বাদ উপলব্ধিকে বৈজ্ঞানিক পূর্ব-নিরূপণবাদের স্তরে নামিয়ে এনেছে। অস্তিত্ববাদীদের এটা কখনোই খেয়াল হয়

নি য়ে মার্কস্‌বাদ ইতিহাসের উপলব্ধিকে বৈজ্ঞানিক সঠিক নিরূপণবাদের স্তরে উন্নীত করেছে অর্থাৎ ইতিহাসকে স্বীকার করেছে নিয়ন্ত্রিত ধারা হিসাবে এবং আবিষ্কার করেছে নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী। মার্কস্‌বাদ ও অস্তিত্ববাদের মূলগত বিরোধ, বিশ্বদৃষ্টি হিসাবে তাদের বৈপরীত্য, এবং তাদের কোন্‌টি বিজ্ঞান-সম্মত ও কোনটি বিজ্ঞান-বিরোধী তার পরিচয় এখানেই পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধিকে সার্ত্র কোন্ লক্ষ্যপথে মূর্ত করে তুলতে চান? তিনি অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন: "আমরা তৃতীয় কোনো পন্থার নামে অথবা ভাববাদী মানবিকতার খাতিরে মার্কস্‌বাদকে বিসর্জন দিতে চাই না; আমরা যা চাই তা হলো মার্কস্‌বাদের নিজের মধ্যেই ব্যক্তির অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।" তাঁর ভাষায় "সমকালীন মার্কসীয় দর্শন ব্যক্তিজীবনের সমস্ত বাস্তব নিরূপণকে বাদ দিয়েছে।...এর ফলে ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে উপলব্ধিকে মার্কস্‌বাদ সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছে।" তাঁর মতে মার্কসীয় সামাজিক বিমূর্ততার মধ্যে ব্যক্তির মূর্তরূপ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আর তাই মূর্ত ব্যক্তির অধিকার পুনঃস্থাপনার নামে তিনি যার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হলো নৃ-বিদ্যা-বাদ (anthropologism)।

কিন্তু ফয়ারবাখের মতাদর্শের মার্কসীয় সমালোচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে anthropologism-এর দুর্বলতার উৎসটা কোথায় তা সুবিদিত। সর্বোপরি এ হলো, জৈবিক সত্তা হিসাবে মানুষের সম্পর্কে নৃ-বিদ্যা সম্মত উপলব্ধির বিমূর্তীকরণ, মূর্ত ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য হিসাবে নয়। ফয়ারবাখের শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই মার্কস্ বিশেষভাবে তাঁর বক্তব্য হাজির করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সার্ত্র মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে স্থাপন করতে চান মানব সম্পর্কে মার্কস্-পূর্ব নৃ-বিদ্যাবাদী ধারণার পুনঃপ্রবর্তনকে।

সার্ত্র তাঁর নৃ-বিদ্যাবাদকে বেশ ফ্যাশন দুরস্ত আপাত-বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে কাজে লাগান। পাভলভের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ঘৃণাসূচক মন্তব্য করেন এবং মনঃসমীক্ষণকে সংহত রূপ দেবার জন্য ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের দ্বারা মার্কস্‌বাদকে 'গভীরতর' করতে চান। মনঃসমীক্ষণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধী বলে মার্কস্‌বাদী যে মত, সার্ত্রের মতে তা ভ্রান্তি বিশেষ। তাঁর মতে শৈশবে ব্যক্তিত্ব গঠনের গোপন রহস্যগুলি আবিষ্কার করে মনঃসমীক্ষণ ব্যক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের চালকশক্তির উপলব্ধিকে মূর্ত করে

তোলে। তিনি বলেন: "সমকালের মার্কস্‌পন্থীদের শুধু বয়স্কদের নিয়েই কারবার।" আর বয়ঃপ্রাপ্ত হিসাবে মানুষগুলো জেগে স্বপ্ন দেখে না।

এই তিরস্কারের অসারতা ও অবিশ্বাস্যতা প্রমাণ করার আবশ্যক নেই। এটা পরিষ্কার যে শিশু-মনস্তত্ত্ব চর্চা কোনো কাজে লাগে কিনা—সেটা আলোচ্য বিষয় নয়; বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে এই চর্চা করা হবে, না দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী ফ্রয়েডবাদের ভিত্তিতে করা হবে, সেটাই বিবেচ্য। তা ছাড়া মতানৈক্য শিশু-মনস্তত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব নিয়ে নয়, সামাজিক বিধিবদ্ধতা (regularity) ও সমাজজীবনে মনস্তত্ত্ব-শারীরবিদ্যাসম্মতবিধিবদ্ধতার (regularity)-র সম্পর্কটা নিয়ে। মনস্তত্ত্ব-শারীরবিদ্যাসম্মত নিয়মাবলী সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এমন কি তাদের নিজেদের পরিবর্তনও সামাজিক কর্মধারার উপর নির্ভরশীল।

সার্ত্র অবশ্য মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের সমন্বয় এবং মনঃসমীক্ষণের সংহতি-সাধন নিয়েই সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে মার্কসপন্থীরা যাতে চূড়ান্ত উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্য অন্য একটি বুর্জোয়া ভাবধারা—সূক্ষ্ম (micro) সমাজবিজ্ঞানকে আত্মস্থ করা দরকার। আমাদের বলা হয় যে সমাজ-সংগঠন, শ্রেণী, উৎপাদনের সম্পর্ক, বনিয়াদ ও উপরি-সৌধ ইত্যাদি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুপযুক্ত, অমূর্ত এবং সমাজজীবনের পূর্ণতা উপলব্ধির পক্ষে অক্ষম। 'মানবিক সম্পর্কের' সমাজতত্ত্ব ও 'দল'-ভিত্তিক (আঞ্চলিক, পারিবারিক, বিবাহসম্বন্ধীয় ইত্যাদি) সমাজতত্ত্বের সাহায্যে একে পূর্ণতর করে তোলা দরকার। সার্ত্রের মতে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে গঠিত এই মানব-নির্মাণবিদ্যাকে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু নিছক ঘটনা হলো এই যে বুর্জোয়া ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রিত সমস্ত 'মানবিক সম্পর্কের'-র সমাজতত্ত্ব মানবসমাজের শ্রেণীভিত্তিক গঠন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে। শ্রেণী সম্পর্কে চূড়ান্ত ও মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'দল-সংগঠনে'র বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মানব-নির্মাণবিদ্যাকে' বসানো হয়েছে রণনীতি ও কৌশলের স্থানে। সম্পত্তি-ভিত্তিক শ্রেণী সম্পর্ককে সম্ভাব্য সকল দলের ও পৃথক পৃথক ব্যক্তির অগণ্য সম্পর্কের মধ্যে একটিমাত্র বলে গণ্য করা হয়েছে।

এ রকম 'সংহতির' পরে মার্কসীয় শিক্ষা নিশ্চয়ই যুক্তিবাদবিরোধী, নৃবিদ্যা-

সম্মত, মনঃসমীক্ষণভিত্তিক ধারণাবলীর অস্পষ্ট পটভূমি কিংবা যান্ত্রিক কাঠামোয় পর্যবসিত হবে। এই জাতের সংহতির পরে মার্কসবাদ তার বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক বিষয়সার হারিয়ে একটা ম্লান ছায়া ও শূন্যগর্ভ শব্দ হিসাবেই টিকে থাকতে পারবে।

কথায় বলে ঘোড়ার চলন খুরে আর চিংড়ির চলন দাঁড়ার মুখে; আঁরি লেফেভ্‌র্‌ মার্কসবাদ থেকে অস্তিত্ববাদের দিকে ঝুঁকেছেন। অবশ্য তিনি নিজেকে মার্কসপন্থী বলেই জাহির করেন। 'প্রকৃত' মার্কসবাদ অর্থাৎ মার্কসের নিজের মার্কসবাদে পুনরাবর্তনের এবং 'সংকীর্ণ মতবাদের ঘুম' থেকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি মার্কসবাদের উপর যে সব অস্ত্রোপচার চালাচ্ছেন, তাতে মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ বিকৃতই করা হবে।

লেফেভ্‌রের মত হল এই যে দার্শনিক বস্তুবাদ সমাজপদ্ধতির ভিত্তিতে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিকচিন্তার সমগ্র বিবর্তনের পরিণতি বা সামগ্রিক রূপ নয়। বস্তুবাদ তাঁর কাছে একটা 'দার্শনিক স্বীকার্য' মাত্র। বস্তুবাদের সূত্রগুলি আলোচনার প্রারম্ভে উপস্থাপিত প্রাথমিক বক্তব্য ছাড়া বেশি কিছু মনে হয় না—সেগুলি কোনো ক্রমেই প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এই সূত্রগুলি শুধু যে অপ্রমাণিত তাই নয়, এগুলিকে প্রমাণ করাও যায় না। লেফেভ্‌র লিখেছেন: "বস্তুবাদকে কখনো যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না—যেমন ভাববাদকেও। বিরুদ্ধ ধারণা দুটিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা এবং তাদের বৈপরীত্যটা দেখানো যেতে পারে, শুধু এইটুকুই।" আর যেহেতু ভাববাদকে বস্তুবাদের মতোই প্রমাণ করা যাবে না, সুতরাং লেফেভ্‌রের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদও সমান অখণ্ডনীয়। "তাই কেউ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, কিন্তু একে বিধ্বস্ত বা খণ্ডন করতে পারে না। নূতন নূতন রূপে ভাববাদ আবার দেখা দেয়। কোনো 'স্বীকার্যকে' কি ভাবে বিধ্বস্ত বা খণ্ডন করা যাবে? একই ভাবে বস্তুবাদের সারবত্তাকেও প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।"

দর্শনের মৌলিক প্রশ্নে, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান-সম্মত সাদৃশ্য আবিষ্কার এবং তাদের বিরোধের অনিবার্য পুনরাবৃত্তিতেই লেফেভ্‌রের বিশ্বাস। ভাববাদের যুক্তিসিদ্ধ, তথ্যগত ও ব্যবহারিক অসারতা

এবং বস্তুবাদের প্রশ্নাতীত কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেক বস্তুবাদী দার্শনিক একমত হলেও তিনি তা অস্বীকার করেন। বস্তুবাদ (ভাববাদের বিপরীতক্রমে) বাস্তবিকই অখণ্ডনীয়। তার কারণ এ নয় যে এটা প্রমাণ করা যায় না। সত্যই কথার কসরতিতে একে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু বস্তুবাদ অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক নূতন সামাজিক কীর্তি, প্রত্যেক নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সামগ্রিক উন্নতির দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বার বার এর প্রমাণ হয়ে চলেছে। বস্তুবাদের সত্যের মতো কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যই এত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

ভাববাদের যে বার বার পুনর্জন্ম ঘটে তার সমগ্র কারণ এ নয় যে ভাববাদ অখণ্ডনীয়। বিজ্ঞানের ও দর্শনের এবং সমাজ-বিবর্তনের সমগ্র ইতিহাস আসলে ভাববাদ খণ্ডনেরই ইতিহাস। খণ্ডন হওয়া সত্ত্বেও ভাববাদ ও তার রক্ত-সম্পর্কাবদ্ধ অগ্রজ ধর্ম এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বস্তুবাদ শুধু যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণাবলী এবং বঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভ্রান্তিসমূহের টিঁকে থাকার ক্ষমতাটা সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় তাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যাও করে।

দর্শন-সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নে লেফেভ্‌রের সূত্রের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো মিল নেই। এ হল দর্শনের পূর্বালোচিত মৌলিক প্রশ্নের ব্যাপারে প্রকাশ্যে সূত্ররচনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের পথ থেকে সমকালীন ভাববাদের লক্ষণাক্রান্ত অপসরণের দৃষ্টান্ত। "অগ্রগামীদের চিন্তার মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের প্রাচীন বিরোধের অবসান হয়ে গেছে" বা বিরোধ "অদৃশ্য হয়ে গেছে, কারণ এর আর কোনো অর্থ নেই"—এই জাতীয় যে সব বক্তব্য লেফেভ্‌র উপস্থিত করেছেন, তাতে এবং তাঁর "একযোগে ভাববাদী ও বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যাকে বিসর্জন দেওয়ার" আহ্বানে এটাই প্রমাণ হয় যে তিনি ভাববাদী প্রতিক্রিয়ার ব্যূহরক্ষায় শান্ত্রী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরীদের লেনিন যে নাম দিয়েছিলেন, তা নির্ভুল—নামটা হল দার্শনিক অস্থিত বুদ্ধি।

দ্বান্দ্বিক দর্শনের বাস্তব সূত্রগুলি সম্পর্কে লেফেভ্‌রের যে বিচার, তার সঙ্গে মার্কস্‌বাদের বিরোধের প্রসঙ্গে এখানেই থামা যাক। তাঁর চোখে বস্তুবাদের মতোই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিও ফলপ্রদ প্রকল্পমাত্র, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। তিনি বলেন: "একে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত চূড়ান্ত সত্যে উন্নীত করার কোনো

অধিকারই আমাদের নেই।" তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে একে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সমূহের মাটিতে উদ্ভূত বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রকাশ যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনায়, দ্বান্দ্বিক দর্শনকে নিন্দিত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এই সব ভুয়ো যুক্তি প্রত্যক্ষত তাদের বিরোধিতা করছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি যে আধিবিদ্যক বিশ্বোপলব্ধিতে ভাঙনের পর ভাঙন এনেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বস্তুবাদী-দ্বান্দ্বিক দর্শনে এই সকল আবিষ্কারের সাধারণীকরণ সাধিত হয়েছে এবং তাদের দার্শনিক সত্যের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। আমাদের যুগের এই সকল আবিষ্কার অধিবিদ্যা-প্রসূত চিন্তার ক্ষেত্রে চরম আঘাত হেনেছে; এ চিন্তা যদি টিঁকে থাকেই, তবে তা (ভাববাদের মতোই) থাকবে তথ্যগত বিরোধিতা সত্ত্বেও। লেনিন সুন্দরভাবে একে উপলব্ধি করে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর লেফেভ্‌র মার্কস্‌বাদের বিশ্বাসহন্তা হয়ে এটা বুঝতে চান না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শোধনকার্যে লিপ্ত থেকেও লেফেভ্‌র এমন কথা ঘোষণা করেছেন যেন শোধনবাদের ধারণার মধ্যে কোনো "বস্তুগত সারপদার্থ নেই", যেন "লেনিন নিজেও মার্কসের বক্তব্যকে শোধন করেছিলেন!" তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক বিধিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কস্‌বাদের পূর্ণতার দিকে অভিযাত্রা এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক সূত্রগুলির পরাজয়-সাধনের চেষ্টার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য আছে, তা যিনি দেখতে চান না, তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই মার্কস্‌বাদী শিবিরের বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

প্রয়োগবাদী ও অস্তিত্ববাদী এবং ক্যাথলিক যাজক ও দলত্যাগী সাম্যবাদী— দার্শনিক ভাববাদের সমস্ত সম্প্রদায় ও প্রতিনিধিবর্গ তাদের নানা মতপার্থক্য সত্ত্বেও একটা মার্কস্‌বাদ-বিরোধী মোর্চায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দর্শন জগতে বর্তমান যে সংঘাত—এটা তার একটা বিশেষ লক্ষণও বটে। তাদের নিজেদের মতপার্থক্যের ব্যাপারটা আসলে হলো মার্কস্‌বাদ-বিরোধী নানা অস্ত্রের ভিত্তিতে কাজ ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপার মাত্র। জাতিগত দার্শনিক ঐতিহ্য ও বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী তারা পৃথক পৃথক পথে কাজ করে চলেছে। কিন্তু তারা একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল কাজই করছে—তা হলো অগ্রবর্তী বৈজ্ঞানিক ধারণাবলীর বিরোধিতা করা।

বর্তমানে আমাদের মতাদর্শের যে যে অংশ সবচেয়ে কম শক্তিশালী, আমাদের প্রতিপক্ষ সেখানেই শক্তি সমাবেশের চেষ্টা করছে। আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে সব বিচ্যুতি রয়েছে, তারই সুযোগ নিয়ে ওরা পরগাছার মতো বেঁচে আছে।—সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে তারা আশ্রয় করছে, অবশ্য ততদিন, যতদিন না সেই আবিষ্কারগুলি বস্তুবাদী দর্শনচিন্তার সাহায্যে আমরা আয়ত্ত করতে পারছি। বিরোধী পক্ষকে আমাদের চিনে নেওয়া উচিত—তাদের ছল-কৌশল সমূহকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য, বিজ্ঞান-উত্থাপিত নব নব প্রশ্নের আশু উত্তরদানের জন্য এবং জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য এটা করা দরকার।

"কমিউনিস্ট" (১৯৬২, সংখ্যা ১) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল রুশ প্রবন্ধের নীরেন্দ্রনাথ রায় কৃত ইংরাজি ভাষান্তরের বাংলা অনুবাদক : বেদুইন চক্রবর্তী। ইংরাজি ভাষান্তরটি রচিত হয়েছিল ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে, কিন্তু নানা আকস্মিক ঘটনায় বাংলা অনুবাদটি এর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

ভ্রম সংশোধন

পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হয়েছে	হবে
৬১৫	১৯	তানের	তালের
৬২৫	২৩	গজেন্দ্রনাথ	গনেন্দ্রনাথ
৬২৬	১৩	সপৈ	সর্পে
৬২৬	২৯	তাল	তান
৬২৮	২৭	সুধীরকুমার নাথ	সুধীরকুমার নান

এই সংখ্যায় ৭৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনার শিরোনামা ভুল ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে : যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

সুলেখা সান্যাল: জীবন ও সাহিত্য

তরুণ সান্যাল

জীবনের ঘটনা কখনও কখনও কপোলকল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, নইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জাত সুলেখা সান্যালের জীবন এত আশ্চর্যজনক হবে কেন। বহুবার আমার মনে হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্র ও জীবনের বহু মিল আছে, তাঁর সাহিত্য যেন আত্মজীবনীমূলক। তবুও শিল্পকে যদি জীবনের চেয়ে বড়ো বলেও মানি, সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিজীবনের পাদপীঠে তাদের ম্লান বলেই মনে হবে। বিশেষত তাঁর ১৯৫৮ সালের পরবর্তী রচনাসমূহে এত বেশি পরিচিত মানুষের মিছিল দেখা গেল যে, আমি সুলেখা সান্যালের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম বলেই তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মকে প্রায় আত্মজীবনী রচনা বলে মনে হয়েছে। এসব কথা আজ যদিও মনে পড়ছে, তথাপি যাঁকে 'সুলেখা দি' বলে ডাকতুম সেই অতি পরিচিত লেখিকাকে অনেক লেখক-লেখিকাদের থেকে তফাৎ করে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তিনি জীবনের শেষ দিকে কলকাতার পরিচিত সাংস্কৃতিক সমাজ থেকে এত দূরে এবং এত বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করতেন যে নানা সংঘর্ষ ও নিন্দাপ্রশংসার বাইরে সাহিত্যকর্ম, কেবলমাত্র জীবন ও সাহিত্যের জন্য বেঁচে থাকতে, তিনি মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য মানসিক শক্তি নিয়ে আত্ম-পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। শ্রীযুক্তা সুলেখা সান্যাল দুরারোগ্য লুকোমিয়া বা রক্তের কর্কট রোগে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বর্ধমানে তাঁর পিত্রালয়ে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাহিত্যকর্মীর সাহিত্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, একথা মেনে নিয়েও আমরা বলব, সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে তাঁর আত্মজীবনের বহু ঘটনার বিম্বন দেখা যায়। সুলেখা সান্যালের অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে ভাগ্যের সঙ্গে দ্বৈরথে শ্রীযুক্তা সান্যাল পরাজয় স্বীকার করেন নি; সেই ভাগ্য যদি পুরুষশাসিত—কী প্রচলিত, কী প্রগতিশীল—সংস্কৃতিসেবীদের বিচারের শেষ পর্যন্ত মানদণ্ড হয়ে থাকে, তবে কলুষকল্মষসাপেক্ষ মধ্যযুগ এবং

লোভ চরিতার্থ করার মূলধনাশ্রয়ী মনই জয়ী হবে। স্থলেখা সান্যালের রচনাই তাঁর জীবনের বিপ্লববার্তা বলে গণ্য হোক, অন্তত আমি সে কথা সর্বদাই মনে রাখব।

স্থলেখা সান্যাল ১৯২৮ সালের ১৫ই জুন (১লা আষাঢ়, ১৩৩৫) অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি গ্রামে ক্রমক্ষীয়মান জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দু পুরুষ আগে এঁদের কয়েকটি নীলকুঠিও ছিল। কিন্তু তাঁর শৈশবে আর সেই পরিবারের পুরাতন মহিমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না বললেই চলে। শিক্ষক জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেমন ব্যক্তিজীবনে তাঁকে শিক্ষা-জীবনের সরল নিষ্ঠা দান করেছিলন, তেমনি মাতৃকুলের ধারায় রামতনু লাহিড়ীর ঐতিহ্যপূত অচলায়তন ভাঙার তরঙ্গভঙ্গও সে চরিত্রে দাগ রেখেছিল। তাছাড়া, কোঁড়কদি গ্রামটিরও বৃটিশরাজের পুলিশের খাতায় বিপ্লবী ও 'স্বদেশী'দের ঘাঁটি বলে নাম ছিল। উত্তীর্ণ কৈশোরে স্থলেখার, অগ্রজদ্বয় এবং তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের নিকটে নতুন সমাজগত দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

স্থলেখা সান্যালের বাল্য ও প্রথম কৈশোর কাটে চট্টগ্রামে পুত্রকন্যাহীন মাসিমার নিকটেই। যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি'তে তাঁর সাহিত্যজীবনের হাতে খড়ি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীশচীন মিত্র (এঁদের দুজনকেই স্থলেখা সান্যালের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ' উৎসর্গীকৃত) তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম উৎসাহদাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রথমে ভিক্টোরিয়া পরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়েন। এম. এ.তেও ভর্তি হয়েছিলেন তারপর কিন্তু পাঠ সম্পূর্ণ করেন নি। ১৯৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর নানাকারণে সুখের হয় নি।

কৈশোরেই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ১৩৫১ সালে 'অরণি'তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'পঙ্কতিলক'। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এবং নির্যাতন ভোগও করেছিলেন। স্থলেখা সান্যালের ১৯৫৪ সালের পূর্বের রচনাগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জনজীবনের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গ-বিভাগের ফলস্বরূপ ছিন্নমূল পিতৃপরিবার ও বাঙালী জীবনের নিদারুণ দুর্ভোগ তাঁকে জীবনের কঠিন পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। কলকাতায় শিক্ষয়িত্রী হিসাবে

নিদারুণ সংগ্রামে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংযুক্ত থেকে তিনি কখনই সাহিত্যশিল্পকে বর্জন করেন নি বরং বাঙালী সংগ্রামশীল নারীর অনন্য অভিব্যক্তি তিনি নানা কাহিনীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

স্থলেখা সান্যালের সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই নারী চরিত্র। যারা সামাজিক বিচারে, অর্থনীতির হাটে উপযুক্ত মূল্য না পেলেও হেরে যায় না। সম্ভবত এই বিচারে স্থলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পপুস্তকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ('সিঁদুরে মেঘ' নামে গল্পটি জনৈক চিত্রপরিচালক ব্যবহার করবেন বলে ইতিপূর্বেই কনট্রাক্ট করেছেন)।

স্থলেখা সান্যালের সাহিত্যকর্মকে মোটা দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁর ১৯৫৪ সালের রচনাগুলি পড়ে। এই রচনাগুলির চরিত্র তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'নবাঙ্কুরে' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭, নয়া প্রকাশ) এবং গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ'-এ স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। নবাঙ্কুর-এ নায়িকা বালিকা ছবির ক্রমে ঘাতপ্রতিঘাতে যুবতী হয়ে ওঠার কাহিনী। ভেঙে পড়া একান্নবর্তী বনেদী পরিবারের মেয়ে ছবির গ্রামের স্বদেশী অধীর কাকার সাহচর্যে, মা মমতার বেদনায় অভিষিক্ত হয়ে, লেখাপড়া শেখবার জন্য পিশিমার সঙ্গে শহরে যাওয়া, তারপর গ্রামে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রভৃতি দিকগুলি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে। 'নবাঙ্কুর' স্থলেখা সান্যালের একটি অত্যাশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'সিঁদুরে মেঘ'-এর গল্পগুলির মধ্যে অবিস্মরণীয় নাম-গল্পটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার মালতী ও অনন্ত ঘর বেঁধেছে। দুজনেরই অতীত জীবনে দুঃখ ছিল। মালতী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বাবাকে ও সংসার বাঁচাতে কালো ধলা অফিসারের লোভের শিকার হয়েছিল। অনন্ত তার আগের বউটিকে কনট্রাক্টের লোভে কর্তব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। দু জনের সম্পর্কের মলিনতা দুজনেই চোখের জলে ধুয়ে দেয়, নায়ক অনন্ত বলে, "তুমি তো দেখেছ, রাতে ঘুমোইনে আমি। ঘুমোব কি—? শান্তি পাইনে যে। এমন ভয় ধরে গেছে মনে। উঠে তোমাকেই পাহারা দিই···গাছটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলেই তো চারাটাকে আরও সাবধানে রাখতে চাই।" 'জীবনায়ন' গল্পের নায়িকা সীমা বেকার স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুরীর সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম। দুঃখের সংসারে আগন্তুক শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ঘর থেকে একদা বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে লতা (অন্তরায়) এবং 'ছোটমাসী'র (ছোটমাসী) নতুন

মর্যাদা আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্য একটি দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে। ঘর থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মা তার শিশুটিকে ('আমার মানিক সোনারে পিস্যা মারল কেন অরা ? আমি পারি নাই রাখতে') জেলখানায় বন্দিনী মায়ের ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মধ্যে ফিরে পায় (জন্মাষ্টমী)।

এককথায় বলতে গেলে সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' বইখানি বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'নবাঙ্কুর', 'সিঁদুরে মেঘ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম ধারার উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কথা প্রসঙ্গত বাদ দেওয়াই ভালো। বিশেষ ভাবে ১৯৫৬ সালের পরবর্তী বহু ঘটনাই নানা ব্যক্তির মনঃপূত না হবারই কথা। তবে একথাটি বলা ভালো যে, কার্যত এ সময়েই তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি বর্ধমান জেলায় বড়শুল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগ দেন। সম্ভবত সুলেখা ব্যক্তিজীবনের এ সময়ে এমন ভুল করে বসেছিলেন যে ভুল শোধরাবার আর এ জীবনে অবসর হলো না। কিন্তু ভুল করেছিলেন বলেই বোধ হয় ভালোবাসা, প্রীতি, ঘৃণা নামক মানবিক যে বোধগুলিকে তিনি পূর্বতন রচনায় বিচার করেন নি, সেগুলিকে নতুন করে তাঁর বিচার করতে হলো। এতে তাঁর ব্যক্তিজীবনে কী লাভ লোকসান হলো তা তিনিই শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এই প্রচণ্ড ব্যর্থতা থেকেই পেলাম।

শ্রীযুক্তা সান্যালের ১৯৫৭ সালে লিউকোমিয়া রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তারদের মতে, অন্তত আরও দু বছর আগেই এ রোগের আক্রমণ হয়েছিল ১৯৫৫ সাল থেকে। তখন পর্যন্ত তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কোনও রচনা প্রকাশ করেন নি, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে তিনি তখন অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লুকোমিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করেন। ভারতসরকারের পাশপোর্ট দপ্তর অতিক্রুত তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। মিসেস কস্টের অধীনে তিনি মস্কোয় লেনিন হাসপাতালে চিকিৎসিত হন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মহামতি লেনিনের শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার হয়)। সোভিয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণা বিভাগ ও ভারতীয় ছাড়পত্র

দপ্তর স্থলেখা সান্যাল ও তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের নিকটে এজন্য ধন্যবাদার্হ।

মস্কোয় তিনি নিরাময়ের দিকেই চলেছিলেন, সেখানে পেয়েছিলেন সোভিয়েত কর্মীদের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি। শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীযুক্তা সান্যাল তা স্মরণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অসামান্য। নিরাময়ের পূর্বেই তিনি ভারতভূমিতে ফিরে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের হেমাটোলজির অধ্যাপক ডঃ জে. বি. চ্যাটার্জির চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি মস্কোতে ছিলেন।

মৃত্যুর কালো ছায়ার নিচে থেকেও স্থলেখা সান্যাল জীবনের প্রতি মমতা হারান নি। যেন মৃত্যুকে পরাভূত করবার জন্যই তিনি ১৯৬১ সালে বি. টি. ডিপ্লোমার অধিকারিণী হলেন; ১৯৬২ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি পান। তিনি এম. এ. পরীক্ষা দেবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাঝে মাঝে রক্ত পরিবর্তন করে যাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অদম্য মনের শক্তির জোরে ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যুকে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

মস্কো থেকে ফেরার পর স্থলেখা সান্যাল কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে প্রায় নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অতি শুভানুধ্যায়ী অনেকেই তাঁর সংবাদও ভুলে গেছেন। তাঁর অতি পরিচিত সাহিত্য সহকর্মীর অনেকে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ দিকের বহু তথ্যই জানি বলে। জানি, কী নিদারুণ বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। দ্রুত অপস্রয়মান জীবনের রৌদ্রটুকু ধরে রাখার জন্য তাঁর আকুতি মাজিত একটি ছোট্ট পরিবেশে কেমন জড়িয়ে রেখেছিল!

মস্কো থেকে ফেরার পর তাঁর যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 'দেয়াল পদ্ম' (মানসী, শারদীয় ১৩৬৮) উপন্যাসটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এতদিনে তিনি তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এতে কোথাও ধরা পড়েছে কিনা জানি না, কিন্তু কেবল যে পুরুষই নয়, নারীও যে মানবিক বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত তা তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। পুরুষকার এবং নারীত্ব উভয়ই যেন যথাক্রমে নারী তনু সন্ধানে

এবং পুরুষের রৌপ্য অনুসরণে ব্যয়িত হতে চলেছে। অনেক সময় মানুষ ঘটনাক্রমে শিকার হয়ে পড়ে। তবু সে ঘটনাগুলি যে অপরের জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। জীবনের প্রবাহ নানা ধারা-উপধারায় কখনও সংঘর্ষে, কখনও মিলিত প্রধাবনে বয়ে চলেছে: মানুষ যেন তার আপাত বহিরঙ্গ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। সুলেখা সান্যাল যেন শেষ জীবনে পলকের জন্য জীবনের ধারাপ্রবাহের মেলবন্ধনটি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ব্রহ্মবাদিনীদেরই একমাত্র আয়ত্তাধীন। 'উলুখড়', 'একটি মামুলি গল্প', 'খোলা চিঠি', 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রভৃতি আত্মবিশ্লেষণ-মূলক গল্পগুলির পরিণতি 'দেয়াল পদ্ম'। 'দেয়াল পদ্মে'র নায়ক সঞ্জয় নায়িকা 'অসীমা'র ভগ্নিপতি। অসীমা ডাক্তার। অসীমা মধ্যপ্রদেশের এক হাসপাতালে কাজ করে তার ব্যর্থ দিনগুলি সেবা দিয়ে ভরিয়ে রাখে। অসীমার পিতৃ পরিবারের ধারণা সঞ্জয় তার স্ত্রীকে খুন করেছে, অথচ শিশু দুটিকে মানুষ হতে দিচ্ছে না। সঞ্জয় পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রী করা টাকায় একটি বিশাল জোতের পত্তন করে, শুকনো মাটিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফসল ফলে না, ঝড় বন্যা অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। অসীমা এসেছিল সঞ্জয়ের কাছে, তার বোনের শিশু দুটিকে নিয়ে যেতে। সঞ্জয় অসীমাকে বলল, তার বোন অর্থ ও শহুরে চাকচিক্যের লোভে তাকে ছেড়ে, শিশু দুটিকে ফেলে একটি আধুনিক চৌকস যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। অসীমাও তার নিজের কথা বলে। বহু কষ্টে কলকাতায় ডাক্তারী পড়া শেষ করে তার দয়িত অশোকের সঙ্গে মিলতে লণ্ডনে যায়। কিন্তু অশোক সেখানে একটি সস্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না-করা ঘর বেঁধেছে। সেই মেয়েটি লরা অশোককে ছাড়ে না, অশোক অসীমাকে কথা দিয়েছিল শুনে বলে, "কথা? কথার কি দাম? তাও ওই বিশ্রী চেহারার মেয়ে! তোমার বন্ধু চন্দ্র চক্রবর্তী কথা দেয় নি আমাকে? তার বাচ্চা ছিল না আমার পেটে?...ওকে দাও না হোস্টেলে পাঠিয়ে।" অসীমা আবার কলকাতায় ফেরে। তারপর দূর দেশে ডাক্তারি।

অসীমা সঞ্জয়ের ভুল বোঝাবুঝির শেষে, অসীমার ফেরার আগের বিকেলে সঞ্জয় অসীমাকে 'দেয়াল পদ্ম' দেখিয়েছিল। এক পোড়ো মন্দিরের শুকনো গা বেয়ে দেয়াল পদ্ম গাছের লতা উঠেছে। "মন্দিরের গায়েই ওর শিকড়টা লাগানো। কে লাগিয়ে ছিল, কবে লাগিয়েছিল কেউ বলতে পারে না;

ভীষণ উঁচুতে ফোটে…ও জিনিস নাকি ওই রকম নির্জন আর ঠাণ্ডা আর পোড়ো বাড়ির গা ছাড়া জন্মায় না।"

সুলেখা সান্যাল তাঁর সাহিত্যকে বুঝি ঐ দেয়াল-পদ্মই ভেবেছিলেন। নাকি কোনো বাংলা দেশের মেয়ে? তার জীবনের লতাটি কোন পোড়ো মন্দিরের দেয়াল বেয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে ঝরে পড়ে গেল। হায়, লতাটি যে মন্দির বেষ্টন করে উঠেছিল, একদা সে মন্দিরের অন্তরেও বিগ্রহ ছিল। সুলেখা সান্যালের জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন। আমি তাঁর সাহিত্য অন্বেষণ করে মন্দিরের দেবতাটিকে অন্বেষণ করি না, কেন না আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকেই শিখেছিলুম, যে দেবতা জীবনকে স্খলন পতন ত্রুটি সত্ত্বেও ফুটে উঠতে দেন, সেই দেবতা মানুষকে খাটো করেন না, তিনি অমর। তাই বুঝি সুলেখা সান্যাল তাঁর দেয়াল পদ্মের নায়িকাকে অসীমা নাম দিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় যখন তিনি নতুন বাঁকে এসেছিলেন,—যেখান থেকে জীবনের নিগূঢ় অভাবনীয় সত্যেরই অনুভূতি জন্মায়—তখনই অকালে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

স্বকৃত ও অ-স্বকৃত

পরিচয়ের বহু প্রতিশ্রুতির মতোই আমাদের গত ফাল্গুন মাসের প্রতিশ্রুতিও সম্পূর্ণ রক্ষিত হতে পারে নি। সম্প্রতি অবশ্য সে অপরাধ পরিচালকদের উপর সম্পূর্ণ আরোপ না করাও চলে। কিন্তু জরুরী অবস্থার পূর্বেই বহু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, সে জন্যে আমরাই অপরাধী। আগামী কয় মাসের মধ্যে আমরা পূর্ব প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করব—পাঠকদের নিকট এই বলতে পারি। আর একটি কথা, প্রতি মাসেই জানতে পারি—বহু গ্রাহক ডাকযোগে পরিচয় পাননি। বিশেষ অনুসন্ধান করে বুঝেছি—এ অপরাধ প্রায়শঃ আমাদের নয়। আমরা অবশ্য পত্র পেলে পুনরায় প্রেরণ করি, ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু সাধ্যমতো গ্রাহকও যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা অনুগৃহীত হব। যথা, প্রথমত একটু সতর্ক দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করবেন। দ্বিতীয়ত, হয় স্বয়ং নয় কোনো স্বনিযুক্ত ব্যক্তির সহযোগে হাতে হাতে পরিচয় সংগ্রহে উদ্যোগী হবেন। তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।

সুলেখা স্মরণে

ছবি বসু

সুলেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল খুব সম্ভব 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র আপিসে, তার আগেই ওর ছোট গল্প পড়েছি আর বিস্মিত হয়েছি এই নতুন লেখিকাটির ছোট গল্প রচনায় আশ্চর্য নৈপুণ্য আর এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। লেখক সঙ্ঘের দৈনন্দিন কাজের মাঝে দুজনেই একসঙ্গে কাজ করতে করতে কখন যে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি তা আর টের পাই নি।

সে সময় লেখক-সঙ্ঘের পরিচালনায় ছেচল্লিশ ধর্মতলায় বহু সাহিত্য-সভা ঘরোয়া ভাবে অনুষ্ঠিত হতো, ছোট গল্পের আসর এখানে বসেছে বহুবার, লেখকের পক্ষে নিজের লেখা অচেনা পাঠকদের সামনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই এলোপাথাড়ি সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া একটু কঠিন ছিল। সুলেখার ছোট গল্প একবার এইরকম এক আসরে পড়া হয়েছিল (খুব সম্ভব ও নিজে সেটি পড়ে নি)। এই ধরনের সমালোচনা কিংবা তত্ত্বকথার আলাপ আলোচনায় ওকে মোটেই উৎসাহিত হতে দেখি নি বরং তখনকার সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে কে কেমন লিখছে, কেনই বা ভালো লেখা আরও বেশি হচ্ছে না এ নিয়ে ওকে অনেক কথা বলতে শুনেছি। নিছক রোম্যান্টিকধর্মী জোলো ভাবপ্রবণতায় ভরা ছোট গল্প রচনায় ওর অনাস্থা ছিল সুস্পষ্ট।

লেখক সঙ্ঘের ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে এক একদিন ও আমাকে বলত— কাল বিকেলটা আর আপিসে না এসে একটু কাজ করি কি বল? কেমন অর্থপূর্ণ ভাবে নিঃশব্দে হাসত সুলেখা।

একদিন কেন দু-দিন দেখা নেই সুলেখার। আন্দাজে বুঝি কাজ মানে গল্পে হাত দিয়েছে ও।

দু-দিন বাদে এসে কেমন লজ্জিত ভাবে বলে—পরিচয়ের জন্য একটা গল্প লিখলাম। কী জানি ওদের ভালো লাগবে কিনা।

প্রথম দিন থেকেই ওকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে দেখেছি, মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি—জীবনটা যদি একটু অনায়াসলভ্য হতো তবে হয়তো বেশ

ফুরসৎ নিয়ে ভালো করে লিখতে পারতাম, তা নয় বেঁচে থাকবার জন্য শুধু হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো !

এরই মধ্যে স্থলেখা বেশ কিছু ভালো ছোট গল্প লিখেছে, ওর জীবনের অভিজ্ঞতায় কুড়োনো পাতাগুলি চিন্তা ভাবনা ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনায় আরও পূর্ণতর রূপদানের জন্য অহরহ ভেবেছে। ওর সে-সব দিনের কিছু কিছু ভাবনার অংশীদার হয়েছি সে-সব দিনগুলিতে।

সে সময়টি বোধহয় ওর উপন্যাস সৃষ্টির প্রস্তুতিপর্ব। পূর্ব বাঙলার এক মধ্যবিত্ত সমাজের একটি কন্যা ওর উপন্যাসের নায়িকা। সমাজব্যবস্থার প্রতিকূল আবহাওয়ার চাপে সে বিপন্ন তবু সে হার স্বীকার করে না। নিজের চরিত্রের এক অসামান্য আত্মপ্রত্যয় কোন্ ফাঁকে সঞ্চারিত করে লেখিকা তার উপন্যাসের নায়িকার মাঝে।

স্থলেখাকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ ওর সেই নির্ভীক চরিত্রটি বার বার মনে জাগছে।

স্থলেখা সান্যালের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জন্ম : বাং ১৩৩৫ সন, ১লা আষাঢ় ১৯২৮ সাল, ১৫ই জুন।

জন্মস্থান : কোড়কদী (ফরিদপুর)

৭ বছর বয়সে চট্টগ্রামে পড়াশোনা শুরু।

১৯৪২ সালে কোড়কদী প্রত্যাবর্তন, ছোটদের পাততাড়িতে রচনা প্রকাশ।

১৯৪৪ সালে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

১৯৪৬ „ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ.

১৯৪৮ „ কারাবরণ

১৯৫২ „ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ.

১৯৫৩-৫৫ : খিদিরপুরে শিক্ষকতা

১৯৫৬—আমৃত্যু : বড়শুল (বর্ধমান) বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

১৯৫৮ জুন : মস্কো গমন

১৯৫৯ মার্চ : মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন

১৯৬২ ৪ঠা ডিসেম্বর : রাত্রি ২-৩০ মিনিটে বর্ধমানে মৃত্যু

স্থলেখা সান্যালের রচনার অসম্পূর্ণ তালিকা

গল্প

পঙ্কতিলক (অরণি, ১৩৫১)

মা মণি (পরিচয়, চেক ভাষায় অনূদিত)
সিঁদুরে মেঘ (পরিচয়) পরে অন্য কয়েকটি গল্প সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত
ছেলেটা (শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৬৩)
ফাটল (শারদীয় নূতন পত্রিকা)
বিবর্তন (চতুষ্কোণ)
ঘেন্না (অনন্যা)
লজ্জাহর (বলাকা)
ভাঙাঘরের কাব্যি (?)
কিশোরী (শারদীয় বলাকা, ১৩৬৮)
পরস্পর (মানসী, দীপালী সংখ্যা, ১৩৬৮)
খোলা চিঠি (অমৃত, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬২)
একটি মামুলি গল্প (পরিচয় ফাল্গুন ১৩৬৬)
যে গল্পের শেষ নেই (শারদীয় বসুমতী ১৩৬৯)
শক থেরাপী (ধরিত্রী, শারদীয় ১৩৬৯)
প্রতীক (অমৃতবার্তা ?)
পাষণ্ড (অমৃতবার্তা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)
মুকুরের মুখ (অসমাপ্ত)
হৃদয়ের রঙ (অসমাপ্ত)

উপন্যাস

নবাঙ্কুর (প্রথম প্রকাশ, মধ্যবিত্ত শারদীয় ১৩৬২)
১ম সংস্করণ : কার্তিক ১৩৬২
২য় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭
উলুখড় (জলসা, ১৩৬৭)
দেয়াল পদ্ম (মানসী, শারদীয়, ১৩৬৯)
নবাঙ্কুর (২য় খণ্ড, অসমাপ্ত, সামান্যই বাকি ছিল)

নবাঙ্কুর ও সিঁদুরে মেঘ ব্যতীত কোনোও প্রকাশিত গ্রন্থ নেই। সিঁদুরে মেঘও বাজারে পাওয়া যায় না।

'ঘাসফুল' নামে একটি ছোটগল্পের বই কলকাতার একজন প্রকাশকের হাতে আছে। সম্ভবত বইটি প্রকাশিত হবে।

বাংলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ কানাইবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র পড়িলাম। খুবই আনন্দের কথা যে তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন হইতেছে ও সেই উপলক্ষে তিনি তাঁহার অনুবাদের কিছু কিছু রদবদল করিতেছেন।

এই তো সুন্দর সুযোগ। ফাউস্ত-এর অনুপম লিরিকগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইতেছে তাহাদের বিভিন্ন স্তবক-গঠনপদ্ধতি যাহা গ্যোতে-র শিল্প প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ। বাংলা অনুবাদে তাহাদের অনুসরণ করার প্রচেষ্টায় কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। আর এরূপ ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কি যে এই প্রচেষ্টায় অনুবাদের খাঁটি বাংলা পদ্ধতির জাতিচ্যুতি ঘটিতে পারে? অলমিতি বিস্তারেণ—

নীরেন্দ্রনাথ রায়

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা (বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৪) 'পরিচয়'-এ 'বাংলা ফাউস্ত' প্রসঙ্গে আমার যে-পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, অনবধানতাহেতু তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল থেকে গেছে। 'পরিচয়'-এর পরবর্তী কোনও সংখ্যায় সংশোধিত হলে সবিশেষ বাধিত হবো।

পৃঃ ৫৫৫
"মরে যাই! ঐ দেখ,
হাঁটছে ডবকা ছুঁড়ী দেখ্, হাঁটে কিবা ঠাটে ভাই!
ওরে আয়, জোরে আয়, উহাদের সাথে মোরা যাই,
তামাকটা কড়া হবে মদ হবে জোরালো বিয়ার,
মেয়ে এক সাজাগোজা পছন্দ এই তো আমার!"

উদ্ধৃতিটির পরিবর্তে হবে:
"চল্ গিয়ে গড়গাঁয়ে হইগে চড়াই,
সুন্দরী মেয়ে আর সেরা মদ ঠিক পাবি ভাই,
আর হবে কী মজাই, হৈ হৈ কতই লড়াই!"
(পৃঃ ৫০)

কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকার জন্য 'পরিচয়'-এ আমার লেখাটি যথাসময়ে দেখতে অসমর্থ হয়েছিলাম। শ্রীযুত কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয়কে ধন্যবাদ, তাঁর ২৯।১২।৬২-তে লেখা চিঠি আমাকে উপর্যুক্ত ভুল সম্পর্কে অবহিত করেছে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

The Exile and the Kingdom—Albert Camus. Penguin Book.

মানুষ তার প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য পায় নি। সে নির্বাসিত। একদিকে অনন্ত, অসীম; অন্যদিকে অপার শূন্যতা। এর মাঝখানে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তার দাহ ও যন্ত্রণা নিয়ে। ইওরোপীয় সাহিত্যে মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা বহুদিন আগে থেকেই চলে আসছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির মূলে এই ধারণার বীজ উপ্ত। যাই হোক পাসকেলের চিন্তায় এই ধারণা রূপ পেল। তারও তিন শ' বছর পরে কির্কেগাড এসে বললেন: "I am no part of a whole, I am not integrated, not included." টমাস উলফ শোনালেন: "Naked and alone we came into exile···which of us has known his brother ? Which of us has looked into his father's heart ?··· Which of us is not for ever a stranger and alone ?" তারপর থেকে নির্বাসন তত্ত্ব সাহিত্য বিশেষে স্থান পেল। আধুনিক বহু ইওরোপীয় লেখকের সাহিত্যে নির্বাসিতের যন্ত্রণা এবং এর জীবনের সার্থকতা হলো মুখ্য বিষয়।

কামুর গল্প সংকলন Exile and the kingdom-এ এই সমস্যাই প্রতিবিম্বিত। বলা যেতে পারে প্রতিটি গল্পের মূল বক্তব্য এই নির্বাসন এবং ঈপ্সিত স্বদেশ খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। পেঙ্গুইন বুকস কর্তৃক প্রকাশিত এই সুলভ সংস্করণে কামুর ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে এবং আমার যতদূর জানা আছে কামু এই ছ-টি গল্পই লিখেছেন। The Fall প্রথমে একটা ছোট গল্প হিসাবে লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন কামু। কিন্তু লেখার সময় তা হয়ে উঠল ছোট উপন্যাস। যাই হোক প্রকাশিত এই গল্পগুলিতে কামু একই সমস্যাকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম গল্পটির নাম The Adulterous Woman. কামুর কোনো গল্প বা উপন্যাসে মহিলা চরিত্র প্রধান ভূমিকা পায় নি। মহিলা চরিত্র এসেছে, নায়কের ওপর কিছুটা আলো ফেলেছে, চলে গেছে। তারা কোনো কিছুর নিয়ামক হয় নি। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি তার ব্যতিক্রম। জেনি এই গল্পের নায়িকা। তার স্বামী মার্সেল ব্যবসাদার। উত্তর আফ্রিকার আরবদের কাছে

সে মালপত্র বিক্রি করে। স্বামীর সঙ্গে জেনিও চলেছে উত্তর আফ্রিকায়। জেনি আসতে চায় নি। তবু এল। সে মার্সেলের কাছে প্রয়োজনীয় তাই। যে নিবিড় একাত্মীকরণ, যাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় প্রেম বলি, তা বোধহয় জেনি অনুভব করে নি। মার্সেলের কাছে জেনির দাম ফুরিয়ে যায় নি—শুধুমাত্র এই বোধটাই তাকে টেনে এনেছে। মরুভূমির মধ্যে জেনি দেখে স্বাধীন আরবদের, দেখে তাদের মুক্ত জীবন। তার মনে হয় এরাই মরু অঞ্চলের মুক্ত প্রাণের অধীশ্বর। জেনি ভাবে এই স্বাধীন জীবন, আদিম প্রাণপ্রবাহ, তার হতে পারত। এই তার নিজের জায়গা। এই তার রাজ্য। অথচ কি করে যে এই ধারণা পেয়ে বসল তা জেনি জানে না। শুধু আনন্দ আর কোমল বেদনায় ভরে এল জেনির চোখ। জেনি খুঁজে পেয়েছে তার স্বদেশ। কিন্তু এই স্বদেশের অংশ আর সে হতে পারে না। সে কিছুতেই ফিরে পাবে না যাযাবর আরবদের পশুসুলভ সুন্দর ও প্রাণপ্রাচুর্য ভরা জীবন-যাত্রা। এর পর থেকে জেনির অনুভব বেদনার্ত কবিতার মতো অন্তগত ও গভীর। রাতে জেনি একা একা এসে দাঁড়াল বারান্দায়। দূরে দেখা যাচ্ছে যাযাবর আরবদের তাঁবু। বিবশিত হয়ে উঠল বিগতযৌবনা জেনির সর্বাঙ্গ। কোনো শব্দ নেই। বাতাস নেই। কেবল মাঝে মাঝে শীতের চাপে পাথরগুলি ভেঙে বালি হওয়ার অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছে। উন্মোচিত হচ্ছে জেনির সত্তা। জেনি যুক্ত হচ্ছে এই আকাশ মাটি নক্ষত্র ও মরুভূমির সঙ্গে। জেনি নিজেকে একটু একটু করে তুলে ধরছে রাত্রির দিকে। ভুলে যাচ্ছে প্রতিবেশ। ভুলে যাচ্ছে মানুষের জীবনের দুঃসহ ভার, জীবনের ক্লান্তি, বাঁচা ও মরার ভীষণ যন্ত্রণা। জেনি এতকাল ভয় পেয়ে ঘুরে ঘুরে মরেছে। তার সামনে কোনো লক্ষ্য ছিল না এতদিন। এইবার শেষ হলো জেনির ছুটে মরার পালা। জেনি শিকড় খুঁজে পেয়েছে।

জেনি যা দিতে পারে নি মার্সেলকে, যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাও ছিল না মার্সেলের, তাই-ই সে দিয়ে এল মরুভূমির উদার রাত্রিকে। নির্বাসিত জেনি আবিষ্কার করল তার হৃত সাম্রাজ্য। জেনি যুক্ত হলো একটা ঐক্যবোধের সঙ্গে: মিশে যেতে পারল, মিলিয়ে নিতে পারল নিজেকে। ব্যপ্ত হতে পারল—যা তার উত্তরণ। জেনি বেঁচে গেল। জেনির এই অনুভব আর এক ধরনের যৌনতা বোধ। কিছুটা মরমীয়া; কিছুটা ফ্রয়েডীয়। কিন্তু তার সামগ্রিক ফল কবিতার মতো দুর্জ্ঞেয় অনিবার্যতা।

জেনির এই অনুভবের সঙ্গে লরেন্সের কিছু চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। লরেন্সের কাছেও বিচ্ছিন্নতা একটা সমস্যা হয়ে ছিল। আদিম ও অপাপবিদ্ধ যৌনতার ভিতর থেকে লরেন্স মুক্তি অনুভব করেছেন। এবং এই অনুভবকে প্রকাশ করার সময় কামুর মতো লরেন্সও নিয়েছেন কবিতার আশ্রয়। আদিমতা এবং আদিম জীবনের মুক্ত প্রকাশের প্রতি দেখা যায় দু'জনেরই আগ্রহ। সুন্দর 'এনিম্যালইজম' দুজনেরই মুক্তির প্রতীক। জেনির মতো লরেন্সের নায়িকাও মিশে যায় মাটির উত্তপ্ত আঁধারে, বীজের নিঃশব্দ বিকাশে, তারকার আলোর রহস্যে। তারা গলে হয় চিরকালের প্রাণের অন্ধকার প্রবাহ।

এই গল্প সংকলনে জেনির মতো ভাগ্যবান হলো Growing Stone-এর নায়ক একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। জেনির মতো সেও যুক্ত হতে পেরেছিল, জেনির মতো তারও ঘুচে গেল বিচ্ছিন্নতা বোধ।

ইওরোপে শুধু লজ্জা ও আক্রোশ। সেই ইওরোপ থেকে ব্রেজিলের শহরে চলে এসেছে ইঞ্জিনিয়ার দ্য এরাস্ট। কিন্তু এই নূতন পৃথিবীর আদিম জীবন-যাত্রার আদিমতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারল না এই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। একদিকে তাকে টানে এই আদিম জীবনযাত্রার ঐশ্বর্য। আদিবাসীদের প্রতি সে অনুভব করে আন্তরিক টান। তাদের সঙ্গে মিলে যাওয়ার একান্ত আগ্রহ অনুভব করে সে। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার হারাতে রাজী নয় ইওরোপীয় সংস্কৃতি থেকে পাওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আদিবাসীদের যূথবদ্ধ নাচ তাকে টানছে। এ সত্য। অন্যদিকে তার মার্জিত বুদ্ধির নিষেধকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। এও সত্য। ইঞ্জিনিয়ার বিরোধে বিক্ষত হয়। ইওরোপেও ফিরে যেতে পারে না সে। ইওরোপে আছে শুধু ঘৃণা আর আক্রোশ। ইওরোপকে শাসন করে বণিক আর পুলিশ। প্লেগের নায়কের মতো মানসিক অবস্থা ইঞ্জিয়ারের।

জাহাজে আসার সময় রাধুনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ইঞ্জিনিয়ারের। রাধুনী মানত করেছিল যে ভালোয় ভালোয় দেশে পৌছাতে পারলে একটা পাথর মাথায় করে নিয়ে যাবে গির্জায় একটা তিথিতে। তিথির আগের রাত্রে খুব নাচগান করেছিল রাধুনী। সকালে পাথরটা আর গির্জা অবধি বইতে পারে নি। মাঝপথে ফেলে দিল। ইঞ্জিনিয়ার পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজে পৌছে দিল গির্জায় নয়, বন্ধুর বাড়িতে। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার ধার্মিক বিশ্বাস অর্জন না করে পেতে চায় ধর্মীয় আনন্দ। আর পাথরটা বইতে হবে রাধুনীকে। এই পাথর

বইতে না পারার ব্যর্থতা বোধ থাকবে তার-ই। সিসিফাসের পাথরটা অন্যভাবে এসেছে এই গল্পে। ইতিমধ্যে যেটুকু ইঞ্জিনিয়ারের প্রাপ্য তা হল এই সেবা, দীন ভাবে এমপিরিকাল পথে অগ্রসর হওয়া। রাধুনীর বাড়ির লোক স্বীকার করে নিল ইঞ্জিনিয়ারকে এবং সেই হল তার নব জীবনের সূচনা।

Guest এই সংকলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প। আলজেরিয়া প্রবাসী ফরাসী স্কুলমাস্টার ডারু নিজেকে নির্বাসিত মনে করে। এখানে সেও অনুভব করে মানুষের রক্ত লোলুপতা। একদিন এক ধৃত আরবকে পুলিশের হেফাজতে রেখে আসার নির্দেশ পায় ডারু। প্রথমে সে এই করতে অস্বীকার করে। পরে তাকে করতেই হয়। ডারু যত্ন করে আপ্যায়ন করে ধৃত আরবটিকে। সে বুঝতে পারে না। পরের দিন সকালবেলা পুলিশ ফাঁড়ির পথে গিয়ে অন্য পথ নেয় এবং তার পালাবার সুযোগ করে দেয়। প্রথমে সে বুঝতে পারে না। তারপর সে বোঝে যে ডারু তাকে পালিয়ে যেতে বলছে। সে চলে যায়। কিছুদূরে গিয়ে সে কৃতজ্ঞতায় হাত নাড়ায়। ডারুর চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু ফিরে দেখে স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর কারা লিখে রেখে গেছে: তুমি আমাদের এক ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছ। এর দাম তোমাকে দিতে হবে। যে কৃতজ্ঞতা যে উত্তাপ নিয়ে ফিরে এল ডারু তা চকিতে নিভে গেল। যে সম্পর্ক যে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছিল ডারু তা শেষ হয়ে গেল। সেই বিস্তীর্ণ নির্জন উপত্যকায় ডারু নিজেকে খুব একা বোধ করতে লাগল। নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গতা বোধ করার সঙ্গে অবিরাম বরফ পড়ার যোগাযোগ আছে তা প্রতীকের স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জেনি এবং ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া এই গল্পের অন্য কোনো চরিত্র কোনো উত্তরণ খুঁজে পায় নি। তারা তাদের সাম্রাজ্য খুঁজেছে; কিন্তু পায় নি। তারা বেদনার্ত, নিঃসঙ্গ এবং নির্বাসিত রয়ে গেল।

রীতির দিক কামু বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন রীতি প্রয়োগ করেছেন! The Adulterous Womanকে যদি কাব্যিক রীতির প্রকাশ বলে ধরা যায় তবে The Silent Manকে বলতে হয় গল্পের বাস্তবমুখী ধ্রুপদী প্রকাশ এবং The Renegadeকে বলা যেতে পারে ফকনরীয় রীতির সার্থক প্রকাশ। রীতির বিষয়ে সদাজাগ্রত ছিলেন কামু। তাই তাঁর কথায় "...problems of style and composition never cease to preoccupy me."

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে মানুষের সম্পর্কহীনতা এবং সম্পর্ক স্থাপনের

সমস্যা, যা কামুর সমগ্র সাহিত্যের সমস্যা, তা এই কটি গল্পে বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত এবং কামুর অনুরাগী এ দেশীয় পাঠকদের কাছে এই সংকলন সাদরে গৃহীত হবে।

জ্যোতির্ময় বসু

জন্মের নায়ক। কৃষ্ণ ধর। প্রতিভা, কলি-৯। দাম তিন টাকা।

"এ জন্মের নায়ক" কাব্যগ্রন্থকে কবি কৃষ্ণ ধর দুভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রথম ভাগের নাম "স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ", দ্বিতীয় ভাগের শীর্ষ নাম "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়"। "স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ"র কবিতাগুলি কবির স্মৃতিচারণা। এই স্মৃতিচারণায় কবির আকুতি কখনো প্রকাশ পেয়েছে প্রেমাস্পদের জন্য, কখন বা কবি অভিমান ভরে কিঞ্চিৎ ক্ষোভে মেনে নিয়েছেন, "আমাকে ডাকবে না তুমি। কোনোদিন আর ভুলেও ডাকবে না, জানি।" অর্থাৎ যে আবেগই প্রকাশ পেয়ে থাকুক না কেন প্রেমের জন্য, প্রেমিকার জন্য আকুলতা কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে বিরাজিত। কবি এ বিষয়ে সচেতন, তিনি জানেন

"এখানে আর ভালবাসা নেই
আছে তার স্মৃতিটুকু,
আগুনের মতো, ক্ষতের মতো, যা
আমাকে দিন রাত কাটছে।" (দুরন্ত চড়াই ও আমি)

তাই এমন নায়কের পক্ষে মৃত্যুচেতনা বাস্তব হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে "আমাকে ছলনা করো না তুমি", "সে আমাকে ভুলবে না বলেছিল ক্রন্দিত সময়ে"; "মনে পড়ে চঞ্চল রৌদ্রের কথা" প্রভৃতির মতো পংক্তি ভাষা ও উপমা পালটে প্রায় বার বার ঘুরে আসে, সেখানে কবির পক্ষে বলাই স্বাভাবিক যে,

"আমার যদি মৃত্যু হয়, তবে
জানবো আমি তোমাকে পেলাম শেষে,
এখন তুমি অনেক দূরে, নাগাল মিলবে না"

অথবা এমন পংক্তিই আমাদের হৃদয় হরণ করে যেখানে কবি নায়কের বিপদ ও ব্যথাকে অন্তহীন করে তোলেন। যেমন :

"আমি তো তোমাকে ডাকি, তুমি কবে ডাকবে আমাকে—
স্মৃতির অপর নাম মৃত্যু, দুঃখ শুধু আমাকেই ঢাকে।"

অথচ "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়…" পর্যায়ে কবি আশ্চর্যভাবে এক্ক

বেদনা, হতাশা, স্মৃতিচারণার ব্যক্তিগত জীবন পেরিয়ে যুক্ত হয়েছেন বৃহত্তর জগতের সঙ্গে, মহত্তম সত্তার সঙ্গে। সেইজন্য কবির নায়ক ট্রাজেডীর অন্তহীন বিপদ পরিত্যাগ করে আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,

"আর তোমার ওই
লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে
সেই কালোমানিকের পিদ্দিম জেলে
পৃথিবীকে আলো করো,
আফ্রিকা॥" (আমার আফ্রিকা)

এই পর্যায়ে তাই কবির নায়ক সমসাময়িক ঘটনায় বিচলিত হয়, এবং সেই ঘটনার আবর্ত থেকে স্বচ্ছ জীবনবোধ অনুসন্ধান করে। নায়ক জানে যে পৃথিবীর নানা বিষাদ ও দুঃখের মধ্যেও মানুষের আশা অন্তহীন, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত এবং মানুষ সেই সুখের জন্য উৎসুক। তাই "কন্যাকুমারিকায় একরাত্রি" কবিতায় জেলেদের ট্রাজেডি ও দুঃখের মধ্যে আমরা তিনজনের আশাবাদ উভয়ের বৈপরীত্যে এত উজ্জ্বল ও তীব্র হয়ে ওঠে। কবি কৃষ্ণ ধর এ রকম একটি কবিতা রচনা করেছেন, যা রসিক পাঠককে সহজেই অভিভূত ও মুগ্ধ করতে বাধ্য। "স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ" অধ্যায়ের কবিতাবলীতে কবির নায়ক যন্ত্রণায় বিদ্ধ ও কাতর, সে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে মরছে, অথচ "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়···" শীর্ষক কবিতাবলীতে কবির নায়ক সামাজিক পটভূমিকায় বৃহত্তর পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন বলেই সে জানে পথ কোথায় এবং সে জানে মানুষ যতই দ্বিধান্বিত ও কুণ্ঠাগ্রস্ত হোক না কেন, মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই কবি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন,

"আগে ছিল ওরা দুইজন
এখন গোটা শোভাযাত্রার দর্পণে
ওদের রোদে পোড়া মুখ দুটো
ভালোবাসায় জ্বলছে,

এগুলো মানুষের জন্য॥" (রূপান্তর)

"এ জন্মের নায়ক" এই রূপান্তরেরই অভিব্যক্তি। এমন বলিষ্ঠ আশাবাদের সোচ্চার ঘোষণার আজ একান্ত প্রয়োজন, বিশেষত আধুনিক বাংলা কবিতায়।

এসো নীপবনে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক সোসাইটি। দাম চার টাকা।

দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আয়োজনে অথবা অবকাশ যাপনের অলস প্রয়োজনে যাঁরা উপন্যাস পাঠ করেন, তাঁদের কাছে "এসো নীপবনে" যথেষ্ট সম্মান পাবে না—একথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো। কারণ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দুরূহ ও জটিল সমস্যার অবতারণা করেছেন বর্তমান উপন্যাসে, যে সমস্যাটি সমসাময়িককালের আধুনিক মনের সমস্যা এবং যা অনুধাবন করা আলস্যে সম্ভব নয়। অবনী, প্রীতি এবং হেমন্ত—এই তিনজনকে কেন্দ্র করে এবং তিনজনের মানসিক অবস্থা প্রক্ষেপ করে লেখক সামগ্রিক সমস্যা ধরতে চেয়েছেন। বর্তমানে হতাশা ও ক্লান্তির স্বরূপ এবং সেই ক্লান্তি ও ফ্রাসটেশান ব্যক্তি-মনের কোন্ অবস্থায় উত্থিত হতে পারে, তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, "এসো নীপবনে" উপন্যাসের লেখক ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ ও সামাজিক জীবনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। রাত্রি, সকাল, সন্ধ্যা—এই তিন পর্বে ভাগ করে লেখক একে একে অবনী, প্রীতি ও হেমন্তর ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে উক্ত চরিত্রগুলির একটি অখণ্ড সত্তা নিরূপিত করেন, ফলে পঙ্গু অবনী দৈহিক সুস্থতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যে আত্মরতিতে মগ্ন হয় প্রীতি মানসিক ভাবে সেই আত্মরতিরই অংশীদার হয় শেষ পর্যন্ত। এবং অবশেষে অবনীর আকস্মিক আত্মহত্যার সংবাদ শুনে প্রথমদিকে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিলেও, শেষ রক্ষা করতে পারে না, তাই স্বামী বর্তমান অবস্থায় সে অবনীর মৃতদেহের উপর মাথা কুটতে দ্বিধা করে না। বস্তুত, স্বামীর একটি অন্তঃশীলা লুব্ধতাই (অবনীকে ঠিকমত হাতে না রাখতে পারলে সম্পত্তি থেকে অনাদি বঞ্চিত হবে এই ভয়ে) প্রীতিকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ অবনীর সেবায় নিয়োজিত করেছে, প্রীতি হয়তো অভ্যাসের বশে প্রথম প্রথম অবনীকে ঘৃণা করলেও এই কবি মানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। এই ভালোবাসার মূলে একটি প্রচণ্ড স্বার্থ কাজ করলেও অবশেষে ভালোবাসার স্বাভাবিক নিয়মেই পঙ্ক থেকে পঙ্কজই প্রস্ফুটিত হয়েছে, আমরা প্রীতির অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমের জন্য সচকিত হলেও স্বাভাবিকতার জন্য আকৃষ্ট হই। অন্যদিকে হেমন্ত বিবাহিত জীবনে অসুখী এবং দীর্ঘদিন নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে পারে না বলেই নীহারকে দেখে মুহূর্তেই প্রেম নিবেদন করতে কুণ্ঠিত নয়। হেমন্ত অবনীর বন্ধু, অথচ অবনীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা গভীর হলেও অবনীর পিতার ঋণই যেন হেমন্তকে অবনীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী করেছে।

হেমন্ত সিনিক, সে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে সর্বত্রই প্রায় স্বার্থের বীজ দেখতে পায়। সেজন্য অবনীর মৃত্যুর পর তার জীবনী লেখার ব্যাপারে, চীফ রিপোর্টার ও পত্রিকা অফিসের মালিকের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোথায় যেন পরার্থপরতা অপেক্ষা স্ব-স্বার্থরক্ষার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রীতির সম্পর্কে তার ধারণা কিছুটা ধোঁয়াটে। আবার প্রীতির ফ্রাশটেশানের মূলে (ফ্রাশটেশানই বলবো) কি গূঢ় কার্যকারণ অথবা প্রতিক্রিয়া কাজ করছে লেখক তা দেখাতে চেষ্টা করেও হেমন্তর ধারণা স্পষ্ট করতে পারে না। লেখক এখানে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন বলে বোধ হয়। অবনীর দ্বিধা দুর্বলতা, নিরাসক্তি, হতাশার তাৎপর্য তার দৈহিক পঙ্গুতায় বিচার্য হলেও, হেমন্ত এবং প্রীতির হতাশা ও ক্লান্তির কারণ যথেষ্ট গভীরতায় নিমগ্ন হতে পারে নি বলে আমার বিশ্বাস। প্রীতির সঙ্গে অবনীর, অনাদির সম্পর্ক অতি সুন্দররূপে চিত্রিত, অথচ প্রীতির কোন্ মানসিকতায় অথবা কখন কোন্ পর্যায়ে অবনীকে ভালোবাসল, এই ভালোবাসার উৎস কোন্ মূলে, লেখক তার ইঙ্গিত দিলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তেমনি হেমন্তর মিশ্রিত অনুভূতির উৎস-সম্পর্কে লেখক আরও স্পষ্ট ও সহজ ধারণা দিলে উপন্যাসটি অনিন্দ্য হয়ে উঠত।

শান্তিরঞ্জন একটি সুন্দর পদ্ধতি "এসো নীপবনে" প্রয়োগ করেছেন। এক একটি অনুষঙ্গে স্মৃতিচারণা করে, কখনো অতীত ঘটনাকে আগে কখনো বা বর্তমান ঘটনাকে পরে সাজিয়ে ঘটনার গতি দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন রেখেছেন। এ পদ্ধতিতে চেতনা-স্রোতে গা ভাসিয়ে যে প্রকটতা লক্ষ্য করা যেত, শান্তিবাবু তা অতি সংযমে ও সতর্কে পরিহার করেছেন। যার ফলে উপন্যাসটি প্রকরণের এক নতুন আস্বাদ দেয়। শান্তিবাবু উপন্যাসটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে ঠিক তিনটি পর্বের মেজাজ অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন, সেজন্য তিনজনের স্বগতোক্তিও মিশ্রিত আবেগে বিভিন্ন স্বরের জন্ম দিয়েছে এবং তিনজনের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জনপ্রিয়তার মোহে সস্তা রোমান্টিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নি বলে শান্তিরঞ্জন রসিক পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন এবং উপন্যাস যে একমাত্র গভীর ও মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাৎপর্যমণ্ডিত হয় একথা "এসো নীপবনে" প্রমাণ করেছে। সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও এজন্য শান্তিবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কুশল লাহিড়ী

চিত্র প্রদর্শনী : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানা।

গত ৮ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানার চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজানা উভয়েই স্বশিক্ষিত শিল্পী, এবং প্রকাশ্য প্রদর্শনী উভয়েরই এই প্রথম। প্রদর্শনীটিতে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঠারোখানি এবং মণি জানার তেইশখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রথম প্রদর্শনীতেই উভয়ে প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশেষত উভয়েরই নানা আঙ্গিক, ভঙ্গি ও শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৃষ্টিশীল বলেই প্রতীয়মান হল। প্রদর্শনীটি চলাকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা উচ্চকণ্ঠে শিল্পীদ্বয়কে প্রশংসা জানিয়েছেন।

শিল্পী হিসাবে এই প্রদর্শনী 'পরিচয়' পাঠকদের নিকটে পরিচয়ের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পরিচয় প্রদর্শিত করেছে। শিল্পী হিসাবে তাঁর genre অনেকাংশে প্রতীকী আবার 'ফরেষ্ট' প্রভৃতি চিত্র ইমপ্রেশনিষ্টিক। ডে ব্রেক প্রভৃতি চিত্রে তিনি যেমন অতি-আধুনিক শৈলী (যেমন সংবাদপত্র দেখা, এক টুকরো দৈনিক স্টেটসম্যানের টুকরো চিত্রে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া) ব্যবহার করেছেন, আবার সানওয়ারশিপার, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি চিত্রে প্রকাশমানতা ও প্রতীকতার সমন্বয় এনেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত চড়া রঙ ব্যবহার করতে ভালোবাসেন মনে হল। রঙের বৈপরীত্যে মাঝে মাঝে চিত্রের রসগ্রহণে বাধাও সৃষ্টি করে। কৃষ্ণলীলা, হরপার্বতী, নটরাজ প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল বিষয়বস্তু ছাড়াও; লাঠি চার্জ, থ্রি ডান্সার্স, হাঙ্গার, ডে ব্রেক প্রভৃতি আধুনিক বিষয়ও তাঁর চিত্রে লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, প্রকৃতি, স্মৃতি ও মিথলজি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি মূল বিষয়বস্তু। চিত্রের স্পন্দন ছন্দ ও বর্ণচ্ছটায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বশিক্ষিত অঙ্কণরীতিতে পারদর্শিতা অর্জন করবেন বলেই আমরা আশা রাখি।

মণি জানার চিত্রগুলি একেবারে অন্য মেজাজের। তিনি যেমন পোর্ট্রেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি প্রতীকী চিত্রসহ নানাবিধ শৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ দেখিয়েছেন। সুধেন্দু উইথ সান, সুধেন্দু মল্লিক এবং সেল্‌ফ্ উইথ দি মুন তাঁর পোর্ট্রেট অঙ্কনের কৃতিত্বই অধিক স্পষ্ট করে দেখায়। তা ছাড়া আথার অব গুএরনিকা, শিশিরকুমার ইন মাইকেল'স রোল এবং মেলানকলি ক্লাউন চিত্রে পিকাসো, শিশিরকুমার এবং চ্যাপলিনকে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন। তাঁর চিত্রগুলিতে সারল্য, রেখার দৃঢ়তা এবং নিবিড় একাকিত্ব লক্ষণীয়। তাঁর 'ল্যাসিভিয়াস' একেবারে অন্য মেজাজের চিত্র, এটিতেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

আমরা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানার উত্তরোত্তর চিত্রে দক্ষতা কামনা করি। তাঁদের চিত্রপ্রদর্শনী সত্যই চমৎকার।

তরুণ সান্যাল